L'AME ENCHANTEE

॥ বিমুগ্ধ আত্মা ॥



মা ও ছেলে

রমাঁ রোলাঁ

[বিমুগ্ধ আত্মা ॥ ৩]

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলিকাতা ১২

১ বৈশাখ, ১৩৪৯

প্রকাশক বিমল মিত্র, ৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
মুদ্রক : মুরারিমোহন কুমার, শতাব্দী প্রেস লিঃ, কলিকাতা-১৪

যুদ্ধের তিরোভাব তো শান্তি নয়।
আত্মার সবলতা থেকে জন্ম নেয়
যে-শক্তি, তাই-ই শান্তি।

স্পিনোজা

এই উপন্যাসটির সমস্ত চরিত্র লেখকের কল্পনা প্রসূত। কোনো জীবিত ব্যক্তির নাম যাতে ব্যবহৃত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও যদি কারুর নাম উল্লিখিত হয়ে থাকে তবে সেটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং তার দ্বারা ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দেশ করা হয় নি।

মা ও ছেলে

Mère et Fils

॥ বিমুগ্ধ আত্মা ॥



প্রথম খণ্ড

॥ এক ॥

যুদ্ধকে ভয় পেল না আনেৎ। ভাবলে : সবই তো যুদ্ধ, মুখোশের আড়ালে যুদ্ধ···যুদ্ধ, তোমার মুখোমুখি দাঁড়াতে আমি তো ভয় পাই না!

তারই মতো, গোটা পরিবারটাও এই ঘটনার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র বিদ্রোহ করল না। সদ্যলব্ধ বিপদের অভিজ্ঞতা থেকে সে নিজে তাকে মেনে নিল নিয়তি হিসেবে। 'যা হয় হোক আমি প্রস্তুত'—মনে মনে সে বললে, তার বোন সিলভীও তাকে স্বীকার করে নিল। এই দিনটির গোপন প্রতীক্ষায় সে এত অধীর হয়ে উঠেছিল যে, চেপে রাখতে সে পারল না তার অসহিষ্ণু চিৎকার। অবশেষে! হাঁ, অবশেষে তার একঘেয়ে দিনগুলির পরিধি বিস্তৃত হবে, ভালোবাসা আর ঘৃণার বৃত্তের হবে প্রসার! এল, সেদিন এল! তার ছেলে মার্ক অনুভব করল এক থমথমে উত্তেজনা। আনন্দ নেই তাতে, আছে বিষাদ। কোনো কথাই সে বলল না, কিন্তু তার ভয়ার্ত চোখে আর হাতে ফুটে উঠল তারই আভাস। মনে হোলো, যে-বিয়োগান্ত আদর্শ তার মূলগত প্রবৃত্তির আহ্বানে জেগে উঠেছে তার ভয়ে সে উঠছে শিউরে, তার দুর্বলতা তাকে সে-আদর্শ থেকে পিছু হটিয়ে নিয়ে চলেছে। যৌবন তো তাকে স্বীকার করতে চায় না, কেন না তার আহ্বান সেই শৃঙ্খলিত শক্তির কাছে, যে-শক্তি বাঁচার যুক্তি-হারানো যুগের উদাসীন বিতৃষ্ণার নিচে চাপা পড়ে আছে। মার্ক দেখল, বয়স্করা ছুটে চলেছে কর্মের প্রেরণায়, আত্মোৎসর্গের উন্মাদনায়। তাদের এই উন্মাদনার বন্যা হয়তো দুদিন পরেই পঙ্কিল হয়ে উঠবে, কিন্তু এখন তো স্বচ্ছ, পবিত্র সে-ধারা। অন্তত যৌবনের সন্ধিক্ষণে প্রাকৃতিক উপদ্রবে কলঙ্কিত কিশোর তো তাই-ই মনে করল। সে নুয়ে পড়ে পান করল আত্মোৎসর্গের সেই তপ্ত পূতধারা আর তার গভীরের পাঁকও বুঝি। তাদের ভবিষ্যতকে সে ঈর্ষা করল, আবার ভয়ও এল তার মনে···চোখ বুজতেই মার চোখে মিলল তার চোখ, দুজনেই চোখ ফিরিয়ে নিল। পরস্পরকে তারা জানে, আরো বেশি করে জানতে তারা চায় না। কিন্তু তারা বুঝতে পারল, ঝঞ্ঝার আভাস দেখা দিয়েছে, আর তারই ভিতর দিয়েই তারা দুজনে চলেছে।

একজন শুধু উত্তেজনা অনুভব করল না। সে সিল্ভীর স্বামী লিওপোল্ড। কিন্তু তাকেই প্রথম রওনা হতে হোলো। সে হিসেব করে রেখেছিল যে পুরোনো টেরিটোরিয়াল শ্রেণী হিসেবে তার ডাক এত তাড়াতাড়ি আসবে না। রাষ্ট্রের বাঁধাধরা আইন কানুনের তারা বাইরে। ডাক যদি একান্তই আসে, পরে আসবে, কেন না, ধাপে ধাপেই তো উঠবে ডাক। কিন্তু এও তার ধারণা ছিল যে, যুদ্ধ তাড়াতাড়িই আসবে আর তাকে ভুলে ফেলে যাবে না। আর হ'লোও তাই। অপ্রত্যাশিত ভাবে এল যুদ্ধ আর সে তাকে স্মরণও করল বই কি! কাঁত্রের অধিবাসী সে। একেবারে পুরোভাগে গিয়েই দাঁড়াল। অথচ তার বয়সের লোক এ-সম্মানের লোভ অনায়াসেই ত্যাগ করতে পারত। বিদায়ের সময় যখন এল, তখন সে হাসিমুখেই যাত্রা করল। হাঁ, সে বাধ্য হোলো। সিল্ভী তখন বীরত্বের উন্মাদনায় ভরপুর, তাছাড়া অন্য মেয়েদের কাছ থেকে করুণার দৃষ্টি আশা করাও বৃথা। প্রতি মেয়ের স্বামী, প্রেমিক আর পুত্র চলেছে যুদ্ধে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ভিতরে এইটেই যেন একমাত্র স্বাভাবিক। কেউ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে বিপদ বাঁধতো বইকি। কিন্তু সাহসই কেউ করল না। এমনকি লিওপোল্ডও সে-কথা ভাবতে পারল না। এ এক হুকুম, একে মানতে হবে। গোটা পরিবার মেনেও নিয়েছে। তাছাড়া আছে ঐ খুদে শয়তান মার্ক। ওর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতো ঘুরছেই, একটু দুর্বলতা আবিষ্কার করতে পারলেই হয়েছে!···তাই লিওপোল্ডের গর্বোক্তিই শোনা গেল। বিদায় ভোজে সে সমস্ত কারখানার লোকদের স্বাস্থ্যপান করল, মন যদিও আসন্ন বিদায়ব্যথায় তখন ভারি হয়ে উঠেছে। ব্যবসায়ের ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত, সিল্ভী বেশ ভালো করেই দেখাশুনো করতে পারবে, এ-ধারণা তার ছিল। কিন্তু আর সব!···ও-চিন্তা না করাই বোধ হয় ভালো···এখন তো সিল্ভী লুক্রেশিয়া···গোল্লায় যাক মেয়ে মানুষটা!···বিদায়ের সময়ে সে চোখের জলে সিলভীর গাল দুখানা ভিজিয়ে দিল।

'এ তো এক অভিযান, আর কি চমৎকার!' সিল্ভী বলল: 'দেখো, ঠাণ্ডা লাগিও না!'

আনেৎ তাকে চুমু খেল (এইটেই বুঝি একমাত্র লাভ); তার দুঃখ হোলো লিওপোল্ডের জন্য, কিন্তু সে দুর্বল হয়ে পড়বে এই ভয়েই সে প্রকাশ করল না···তবে কি যাওয়া উচিত নয়? কিন্তু না গিয়েই বা উপায় কি!

সে উদ্বিগ্ন, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে আনেৎ-এর স্নেহকোমল চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু সেখানে সে আর কিছু আবিষ্কার করতে পারল না, শুধু পেল এক দৃঢ় বলিষ্ঠ উত্তর : 'হাঁ, তোমাকে যেতে হবে!'

একটা দেয়াল। বেরোবার পথ নেই, শুধু এগিয়ে যেতে হবে।

সে রওনা হোলো।

॥ দুই ॥

উঁচু তলা থেকে শুরু করে নিচু পর্যন্ত কেউ বাদ পড়ল না, মৌচাক থেকে মৌমাছির মতই ঝাঁকে ঝাঁকে তারা বেরিয়ে এল। প্রতি তলা থেকে এল অর্ঘ্য, প্রতি পরিবার থেকে পড়ল বলি। একেবারে নিচু তলা থেকে গেল দুজন শ্রমিক, দুজনেরই সন্তান-সন্ততি আছে। পাঁচতলা থেকে গেল বিধবার একমাত্র ছেলে, প্রয়ত্রিশ বছর তার বয়েস, এখনো বিয়ে করেনি। আনেৎদের তলা থেকে গেল ব্যাঙ্কের কেরানীটি, সবে সে বিয়ে করেছে। তারই নিচতলা থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের দুই ছেলে। তার পরের তলা থেকে আইনের অধ্যাপকের একমাত্র ছেলে। তারো নিচে থেকে গেল নিচতলার সেই কাঠ আর মদের দোকানদারের ছেলে···সবশুদ্ধ আটজন যোদ্ধা। কিন্তু স্বেচ্ছায় তারা যোদ্ধৃপদ বরণ করে নেয়নি। কেউ এবিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শও করেনি। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বাধীন নাগরিকদের সে-কষ্টটুকুও স্বীকার করতে দিতে রাজি নয়। আর নাগরিকদেরও আছে সম্মতি। বাস্, আর কি দরকার!

বাড়ির উপর থেকে নিচুতলা পর্যন্ত সম্মতির সুর বেজে উঠল। শুধু একজন বুঝি সে-সুরে সাড়া দিল না। সে নববধূ মাদাম শার্দনে, আনেৎ-এরই প্রতিবেশী। কিন্তু এত দুর্বল সে, অভিযোগ করবার তার সাহসই হোলো না, আরো কজন বুঝতে পারল কেন তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা, তাদের বাঁচার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন এসেছে, কেন আজ তাদের এক অদৃশ্য প্রভুর হাতে বলি হিসেবে সঁপে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তারা দু-একজন মাত্র, অন্য কেউ বুঝবার চেষ্টাও করল না। সম্মতির জন্য উপলব্ধির তো কোনো প্রয়োজন

নেই। আর জীবনের শুরু থেকে এই সম্মতি দেওয়ার জন্যই তারা লালিত পালিত হয়েছে। হাজার হাজার আত্মা সম্মতির এক সূত্রে আজ বাঁধা পড়লো, বিচার-বুদ্ধির তাদের প্রয়োজন নেই। পরস্পরের দিকে তারা চেয়ে থাকবে, পরস্পরকে তারা অনুকরণ করবে। মন আর শরীরের কলকব্জা আপনা থেকেই চলবে, কোনো চেষ্টার প্রয়োজন তো নেই।···হা ঈশ্বর! একপাল জন্তুকে তাড়িয়ে বাজারে নিয়ে যাওয়া তো খুব সহজ! বেশি কিছু তো দরকার নেই, চাই একজন মেষপালক আর গোটা কয়েক কুকুর। জন্তুরা যতো দলে ভারি হবে, ততোই তারা পোষ মানবে, ততো সহজেই তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে। কেননা, তখন তারা তো এক বিরাট সমষ্টি, সেখানে বিভিন্ন পালের সত্তা হারিয়ে গেছে···জনগণ যেন জমাট বাঁধা রক্ত···তারপর একদিন আসবে সেই বিরাট বিপ্লব, যেদিন জাতি আর ঋতু আবার নবীন জীবনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে—যুগে যুগেই তো এই পরিবর্তন আসে। তখন এই জমাট বাঁধা নদী দুকুল ছাপিয়ে উঠে বিধ্বস্ত করে দেয় সব, ভাসিয়ে নিয়ে যায় এই পচা গলা শবের স্তূপ।

এই বাড়ির বাসিন্দারা সবাই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন। কারো ধর্মবিশ্বাস, ঐতিহ্য বা প্রকৃতির সঙ্গে কারো মিল নেই। প্রতি পরিবারটাই যেন এক আত্মিক প্রকোষ্ঠ—প্রতিটিরই যেন এক নিজস্ব নিয়ম। কিন্তু তবু আজ তারা সবাই এই যুদ্ধকে স্বীকার করে নিল, নিল মেনে।

নিজের ছেলেদের তারা ভালোবাসে। প্রতি দশটি ফরাসী পরিবারের ভিতরে ন'টিতেই ছেলে হচ্ছে একমাত্র ভিত্তি, যাকে ঘিরে পরিবার গড়ে ওঠে। পঁচিশ কি ত্রিশ বছর বয়সে, যখন জীবন একরকম শুরুই হয়নি, তখনই তারা সন্তানদের হাতে নিজেদের অনাস্বাদিত আনন্দ আর উচ্চা-কাঙ্ক্ষার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু ডাক এলে তারা নিজেদের তো উৎসর্গ করেই, ছেলেদের উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করে না। এখানে তারা অভিযোগ করে না, বিদ্রোহ করে না।

পাঁচতলায় থাকেন বিধবা কাইয়ো, প্রায় ষাট বছর তাঁর বয়স। তাঁর তেত্রিশ বছর বয়সে স্বামী মারা যান, ছেলের বয়স তখন আট কি নয়। সেই থেকে তাঁরা পরস্পরকে একদিনের জন্যেও ছেড়ে থাকেননি। এমনি করেই কেটেছে দিন। মা আর ছেলে, দুটি যেন

বুড়োবুড়ি। ছেলে হেক্টর, ক্যাথলিক; বয়স এখনো চল্লিশ পার হয়নি, কিন্তু এরই মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর ধরন-ধারণ সে রপ্ত করে নিয়েছে। শুরু হবার আগেই তার জীবন গেছে শেষ হয়ে। কিন্তু এজন্য তার অভিযোগ নেই, অন্য জীবন সে কামনাও করে না।

বাবা ছিলেন পোস্টঅফিসের কর্মচারী। ছেলে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষ এক ধাপও এগোয়নি, একই জায়গায় রয়ে গেছে। এগোয়নি বটে, কিন্তু পিছিয়েও যায়নি। কেউ কি বুঝতে পারবে এইটুকু বজায় রাখতে কতখানি চেষ্টার প্রয়োজন? দুর্বল আর হতভাগ্যের কাছে তার পুরোনো অধিকার না হারানোই তো অগ্রগতি। ছেলেকে মানুষ করবার মতো সঙ্গতি মার ছিল না, তাই তাকে অবলম্বন করতে হয়েছিল হীন বৃত্তি। পোড়া কয়লা কুড়িয়ে নিজেকে আর ছেলেকে ভরণ-পোষণ করতে হয়েছে। একদিন যার ছোটোখাটো মধ্যবিত্ত সংসার ছিল, তার পক্ষে এ'তো কম দুঃখের নয়। কিন্তু তিনি কখনো অভিযোগ করেননি। এখন তাঁরা তাঁদের সেই হারানো স্বর্গে আবার ফিরে এসেছেন, ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন। এখন বিশ্রাম; ছেলের সঙ্গেই তিনি আছেন, ঘর-গৃহস্থালি দেখেন। সরল শান্ত মুখখানা তাঁর, সাদা লেস-দেওয়া টুপিতেই তাঁকে ভালো মানায়, তবু রবিবার দিন পাকা চুল-ভরা মাথায় সম্ভ্রান্ত মহিলাদের টুপিই তিনি পরেন। দাঁত কটা পড়ে গেছে, মুখের হা-টাও বেশ বড়, কথাও জোরে কখনো বলেন না। কিন্তু ছেলে আর পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর মুখে স্নেহের হাসি ফুটে ওঠে, হয়তো ক্লান্তির আভাসও তাতে পাওয়া যায়। কোমরটাও তাঁর একটু কুঁজিয়ে গেছে। বাড়ির ভিতরে তিনিই সকলের থেকে ভোরে ওঠেন, ছেলের জন্য কফি তৈরি করে তার বিছানায় পৌঁছে দিয়ে আসেন। ছেলে অফিসে গেলে ঘর দোর বেশ ভালো করেই সাফ করেন, রান্না করেন। রাঁধুনী তিনি ভালোই, আর ছেলেও তাঁর ভোজন-বিলাসী। সন্ধ্যেয় ফিরে ছেলে তাঁকে যে কথাগুলো সেদিন শুনেছে বলে যায়। খুব মন দিয়ে তিনি শোনেন না, কিন্তু শুনতে ভালোই লাগে। রবিবার তিনি গির্জায় যান, ছেলে যায় না। তাদের মধ্যে এ-নিয়ে একটি বোঝাপড়া হয়ে গেছে। ছেলে নাস্তিক নয়, আবার ঠিক আস্তিকও তাকে বলা যায় না। ধর্ম মেয়েদের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে—এই তার বিশ্বাস। তাই দুজনের জন্যই মাকে প্রার্থনা করতে হয়। বিকেলবেলা দুজনে একটু

বেড়িয়ে আসেন, কিন্তু মহল্লা ছেড়ে কখনো বেশি দূর যান না। ছেলে তো অল্প বয়সেই বুড়িয়ে গেছে। অল্প খরচা, একটু আধটু আনন্দ এই নিয়েই তারা খুশি—এক অভ্যস্ত খাতে তাঁদের জীবন বয়ে চলেছে—পুনরাবৃত্তিকে তাঁরা মেনে নিয়েছেন। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক এত গভীর যে, ছেলে বিয়ে করতে কখনো চায়নি, বিয়ে কখনো সে করবে না। তার বন্ধুবান্ধব নেই, নেই কোনো প্রেমিকা, পড়বার বইও নেই বললেই হয়, তবু তার বিরক্তি ধরে না। তার বাবা যে খবরের কাগজ রাখতেন, এখনো সেইখানাই সে রাখে, এই চোতা কাগজটা তিন তিনবার তার মত বদলেছে, কিন্তু সে বদলায়নি। খবরের কাগজের মতই তার মত। কৌতূহলও তার নেই, এ যেন এক যান্ত্রিক জীবন! এর মধ্যে মা আর ছেলের একঘেয়ে কথাবার্তা, চুপচাপ বসে থাকা বা রোজকার সাধারণ ঘটনা নিয়ে আলাপটুকুই যা ভালো। কোন প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁদের নেই—শুধু তাঁরা চান ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকতে—এ তাঁদের রীতিমত এক অভ্যাস। কিন্তু কোনো হাঙ্গামা বাঁধলে চলবে না! পরিবর্তন যদি আসে তো যত কম হয় ততই ভালো। চিন্তাও তাঁরা কমই করতে চান। দুজনে সুখশান্তিতে থাকবেন এই তাঁদের কামনা।

কিন্তু এই কামনাটুকুও তাঁদের পূর্ণ হোলো না। তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে এল যুদ্ধ, এল বিদায়ের আদেশ। মা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলেন। কোনো পক্ষ থেকেই অভিযোগ এল না। কেনই বা আসবে? শক্তি এনেছে নব ন্যায়ের বিধান, শক্তি গর্জন করে উঠেছে।

কাইয়োরা থাকেন আনেৎদের উপরের তলায়। আর তাদের নিচতলায় থাকেন বের্ণাদ্যাঁ পরিবার। বাবা, মা, দুই ছেলে আর দুই মেয়ে। এঁরা ক্যাথলিক, রিপাবলিকে বিশ্বাসী। মিদি থেকে এসেছেন।

বাবা ম্যাজিস্ট্রেট। বেশ হৃষ্টপুষ্ট বেঁটে লোকটি, বুনো শুয়োরের মতোই গা তাঁর লোমে ভরতি, ঘন দাড়িতে সারা মুখখানা ছেয়ে আছে। লোকটি ফুর্তিবাজ, তাই কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায়। নাগরিক জীবনধারায় তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন, কিন্তু কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বললে বুনো শুয়োরের মতই ক্ষেপে ওঠেন, পা দাপাতে থাকেন। কিন্তু কতক্ষণই বা তার মেয়াদ? হঠাৎ অফিসের কাজের কথা তাঁর মনে পড়ে যায়, তখনই তর্জন গর্জন যায় থেমে, তিনি আত্মস্থ হন, প্রশান্তি ফিরে আসে।

ছোট ছেলেটির বাইশ বছর বয়স, সবে আইন পড়তে শুরু করেছে।

ষোড়শ শতকের শেষদিকের ছুঁচোলো দাড়ি, পাতলা ঠোঁটের মিহি হাসি, ক্লান্তচোখের দ্ব্যর্থবোধক ভঙ্গী সে বেশ রপ্ত করে নিয়েছে। ছেলেটি ভালোই, কিন্তু মঁসিয়ে দ্য এপারনোঁর দলে ভিড়ে তারই দূষিত হাওয়া সে পূর্ণভাবে ভোগ করতে চায়। অন্য ছেলেটির বয়স আটাশ বছর। বেশ গোলগাল, নিখুঁত করে দাড়ি কামানো, শিল্পীর মতনই উপরের দিকে তুলে দেওয়া চুল। ঠিক বেরিয়ে-ধরনের যেন। ঢেউয়ের মতোই এসে কপালের উপর দু-এক গোছা পড়েছে। সে কামেলোদের মোকদ্দমায় ব্যারিষ্টার হিসাবে খানিকটা সুনাম অর্জন করেছে। রাজতন্ত্র ফিরে এলে সে সীলমোহরের দপ্তরের ভার পাবে। পরিবারে তিনটি স্ত্রীলোক, মা আর দুটি মেয়ে, তাঁরা ঘুরে বেড়ান অন্তরালে (আনেৎ-এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে অনেক পরে)। তাঁরা নিজেদের সত্তাকে লুপ্ত করে দিয়েছেন, পড়াশুনোও বিশেষ করেন না, সব সময়ই বাড়িতে থাকেন, থিয়েটারে কখনো যান না, কিন্তু গির্জায় প্রায়ই যান, ধর্মকর্ম নিয়েই থাকেন।

পুরুষ তিনজনই প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রাচীন সংস্কৃতির কঠোর আওতায় তাঁরা বেড়ে উঠেছেন। লাটিন ভাষায় তর্ক-বিতর্ক করা তাঁদের পক্ষে বরঞ্চ সহজ, কিন্তু দেশের বাইরে গিয়ে ইংরেজি বা জার্মান ভাষায় পথের হদিশ জিজ্ঞেস করা শক্তই হবে। এবং তাঁরা তাতে রাজীও নন। উত্তরের বর্বরজাতিই বুঝবে তাঁদের ভাষা। অতীতের আদর্শের ভিতরেই তাঁরা বেঁচে আছেন। সৎ খ্রীষ্টান হিসেবেও তাঁরা মাওরাসের আদিম ভাবধারাকে বিশ্বাস করেন; হাঁ, লোক ছিলেন বটে মাওরাস! চপল স্বভাব তাদের, যখন আড্ডায় বসেন দু-একটা বাজে আলাপও করেন বই কি। যখন পরিবারের ছজন একসঙ্গে প্রার্থনা করেন, সে এক চমৎকার দৃশ্য। সংকীর্ণ তাদের দিগন্ত, কিন্তু ফরাসী দেশের দৃশ্যাবলীর মতই সুস্পষ্ট। পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট শহরের দৃশ্য যেন—শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেছে, কিন্তু পরিবর্তন হয়নি। পারীর এই মহল্লাগুলিও যেন ছোট্ট একএকটা প্রাদেশিক শহর। তাদের দেয়ালের বাইরে কি আছে অধিবাসীরা তা জানতে চায় না। তাই বিরূপতাও তাদের নেই। শুধু আছে বিদ্রূপের ভাব, কিন্তু তার কারণ কি, তাও তারা জানতে চায় না। তারা তাদের দেয়ালের বাইরের সবকিছুকেই অস্বীকার করে, নিজেদের বৃত্তের ভিতরে নিজেদের জন্যই বেঁচে থাকতে চায়।...সবার উপরে আছেন ভগবান—আকাশের খিলান যেখানে—

সাদা মিনারে সন্ত সলপিসের ঘণ্টা-ধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। আর কি চাই।

কিন্তু যখন রিপাবলিক তাঁর দুই ছেলের দাবী জানালো, যে শত্রুর মেসিনগানকে তাদের নিজেদের মাংস দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে হবে, কেউ তারা আপত্তি করলেন না। দুজনই দুঃখিত হলেন, কিন্তু কারো চোখে মুখে ফুটে উঠল না তার ব্যঞ্জনা। তারা জানতো সীজারের প্রাপ্য সীজারকেই মিটিয়ে দিতে হবে। ভগবান ততো কড়া মনিব নন। আত্মা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট। দেহের দাবী তিনি ছেড়েই দিয়েছেন। এমন কি মানুষের কাজের উপর তার দাবীদাওয়া নেই। সদিচ্ছা থাকলেই যথেষ্ট। এতে সীজারেরই লাভ।

তেতলায় থাকেন মঁসিয়ে ঝিরের। আইনের অধ্যাপক তিনি। ক'বছর হ'লো তিনি বিপত্নীক হয়েছেন, ছেলেকে নিয়েই থাকেন। একটু ভিন্ন প্রকৃতির লোক তিনি, যদিও মিদি থেকেই এসেছেন। তিনি শার্দনের প্রটেস্টাণ্ট। নিজেকে তিনি স্বাধীন মতাবলম্বী বলেই মনে করেন (আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেরই টালি-ছাওয়া মগজে এই মোহটুকু আছে)। বের্ণাদ্যাঁরা বলেন, লোকটা মনে মনে য়্যুগেনো। তাঁরা তাঁর ধরন-ধারণ দেখে হাসেনও। তাঁর চেহারাটাও প্রচারকের মতোই রাসভারী। খাঁটি লোক তিনি, কর্তব্য সম্বন্ধে খুবই কড়া, নানা নৈতিক কুসংস্কারও তাঁর আছে—কিন্তু করুণার কণা মাত্র নেই। উপরের তলার প্রতিবেশীদের উপর শ্রদ্ধা তাঁর আছে, তাছাড়া নিজের ব্যবহারও তাঁর খুবই ভদ্র, কিন্তু প্রতিশোধ নিতে তিনি কখনো ছাড়েন না। কথায় বলে, যার যে-রকম ব্যবহার তাই দিয়ে তাকে জব্দ করা—তিনিও তাই করেন। ন্যায়পরায়ণ হবার সাধু চেষ্টা তিনি করে থাকেন, কিন্তু ক্যাথলিকতা তাঁর কাছে এক কলঙ্ক, এক পঙ্গুতা, সেরা মানুষগুলোকেও ওতে নষ্ট করে দেয়—এই তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস। লাতিন জাতিগুলির অবনতির কারণও এই থেকে আবিষ্কার করতে তার দ্বিধা নেই। কিন্তু তাহলেও তিনি একজন নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিক। তিনি যা কিছু বলেন বা লেখেন, তাতে এই মোহটাকে সাবধানে এড়িয়েই যান। এতে বিপদও কম নেই। কেমন যেন লেখা মিইয়ে যায়, একঘেয়েমি দেখা দেয়। তাঁর বক্তৃতায় তো এ জিনিষটা বেশি করে ধরা পড়ে। সেগুলি নজিরে ভরা, টীকায় কণ্টকিত। একঘেয়ে নাকি সুরে সেগুলো তিনি পড়ে যান। কিন্তু তিনি নিজেই জানেন না, যে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিচ্ছে। জানবেনই বা

কেমন করে, এ-ধারণা যে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে! তাছাড়া নতুন ভাবধারাকে গ্রহণ করবারও তাঁর শক্তি নেই। বহু পড়াশুনো তিনি করেছেন, জীবনের অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে, কিন্তু পাকা চুলের নিচে এমন এক সরলতা লুকিয়ে আছে যা হাস্যকর, মর্মস্পর্শী আবার ভীতিজনকও বটে। কেননা এই তাঁর অন্ধ গোঁড়ামির আকর। এ এক উচ্চ নীতিবোধ, এক স্ফীত মানসের পরিচয়। যাঁরা তাঁর মতের পোষক নন—তাদের তিনি বুঝতে পারেন না।

তাঁর ছেলেও তাঁরই মতো। সে সরবোনে পড়া ডাক্তার। তিরিশ বছর বয়সেই এক চমৎকার গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছে। কিন্তু এখনো নিজের ভাবধারার চশমার ভিতর দিয়েই পৃথিবীকে দেখছে। অবিশ্যি তার নিজের ভাবধারার সে-চশমা। একজন চক্ষু-চিকিৎসককে দিয়ে যে চশমা পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত, একথা তার মনেই হয়নি। তার বাবারই মতো তারও ধারণা; প্রারম্ভে সত্য নয়, প্রারম্ভে এল তত্ত্ব। রিপাবলিক তো একটা তত্ত্ব। প্রথম বিপ্লবে যে সুবিধা সুযোগ পাওয়া গেছে তাকে উপপাদ্য হিসেবেই প্রমাণ করা যায়। এই যুদ্ধ সেই প্রমাণ প্রয়োগেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। পৃথিবীতে গণতন্ত্র আর শান্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই এর প্রয়োজন। বাবা আর ছেলে একথা একবার ভেবে দেখেন না যে, হয়তো শান্তি দিয়েই শুরু করলে ভালো হয়। যারা শান্তি ভঙ্গ করছে, তারা যে অধস্তরের মানুষ, সত্যকে তারা দেখতে চায় না, স্বীকার করতে চায় না—এ-প্রশ্নও তাঁদের মনে জাগে না এবং আজ এই লোকগুলোকে তাঁদের নিজেদের এবং পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য যে একথা বুঝিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে এ-সম্বন্ধেও তাঁরা অজ্ঞ।

এই দুজন মানুষ, বাপ আর ছেলে—এরা যেন দুভাই—দুজনের চেহারায় সৌসাদৃশ্য আছে, দুজন দুজনকে ভালোও বাসেন। লম্বা, পাতলা চেহারা, সন্দেহের অবকাশ নেই এমন এক ভাবধারায় তাঁরা আচ্ছন্ন। তাঁদের গণতান্ত্রিক মতবাদের কাছে তাঁরা নিজেদের বিজ্ঞানকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের মতবাদই তাঁদের বিবেক, অন্য বিবেকের ধার তাঁরা ধারেন না। দৃঢ় তাঁদের বিশ্বাস, হয়তো বিপদের সামনে দাঁড়িয়েও এ-বিশ্বাস তাঁদের অটুট থাকবে (ছেলে তো বিপদের মুখেই ছুটে গেল, সে গেল ট্রেঞ্চে; বাপের মনও ছুটে গেল তারই সঙ্গে দুঃখ সহ্য করতে।) হাঁ, বিশ্বাস তাঁরা করেন বইকি; আর তাঁরাই স্বাধীন মতাবলম্বী বলে ভান করেন।

ছোট ঝিরের লিডিয়া মুরিসিয়েরকে বাগদান করেছে। চমৎকার মেয়ে,

তেজস্বিনী। জেনেভার এক সমৃদ্ধ পরিবারের কন্যা। সে তার সঙ্গে প্রেমে পড়েছে, আর ছোট ঝিরেরও তাকে ভালোবাসে—তবে তাতে নীতির গন্ধই বেশী। লিডিয়ার ভালোবাসা ঠিক ধর্মসম্মত নয়, বরং তাকে অপবিত্রই বলা যায়। কিন্তু ছোট ঝিরের-এর মতো ধার্মিক তাকে হতে হবে বইকি, তাই সে চেষ্টা করছে—যেমন তার হাসি হাসি নীল চোখ দুটিতে মাঝে মাঝে গাম্ভীর্য আনতে চেষ্টা করে, তেমনি আর কি! মনের দিক থেকে এমনি অপবিত্রই হয়তো সে থাকত। হয়তো জীবন থেকে স্বাভাবিক আনন্দই পেতে চাইত; চাইত এই পৃথিবীকে, এই জল, হাওয়া, ঋতু, স্বাস্থ্য, রোদ আর প্রেমিকের ভালোবাসা,—যদি তার প্রিয়তম তার জীবনের সুখ, জীবনের বাইরে ভাবধারার ভিতরে না খুঁজতে যেত। কি আর করবে সে! নিজের সুখ সে তার প্রিয়তমের মতোই জীবনের বাইরে খুঁজছে। এই ছোট্ট সুইস মেয়েটি যদি একা থাকত, তাহলে তাকে এই জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষে কোনো পক্ষই যোগ দিতে হোতো না, এবং ফরাসী প্রজাতান্ত্রিক শাসনের বাঁধাধরা বুলি, বিপ্লবের ইতিহাস, কি মানুষের দাবীর কথাও মুখস্ত করতে হোতো না।···তার নিজের সহজাত প্রবৃত্তির আহ্বান শুনলে সে তাকে এই বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করে আনতে পারত বইকি! এই যুদ্ধ তাকে কি উদ্বিগ্নই না করে তুলল! এযে তার চিন্তারও বাইরে। কিন্তু তার প্রেমিক যখন একে অন্য চোখে দেখল, নিজেকে সে ভৎর্সনা করল। সে দুর্বল, তাইতো সে ভুল করেছে। ওর উপযুক্ত হতে হলে চোখ বুজে তাকে থাকতে হবে···হে আমার প্রিয়তম, আমি বিশ্বাস করতে চাই, তোমার কথাই আমি বিশ্বাস করতে চাই, তোমার কথাই আমি বিশ্বাস করতে চাই। তোমার বিশ্বাসই তো আমার বিশ্বাস···

ক্লারিস শার্দনেই বাড়ির ভিতরে একমাত্র লোক যে বিশ্বাস করতে চাইল না। সে আনেৎ-এর প্রতিবেশী, একই তলার বাসিন্দে। না, না! তার ভালোবাসা নিজেকে উৎসর্গ করতে চায় না, প্রেমিকের মিথ্যা মতবাদের কাছে প্রেমিককে বলি দিতেও সে চায় না···না, তাও সত্যি নয়। তার স্বামী'ও বিশ্বাস করল না। কিন্তু জনসাধারণের মতামতের প্রতি আছে তার 'শ্রদ্ধা আর ভয়'। ব্যাঙ্কের নগণ্য কেরানি, সুন্দর ছেলেটি, পাতলা গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, বিবর্ণ তার মুখ আর অনুজ্জ্বল দুটি চোখ। পৃথিবীর ঘটনা, ব্যাঙ্কিং,

রাজনীতি—এমন কি তার নিজের দেশও তার কাছে তুচ্ছ। জগতে একমাত্র সার বস্তু যে-খুদে মেয়েটিকে সে গ্রহণ করেছে সে—না, মেয়েটিই তাকে গ্রহণ করেছে? তিনমাস আগে তাদের বিয়ে হয়েছে। তিনমাস! কি সেই মাসগুলি!···পরস্পরকে তারা এখনো বুঝি পরিপুর্ণভাবে পায়নি। তারা পরস্পরের হাত চেপে ধরল, ক'মাসের অতিক্রান্ত রাতগুলির কথা ভেবে শিউরে উঠল। এই কামনাময়ী নারী তাকে জড়িয়ে ধরেছিল—কি নিবিড় সে আলিঙ্গন! পারীর এক ছোট্ট মেয়ে তাকে দেবতার মতোই পুজো করে। দেবতা তো তারই, তার কামনার ধন, তার খেলনা, তার প্রিয়তম, তার পোষা জীব, যদি তার আত্মা থেকে থাকে সে তার আত্মা। সে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি!···মেয়েটি ছিপছিপে, জ্বোরো রোগীর মতো উত্তেজনাময়ী, মখমলের মতো চোখ, ঠোঁট দুখানি এক রক্তরেখার মতো, কতো যত্ন করেই না সে ঠোঁটে রং মাখে। কামনা তার ঠোঁটের রক্ত চুষে নিয়েছে, সে তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। না, অবাক সে হয়নি, এই ক্ষুধার্ত জীবের হাতে সে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। তারা পালা করে পরস্পরের শিকার হয়েছে। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেনি তাদের খেলা শেষ হয়ে এসেছে···জীবনের আর কোন মানে নেই···

কিন্তু যুদ্ধ যখন এল, অভিযোগ না করে সে উঠে দাঁড়াল। আনন্দের ব্যাপার এ নয়, সেও সাহসী নয়। সে হয়তো কাঁদতো, কিন্তু দুর্বলতা প্রকাশ করলে পাছে কেউ ঠাট্টা বা ঘৃণা করে তাই সে কাঁদল না। হয়তো বেশি ভালো-বাসাটাও খুব পৌরুষের পরিচয় নয়। ক্লারিস বুঝতে পারল, সে চিৎকার করে উঠল: 'ভীরু, ভীরু!'

তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল।

সে তখন রাশ টেনে ধরেছে, বিদ্রূপ করে বললে:

'ভীরু! যে বীর হতে চলেছে, তাকে উপযুক্ত খেতাবই দিলে বটে!'

দেশের জন্য মরতেই সে চলেছে! ক্লারিস তাকে থামতে বলল, অনুনয় করল। শোকাবহ শব্দটি শুনে সে ভয় পেল। তারপর সে ক্ষমা চাইল। আর স্বামী পেল তার জলন্ত দেশাত্মবোধ জাহির করবার সুযোগ, তার সাহস জাগিয়ে তোল-বার উপায়ও বুঝি। ক্লারিস আর অভিযোগ করতে সাহস পেল না। একা, সে একা! কি ভাবছিল তখন সে নিজেই জানে না। সমস্ত পৃথিবী (সে তো তুচ্ছ) আর তার স্বামী (তার সব কিছু তো সেই) হয়তো তার নাম দেবে বিদ্রোহ, কিন্তু সে তো জানত তার স্বামীর মনের গভীরে তারই মতো ভাবনা তখন জেগে

উঠছিল, হাঁ অসুখী যৌবনেরই প্রশ্ন···দেশের জন্যে কি মরতে হবে? না, না! দর্শকের জন্য, গ্যালারীর হাততালির জন্য!···পুরুষরা এমনিই ভীরু! তাদের নিজেদের সুখটুকু রক্ষা করবার সাহসও তাদের নেই।

বেচারা, বেচারা পুরুষ! ক্লারিস তার চোখের জল মুছে ফেলল। পাদ-প্রদীপের সামনে এসে তারা দাঁড়িয়েছে। হাসতে তাকে হোলো, স্বামী তাই-ই চায়। নেপথ্যে গিয়ে কাঁদবার সময় তো ঢের আছে।···হাঁ, তুমিও···আমাকে প্রতারিত করতে চেও না! তুমিও তো মৃত্যুকে অনুভব করছ তোমার হৃদয়ে! তবে—ভীরু, ভীরু, তবে কেন চলে যাচ্ছ?

সেও তার মনের ভাষা পড়ল, আপন মনেই ভাবল: জোরে চিৎকার করে উঠল; কিন্তু কি করতে পারে মানুষ?

কিন্তু ক্লারিস, পতিব্রতা ক্লারিস বুঝতে পারল না। বুঝতে পারল না কি ব্যথা বাজছে তার বুকে, কেন সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কি আবার করবে? এইখানেই থাক।

সে ঘাড় নাড়ল, নিরুৎসাহ হোলো।

আজ সমস্ত পৃথিবী ওর বিরুদ্ধে! তার স্বামীর বিরুদ্ধেও তো! তাই সে রেগে উঠল! স্বামী তো বলছে, পৃথিবী ঠিকই করেছে। সে মেনে নিয়েছে, বশ্যতা স্বীকার করেছে পৃথিবীর কাছে। কিন্তু কেন?

একেবারে নিচুতলার কুঠরির বাসিন্দা দুজন শ্রমিক। পেরে কাজ করে চামড়ার কারখানায় আর পেলতিয়ে ইলেক্ট্রিকের কারখানায়। তারা যুদ্ধের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়াত, কিন্তু কাউকে সাথী পেলো না বলেই যুদ্ধের মিছিলে ভিড়ে পড়ল। অন্য উপায় যে নেই! তারা সোসালিস্ট, নিজেদের আদর্শ নিয়েই রওনা হোলো।

এক সপ্তাহ আগেও পেরের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধ আর হবে না। ওসব খবরের কাগজের বাজে কথা, জুয়া খেলতে বসে মন্ত্রী আর রাজনীতিজ্ঞের দল অমনি মিথ্যের জাল বুনে যান।—'এই মানুষ-ব্যবসায়ীদের কেউ যদি আমাদের ভিতরে শিকারের সন্ধানে আসে, আমরা ছেড়ে কথা কইব না। হাঁ, আমাদের উপর নির্ভর করতে পার—আমরা ইণ্টারন্যাশনালের লোক—ঝোরে, ভাইয়াঁ, গেদ, রেনোদেল, ভিভিয়ানি এবং আর আর প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভর করতে পার। তারপর আছে সীমানার ওপিঠে আমাদের

সাথীরা, জার্মান সাথীরা···পেলতিয়ে, শুনছ! এই তো কদিন হোলো আমরা এক সভা করেছি। সব ঠিক, সাঙ্কেতিক শব্দও বলে দেওয়া হয়েছে। এই বদমায়েসগুলো এবার যদি সৈন্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করে, তাহলে আমরাও আমাদের কাজ শুরু করব।'

পেলতিয়ে হেসে বললে :

'সাঙাৎ, তুমি দেখছি নেহাৎ ছেলেমানুষ!'

পেরে রেগে উঠল। সাঁইত্রিশ বছর তার পেরিয়ে গেছে, আর এই সাঁইত্রিশ বছরের কঠোর পরিশ্রমের দাম ওদের পঞ্চাশ বছরের নিষ্কর্মা জীবনের চাইতে ঢের বেশি। কিন্তু পেলতিয়ে শান্তভাবে উত্তর দিল :

'সত্যি কথা! খুব পরিশ্রম তোমাকে করতে হয়েছে। তাই ভাববার সময় পাওনি।'

পেরে তীব্র প্রতিবাদ করল, ওদের পত্রিকায় গত সংখ্যায় প্রকাশিত একটা প্রবন্ধ তাকে পড়তে দিল। এইটেই একমাত্র পত্রিকা যে তার মনের মতো করে মিথ্যের জাল বুনে যেতে পারে। পেলতিয়ে কাঁধে একবার ঝাঁকুনি দিয়ে শ্রান্তস্বরে বললে : 'ওতো কথার কথা! দেখো যখন সময় আসবে, সবাই মার্চ করে বেরিয়ে পড়বে।'

হাঁ, মার্চ করেই তারা চলে গেল। যেমন করে কাপুরুষ মাতাদরের গুপ্ত ছুরিকার আঘাতে ষাঁড় লুটিয়ে পড়ে, তেমনি করেই একদিন নিহত হলেন ঝোরে, শোকবিহ্বল পারী তাঁর প্রেতকৃত্য শেষ করল। বক্তৃতার পর বক্তৃতা, ঝরতে লাগল বক্তৃতার বৃষ্টি। কিন্তু যাঁর জন্যে এই বক্তৃতা তাঁর নিজের কথা বলবার দিন তখন শেষ। তাঁর কফিন ঘিরে কাঁদল পারী। কেউবা ভাবল : 'ও মরল না বেঁচে গেল!'

কিন্তু জনগণ রইল প্রতিশোধের প্রতীক্ষায়, হাঁ, সে-আদেশ আসবে বই কি—তাদের ব্যথা ঘুচে যাবে, অন্ধকারে দেখা বিদ্যুতের ঝলক। কিন্তু বাগ্মিতায় মুখর সেই সব মুখ থেকে আদেশ তো উচ্চারিত হোলো না। নিস্থত হোলো মৃত্যু আর আত্মোৎসর্গের কথা। তাঁরা বললেন :

'আমরা শপথ করছি, ঝোরের মৃত্যুর আমরা প্রতিশোধ নেব।'

কিন্তু একথা স্পষ্ট উচ্চারণ করবার আগেই তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। যারা তাঁর মৃত্যুর কারণ, সেই যুদ্ধের দালালদের দলেই তাঁরা ভিড়ে পড়লেন। তাঁরা জনগণকে আদেশ দিলেন :

'যাত্রা তোমাদের শুরু হোক, হত্যা কর তোমরা। এস, আমরা আমাদের ভাইয়ের মৃতদেহের উপর এক পবিত্র সংঘ গড়ে তুলি!'

জার্মান সাথীদের মুখেও উচ্চারিত হোলো ঐ একই কথা।

জনগণ হতবাক। তাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই তারা তালে তালে চলতে শুরু করল! বিচার-বুদ্ধি তো তাদের ব্যাপার নয়। যাঁদের উপর তারা বিচার করবার ভার দিয়েছে, তাঁরাই যখন যুদ্ধের পথে তাদের নিয়ে চলেছেন, তখন তো যেতেই হবে। পেরে নিজের মনকে বোঝালে ইণ্টারন্যাশনাল আর জনগণের জন্যই সে যুদ্ধে চলেছে। যুদ্ধের পরে তো আসবে সেই স্বর্ণ যুগ! হাঁ, গেলার বড়িটাকে কোনোরকমে গিল্টি করে না নিলে চলবে কেন? পেলতিয়ে, মোহ-বিচ্যুত পেলতিয়ে বলল: 'হাঁ, ঐ আশায়ই বসে থাক! আমার তো বাপু জনগণের কথা শুনে শুনে বিরক্তি ধরে গেছে। এবার নিজের কথাই ভাবব। সবাই যা করেছে, আমাকেও তাই করতে হবে।'—সোসালিজমের হোমড়া-চোমড়ারাই যখন পেছু হটেছেন, আপোস করেছেন, তখন সে আর কি করবে?

পেলতিয়ে আপোসই করল।

সারা বাড়িতে অনুভূতির প্রবল ঝড় বইল না। জার্মানদের উপর তারা রেগে উঠল, কেন না ওরাই তো আক্রমণকারী (হাঁ, তা ওরা তো বটেই! কিন্তু একথা নিয়ে আলোচনা উঠল না, কারণ ওতো জানা কথা!) যুদ্ধ তারা চায় না, কিন্তু ওদের শিক্ষা দিতে তারা চায়। তাদের আত্মোৎসর্গের চেতনা জাগিয়ে তুলল তাদের উদ্দীপনা। কিন্তু ঘৃণার তখনো জন্ম হয়নি।

শুধু একতলার কাঠ আর মদের ব্যাপারী রাভুসার মনেই যা একটু ঘৃণা ছিল। লম্বা-চওড়া লোকটি, বুকের ছাতিখানা বেশ বড়, কাঁধ দুটোও চওড়া, বেতো পা দুখানা টেনে টেনে সে চলে। জার্মানদের কথা উঠলেই সে থুথু ফেলে, গাল দেয়। ছেলে ক্লোভির উপর তার হিংসে হোলো। হুনদের পেট ফাঁসাতেই তো সে চলেছে। ছেলেও মহা খুশি, এযেন এক বনভোজন! সেখানে গিয়ে সে পাবে বীয়ার, গ্রেচনদেরও সে পাবে বই কি। তারা হাসল, চিৎকার করল···কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যেত, বুড়ো তার সন্তানকে, একমাত্র সন্তানকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে বাধ্য হয়ে অস্থির হয়েছে। তাই সে উদ্বিগ্ন আর তার সেই অস্থিরতাকে সে চিৎকার করে দাবিয়ে রাখছে।

যদি সে···যদি তারা···ভগবান, তারা যদি ওকে মেরে ফেলে! তাতে কি হয়েছে! বাড়ির আবহাওয়ায় এখন আত্মমর্যাদার থমথমে ভাব : নেই আলোড়ন, নেই দুর্বলতা, শুধু আছে এক বশ্যতা—এক বলিষ্ঠ ধর্মের কাছে নতি স্বীকার! তারাও দেখালো তাদের আত্মবিশ্বাস, এক অজানা দেবতার কাছে ধনুকের মতোই নুয়ে পড়ল। নিজস্ব ভাবনা রাখল গোপন করে।

·

সবাইকেই কি দেখে এসেছি? বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতে গিয়ে কাউকে ভুলে যাইনি তো?

হাঁ, হাঁ ছ'তলার ছোট্ট ঘরে, কাইয়োদের পাশাপাশি লেখকটি আছে, সেই তো বাদ পড়ে গেছে। ছোকরা লেখক, উনত্রিশ বছর বয়স তার। নাম, জোসেফিন ক্লাপিয়ে, বুকের দোষ আছে বলেই সৈন্য বিভাগ থেকে রেহাই পেয়েছে। নিজের গর্তেই সে থাকে। এবিষয়ে তার নিজের প্রবৃত্তিই তাকে সাবধান করে দিয়েছে। বাড়ির বাসিন্দারা তাকে করুণা করে। কিন্তু করুণা এমনি সৌখীন জিনিস যে বেশি বাড়াবাড়ি চলে না। আর ক্লাপিয়েও খুব সাবধানী। তার বিবেকও সুস্থ নয়। নিচের তলায় দুটি চোখের সজাগ পাহারা বসেছে—ও, তার নামও করিনি বুঝি! সে ব্রশ । তাকে এড়িয়ে যাওয়াও চলে না, কেন না যে স্ত্রীলোকটি বাড়ীর খপরদারী করে তার স্বামী সে। পুলিশের গোয়েন্দা সে, ডাক তার আসেনি। দেশেই তার চোখ আর হাতের মুঠো দুটোর প্রয়োজন। তার কাজ তাকে বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি, পাড়েই রেখে গেছে। কিন্তু তাহলেও সে যোদ্ধা বই কি! পিছনের শত্রু আর সন্দেহজনক লোকদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে তো হবে। নিজের বাড়ির উপর তার খুব দরদ। এখানে ওসব ঝামেলা নেই। হয়তো তার জন্যেই ভাড়াটেদের উপর সে কড়া নজর দেয় না, বরং একটু ঢিলেমিই দেখায়। কিন্তু সবার আগে কর্তব্য, তাই ক্লাপিয়ের উপর কড়া নজরই সে রাখল। ক্লাপিয়ে আবার শান্তিবাদী।

এইখানেই শেষ। বাড়ির পাহারাদার কুকুর নিয়ে বাড়ি ঘোরা আমাদের শেষ হোলো। সব জায়গায় আমরা ঢুকে দেখেছি, শুধু দোতলায় যাইনি। গোটা দোতলাটাই বন্ধ। পবিত্র স্থান, মালিকের বাস এখানে। মঁসিয়ে আর মাদাম পগনো বুড়ো হয়ে গেছেন, টাকাকড়িও তাঁদের যথেষ্ট। এখন তাঁরা বাইরে। জুলাইতে বাড়ি ভাড়া পেয়েছেন, ফিরবেন অক্টোবরে।

এরই ভিতর বছরের সিকি ভাগ কেটে যাবে।

আর যাবে লক্ষ লক্ষ জীবন।

॥ তিন ॥

আটজন যোদ্ধা চলে গেল। যারা পড়ে রইল তারা যেন রুদ্ধশ্বাসে শুনতে লাগল দূর থেকে ভেসে-আসা পায়ের শব্দ। পথে গোলমাল, কিন্তু তাদের বুকে আর বাড়ির উপর নেমে এল রাত আর নিয়তির নিস্তব্ধতা।

আনেৎ শান্তই রইল। কিন্তু কোনো বাহাদুরীই নেই, কেন না তার তো কিছু হারাবার ভয় নেই। সে বুঝতে পারল সে-কথা, অপমান বোধ করল। সে পুরুষ হোলে মূহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে চলে যেত, নিশ্চয়ই চলে যেত। তার ছেলের বয়েস যদি মাত্র পাঁচ বছর হোতো, তাহলে কি সে এমন দৃঢ় হতে পারত?···কে জানে? সে হয়তো বলবে, ওকথা সে তখন চিন্তাই করত না। সে এমন মেয়ে, নিজের উপর রাগ করে লজ্জিতই হোলো। তার দুঃখ সে নিজেই আর তার প্রিয়জনদের নিয়ে এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারল না। দুঃখ হওয়া সম্ভব বই কি! কিন্তু সত্যিই কি তার ছেলেকে ছুঁড়ে দিতে পারত? সে কি নিশ্চিত বলতে পারে? যাক্, আমরা তাকে না হয় বিশ্বাস করলাম। এ বিশ্বাসটুকু না করলে সে তো কুপিতা জুনোর মতোই ভ্রূকুটি করবে। কিন্তু ছেলে তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবার কামনা সে শত চেষ্টা করেও সংযত করতে পারল না। সে যে তার সন্তান···সে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

কাজের যত সম্ভাবনাই তার ভিতরে ঘুমিয়ে থাক না, কাজ করবার ডাক তার পড়ল না। এখনো সে আর তার ছেলে নিরাপদ। নিয়তি তাকে শুধু দেখবার জন্যই যেন ছুটি দিয়েছে। আনেৎ তার ছুটির সদ্ব্যবহার করল। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, দৃষ্টি রইল তার সজাগ, স্বাধীন—কোন আদর্শ এসে তাকে বাধা দিল না। এর আগে সে কখনো যুদ্ধ আর শান্তির সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। প্রায় পনেরো বছর ধরে সে রুজি-রোজগারের যুদ্ধেই ব্যস্ত ছিল, তার মনে চলছিল আরো ভয়ানক সংঘাত, নিজের সঙ্গে নিজেরই সে

সংঘাত। সেই তো ছিল প্রকৃত যুদ্ধ, প্রতিদিনই নতুন করে শুরু হোতো, সন্ধি স্বাক্ষরিত হোতো বটে, কিন্তু সে সন্ধিগুলি একতাড়া কাগজ বই তো নয়। বাইরের যুদ্ধ ছিল আনেৎ-এর আবহাওয়া থেকে বহু দূরে, রাষ্ট্রের রাজনীতিও তাই। তৃতীয় রিপাবলিক তো এক অকেজো রাষ্ট্রের কাঠামো, এরই অংশীদার বাকপটু সম্রাটের মতো, সে কখনো 'না' না বলে 'হাঁ' বলতো না; কখনো সে যুদ্ধের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠত, অস্ত্র-শস্ত্রের আড়ম্বর দেখাত, কখনো বা শান্তির প্রতীক শুকনো জলপাইয়ের পাতার গুণগান করত। এমনি করেই চলছিল—ইউরোপের ভাগ্য ভালো, (যদিও সে তার অনুপযুক্ত) পুরো চল্লিশ বছর ধরে অপ্রতিহত শান্তি বিরাজ করল ইউরোপে (আনেৎ-এর এই চল্লিশ বছর)। সমস্ত জাতিগুলি যুদ্ধকে দেখল এক আবছা, সুদূরের জিনিস হিসেবে—যেন এ এক রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট, বা একটা ভাবধারা, অথবা নৈতিক এবং দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের একটা বিষয়।

যুগের এই প্রচলিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার রঙ আনেৎ-এর মনেও ধরল বইকি। শান্ত সে রঙ। আপেক্ষিক তত্ত্ব তখনো এসে সবকিছুর ভিত নড়িয়ে দেয়নি। আনেৎ পরীক্ষিত সত্যগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলেই মেনে নিল। এ নিয়ম বদলায় না, যুদ্ধ এই প্রাকৃতিক নিয়মেরই এক অংশ। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, এ-কথা সে কোনোদিন ভাবতেই পারেনি। হৃদয়ের তো অনুশাসন এ-নয়, বিচার বুদ্ধি দিয়েও তৈরি হয়নি, তবু পুরুষ আর নারীকে শাসন করল এই আইন, সবাইকে স্বীকার করে নিতে হোলো। আনেৎ মৃত্যুর মতোই তাকে বরণ করে নিল, জীবনকেও সে এমনি ভাবে বরণ করে নিয়েছে। রহস্যময় উদ্দাম জীবনের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রয়োজনের বোঝা মানুষের কাঁধে প্রকৃতি চাপিয়ে দিয়েছে—যুদ্ধ তো তার ভিতরে অতি অসম্ভব কিছু নয়—এমন কি অতি নিষ্ঠুরও বুঝি নয়।

আর সকলের মতোই আনেৎ-এরও দেশাত্মবোধ জেগে উঠল। খুব উগ্র নয় সে-বোধ, কিন্তু প্রশ্নের দ্বিধা সেখানে রইল না। তবে দৈনন্দিন জীবনে সে তা নিয়ে গর্ব করল না, তাকে বিচার করে দেখল না। এও তো এক সত্য—এক প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু যখন ঘড়িঘরের পেটা ঘণ্টার উপরে হাতুড়ির ঘার মতোই যুদ্ধের ঘা এসে পড়ল দেশের উপর, আনেৎ-এর মনে হোলো দেশ যেন তারই এক অঙ্গ—এক বিস্তীর্ণ আচ্ছন্ন প্রদেশ, ঘুম থেকে জেগে উঠছে। সে প্রথমেই অনুভব করল, নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে ছাড়িয়ে দিতে

হবে। এতদিন সে ছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের খাঁচায় বন্দী। এখন সে খাঁচা থেকে পেয়েছে মুক্তি, অবশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করছে। তার বিচ্ছিন্নতার ঘুম থেকে সে জেগেছে। সে এখন জনগণেরই একজন।···

সে তার নিজের ভিতরে অনুভব করল জন-জাগরণের সাড়া···প্রথমে তার মনে হোলো, একটা প্রকাণ্ড দরজা যেন খুলে গেছে, আত্মার সে-দরজা। এতদিন বন্ধই ছিল—জেনাসের মন্দির—খুলছে, ধীরে ধীরে খুলছে···প্রকৃতি আদিম নগ্ন শক্তিগুলির উপর থেকে অবগুণ্ঠন ফেলছে খসিয়ে···কি দেখবে সে? কি ভেবে উঠবে তার চোখের সামনে?···যাই হোক না, সে প্রস্তুত, সে প্রতীক্ষা করছে, হাঁ, প্রকৃতিস্থও সে আছে বইকি!

তার আশে পাশে যারা ঘুরছে, তাদের জন্য তো এ জ্বলন্ত জীবন নয়। তাদের জীবনের তো গেঁজলা উঠছে। আগষ্টের প্রথম সপ্তাহ যেতে না যেতে তাদের এই জ্বরে ধরেছে। অসহায় দেহযন্ত্র হয়ে গেছে বিকল, চামড়ায় দূষিত রক্তের ছাপ পড়েছে। রোগীরা এখন চুপ চাপ, জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন। ঘরে তারা বন্দী। এখনো বিস্ফুর্ত হয়নি ব্রণগুলি।

আনেৎ এখনো শান্ত। তার এই বৃত্তের ভিতরে সেই একমাত্র মনের ভারসাম্য হারায়নি। বরং আগের চাইতেও যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। হয়তো, সেই দুর্ধর্ষ আক্রমণের সেই বর্বর যুগের মেয়েদের মতো, মায়েদের মতোই সে। সে এক দিন! অস্থায়ী প্রাকার গড়ে সুখে স্বচ্ছন্দে আছে তারা। হঠাৎ একদিন ঢেউয়ের মতো তাদের নগরের বংশদণ্ডের প্রাকারের উপর হানা দিল শত্রু, মেয়েরা ছুটল, মায়েরা ছুটল তাদের রথে চড়ে নগর রক্ষা করতে। প্রান্তরের মুক্ত হাওয়ায় তাদের নগ্ন বক্ষ দুলে দুলে উঠল। হৃদয় তখন শান্ত, আসন্ন সংগ্রামের প্রতীক্ষায় দৃঢ়—হাঁ, রুদ্ধ আর্তনাদ আর শত্রুর উৎক্ষিপ্ত শিকরের লালসায় তারা তখন মুগ্ধ। তারা তখন উন্মুখ। মন তখন ছুটেছে; রথের চাকায় কলঙ্কিত বিধ্বস্ত ভূমির পরপারে, দিগন্তকে সে আলিঙ্গন করছে, আলিঙ্গন করছে অন্ধকার-ঘেরা বন, ঋজু পাহাড়ের সারকে। মুক্ত আকাশের মিনার সে ছুঁয়ে গেছে—সেইখানেই তো মুক্ত আত্মার আশ্রয়।

আনেৎ তার রথ থেকে তাকিয়ে দেখল, সে চিনতে পারল: 'হাঁ, এই পথ···'

ভারতবর্ষও এই কথা বলেছেন: 'হাঁ বৎস, তুমিই সেই!'

পৃথিবীর বৃত্ত পূর্ণ হয়ে উঠল। সে এই আক্রমণকারী আত্মার ভিতরে

খুঁজে পেল নিজেকে। ঐ জ্বরার্ত আত্মারা, ওরা তো আমিই! আমিই তো ঐ লুক্কায়িত শক্তি, ঐ উলঙ্গ দানব। এই আত্মোৎসর্গ আর নিষ্ঠুরতা, এই উদ্দীপনা, আর প্রচণ্ড উন্মাদনা এইযে গভীর থেকে উঠে এল অভিশপ্ত আর ভয়ঙ্কর শক্তি···এসবই তো আমি···আমি···আর সবার যা আছে, আমার ভিতরেও তা আছে বইকি। এতদিন লুকিয়ে ছিলাম, এবার নিজেকে আবিষ্কার করেছি, চিনেছি। আমি তো তখন ছিলাম আমার ছায়া। এতদিন স্বপ্ন আমার দিনগুলি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, ভরে দিয়েছিল। আমার যথার্থ স্বরূপ ছিল অবদমিত স্বপ্নের ঘোরে বিভোর। এখন এল আমার স্বরূপ, আমার আত্মা। যুদ্ধ চলেছে পৃথিবীতে···আমি···

যে-অব্যক্ত, যে-অজানা—পানপাত্রে ঢালা মদের মতোই উত্তাল হয়ে উঠছে, তাকে প্রকাশ করার তো ভাষা নেই। পানোন্মত্তের চিন্তাধারা বা তার নিস্তব্ধতাকেই বা কে রূপ দেবে? সে চিন্তাধারার এই বুদ্বুদ উঠতে দেখল, তাকে সে শুঁকল—এ এক শান্ত ঘূর্ণি যেন···

এক ভয়ঙ্কর নাটকের অভিনয় চলছে, সে তো তারই একজন অভিনেত্রী। এখনো মঞ্চে প্রবেশ করবার সময় হয়নি। সে প্রস্তুত, কিন্তু ডাক আসেনি এখনো। শুধু তাকিয়ে দেখছে সংঘাতের পর সংঘাত। এ এক মুহূর্ত, অদ্ভুত মুহূর্ত! দৃষ্টি ডুবে যাচ্ছে ঘটনাপ্রবাহে, কিন্তু এখনো তীর আঁকড়ে সে আছে সঙ্কেতের প্রতীক্ষায়—সে তাকে বলে দেবে:

'এবার তোমার পালা! ঝাঁপিয়ে পড় এবার!'

॥ চার ॥

ঢেউ ফুলে ফুলে উঠছে, গর্জন করছে। বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। বন্যার জল সর্বত্র। পরাজয়, হত্যা, আর জ্বলন্ত গ্রামের সার। পনেরো দিনে পাশ্চাত্যের মানবতা পনেরো শতাব্দী আগের অতীতে ডুবে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আগের কালের মতোই আসছে জনগণের ঘূর্ণি, নিজের বাসভূমি থকে বিচ্ছিন্ন তারা, আক্রমণের আগেই তারা পালিয়ে আসছে।

উত্তর থেকে অবিরাম পারীতে আসতে লাগল আশ্রয়প্রার্থীর দল, তারা

ঝাঁপিয়ে পড়ল পারীর উপর। এ যেন ছাইয়ের বৃষ্টি, এর পরেই আসবে লাভা প্রবাহ। দিনের পর দিন গ্যার দ্য ন্যর্দের নর্দমা দিয়ে বয়ে এল এই শোকার্ত বন্যা। কর্দমাক্ত, ক্লান্ত তারা প্লাস দ্য স্ট্রাসবুর্গের পাশে গিয়ে জমায়েত হোল। সে এক বিরাট জনতা, অসহায় জনতা।

আনেৎ-এর কোনো কাজ ছিল না। কিন্তু অব্যবহৃত শক্তির তাগিদে সে ছুটে গেল এই মানুষের পালের মাঝখানে, এই ক্লান্তির স্তূপের ভিতরে। শুনল তাদের আর্ত চিৎকার আর দেখল তাদের হতাশার অভিনয়। তার মন ভরে গেল ক্রোধে আর করুণায়। এই অজানা হতভাগ্যদের ভিড় থেকে সে চাইল এমন কাউকে খুঁজে নিতে, যার উপরে সে তার মাইওপিয়াগ্রস্থ দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে, যাকে সে সাহায্য করতে পারে। এই তার উদগ্র কামনা।

স্টেশনে ঢুকেই সে ছুটো থামের আড়ালে দু'জনকে দেখতে পেল—পুরুষটি শুয়ে পড়েছে, মেয়েটি তারই পাশে বসে। তার হাঁটুর উপরে পুরুষটির মাথা। এত শ্রান্ত তারা, ট্রেন থেকে নেমেই একেবারে গেটের কাছে এলিয়ে পড়েছে। পথের ভিড় মেয়েটির গা ঘেঁষে চলে যাচ্ছে। সে যেন ভিড় আর শায়িত মানুষটির মাঝখানে একটা বেড়া। তাকে দলে পিষে তারা যাক না ; মেয়েটির সে-খেয়ালই নেই। তার চোখ রয়েছে দুটি বোজা চোখের দিকে। আনেৎ দাঁড়াল, তাকে নিজের শরীর দিয়ে আবৃত করে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। শুধু পেছনটা দেখা যাচ্ছে, দুধের মত সাদা রং, লাল চুল, বিবর্ণ গাল দু'খানা সে চেপে ধরে আছে। পুরুষ নাকি ? হাঁ, পুরুষ বটে, তবে একেবারে ছেলেমানুষ, আঠারো কি উনিশ বয়স, শরীরে এক ফোঁটাও শক্তি নেই। আনেৎ-এর প্রথমে মনে হোলো ছেলেটি সবে মারা গেছে। তারপরেই সে শুনতে পেল কাঁপা গলায় মেয়েটি বলছে : 'না, না, তুমি মরবেনা ! মরা তোমার হবে না…'

তার কাদামাখা ক্ষতবিক্ষত হাত দুখানা তার চোখ গাল আর মুখোশের মতো মুখের উপর রাখছে।

আনেৎ তার কাঁধে হাত রাখল। সে ফিরেও তাকাল না। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার আঙুলগুলো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজের হাতখানা রাখল ছেলেটির মুখে। মেয়েটি যেন দেখেও দেখল না। আনেৎ বলল : 'এখনো বেঁচে আছে, ওকে বাঁচাতে হবে।'

এবার মেয়েটি তাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল : 'বাঁচাও, ওকে বাঁচাও !'

আনেৎ এবার ওর দিকে ভালো করে তাকাল। মুখ দাগে ভরতি, গড়নও ভালো নয়; কিন্তু মুখের সব চাইতে সেরা আকর্ষণ তার লাল ঠোঁট আর ছোট নাকটি। কপাল খুবই নিচু আর বিশ্রী, গাল আর চোয়ালের হাড়ও চওড়া। কিন্তু ঠোঁট দুটি চমৎকার, আর চমৎকার তার লাল চুল। সরু কপালের উপরে চুড়ার মতোই দেখাচ্ছে। মাংসল মুখে বড় বড় দুটি লাল চোখের উপরও নজর পড়ল।

আনেৎ জিজ্ঞাসা করল: 'ও তো আহতও হয়নি, তবে?'

মেয়েটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল: 'দিনের পর দিন আমরা হেঁটেছি। ওতো একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে।'

'কোত্থেকে আসছ?'

'কোসিন্স থেকে। সে একেবারে উত্তরে। ওরা সেখানে হানা দিয়েছিল, সবকিছু আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল। আমি ওদের কটাকে খুন করেছি··· খামার বাড়ির দেয়ালে বন্দুক টাঙানো ছিল, সেই বন্দুক নিয়ে ঝোপের ভিতরের একটা লোককে গুলি করলাম। তারপর পালিয়ে এলাম। যখনই একটু জিরিয়ে নেব ভেবেছি, তখনই শুনেছি ওদের ঘোড়ার খুরের শব্দ। ওরা যেন রোলারের মতোই এল। আকাশ সেদিন কালোয় কালো, বৃষ্টিও শুরু হোলো, শিল পড়তে লাগল···আমারা ছুটলাম···ছুট, ছুট, ছুট···ও পড়ে গেল। ওকে কাঁধে তুলে নিলাম।'

'ও কে?'

'আমার ভাই।'

'চল এখান থেকে আমরা যাই। ওরা কখন মাড়িয়ে দেবে কে জানে। ওঠ। পারীতে কেউ চেনা আছে?'

'কেউ না, আর সম্বলও কিছু নেই। সব গেছে। টাকাকড়ি কিছু আনতে পারিনি, এক পোশাকে বেরিয়ে এসেছি। এই যা পরনে দেখছ, আর কিছু নেই।'

আনেৎ দ্বিধা করল না: 'এস, আমার সঙ্গে এস।'

'কোথায়?'

'আমার বাড়িতে।'

ওরা ছেলেটিকে তুলল; বোন ধরল কাঁধ, আনেৎ দুটি পা। দুজনেরই গায়ে জোর, আর ছেলেটির শরীরও খুব হালকা। স্কোয়ারের কাছে ওরা একটা ডুলি

পেল। একজন মজুর আর এক ছোকরা বয়ে নিয়ে যেতে রাজি হোলো। বোন আব্দার ধরল, ভাইয়ের হাত ধরেই সে চলবে। কিন্তু পথিক আর বেয়ারাদের সঙ্গে বার বার ধাক্কা খেল। আনেৎ মেয়েটির আর একখানা হাত এবার তার নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চলতে লাগল। ডুলিটা মাঝে মাঝে দুলে উঠছিল, আনেৎ অনুভব করল, মেয়েটির আঙুলগুলোও সঙ্গে সঙ্গে কেমন কুঁচকে যাচ্ছে। বেয়ারারা এক মুহূর্তের জন্য ডুলি নামালো, মেয়েটি অমনি ঝুঁকে পড়ে তার ভাইয়ের মুখে হাত বুলিয়ে দিল, ফরাসী আর ফ্লেমিশ ভাষা মিশিয়ে কত আদরই তাকে করল।

তারা এসে পৌঁছল বাড়িতে। আনেৎ খাবার ঘরে তাদের থাকার বন্দোবস্ত করে দিল। বের্নাঙ্কাঁ পরিবার ছেলেটির জন্য পাঠিয়ে দিল একটা বিছানা। আনেৎ-এর গদি মেঝেয় বিছিয়ে আর একখানা বিছানা পাতা হোলো। ওরা ছেলেটির পরনের কাপড় জামা খুলে ফেলল। তখনো তার জ্ঞান ফেরেনি। ডাক্তারও ডাকল। ডাক্তার আসবার আগেই বোনটি শ্রান্তিতে ভেঙ্গে পড়ল, পনেরো ঘণ্টা সে ঘুমলো। অনেৎ রইল সজাগ।

দুটিই যেন মুখোশ। একজন শুকিয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে, যে কোনো মুহূর্তেই সে মরতে পারে; আর একজন উন্মাদ, মুখ তার হাঁ করে আছে, নিশ্বাস পড়ছে; অসংলগ্ন কথার ঝাপ্টা এসে লাগছে। রাতের নিস্তব্ধতায় আনেৎ ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ঘুমন্তকে দিল পাহারা। একজনের ঘুম মৃত্যুর আর একজনের প্রলাপের। সে কেঁপে উঠল। নিজেকে সে প্রশ্ন করল: 'এ উন্মত্ততার মশালকে সে কেন নিয়ে এল তার বাড়িতে—কেন—কেন?'

॥ পাঁচ ॥

আগে এই বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে কোনো সম্পর্কই ছিল না। বড়জোর তারা প্রতিবেশীদের নাম জানত। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম কটা সপ্তাহ তাদের এক করে দিল। এই ছোট ছোট প্রদেশগুলি তাদের বিভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে একই জাতিতে পরিণত হোলো। এবার তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর ভীতি একই সঙ্গে মিশে গেছে। এখন আর কেউ সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় পাশ কাটিয়ে

যায় না, পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা এখন পরস্পরকে আবিষ্কার করছে। দুটো কথাও বলে। তাদের সন্দিগ্ধ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রশ্ন করতে অপমান বোধ করে না। কেন না ব্যক্তিগত কোনো প্রশ্ন নেই, একই প্রশ্ন এখন সবাইকে নাড়া দিচ্ছে; যারা চলে গেছে—তাদের সম্বন্ধেই এ-প্রশ্ন। হাঁ, আরো এক প্রশ্ন আছে—সে-প্রশ্ন সকল প্রশ্নের জননী—এবং তা হোলো আক্রান্ত জাতির সম্বন্ধে। পিওন আসার সময়ে একটা ছোট দল সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে থাকে, পরস্পরের বিশ্বাসের উষ্ণ আদান-প্রদানে তারা নিজেদের দুর্ভাবনা ভুলে যায়। এ এক প্রকার বশ্যতা—ইচ্ছে করলে কুসংস্কার সে যেমন সৃষ্টিও করতে পারে তেমনি ভুলেও যেতে পারে। আর প্রতিবেশীরা তো সাময়িকভাবে তা ভুলেই গেল। মঁসিয়ে ঝিরের এখন মঁসিয়ে বের্নাম্বাঁর সঙ্গে আলাপ করেন বই কি। পরিবারের নিষ্ঠাবতী মহিলারা আনেৎ কাছে এলে এখন হেসে কথাও বলেন। তাঁরা তাদের এই রহস্যময়ী প্রতিবেশিনী আর তার অনিয়মিত মাতৃত্ব সম্বন্ধে তাঁদের সন্দেহ বর্তমানে ভুলে যেতেই চান। আগের চাইতে যে তাঁরা সহানুভূতিশীলা বা সহিষ্ণু হয়েছেন তা নয়। তবে তাঁরা যা স্বীকার করেন না, তাকে সাময়িক ভাবে ভুলে যেতেই চান।

মাদাম শার্দনে শুধু এখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। লিদিয়ার স্নেহকোমল দৃষ্টি তিনি উপেক্ষাই করেছেন। অথচ লিদিয়া তার দুঃখের কারণ জানে। সে চায় তারই সঙ্গে তার নিজের দুঃখ আর আর আশা-আকাঙ্ক্ষা মিলিয়ে দিতে।

বাড়ির উঁচু থেকে নিচুতলা আজ সবাই একই নৌকোয় ভেসে চলেছে, ঝড় আসছে। বিপদ তাদের এনেছে সম পর্যায়ে।

হায়, সারা দুনিয়াটা কেন এমনি আক্রান্ত হোলো না! (হাঁ, হবে বইকি!) তাহলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে সব জাতিগুলো অবশেষে এক হয়ে এক বিরাট মানবজাতিতে পরিণত হতে পারত। কিন্তু তার জন্য চাই প্রথমে দুটি শর্ত। এক—কারো একা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় থাকবে না, আর একটি—সকলেরই বিপদ এড়িয়ে যাওয়ার একটা উপায় থাকবে। এই উপায় যদি না থাকত তাহলে যে মানুষ সব বিসর্জন দিতে পারত। কিন্তু এই দুটি শর্ত বেশিক্ষণ একসঙ্গে পাওয়া যায় না। এখন তারা একসঙ্গে দেখা দিয়েছে।

প্রায় পারীর দেয়ালের উপর জার্মান বাহিনী এসে পড়েছে। সরকার উধাও। এই বাড়ির সবাই সরকারের বোর্দোতে স্থানান্তরে রেগে উঠেছে,

সিল্‌ভী তো সবচাইতে বেশি। তাকে দেখে রাজা লুই পালিয়ে যাওয়ার সময়কার বুড়ি ঠাকুমাদের কথাই মনে পড়ল। আমাদের সাঁতো-মার্গোর বীরেরা তার কাঁচির সুমুখে এলে, নিশ্চই নিস্তার পেত না। যাক্‌ এ ঋণ রইল, পরে মীমাংসা হবে। হাতে এখন জরুরী কাজ। অস্থির পারীবাসীদের ব্যস্ত রাখবার জন্য গাল্লিয়েনি ট্রেঞ্চ খুঁড়তে হুকুম দিয়েছেন। সিলভী আর মার্ক, পিসী আর ভাইপো, তাই নিয়েই ব্যস্ত। তারা মাটি খুঁড়ছে, ঠেলাগাড়ী করে মাটি নিয়ে যাচ্ছে। ভীতির ছায়া এখনও পড়েনি। পারীর অধিবাসীরা চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত কিন্তু আশা তাদের এখনও আছে। মার্ক তার বিখ্যাত রিভলভারটা পকেটে পুরে বার বার হাত বুলাচ্ছে। জার্মানরা পারীতে ঢুকবে এ আশা সে এখন করতে পারে বইকি! রিভলভারটা পরখ করে দেখবার সময় আসছে। আর আনেৎ—হাতদুটো তার যেন জ্বলছে, কিন্তু এখনো শান্ত সে—জীবন বুঝি এত ভালো তার কখনো লাগেনি। তার ছেলে আর তার বিপদের কথা সে এখন জানতে পেরেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে।

অন্য সকলেরও একই অবস্থা। বাপ-মারা ছেলেদের জন্য দুর্ভাবনা করছে না। এখন তো তারাও তাদের ছেলের মতোই বিপদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

লিদিয়া মুরিসিয়ের প্রায়ই তার প্রেমিকের চিঠি পড়ে শোনাতে আসে আনেৎকে। পরিচয়ের আগেই হয়েছে ওদের প্রণয়। আনেৎ আবিষ্কার করেছে তার গোপন ঝর্ণার গোপন গান—সে-ঝর্ণা বুঝি লোকের সামনে উৎসারিত হতে লজ্জা পায়। লিদিয়া তার হাসি দেখে বুঝতে পেরেছে, এই গোপন গান বাড়ির ভিতরে শুধু একা সেই উপভোগ করতে পারে। কিন্তু হৃদয়ের এই গানের কথা তারা কখনো বলে না। এই অস্ত্রের ঝনাৎকারের মাঝে সে তো নেহাৎ বেমানান। তাদের শান্তির দিনের সে-সুর, তাদের সেই হারানো সুখের বাঁশি আজ না হয় বোবা হয়েই থাক! লিদিয়া তার প্রেমিকের চিঠি পড়ে শোনায়। সভ্যতার সৈনিকের মহিমাময় কর্তব্যের কথাই থাকে তার ছত্রে ছত্রে। সেই মৌন মূক তরুণ তাকে সেই মহিমার অন্তঃপুরে নিয়ে গেছে, আর লিদিয়া তারই শীতল জ্যোতির্ময়ী ধারায় অবগাহন করছে, হৃদয়ে এসেছে তার আনন্দের কম্পন। তার বুকের উষ্ণতা গলিয়ে দিয়েছে তার ভাবধারার তুষার। লিদিয়া এখনো ছেলেমানুষ, তার তরুণ

প্রেমিকের কঠোর আত্মোৎসর্গ তাই রঙীন মোহ নিয়েই তার কাছে দেখা দিয়েছে। বীরত্ব এখনো তার কাছে বুঝি খেলা। সে জানে বিপদ এখানে আছে, কিন্তু এও সে বিশ্বাস করে এক দেবতা রক্ষা করেছে তার প্রেমিককে, তার প্রেমকে ঘিরে সজাগ পাহারা দিচ্ছে। তার প্রেমিক আর এই দেবতার মুখখানা কি একই রকম দেখতে? সে সুখী, আত্মবিশ্বাস তার আছে, শিশুর মতোই সে হেসে ওঠে আবার হঠাৎ কেঁদেও ফেলে, কিন্তু কারণ কাউকে বলে না। আনেৎ তাকে করুণাই করে। সে তার আবৃত্তিতে খুঁজে পায় গরিমা···এক নিশ্বাসে সে আবৃত্তি করে যায় তারপর হোঁচট খায়, দ্বিধা এসে দেখা দেয় (কোনো কথা ভুল হোলো নাকি?) চোখের দৃষ্টিতে, দ্বিধা জড়ানো মিষ্টি হাসিতে, ফুটে ওঠে ক্ষমা প্রার্থনার আকুতি। আনেৎ-এর তাকে তখন জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে করে:

'ওগো খুদে মেয়ে, এতো তোমার নিজের কথা নয়। তোমার কপাল আমার মুখের কাছে নিয়ে এস না! যখন তুমি চুপ করে থাক, আমি যে তোমার অন্তরের কথা শুনতে পাই···'

কিন্তু ওকে সে মুখ ফুটে বলে না। ওর শোনাও উচিত নয়। ঐ শেখা কথা আওড়ালে যদি বিস্মৃতি আসে, আসুক না। ভাবধারা তাকে দিক না ঘুম পাড়িয়ে!

বাড়িশুদ্ধ সবাই যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। আনন্দ এই পাঁচ দিনে উঠেছে উত্তুঙ্গে, শুরু হয়েছে জাতির সঙ্গে জাতির সংগ্রাম। আত্মরক্ষা, পরস্পরকে সাহায্য, মহিমা, আর আত্মোৎসর্গ পরিপূর্ণ রূপ নিয়েই দেখা দিয়েছে। তারপরে এল সেইদিন, যেদিন জনতা নোতরদামে গিয়ে প্রার্থনা করল। গির্জার গ্যালারি থেকে ধর্মযাজকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল: 'জয়! আমাদের জয় সুনিশ্চিত!'

তারপর থেমে গেল সব। প্রথম উৎসাহ তখন নিঃশেষিত। আত্মারা মুষড়ে পড়েছে।

অক্টোবর থেকে যুদ্ধের গতিও মন্থর হয়ে এল। বিপদের চরম মুহূর্ত কেটে গেছে। মাংসের ভিতরে ফুটেছিল কাঁটা, এবার পেকে উঠল। জীবনকে এই ক'বছরের ভিত্তিতে ঢেলে সাজতে হবে। কিন্তু দৃঢ় হয়ে কে পারবে এই কটা বছরের মুখোমুখি দাঁড়াতে? সবাই নিজেকে প্রতারণা করতে লাগল, পরস্পরকে প্রতারণা। মহিমাকে জীইয়ে রাখবার জন্য

নানা কৃত্রিম উপায় বার করল। খবরের কাগজের মিথ্যা প্রচার আর ধাপ্পায় তারা ভুলল। (খবরের কাগজও তাই চাইল, সে দানবীয় উল্লাসে জানাল তার আহ্বান) আর জনগণ এই উত্তপ্ত ঘৃণার বিস্ফোরণে জেগে উঠল, মাতালের মতোই বিহ্বলতা থেকে শিউরে উঠল।

বাড়িখানা তখন তার নিজেরই দুঃখ, বিরক্তি আর অসহিষ্ণুতার রসে গুমিয়ে গুমিয়ে সিদ্ধ হচ্ছে। শীত এল এবার। অধিবাসীদের আত্মার গেঁজলার উপর পড়ল শীতের মিয়নো আলো।

আপলিন আর আলেক্সিস কিয়েরসি—উত্তর অঞ্চলের দুই আশ্রয়প্রার্থী, এখনও আনেৎ-এর সঙ্গেই আছে। আনেৎ তাদের কয়েক সপ্তাহের জন্য রেখেছিল। ভাই ভালো হয়ে উঠলে একটা বাড়ি আর চাকরি খুঁজে নেবে—এই সে ভেবেছিল। কিন্তু তা করেনি। তাদের মনে হয়েছিলা আনেৎ তাদের রাখবে, সেই তো স্বাভাবিক। তাই তারা মাথাও ঘামায়নি। আনেৎ চালাতে পারবে কি না-পারবে—সেও তাদের ব্যাপার নয়। তারা তো দুটি শীকার—সারা ফ্রান্সের ঋণ তাদের কাছে। ব্যাপারটা এতদূর গড়াল যে আপলিন ঘর নিয়েই একদিন অভিযোগ জানাল। কোনোরকমে খাবার ঘরে তারা মাথা গুঁজে রয়েছে। একেবারে আনেৎ-এর ঘরটারই দাবী সে করল না, কিন্তু ঘরটা পেলে খুশি হয় এমনি তার ভাবখানা। একটু ধন্যবাদও দেয় বইকি। মার্ক রেগে উঠল। মেয়েটা বিতৃষ্ণা জাগায় বটে কিন্তু কেমন আকর্ষণও যেন তার আছে।

অদ্ভুত দুটি অতিথি তারা। আলেক্সিস দিনের বেশিভাগই শুয়ে কাটিয়ে দেয়। আপলিনও কচিৎ বাইরে যায়। ঘরে আলো বাতাস খেলতে দিতে সে চায় না। একথা তাকে বোঝানোও মুশকিল। তারা সারাদিন দরজা বন্ধ করেই থাকে। আলেক্সিস এমনিই কুড়ে, তার উপরে গত আগস্টের মানব-মৃগয়ায় দৌড়টা একটু তার পক্ষে বেশিই হয়ে গেছে। তার চুলগুলো ঘন আর কোঁকড়া, ছোট কপাল, খুদে নীল দুটি চোখ, পরিপূর্ণ দুটি ঠোঁট, হাঁ করে সে নিশ্বাস ফেলে। তার বোনই যেন পরিবারের পুরুষ, দিবা স্বপ্নেই সে ডুবে থাকে, কথাও কম বলে। জপের মালা নাড়ে, বিড়বিড় করে। প্রার্থনা তাদের দোলনা যেন, ঘুমন্ত আত্মাকে তারা দোলা দিয়ে ঘুম পাড়ায়। ভাই আর বোন দুজনেই ধার্মিক—তবে সে-ধর্ম তাদের নিজেদের মনগড়া। ভগবান তাদের সম্পত্তি, সেখান থেকে কে উৎখাত করে!

আলেক্সিস কুড়ে বটে কিন্তু একগুঁয়ে, সে কামড়ে পড়ে থাকতেই শুধু জানে। আর সব সে আপলিনের হাতে ছেড়ে দিয়েছে।

আপলিনের ভিতরে যেন এক আদিম প্রেরণা ঘুমিয়ে আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে যখন ঝুঁকে পড়ে বুনে যায় তার অস্থির আঙুলগুলো ঠিক চলতে থাকে, তার প্রেরণার সে তখন কণ্ঠরোধ করেই রাখে। হঠাৎ সেলাইয়ের সরঞ্জাম ফেলে উঠে দাঁড়ায়, পা মেঝেয় ঠোকে, তারপর শুরু হয় চলা—বিছানা আর জানালার মাঝখানে ফালি জায়গাটুকুর ভিতরে সে ঘুরতে থাকে; মাঝে মাঝে থেমে পড়ে অদৃশ্য শত্রুকে ঘুষি উঁচিয়ে শাসায়; নখ দিয়ে চোখ উপড়ে ফেলবে—এই ভয় দেখায়। অনর্গল কথা বলে যায়, একঘেয়ে গোঙানি, শাসানি আর কান্না ফুটে উঠে স্বরে। এক সময়ে ফুরিয়ে যায় কথা, সে তার ভাইয়ের বিছানার উপর আছড়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে—বৃষ্টি ধারার মতো ঝরে ঝরে পড়ে সোহাগ। ভাইয়ের একঘেয়ে দুঃখের পাঁচালী যেন তার সঙ্গে মিশে যায়। তারপর চুপ করে যায় তারা—তখন ঘরে যেন মৃত্যুর নীরবতা এসেই দেখা দেয়।

এরকম প্রতিবেশী থাকা মোটেই সুখের নয়, কিন্তু কেউ ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে সাহস করল না। তারা ওদের করুণাই করে, তাই চুপ করেই রইল। ওরা নিজেদের পাওনার থেকে ঢের বেশি দুঃখ সহ্য করেছে। পালাবার আগে, বুড়ো চাকরটাকে গুলিতে লুটিয়ে পড়তে দেখেছে, বাড়িও তাদের পুড়ে গেছে আর তারই সঙ্গে পুড়ে মরেছে তাদের বুড়ি-মা। এই ঘটনায় যে তারা কতখানি আঘাত পেয়েছে একথা যে কেউ বুঝতে পারে। আনেৎ-এর উপর দিয়ে বহু বিপদের ঝাপ্টা গেছে বলেই সে ওদের রাখতে বাধ্য হয়েছে। আর আপলিনও যেন আর সবার চাইতে ওর সাহচর্যই পেতে চায় কিন্তু সম্পর্ক আর বেশিদূর গড়ায়নি। তার কারণ, আপলিনের স্বভাব। মাঝে মাঝে আকস্মিক বিরুদ্ধতা এক রুক্ষ সহানুভূতিতে রূপান্তর হয় বটে, কিন্তু ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। তাই আবার বিরুদ্ধতায়ই ফিরে যেতে হয়। যখন সে বন্ধু হয়ে ওঠে—এমনি বিরল মুহূর্তে তার মনে হয় আনেৎ-এর স্বভাবের সঙ্গে তার কেমন যেন এক আত্মীয়তা আছে, কিন্তু আনেৎ তার সে-আত্মীয়তা স্বীকার করতে পারে না। আবার তাদের মাঝখানে যবনিকা পড়ে যায়, তারা তখন সুস্থ, স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু এই মুহূর্তগুলি বিরল। আপলিন বেশির ভাগ সময়ই

তার বিক্ষুব্ধ উন্মত্ত আত্মার বদ্ধজলায় মাথা গুঁজে পড়ে থাকে, আত্মকেন্দ্রিকতা ত্যাগ করতে সে রাজি নয়। বদ্ধ জলা থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয়।

মার্ক বাচ্চা কুকুরের মতো গন্ধ শোঁকে, বিরক্ত হয়, প্রলুব্ধ হয়। সে ঘৃণা করে। কিন্তু আবার এরই জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। আর আনেৎ? এই দুর্গন্ধময় উত্তেজনার আবহাওয়া তার রাতের নিদ্রাহীনতার উপর পাথরের মতোই চেপে বসে।

বদ্ধজলা থেকে যেন সোঁদা গন্ধ এসে সিঁড়িটা ঢেকে দিল। দোরের আড়ালে আড়ালে রইল জমাট বেঁধে। আনেৎ-এর তলার বাসিন্দে ক্লারিস বদ্ধঘরে উঠল শিউরে। কারো সঙ্গে দেখা সে করে না। সারা পৃথিবীটার উপরই সে চটে আছে। ভিতরটা যেন তার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আঁধার হয়ে গেছে। রক্ত চলাচল গেছে থেমে। সে যেন পাথর বনে-যাওয়া কোন গাছের বাকল। যে চলে গেছে তার খবর পেলেই উষ্ণতা ফিরে আসবে কিনা কে জানে। হয়তো চিঠি যখন সে পড়বে, চোখ থাকবে শুকনো, মন তখনো থাকবে জমাটবাঁধা। চলে যাওয়ার সময় সে তার রাতের সূর্যকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তাই তার চিঠি পেলে সে পড়ে তাল পাকিয়ে হাতের মুঠোয় চেপে রাখে। উত্তরও দেয় বইকি। বর্ণহীন, ছোট্ট চিঠি—নিজে যে দুঃখ পাচ্ছে তার কোনো চিহ্নই তাতে মেলে না, তাকে দুঃখ দিতেও বুঝি সে চায় না। না, ভান সে করে না, তার কাছে লেখার স্বার্থকতা বাহ্যিক প্রকাশে—তার গভীরে সে যেতে চায় না—কি তারা করেছে এইটেই সেখানে বড়। কি তারা ভাবছে তার কোন দাম নেই—দাম নেই তাদের সত্তার। এমন কি সে নিজের মনে মনেও সেকথা ভাবেনি। হৃদয়ের আদান-প্রদানে অন্তরের স্পন্দন শুনতে হবে বইকি। কিন্তু তার হৃদয় যে তুষারপাতে শুকিয়ে গেছে, কুঁকড়ে গেছে—এমন কি তার দুঃখও যে কঠোরতা দিয়ে ঘেরা! তার হৃদয়ের তিক্ততা যেন এক খণ্ড লোহা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু বসন্তে গলে গেল তুষার। একদিন মার্ক শুনতে পেল তার হাসি। তার শোয়ার ঘরে ঘুরে বেড়াল সে, আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে দেখল মুখ। সিঁড়িতে দেখা গেল তাকে। রুচিমাফিক তার সাজ। সেদিন অনেক রাত বাইরে রইল। পারীর মেয়ে সে, পোশাক সম্বন্ধে তার আছে এক সহজাত প্রবৃত্তি। কমনীয় তার দেহ, লীলা-চপল তার ভঙ্গী। এক ভস্মাচ্ছাদিত

বহ্নি যেন, কিন্তু ঠাণ্ডা তার চোখ দুটি। নিঃশব্দে সে চলল, মাঝে মাঝে মাথা নুয়ে জানাল অভিবাদন। কেউ কথা বলতে গেলে সংক্ষেপে দিল তার উত্তর।

তারপর আবার পথ চলল। আলাপের ইচ্ছেই বুঝি তার ছিল না।

'আমার পথে আমি চলেছি, তোমার পথে তুমি যাও না!'

এ বাড়িতে সে অপরিচিত। কাউকে প্রতিবেশীর সম্মান সে দেয়নি, তাই তার চারদিক ঘিরে গড়ে উঠেছে বিদ্বেষের প্রাকার, কিন্তু তার ভ্রুক্ষেপ নেই। সেদিন যখন সে বেরিয়ে গেল কেউ জানতে চাইল না। অনেক রাত্রে সে ফিরল, একজন শুধু দেখল। সে কল্পনাপ্রবণ মার্ক। হাঁ, সেই শুধু···তাকে তখন ঘিরে ফেলেছে।···তার বিছানার আশে পাশে ডানে বাঁয়ে শুধু কুমারী···জ্ঞানহীনা কুমারী আর তাদের উষ্ণ দেহ! পারীর উপর দিয়ে বয়ে চলেছে কামনার ঝড়!

এই কামনারই ভগ্নী ঘৃণা।

ঘৃণাও তো পবিত্র হতে পারে। অন্তত বের্নাদ্যাঁ পরিবারের পক্ষে তাই হোলো। খ্রীস্টান পৃথিবীর পবিত্র পিতা 'শান্তির' জিগির তুলেছিলেন, রাষ্ট্র এবং ধর্মযাজক সম্প্রদায় তাঁকে চুপ করিয়ে দিল। দু'দলের তখন চুক্তি হয়ে গেছে···হাঁ, সেই সর্বোচ্চ আচার্যের কণ্ঠ রোধ করে দেওয়ার খুবই তখন প্রয়োজন ছিল বই কি। ধর্মবিশ্বাসীরা বিদ্রোহ করল। গল্‌দেশীয় রক্ত ফুটে উঠল শিরায় শিরায়। বুড়ো বের্নাদ্যাঁ, ধার্মিক বের্নাদ্যাঁ, বিদেশী পোপের বিরুদ্ধে গর্জন করে উঠলেন। সৌভাগ্যের কথা, ফ্রান্সের ধর্মযাজকেরা পোপের বাণীকে ঢেকে দিলেন ছদ্ম আবরণে :

'হে পবিত্র পিতা, শান্তির প্রার্থনাই তোমার আদেশ···তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক প্রভু—আর পূর্ণ হোক আমাদেরও ইচ্ছা। হাঁ, হাঁ ভ্রাতৃমণ্ডলী, শান্তি, শান্তি আমরা চাই···'

'শান্তি মানে তো জয়লাভ!' নোতরদামের অভ্যন্তর থেকে এল উত্তর, প্রধান ধর্মযাজকেরই প্রতিধ্বনি।

উত্তর এল মাদেলিনের স্বর্ণ মন্দির থেকে : 'ভগবান, শান্তি, প্রকৃত শান্তি···আমাদের প্রকৃত শান্তি আমরা চাই—যাদের আমরা হত্যা করব, এতো সেই শত্রুর শান্তির নয়!'

এ শুধু সংজ্ঞার রকমফের ছাড়া কিছু নয়।

এমনি করেই খ্রীস্টান পৃথিবীর বিবেক রইল অটুট, বের্নাদ্যাঁ পরিবার পোপ আর তাঁর অনুচরদের প্রতি সন্তুষ্ট হোলো। হাকিমের বুকখানা স্ফীত হয়ে উঠল, আইনের ভুল ব্যাখ্যায় এক ক্রুর আনন্দে ভরে গেল—তিনি বেদীর সামনে মাথা নোয়ালেন। তাঁর চোখ দুটিতে ভক্তি উছলে পড়ল, খোঁচা খোঁচা দাড়ির ভিতর দিয়ে খেলে গেল গোপন হাসি।

চমৎকার হয়েছে! পবিত্র পিতা তুমি প্রতারিত হয়েছ!

ধর্মযাজক সারতিলাঞ্জ পারীর হতভাগিনীদের কাঁদালেন। এক অভিনব উন্মাদনায় তারা কাঁদল। তারা দেখল যিশু গেথস্‌মেনের ট্রেঞ্চে তাদেরই ছেলেদের মতো সৈনিকের পোশাকে আবির্ভূত হয়েছেন। তাদের রক্তিম আর ভয়ার্ত চোখের সামনে বদলে গেল হত্যার ক্ষেত্র, দেখা দিল এক বেদী—সেই বেদীর উপর স্বর্ণ আর মৃন্ময় ভৃঙ্গারে, বেদনা আর মহিমায় অনুষ্ঠিত হোলো সেই স্বগায় রুধিরের আহুতি-উৎসব। তারা কাঁদল আর দেখল সেই উৎসব।

·

সেই হতাশার উন্মাদনায় প্রথম আকণ্ঠ পান করতে এগিয়ে গেল দুখানি ঠোঁট, চুম্বনের জন্যই তো তারা তৈরি হয়েছিল। সে-ঠোঁট দু'খানি লিদিয়ার।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে তার প্রিয়তম নিহত হোলো। বহুদিন খবর সে জানতে পারেনি। সংঘর্ষের সেই কোলাহলে পশ্চাদ্ধাবন আর অপসরণের সেই মুহূর্তে—যখন মাংসের দেয়ালের উপর ঝুঁকে পড়েছে, মৃত মাংসের স্তূপ দলে পিষে চলেছে তারা, তখন এ বিষয় নিয়ে ভাববারই বা অবসর কোথায়? লিদিয়ার তখনো আত্মবিশ্বাস অটুট, সে তখনো তার চিঠি পড়ছে, অথচ পনেরো দিন আগে সে-নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে একথা সে জানতে পারেনি। দেশ রক্ষা পেল, কিন্তু রক্ষকরা যে বাঁচল না, একথা কেউ স্বপ্নেও ভাবল না। অক্টোবরে এল মৃত্যুর অভিজ্ঞান। তার নিষ্ঠুরতায় সন্দেহের অবকাশ নেই। তার এক সঙ্গী স্থান, কাল আর দিনের হদিশ দিল। হাঁ মৃত্যুদণ্ডই এল। কিন্তু কিছুই বদলাল না। মঁসিয়ে ঝিরের দরজা বন্ধ করে রইলেন। বাড়িউলী সবই জানত, সে না বল্‌লে কেউ টেরই পেত না। লিদিয়া যেন ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে এবার তার শ্বশুরের ফ্লাটেই উঠে এল। কোনো সাঁড়া শব্দ পাওয়া গেল না। ওদের দরজার সামনে দিয়ে আনেৎ-এর নিচে নামবার পথ।

নিস্তব্ধতা যেন তার টুটি টিপে ধরছিল, কিন্তু তাকে ভাঙবার সাহসও বুঝি তার নেই।

দরজায় ধাক্কা দিল আনেৎ। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে দিল লিদিয়া। আবছা অন্ধকারে তাকে ভালো করে চেনা গেল না। কথা তারা কইল না, পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল। লিদিয়া কাঁদল নিঃশব্দে, আনেৎ অনুভব করল তার উষ্ণ চোখের পাতা থেকে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে—আনেৎ-এর গাল ভেসে যাচ্ছে। লিদিয়া এবার তার হাত ধরে শোয়ার ঘরে নিয়ে এল।

সন্ধ্যা ছটা, আঁধার ঘর, পাশের ঘর থেকে আলোর রেখা এসে পড়েছে ঘরে। মঁসিয়ে ঝিরের বোধহয় ঘরে যাচ্ছেন, কিন্তু সাড়াশব্দ নেই। আনেৎ আর লিদিয়া দুজনেই বসে পড়ল, হাত তখনো তারা ধরে আছে। ফিস ফিস করে কথা কইল।

লিদিয়া বলল : 'আজ সন্ধ্যেয়ই চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় ?'

'ওকে খুঁজতে।'

আনেৎ প্রশ্ন করতে সাহস পেল না।

'কোথায় ?'

'ও যেখানে ঘুমিয়ে আছে ?'

'কি বললে ?'

'হাঁ, এখন সেখানে যাওয়া যায়।'

'কিন্তু ঐ হাজার হাজার লাখো লাখোর ভিড় থেকে কি করে খুঁজে বার করবে ?'

'ঠিক পারব। ওকে আমি খুঁজে পাবই।'

আনেৎ-এর ইচ্ছা হোলো সে চিৎকার করে বলে : 'না, না, যেও না ! ওতো তোমার মধ্যেই বেঁচে আছে। কসাইখানার পুতিগন্ধে ওকে তুমি খুঁজতে যেও না লিদিয়া !'

কিন্তু তখনি মনে হোলো, লিদিয়া এখন তো আর স্বাধীন নয়। আনেৎ তার হাত ছুঁলো, কিন্তু হাত যে এক মরা মানুষ ধরে আছে। সে বললে : 'আচ্ছা তোমার সঙ্গে আমি যদি যাই ?'

লিদিয়া উত্তর দিল : 'ধন্যবাদ !' তারপর পাশের ঘরের দিকে চেয়ে বলল : 'বাবাও যাচ্ছেন।'

পরস্পরের কাছে তারা বিদায় নিল।

সেই সন্ধ্যেয় সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হালকা আর ভারী পায়ের শব্দ আনেৎ শুনতে পেল। তারা চলে গেল।

দশদিন পরে যেমন নিঃশব্দে তারা গিয়েছিল, তেমনি তারা ফিরে এল। আনেৎ টেরই পেল না। হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠতেই দরজা খুলে সে দেখল, বাইরে শোকের কালো পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে লিদিয়া, তার মুখে বুকভাঙ্গা হাসি। আনেৎ-এর মনে হোলো সে যেন ইউরিডিসির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সে তার আরফিউসকে নিয়েই এসেছে। আনেৎ তাকে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে গেল, দরজা বন্ধ করে দিল। তাকে সেই মৃতের দেশের ভ্রমণ কাহিনী শোনাবার জন্যেই যেন লিদিয়া উদগ্রীব। সে কাঁদল না, তার চোখে ঝলমল করে উঠল দীপ্তি, কিন্তু সে-দীপ্তি বুঝি আরো মর্মস্পর্শী। সে বিড়বিড় করে বলল :

'হাঁ, তাকে আমি পেলাম···সে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।···সেই বিধ্বস্ত মাঠের উপর দিয়ে চললাম, কবরের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরলাম। তখন ক্লান্তি এসে গেছে, এবার এলাম একটা ছোট্ট বনের ধারে, সে যেন হাতছানি দিয়ে বললে, এস, এবার আমার কাছে এস! ওকের বন···রক্তাক্ত পোশাক, চিঠি আর ন্যাকড়ার স্তূপ। একটা ছোট্ট পল্টনকে এখানে ঘেরাও করা হয়েছিল। আমি বনের ভিতরে ঢুকলাম—না, সে-ই নিয়ে গেল। বাবা বললেন, গিয়ে লাভ কি? অনেক তো ঘোরা হোলো। এবার চল, ফিরে যাই। আমি একটা ওকগাছের তলায় ঝুঁকে পড়ে শ্যাওলার ভেতর থেকে এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ তুলে নিলাম, তাকিয়ে দেখলাম, এযে আমারই চিঠি! এই খানাই শেষ সে খুলেছিল! রক্ত লেগে আছে। আমি নুয়ে পড়ে ঘাসে চুমু খেলাম, সে যেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেখানে শুয়ে পড়লাম। এত আমাদেরই বাসরশয্যা, আমি তখন সুখী! সুখী! ইচ্ছে হোলো, চিরদিনের জন্য এখানে ঘুমিয়ে পড়ি—এই ওকগাছের তলায়—হাওয়ায় যেখানে বীরত্বের উন্মাদনা! এইখানে—' সে হাসল—তার হাসিতে আবেগময় হতাশা। আনেৎ তার দিকে তাকাতে পারল না।

মঁসিয়ে ঝিরের যেন পাথর বনে গেলেন। নিজের কাজ তিনি শুরু করলেন। কারো সঙ্গে কথা বলেন না, কিন্তু তাঁর বক্তৃতায়, তাঁর প্রবন্ধে তিনি প্রচার করতে লাগলেন এক নিষ্ঠুর জেহাদ। উদ্দাম হয়ে উঠলেন তিনি, শত্রুর

আত্মাকে অপমান করলেন, মানবতা থেকে কেটে বাদ দিলেন। বাড়িতে সবাই তাঁর কাছে মাথা নোয়াল বটে, কিন্তু তাঁকে এড়িয়ে চলল। কেন না, যারা বেঁচে আছে তাদের প্রতি ভর্ৎসনা তাঁর দৃষ্টিতে তখন ফুটে উঠেছে। সবাই যেন নিজেকে দোষী বলেই মনে করল। তাদের সহজাত প্রবৃত্তি এবার খুঁজে বার করল এক হতভাগাকে, একই তূণে অভিযোগের তীরগুলো পোরা হোলো। লক্ষ্য হোলো উপরের তলার মানুষটি—তার অপরাধ সে যুদ্ধে যায়নি।

সে হৃদ্‌রোগী ক্লাপিয়ে। মারণাস্ত্রের রোগও তাকে পেয়ে বসেছে বুঝি। ফরাসীর আত্মা যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করে নেবার জন্য প্রস্তুত।...কিন্তু এ-লোকটি সেই দলের যারা এই সর্বনাশা যুদ্ধ নিয়ে এসেছে, কিন্তু নিজেরা তারা শান্তিবাদী।

লাজুক ছেলে, বিশেষত্ব তার আছে, লেখেও ভালো। সে চেয়েছে তার কলম আর বই নিয়ে শান্তিতে কাটিয়ে দিতে। কিন্তু সিঁড়ির উপর যখনই সে ঝুঁকে পড়ে, মনে হয় সন্দেহের একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে। যখন সে বাইরে যায়, আধো খোলা দরজার ভিতর দিয়ে জোড়া জোড়া চোখ তার দিকে চেয়ে দেখে। সে অভিবাদন করলে কেউ যেন ভ্রূক্ষেপও করে না। এমন কি ব্রুশঁও তাকিয়ে দেখে না, অফিসে বসে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কিন্তু পথে পড়েই ক্লাপিয়ে দেখতে পায়, ব্রশঁ তার পেছনে পেছনে চলেছে। সে নিজে যে-তলায় থাকে, সেখানে মজুরবৌদের চোখে বিদ্রূপের ছায়া ঝলসে ওঠে।

হয়তো এর বেশির ভাগই তার নিজের সৃষ্টি, কারণ সৃষ্টিই তার কাজ। তার কল্পনা এক গেলাস শাম্পেনের মতোই বুদ্বুদের সৃষ্টি করছে। সে ভয় পেল। সে একা মানুষ, কিন্তু সৌন্দর্যবোধ দিয়ে তার একাকীত্বকে সে বেশি দিন দাবিয়ে রাখতে পারল না। পারবেই বা কি করে? তার জন্য চাই চরিত্রের দৃঢ়তা, কিন্তু দোয়াতের তলায় তো তা মেলে না। সুষ্ঠু কথার সমারোহ তোমাকে যখন আমন্ত্রণ জানায়, সে শুভ আমন্ত্রণই হবে; কিন্তু তুমি যখন বিপথে চলবে, তখন সে তোমাকে মিথ্যায় প্রণোদিত করে। ক্লাপিয়ের পক্ষেও তাই হোলো। তার শান্তিবাদ ঘুচে গিয়ে দেখা দিল কর্মপ্রেরণা—বাড়ির সেই চরম দাবী সে মেনে নিল। সেন্সর অফিসে সে নিল কাজ, চিঠিপত্র খোলার কাজ। খারাপ লোক সে নয়, কারো ক্ষতি করতেও সেচাইল না। কিন্তু দুর্বল যখন নিজের পথ ছেড়ে দেয়, তখন বলবানকেও

হার মানায়। উৎসাহের আতিশয্যে সে উদ্দাম হয়ে উঠল। তাঁর পুরনো সঙ্গীদের সে চেষ্টা করল তার নতুন ভাবধারায় দীক্ষিত করতে। দলত্যাগী যে সে তো পুরনো সাথীদের ত্যাগ করতে প্রস্তুত। যারা তাকে বাধা দেবে তারা নিপাত যাক। তার নরম হাতে রাষ্ট্রের নখ উঠল গজিয়ে। দুর্বল বুকে সেই মহিমময় কর্ণেলিয়াসের মতোই দ্রুত স্পন্দন অনুভূত হোলো, সে রূপান্তরিত হোলো রোমক বীরে। তার নিজের প্রিয়জনকে বলি দিতেও তখন সে প্রস্তুত।

এই মূল্যেই সে কিনল ব্রশঁর অনুরাগ, তার সদয় দৃষ্টি। কিন্তু সে ভেবে পেল না, আনেৎ-এর মতো স্বদেশপ্রেমিকারা কেন তার উপর বিরূপ হোলো। হাঁ, বিরূপ বই কি, তাকে দেখলেই তো সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

॥ সাত ॥

আনেৎ-এর সমূহ বিপদ উপস্থিত। আত্মার বিশ্বাস সে হারিয়ে ফেলছে। যতদিন আর মাস যাচ্ছে, বাড়ছে তার অধৈর্য। হাতে তেমন কাজও নেই, ভাবনার সময়ই বেশি। সে চারদিকে চেয়ে দেখবার ফুরসৎ পেল, বুঝতে পারল, কি এক দানবীয় শক্তি ওদের পেয়ে বসেছে—অতি কঠোর থেকে অতি কোমল—কেউই বাদ পড়েনি। সবকিছু অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে—পাপ আর ধর্ম—সব অস্বাভাবিক। প্রেম, ঘৃণা, বীরত্ব, ভয়, বিশ্বাস, অহমিকা আর আত্মোৎসর্গ—সব কিছুতেই আজ রোগের ছোঁয়াচ। রোগ বেড়ে চলেছে। কেউ বাদ পড়েনি।

আনেৎ আকস্মিকতা বলে একে মেনে নিল না বলেই আঘাত পেল সব চাইতে বেশি। কারো উপরে এর দায়িত্ব চাপাবার কল্পনাও সে করতে পারল না। যুদ্ধকে সে বুঝতে পারল না বটে, কিন্তু ভালো করে চিনতে পারল। যুদ্ধ সে দেখতে পেল না, মন্ত্রণা পরিষদের গুপ্ত পরামর্শ তার কানে এসে পৌঁছল না; সেই পশুর মুখখানা দেখার সুযোগও তার হোলো না, কিন্তু মুখে সে অনুভব করল তারই বিষাক্ত নিশ্বাস। যুদ্ধ যে প্রকৃতিরই দান—একথাই আরো বেশি করে তার

মনে পড়ল। এ যেন আত্মারই এক রোগ, বিজ্ঞানেরই এক সত্য। রোগকে জাহির করিবার অভ্যেস লোকগুলোর নেই, তাই তারা তাকে এক নতুন মহিমার মোড়কে পুরে দেখিয়ে বেড়াল। এ যেন এক 'আদর্শ', ভগবানেরই প্রেরিত আদর্শ। কসাইয়ের দোকানে মাংস এমনি রঙীন কাগজের ফুল দিয়েই সাজানো থাকে। তাই তো মিথ্যা আর দাসত্ব থেকে সৎ চিন্তাধারাও রেহাই পেল না, দানবের কুষ্ঠ সংক্রামিত করল তাদের। আনেৎ তার নিজের ভিতরেও খুজে পেল রোগের লক্ষণ। হত্যা আর আত্মোৎসর্গের মোহে সেও হয়ে উঠল উন্মাদ। হৃদয় আর ইন্দ্রিয় তাকে স্বীকার করল না বটে, কিন্তু তার ঘুমন্ত আত্মা তারই দিব্য জ্যোতিতে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। তার রাতকে সে বিকৃত স্বপ্নের হাতে সঁপে দিল।

যদি তার নিজের ব্যাপারই হোতো, এই বিষের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হয় তো শুরু হোতো না। কেননা, সকলেই তো এ শর্ত মেনে নিয়েছে। তাকে বাধাও সে দিত না। গর্বভরেই সে সহ্য করত, হয়তো অভিভূত হয়েও পড়ত না। কিন্তু চোখের আলোর চাইতেও যে তার কাছে প্রিয়তম, তারই উপর দেখল এই বিষের বিস্তার। সে শিউরে উঠল।

মার্ক বয়স্কদের চাইতেও বেশি সংক্রামিত হোলো বিষে, কেননা, সুকোমল তার মন, দেহও তার সুকুমার। বাড়ির বাইরে আর ভিতরে যা ঘটল, কিছুই তার নজর এড়ালো না। তার চোখ আর কান, তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়, সমস্ত দেহ, রূপান্তরিত হোলো এক শব্দধর যন্ত্রে। সেই যন্ত্রে ধরা পড়ল বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চালিত আত্মার স্নায়বিক প্রবাহ। তার বুদ্ধির চাইতেও প্রখর হয়ে উঠল তার সহজাত স্থূল প্রকৃতি। সে বহুদূর থেকেই জনগণের বিবেকের জটিলতার হদিশ পেল। অন্য সকলের আগেই তার প্রতিবেশী দুই ভাই বোনের ভাগ্যলিপি সে পাঠ করল, আদ্যপান্ত পড়ে গেল, কিন্তু বুঝতে পারল না। তার মা বোঝবার আগেই সে টের পেল ক্লারিসের পরিবর্তন। আনেৎ এই পরিত্যক্তা মেয়েটির হতাশাই দেখল, কিন্তু মার্ক দেখতে পেল তার পুরনো পালক ঝরে পড়ছে, নতুনের আভাস দেখা দিয়েছে। সে পার্টিশনের ভিতর দিয়ে তার উপর রাখল সজাগ দৃষ্টি। যখন সে বেরোয় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তার দূরাগত কস্তুরী গন্ধের আঘ্রাণ নেয়। তার দেহ বা পোশাকের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন তার দৃষ্টি এড়ায় না। তার স্বামী বা প্রেমিক হলেও বুঝি এতটা কৌতুহলী

সে হোতো না। না, সে প্রেমে পড়েনি। কিন্তু কিশোর-সুলভ কৌতূহলও এ নয়। তার চাইতে ঢের ঢের বেশি এর আবেদন। নারীর আত্মা, নারীমন—সে চাইল তারই গভীরে ডুবে যেতে। এমন কি ক্লারিস টের পাবার ঢের আগেই সে আবিষ্কার করল তার পাপ। আরো সুন্দর হয়ে উঠল সে তার চোখে। সে তাকে অনুসরণ করল—শুধু তাই নয়—সে চাইল তার মনের গভীরে ডুবুরী হতে—ঐ দুটি বুকে কি হচ্ছে কে জানে! তার নিষিদ্ধ চিন্তা, গোপন স্পন্দন, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা যাচাই করে নিতে সে চাইল। ইন্দ্রিয় তখনো পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। সে তখনো বুঝতে পারেনি, সে কি মেয়ের সাহচর্য চায়, না, সে চায় মেয়ের মন অধিকার করতে!

এক রাতে সে মার সঙ্গে একটু দেরি করে বাড়ি ফিরছিল। দেখল, না, তার মনে হোলো, সে দেখছে—পথের আবছা আলোয় চলেছে ক্লারিস আর তার সঙ্গী। সে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল, তার চোখ দুটি এক অদ্ভুত নম্রতায় নেমে এল, সে তাকে দেখেছে, একথা জানাতে চাইল না। আনেৎ তার চিৎকার শুনেছিল; জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি! সে তাড়াতাড়ি কথা চাপা দিল। তার মনে হোলো ক্লারিসকে রক্ষা করা তার কর্তব্য। সে তা এতদিন করেনি বলে দুঃখ হোলো কিন্তু যে-মেয়েটিকে সে দেখল —সে কি ক্লারিস? সে নিজেই বুঝতে পারল না। সে তো তাকে গ্রাস করে ফেলেছে—তবে কি সে নয়? না না, কোনো অজানা মেয়ে।

এই উন্মাদনায় রাতগুলো ভরে গেল, বাড়িখানা থেকে চুইয়ে পড়ল উন্মাদনার প্রবাহ। যুদ্ধমান নগরীর আবহাওয়াও যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল—এ যেন ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আকাশের ঢাকনার নিচে উত্তপ্ত মাটি থেকে কুয়াশা উঠে এল। প্রতীক্ষা, দুশ্চিন্তা আর বিরক্তি, শোক আর মৃত্যু হাওয়া দিয়ে বাড়িয়ে দিল, ছড়িয়ে দিল বাসনার স্ফুলিঙ্গ। ক্লারিস তো শুধু একা নয়, এমনি আত্মা সেদিন আরো ছিল।

পেরের মেয়েও আর বাড়ি ফিরল না। মার্ক সবই লক্ষ্য করল। নাম তার মার্সলিন। মেয়েটির যেন তার নিজের সঙ্গে মিল আছে বলে মনে হয়। সাহসিকা, বিদ্রূপ-ভরা দুচোখ, নাকটা একটু উপর দিকে তোলা, সুগোল চিবুক, ঠোঁট দুখানা বাঁশীর মতো ছুঁচলো। মার্ক চাইল ঐ বাঁশী বাজাতে —ওর ঠোঁটের সঙ্গে তার ঠোঁটের ছোঁয়া লাগবে একথা ভাবতেও তার কাঁধ

থেকে হাঁটু অবধি থর থর করে কেঁপে উঠল। সিঁড়িতে দেখা হলে মেয়েটি ওর নাম ধরেই ডাকে, ওর মুখের দিকে এমন করে তাকায় যে ও ঘাবড়ে যায়। কিন্তু মার্ক তার চাঞ্চল্য চেপে রেখে ওকে পেরেৎ বলেই ডাকল। হাসল মেয়েটি, চোখে চোখ মিলল, তারা চিনল নিজেদের। পেলতিয়ের মেয়ে নেই কিন্তু সম্মান তারও রইল না (অবশ্য সম্মান যদি একে বলা যায়)। তার স্ত্রী ভারি আমুদে মেয়ে, স্বাস্থ্যবতীও বটে। সিল্কের মোজা আর লেস দেওয়া জুতো সে পরে। এগুলো সে রোজগার করা টাকায়ই কিনেছে। কারখানায় সে কাজ করে—আর আছে নিঃশব্দে আসা আর যাওয়ার ব্যবসা। এই যুদ্ধের দিনে কথাটা খুব খাপ খেয়ে গেছে বটে! পেলতিয়ে দেশপ্রেমিক, তার স্ত্রীও তাই। সে মিত্রশক্তির সৈন্যদের সঙ্গে ছাড়া স্বামীকে কখনো প্রতারিত করেনি। স্বামীর কি কোনো অনিষ্ট সে করেছে? কেন, সেও তো যুদ্ধ করছে! সেই কথাই তো সে বলে আর হাসে। এমনি করেই গল্‌দেশের এই মেয়ে নিজেকে প্রতারিত করছে। আছে সে ভালোই কিন্তু বেচারীর স্বামীর অবস্থা তাতে বিন্দুমাত্র ভালো হয়নি। বর্তমানের বিরাট হাঁ সব কিছুকে গ্রাস করেছে, সব কিছুর উপরেই তার দাবী—হাঁ সেই তো সব। আবার সে কিছুই নয়। এক অতল গহ্বর।

মার্ক ঘুরছে এই বর্তমানের অলাত চক্রে। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবা তো বোকামি! ভবিষ্যৎ! হয়তো ভবিষ্যতই নেই। ভবিষ্যতে বিশ্বাস করলে চলবে না। যা আসে আসুক, মুখ বুজে মেনে নাও। তোমার হাত আছে, আছে চোখ আর দেহ, ময়ূরের লেজের মতো সেখানে জোড়া জোড়া চোখ—জীবনকে প্রতি রোমকূপে জীইয়ে রাখ। নাও, নাও, কেড়ে নাও! ভালোবাস, জানো, উপভোগ কর, ঘৃণা কর!…

মার্ক ক্লাস ছেড়ে ঘুরে বেড়াল পারীর চারদিকে। জ্বোরো রোগীর মতো দেহে তার উত্তেজনা, মনে কৌতূহল। যুদ্ধ, নারী, শত্রু, কামনা—এক উষ্ণ, প্রজ্জ্বলন্ত প্রটিউস যেন, হাজারটা তার জিভ। যে পর্যন্ত না পেট মোচড় দিয়ে ওঠে, উত্তেজনার পাত্রে পড়বে চুমুক, চুমুকের পর চুমুক। কত কিছু নিয়েই না আজ এসেছে উত্তেজনা—তারপর তো আসবে সেই মুহূর্ত যখন তুমি অভিভূত হয়ে যাবে, এলিয়ে পড়বে জৈবিক শ্রান্তিতে! এই পালানো-ঘোড়ার ছানার উপর কেউই নজর রাখল না। কি করে রাখবে? প্রত্যেকেই তো তখন নিজের ভাবনার শিকার। আনেৎও বহুদিন কিছু সন্দেহ

করল না। তার অস্থিরতা তখন বাড়ছে, পড়াবার কাজগুলো চলে গেছে। মধ্যবিত্তরা শিক্ষকনামধারী অকেজো জীবগুলির মাইনের অঙ্কটা আয়-ব্যায়ের হিসেব থেকে তখন কমাতে শুরু করেছে। আনেৎ কয়েক সপ্তাহের জন্য পারীর আম্বুলেন্স বিভাগে সহকারী হিসাবে রাতে চাকরি নিল।

মার্ক সুযোগের সদ্ব্যবহার করল বইকি। সে পালিয়ে পালিয়ে ঘুরে বেড়ালো, শুকলো; আস্বাদ নেয়ার চাইতে দেখল বেশি, অনভিজ্ঞ বলেই বুঝি সাহস করল না। গর্বিত বলেই তার অজ্ঞানতা প্রকাশ করে উপহাসাস্পদ হতে চাইল না। তার বুকে তখন দ্রুত স্পন্দন, পা ক্লান্ত, গলা শুকিয়ে গেছে, হাত দুখানা উত্তপ্ত। সে এল, চলে গেল, আবার ফিরে এল, অবিরাম ঘুরে বেড়ালো। হয়তো শীগগিরই সে ভেঙে পড়তো, যদি দ্বিতীয় রাতে এক ছোট্ট পানশালার সন্দেহজনক আবহাওয়ায় একখানা দৃঢ় হাত এসে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি না দিত, বিদ্রূপ আর রাগের ঝাঁজ মিশিয়ে না বলত: 'এখানে কি করতে এসেছ?'

সে তার মাসী সিল্‌ভী···কিন্তু সে-ই বা এখানে কি করতে এসেছিল? নিজের উপরে তার বিশ্বাস সে হারায়নি, তাই সেও পাল্টা জিজ্ঞেস করল: 'আর তুমি?'

হেসে উঠল সিল্‌ভী: 'খুদে বদমাশ!' তার হাতখানা নিজের হাতের ভিতর পুরে বললে: 'আমার সন্ধ্যেটাই মাটি করলে দেখছি! কিন্তু সবার আগে কর্তব্য। তোমাকে পেয়েছি যখন ছাড়ছিনে। বাড়ি নিয়ে যাব।'

সে নিষ্ফল প্রতিবাদ জানালো। সিল্‌ভী বাড়ি ফেরবার আগে একটু বেড়াতে রাজি হোলো। পাশাপাশি চলল মাসী আর বোনপো। পরস্পরকে বিদ্রূপ করল তারা। মার্ক ছুটে বেড়াতে চায়, কিন্তু এই অপরিণত স্বাধীনতায় বিপদ আছে, একথা বোঝবার মত জ্ঞান সিল্‌ভীর ছিল।

'তুমি কি স্বাধীন যে, যা-খুশি তাই করবে? থাম! তুমি আমাদের চোখের মণি। তোমার মার আওতায় এখনো আছ। তুমিতো যাদুঘরের জিনিস, তালাচাবি বন্ধ করেই আমরা রাখব।' সে ঠাট্টা করল, করল তিরস্কার।

মার্ক, বিদ্রোহী মার্ক, মাটিতে পা ঠুকল। স্বাধীন নয় সে? তাহলে মাসী কেন স্বাধীন হবে?

'ওগো বন্ধু, আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে!'

তার ঔদ্ধত্যের পালের হাওয়াটুকু যেন ফুস্‌ করে বেরিয়ে গেল।

বিদ্রূপ ভরে সিলভী তাকালো তার পানে। মার্ক রেগে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলল : 'তোমাকেও তো ধরে ফেললাম!'

সিলভী হাসল। দুজনেই দোষী, পরস্পরকে তারা শাসালো চোখে চোখে। সিলভী তাকে নিয়ে গেল বাড়ি, কিন্তু আনেৎকে কিছুই বলল না। বড় বোনের কঠোরতা আর গাম্ভীর্যে তার বিশ্বাস নেই। মনে মনে সে ভাবল : একটা স্প্রিংকে ছুটতে বাধা দেবে কি করে। ওর সামনে পাথর রাখ, ঠিক লাফিয়ে পার হয়ে যাবে।

হঠাৎ আনেৎ-এর চোখ খুলে গেল। সে বুঝতে পারল, ছেলেকে একা ছেড়ে দিয়ে ভালো করেনি। চাকরি ছেড়ে দিল সে। তা ছাড়া আহতদের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ দেখে সে বিরক্ত হোলো—ভালোবাসা এসে মিশেছে করুণার সঙ্গে—এ যেন রক্তের সাগরে ভালোবাসা, রক্তের ভালোবাসা···

নিজেকে অত বড় ভেব না। তুমিও তো ওদেরই মতো অনুভব করেছিলে···

এইটেই চূড়ান্ত ভণ্ডামি। সুসভ্য-পশু—মানুষ—এমনি করেই তার ভয়ংকর প্রবৃত্তিগুলোকে মিথ্যের গন্ধ দিয়ে লোভনীয় করে তোলে। তার সন্তানের গায়েও লাগল তার নিশ্বাস। তার পোশাক, চুল, গায়ের চামড়া গন্ধে ভরে গেল। কিন্তু মৃত্যুর এ-গন্ধকে হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছতে সে তা দেবে না।

যৌবনের সন্ধিক্ষণের এই আলোড়নে আনেৎ শুধু ভয়ই পেল না, তার মনে হোলো : ইন্দ্রিয়ের এই আক্রমণ, শিশু-দেবতার এই উদ্দামতা, মার্ক চেপে রাখতে পারছে না। জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মা এই মুহূর্তেরই প্রতীক্ষা করেন, এখানে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য এলেও তিনি আশ্চর্য হন না। শুধু দৃষ্টি সজাগ রাখেন, নিঃশব্দে দেখে যান কেমন করে কিশোর তার আবশ্যকীয় অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে চলেছে, খোলস বদলাচ্ছে, মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। শান্তির মৃদু আবহাওয়ার এই মুহূর্তগুলি চমৎকার—বসন্তের দিনে দুপুরের প্রেমের মতোই মধুর। কিন্তু মানুষের উন্মাদনার এই ঝড়ে তার কোনো মাধুর্যই তো সে খুঁজে পেল না।

এক সন্ধ্যায়, সারাদিনের খাটুনি আর ছুটোছুটির পর আনেৎ বসে ছিল লুক্সেমবুর্গ উদ্যানে। কয়েকজন স্কুলের সঙ্গী নিয়ে তার ছেলেও সেখানে এল। তারা কি যেন বলাবলি করছিল। আনেৎকে তারা দেখতে পেল না। গাছের আড়ালে একটি বেঞ্চিতে সে বসেছিল। হঠাৎ

সে স্পষ্ট শুনতে পেল তার ছেলের ব্যগ্র, বিদ্রূপ-ভরা স্বর। সে সেই-দিনের গর্ব করছে যখন তারা বর্বর জার্মানদের উপর নেবে প্রতিশোধ, একটা চোখের বদলে দুটো চোখ উপড়ে ফেলবে, একটা দাঁতের বদলে ভেঙে গুড়িয়ে দেবে তাদের চোয়াল। তার মনে হোলো, পথের এই ছোকরারা ভোগের আগেই নিহত পশুর রক্তের গন্ধে মেতে উঠেছে। শক্তির খেলায় তারা মেতে উঠেছে, নেই তাদের বাজে সংস্কার, দুর্বলতা। মার্ক গর্বভরেই বলল: 'হুনরা আমাদের ধ্বংস করছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে, পুড়িয়ে মারছে, আমাদের বুকে ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে। হাঁ, ওদের কাজের তারিফ করি কিন্তু ওদেরও ছাড়িয়ে যাব আমরা। সে হবে এক বিরাট হাঁ, বিরাট মাইফেল! হাঁ, খবরের কাগজে ওদের জন্য সভ্যতার দোহাই আমরা পাড়ব বইকি! আমরা সভ্যতার বান ডাকিয়ে তবে ছাড়ব।'

ওর কথায় সবাই সায় দিল। মার্ক তার সাফল্যে ফুলে ফেঁপে উঠল। তার পর শুরু হোলো তাদের ভবিষ্যৎ কীর্তির জাল বোনা: তারা নারী আর কুমারীদের গর্ভবতী করে দেবে—কিন্তু দুঃখ এই যে—ফরাসী বীর্যেই তাদের উর্বর করে তুলতে হবে। কিশোররা বুঝতে পারল না, কি ওরা বলছে। বলদৃপ্ত যৌবনের ভান তারা করল। কিন্তু দৃপ্ত যৌবনই কি তা জানে? তবু তারা মেতে ওঠে।

আনেৎ-এর মুখে কে যেন থাবড়া কষিয়ে দিল। তার ছেলের হাসি-মুখ থেকে যে পাপ উচ্চারিত হয়েছে, তারই ব্যথা বাজল তার বুকে। এরই সে জন্মদাত্রী! এরই! না, সে জানে না, বোঝে না···কিন্তু জানতে পারলে, বুঝতে পারলে কি এর চাইতে আরো ভীষণ হয়ে উঠবে না? এই আদিম আহ্বান থেকে কি করে সে তাকে বাঁচাবে?

আর একদিনও সে শুনল: তার মুখের উপরই মার্ক শুনিয়ে দিল—যুদ্ধ আর শান্তির এই দালালদের, ঈশ্বর আর আইনের বরপুত্রদের, সে ঠাট্টা করল। ঝিরের আর বের্নাদ্যাঁদের বীরত্বের ভণ্ডামি তার সজাগ চোখ এড়িয়ে যায়নি। তাদের ক্রুশ আর মতবাদের ভাঁওতা যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেল ওদের। সে কখনো তাদের বিশ্বাস করেনি, সবকিছুকেই সে অবিশ্বাস করে। কথা, কথার উপর এই কিশোরদের বিরক্তি ধরে গেছে। বয়স্ক-দের ঠোঁট থেকে, তাদের জিভ থেকে ঝরে পড়ছে কথা। ন্যায়, শ্রদ্ধা, অস্ত্র, ভগবান—কথা, কথা শুধু কথা! গির্জার ধর্মযাজকই হোক, আর

সাধারণ মানুষই হোক, এক তুলিরই পোচ পড়েছে…(চমৎকার, চমৎকার! আমাকে তো ওরা ছুঁতে পারেনি !)

কিন্তু মার্ক ক্ষেপে গেল না, বরং হাসল। এ ভণ্ডামি ভালো ; ন্যায়সঙ্গতও বটে। লোকের চোখে ছুঁড়ে মারতে আদর্শ আর ধর্মের মতো অমন চমৎকার ধুলো আর নেই—এ যেন এক শ্বাসরোধী বাষ্প। যে যত বড় প্রতারক, সেই তত বড় শক্তিমান।

ভালোই তো! আমাদের প্রচারক বা অধ্যাপকের অভাব নেই, অভাব নেই গির্জার, ভণ্ড মুদ্রাযন্ত্র আর শাসনপরিষদের! মিথ্যা বলা তো ভালো : সে-মিথ্যা যদি মিখায়েল স্ট্রগফের মতো 'ভগবান, জার আর পিতৃভূমির' জন্যেই বলতে হয়। মানুষের আবিষ্কারের ভিতরে ভগবানকে নিয়ে মিথ্যার জাল বোনাই তো সব চাইতে সরস!

স্কুলের এই নাবালক মাকিয়াভেল্লি গর্বভরে দিল তার অস্থয়ার পরিচয়। আনেৎ রেগে উঠল। শান্ত থাকাই ভালো ছিল। কিন্তু মার্কের আঘাত গিয়ে পড়ল তার মনে, সে রেগে চিৎকার করে উঠল: 'চুপ, চুপ, যথেষ্ট হয়েছে!'

মার্ক অবাক হয়ে গেল। 'কেন?'

'ও নিয়ে ঠাট্টা করা চলে না!'

বিদ্রূপ করে মার্ক বলল: 'ওরা কিন্তু ঠাট্টাই করছে।'

'না, ওরা এই আদর্শের জন্য মরছে।'

'ওঃ, আমি ভুলেই গিছলাম যে, তুমি সেই যুগের মানুষ, যখন বিচার না করেই সবাই এগুলো হজম করত। আমি ক্ষমা চাইছি।'

'না, ক্ষমা নেই', আনেৎ বলল, রাগ তার বাড়ছে। 'তোমার ঠাট্টা থামাও।'

'না, ঠাট্টা নয়, এমনি করেই আমি ভেবেছি,' মার্ক বলল। মুখখানা তার গম্ভীর, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। সে বলে গেল : 'তোমার বোঝা উচিত ছিল, আমি শ্রদ্ধাই জানাচ্ছি।'

'তার জন্যেই ক্ষমা করতে আমি পারব না। ওদের ওসব—ভগবান, ধর্ম—ওসব আমি মানি না। এতো আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে তাদের প্রতি আছে আমার শ্রদ্ধা। যখন দেখি ধর্মবিশ্বাসের দোহাই পেড়ে মানুষ ঠকাচ্ছে, আমার বিশ্বাস না থাকলেও আমি তারই পক্ষ সমর্থ করতে ছুটে যাই। এর জন্য দুঃখ স্বীকার করতেও আমি রাজি।'

মার্ক উত্তর দিল : 'তুমি বৃথাই সময় নষ্ট করছ। সেই বিশ্বাসকে ব্যবহার করাই তো উচিত। সে তো এক শক্তি—মানুষের অজ্ঞানতার মতোই এক শক্তি। এস আমরা তাকে কাজে লাগাই। জয়লাভের জন্য আমাদের সব কিছুকেই তো কাজে লাগাতে হবে। আমি বিশ্বাস করি না বলেই তো তাকে আজ কাজে লাগাব।'

আনেৎ মাথা নিচু করল, ওর চোখে তার চোখ, তারপর বলল : 'তোমাকে ঘৃণা করতে বাধ্য কোরো না।'

মার্ক শিউরে উঠল, পিছিয়ে গেল এক পা।

আনেৎ দাঁড়িয়ে রইল, চোখে তার অস্থৈর্য, মুখখানা সামনে ঝুঁকে পড়েছে। হাঁ, আর একবার সে জুনো। একটা মাদী ষাঁড় যেন, আগেকার আনেৎ-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত। নাকটা তার স্ফীত হয়ে উঠল, কর্কশ স্বরে সে বলল : 'আমি সব কিছু সইতে পারি—ভয়ংকর পাপ, এমনকি নিষ্ঠুরতাও আমি সইতে পারি। কিন্তু একটা জিনিস আমি ক্ষমা করতে পারি না। সে ভণ্ডামি। বিশ্বাস নেই, অথচ তাকে আঁকড়ে ধরবার ভান, আর নিজের ভাবধারাকে প্রতারণা—সে তো ধর্মের ভণ্ডামি। এর চাইতে না জন্মালেই তো ভালো ছিল। যেদিন তোমার এই অধঃপতন আমি দেখতে পাব, জুতো থেকে যেমন ধুলো-কাদা ঝেড়ে ফেলি, তেমনি ঝেড়ে ফেলব তোমাকে! যত মন্দ, যত নীচই হও, নিজের কাছে খাঁটি থাকবে। আমি বরং তোমাকে ঘৃণা করব, কিন্তু ছোট ভাবতে পারব না মার্ক।'

চুপচাপ রইল মার্ক, শ্বাস তার রুদ্ধ হয়ে এল। দুজনেই কেঁপে উঠল রাগে। মার্কের গালে পড়ল রূঢ় কথার চাবুক। সে ফিরিয়ে দিতে চাইল ; কিন্তু নিশ্বাস তখন ফুরিয়ে গেছে। এ ঝড় সে আশা করেনি। মা আর ছেলে শত্রুর মতোই তাকাল পরস্পরের দিকে। মার্কের চোখ নেমে এল। ক্রোধের অশ্রু লুকোবার জন্যই সে চোখ নামাল। হাসবার ভান করল, সমস্ত শক্তি জড়ো করে সে চাইল দুর্বলতা ঢেকে রাখতে। আনেৎ হঠাৎ উঠে গেল। দাঁতে দাঁতে ঘষলো মার্ক, তাকে সে তখন বুঝি খুন করতেও পারে!

তার কথা উত্তপ্ত লৌহশলাকার মতোই দাগ রেখে গেল।

আনেৎ বাইরে যেতে-না-যেতে তার এই ক্রোধের জন্য এল অনুতাপ। ভেবেছিল ক্রোধকে সে জয় করেছে, কিন্তু ঝোড়ো মেঘ কয়েকমাস ধরেই জড়ো হচ্ছিল, সে তা টের পায়নি। এবার সে বুঝতে পারল, এই বিস্ফোরণও

বুঝি শেষ নয়! তার নিজের কথাগুলো ঘৃণ্যই মনে হোলো, তাদের বর্বর রুক্ষতায় সে নিজেই মার্কের মতো লজ্জিত হোলো। ক্ষমা সে চাইল, অন্তত ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করল। দু'জনে আবার যখন একত্র হোলো, সে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল, কোমল হয়ে উঠল। যেন কিছুই ঘটেনি এমনি ভাবই দেখাল।

কিন্তু ছেলে ভুলল না। সে রইল দূরে দূরে। অপমানিত হয়েছে সে, প্রতিশোধও সে চায়। আনেৎ স্পষ্ট কথা ভালোবাসে তাই সে তাকে আঘাত দিয়েই কথা বলতে চেষ্টা করল। 'ওঃ, তুমি যদি নিষ্ঠুর ব্যবহার চাও…'

সে ইচ্ছে করেই তার টেবিলের উপর ছড়িয়ে রাখল চিঠিপত্র, উচ্ছৃঙ্খলতার নিদর্শনও সেখানে পাওয়া গেল। মার মুখখানা এসব দেখে কেমন হয় সেদিকেও রইল ছেলের কড়া নজর। আনেৎ আবিষ্কার করল তার এই খেলা, কিন্তু এমন এক মুহূর্তে তখন এসে গেছে, সে আর বিস্ফূর্ত না হয়ে পারল না। মার্ক জিতে গেল। বলল: 'হাঁ, আমি ঠিক করেছি।'

এক রাতে, তার মা তখন ঘুমিয়ে ছিল, সে বিছানা ছেড়ে উঠে গেল। পরদিন দুপুরে খাওয়ার আগে ফিরল না। আনেৎ তখন দুশ্চিন্তা, ক্রোধ আর বেদনার মাত্রা পার হয়ে গেছে। ছেলে যখন হাজির হোলো, আনেৎ কোনো কথাই বলল না। তারা দুপুরের খাওয়া শেষ করল। মার্ক অবাক! স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে সে ভাবল: 'ওকে আমি জয় করেছি।'

আনেৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল: 'কাল রাতে চোরের মতো তুমি পালিয়ে গিছলে। আমার ছিল তোমার উপর বিশ্বাস। কিন্তু সে-বিশ্বাস আজ আর নেই। কিন্তু এই-ই প্রথম নয়, আজ আমি জানলাম। দিনরাত পাহারা দিয়ে নিজেকে বা তোমাকে ছোট করতে চাই না। তুমি তখন প্রতারণার আশ্রয় নেবে, আরো ধূর্ত হয়ে উঠবে। এখানে তোমাকে রক্ষা করা অসম্ভব। আবহাওয়াই বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। তুমি তার সঙ্গে যুঝবে, এত বল তোমার নেই। আজ ক'মাস ধরে যা কিছু করেছ বা বলেছ তাতে এই মনে হয়েছে যে, রোগের বীজাণু তোমাকে ছেয়ে ফেলেছে। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'শহরের বাইরে। আমি একটা কলেজে চাকরির দরখাস্ত করেছি।'

মার্ক চিৎকার করে উঠল: 'না!'

তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গেল। পারী ছাড়তে সে চায় না। মাকে

অনুনয়-বিনয় করল। সে তার হাতে হাত রেখে আব্দার ধরল : 'না, তুমি দরখাস্ত করো না!'

'করে ফেলেছি যে।'

সে হাত সরিয়ে নিল। বৃথাই সে অপমানিত হয়েছে ভেবে ক্ষেপে গেল। আনেৎ তখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। কোমলতা তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। সে বলল : 'যদি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর...'

শুষ্ক কণ্ঠে ছেলে বাধা দিল : 'আমি কোনো প্রতিজ্ঞাই করব না। প্রথমত, তুমি তো আমাকে বিশ্বাসই করবে না। একথা তো তুমি এইমাত্র বললে। তুমি ভাবছ : আমি তোমাকে প্রতারণা করব। হাঁ, প্রতারণাই করব, তোমার মুখের উপর সেই কথাই বলছি : আবার আমি প্রতারণা করব, তোমাকে ঠকাব। আমাকে বাধা দেওয়ার অধিকার তোমার নেই।'

'বটে!' আনেৎ বললে : 'তোমার রাতের উপর পাহারা দেওয়ার অধিকারও আমার নেই?'

'না, কারো নেই! আমার রাত, আমার জীবন—তারা আমারই। আর কারো নয়।'

একটা ভীষণ কথাই সে উচ্চারণ করল। সে কি বুঝতে পারল কি বলছে? আনেৎ বিবর্ণ হয়ে গেল, মার্কও তাই। এতটা উদ্দাম হতে তারা চায়নি। কিন্তু তবু তাদের সেই উদ্দামতা হয়তো সহজাত প্রবৃত্তির বিদ্বেষকে ছাড়িয়ে যেতে পারল না। কেননা, ঘা মারতে সে জানে আর মারেও ঠিক তাগ করে। এ এক নিঃশব্দ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ! মগজের চিন্তার আগেই হাত হানে আঘাত, আগেই ঠিক করা আছে, কেউ চিৎকার করে উঠবে না। কিন্তু ঘা ঠিক লক্ষ্যে গিয়েই পৌঁছয়, আত্মার ক্ষত পেকে ওঠে।

এই মুহূর্ত থেকেই তাদের আলোচনার প্রতিটি শব্দ যেন তাদের দূরত্ব আরো বেশি বাড়িয়ে দিল। আনেৎ ছেলের খুঁত বেশি করেই ধরল আর তাই নিয়ে অপমানও তাকে করল বই কি। তার ফল হোলো এই যে, মার্কেরও গর্ব বেড়ে গেল, সে অস্বীকার করল মায়ের কর্তৃত্ব। তার সেই প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে, তার কঠোরতায় সে হয়তো উন্মাদ হয়ে গেল। কিন্তু সে বশ্যতা স্বীকার করতে চাইল না। আনেৎ তাকে বেছে নিতে বললে : হয় সে তার সঙ্গে বাইরে যাবে, না হয় তো আনেৎ তাকে পারীর কোনো বিদ্যালয়ের দেয়ালের ভিতরে বন্দী করে রাখবে। রাগে চিৎকার করে উঠল ছেলে। তার কাছে

অপমানজনক মনে হোলো কর্তৃত্বের এই শর্ত। সে বন্দী হয়ে থাকতেই রাজি হোলো।

'কি চাও?'

'যা ইচ্ছে তোমার। শুধু তোমার সঙ্গে থাকতে চাই না।'

তারপর বিদায়। ঘৃণা বুকে নিয়েই তারা বিদায় নিল। কিন্তু তারই গভীরে রইল ভালোবাসা—তিক্ততায় মাতাল ভালোবাসা! আহত ভালোবাসা! সে বহু দুঃখ সয়েছে, রক্ত ঝরেছে তার, তাই সে ভালোবাসা আজ প্রতিশোধ চাইছে!

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ এক ॥

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও বাদ পড়ল না। প্রতি দশজনের মধ্যে একজন পড়ল বলি। এবার আমদানি হোলো স্ত্রীলোকের। আনেৎ-এর দুটো ডিগ্রি, মধ্য-ফ্রান্সের কোনো শহরের এক কলেজে সে চাকরি পেয়ে গেল।

উনিশ শো পনের সালের অক্টোবরের প্রথম দিকে সে ছাড়ল পারী। কি সুন্দর শরৎ! মাঝে মাঝে মাঠের ভিতরে থামছে ট্রেন—এক দীর্ঘ বিরতি; থ্রাস পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে আঙুরের ঝোপে ঝোপে। শান্ত নদী বয়ে চলেছে প্রান্তরের ভিতর দিয়ে, শস্যের সোনালী পাড় ঝলসে উঠেছে। আগে এই অঞ্চলটাকে সে চিনত, জানত তার অধিবাসীদের। তারা যুদ্ধ সম্বন্ধে উদাসীন, বিদ্রূপের আমেজ তাদের কথায়। তার মনে হোলো, অবশেষে মহামারীগ্রস্ত আত্মার কোটর থেকে পালিয়ে এসে সে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু ছেলেকে ছিনিয়ে আনতে পারেনি বলে সে নিজেকে ভর্ৎসনা করল।

কিন্তু কয়েক দিন যেতে না যেতেই সে বুঝতে পারল তার ভুল। এই সমৃদ্ধ, ঘুমন্ত জনপদের উপর ঘনিয়ে আসছে ঝড়ের ছায়া। এখন সংঘর্ষ চলেছে আর্তোয়া আর শাম্পেনে···বন্দীদের পিছনে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

যেতে যেতে একটা স্টেশনে একটি ঘেরা জায়গায় সে ভিড় দেখতে পেল। জনতা চিৎকার শুরু করেছে, ঠেলাঠেলি করছে। একপাল জন্তু যেন, কয়েকঘণ্টা বা কয়েকদিনের জন্য এখানে বন্দী হয়ে আছে। এরাই জার্মান বন্দী। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলেছে এদের নিয়ে টানা-হেঁচড়া। কোথায় যাচ্ছে, কখন গিয়ে পৌঁছবে, কোনো ধারণাই তাদের নেই। শহরের পুরুষ, স্ত্রীলোক আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটে আসছে এই খাঁচায়-পোরা জন্তুদের দেখতে। এ যেন এক ভ্রাম্যমাণ সার্কাস। দর্শনী না নিয়েই দেখাচ্ছে। বন্দীরা ভেঙে পড়ছে কাঁকরের উপর। বেশির ভাগই চুপচাপ, চেতনা নেই, বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টির বৃত্ত তাদের ঘিরে আছে। আর জনতা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখছে। কেউ বা ফুর্তিতে থুথু ছেটাচ্ছে

তাদের গায়ে। কয়েকজনের হয়েছে জ্বর। মারখাওয়া কুকুরের দল লজ্জা আর ভয়ে কাঁপছে। ঠাণ্ডা রাত আর বৃষ্টি এনেছে আমাশা। প্রতিমুহূর্তে দর্শকদের হাসির শব্দ কানে এসে বাজছে। ছেলেমেয়েরা কাঁদছে, মেয়েরা করছে চিৎকার, হাঁটু চাপড়ে হাসিতে ফুলে-ফেঁপে উঠছে তারা, চোয়াল দুটো হাঁ হয়ে আছে আনন্দে। এ নিষ্ঠুরতা নয়, অনুভূতির অভাব। জানোয়াররা ফুর্তি করছে···জনতার উচ্চহাসি বুঝি চিরদিনই এমনি পশুত্বেরই পরিচয় দেয়, সে-পশুত্ব যেন চরমে উঠেছে। প্রাকারের দুধারেই হিংস্র গরিলার দল, মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আনেৎ গাড়িতে উঠতে গিয়েই তার আশে-পাশে লোমশ দেহের দিকে তাকিয়ে দেখল, নিজের হাতের উপরও তার নজর পড়ল। বিরক্তি ধরে গেল মনে, কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না।

এই স্মৃতি কদিন হানা দিল তাকে কলেজে, এই বাগান-ঘেরা কলেজে। এক চমৎকার শ্লেষ! একগাছা তৃণও আর বাকি নেই, টলেডোর মরুভূমির মতোই এখন তা ধূসর আর কর্কশ! গিলোটিনের মতোই গেট, তারই ভিতরে এক ফালি উঠোন, চারদিকে শ্বাসরোধ করা দেয়াল—বিষণ্ণ চোখের মতো জানালার সার। উঠোনের একপাশে একটা কলা গাছ, রুগ্ন, দোমড়ানো, কোনোরকমে খাড়া হয়ে আছে। খুদে জন্তুদের নখের ঘায়ে তার ছাল উঠে গেছে, নিচে পাতাও নেই, তাদের থাবায় পাতাও ঝড়ে পড়েছে; গুড়ির উপর লাথির দাগ। দেখেই মনে হয়, বড় আর ছোট সবাই আজ জীবনকে ধ্বংস করতে মেতে উঠেছে, ষড়যন্ত্র করছে। রাষ্ট্র নিয়ে গেছে পুরুষদের, ছেলেমেয়েরা তাই প্রকৃতির উপর নিচ্ছে প্রতিশোধ। ধ্বংস শুধু ধ্বংস! যুদ্ধ আর শান্তি—দুজনেই ধ্বংসে মেতে উঠেছে। শিক্ষার অর্থেকই তো এই!

দেয়ালের বাইরে একটা রাস্তা, সেখানে সারি সারি চামড়ার কারখানা। স্যাঁতসেঁতে ক্লাসে তারই গন্ধ এসে পৌঁছয়, আর এখানে বদ্ধ খুদে জন্তু-গুলো পচে বিষাক্ত হয়ে ওঠে। কজনই বা ছাত্র—বেশি হলে জন বিশেক হবে। শক্ত বেঞ্চে হুটোপাটি খায়। জানালা দিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে আসে পড়ন্ত শরতের কুয়াশা, বদ্ধ ঘরের আবহাওয়া আরো গুমোট হয়ে ওঠে। একটা স্টোভ গর্জন করতে থাকে। যখন দম আটকে আসে, তখন দরজা খোলা হয়। (জানালা বন্ধই থাকে) তখন আসে কুয়াশা, আসে কষানো চামড়ার গন্ধ; জীবন্ত চামড়ার গন্ধ শোঁকার পর যেন ভালোই লাগে এই দুর্গন্ধ।

পরিচ্ছন্নতায় যতই অভ্যস্ত হোক না, স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া যতই পছন্দ করুক না, স্ত্রীলোক পুরুষের চাইতে সহজেই আবর্জনার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় রোগশয্যা। সেবায় তার চোখে দেখা দেয় না বিরক্তি, হাতের আঙুলগুলো শিউরে ওঠে না, কুঁচকে যায় না। আনেৎ-এর ঘ্রাণেন্দ্রিয় বশ্যতা স্বীকার করল। আর সবার মতই এই পশুর আস্তানার গন্ধে সে নিশ্বাস নিল, নাক একবারও কুঁচকে উঠল না। কিন্তু এদের আত্মার পূতিগন্ধ তার সহ্য হোলো না। তার আত্মা তখনো নুয়ে পড়েনি।

॥ দুই ॥

কিন্তু কামনায় উষ্ণ সে-আত্মা আর নেই, নেই সংঘাত, ঘৃণা, আর পীড়ন। সে তো মুক্তি পেয়েছে, তার তো এখন সন্তুষ্ট হওয়াই উচিত। এখানে সে পেল ঔদাসীন্য।

এই কোমল মাটি সহ্য করেনি পীড়ন, সমৃদ্ধ কোমলতায় সে ঝিমিয়ে আছে। উপত্যকার বুকে যেন পালকের বিছানায় এলিয়ে দিয়েছে নিজেকে, পাহাড়ের উপাধানে গড়িয়ে পড়েছে তার মাথা। ভালো করেই সে ঘুমোতে চায়, উপাধানের বাইরের জগতের স্বপ্নও সে দেখতে চায় না। শান্ত মাটি, শান্ত জাতি, অচঞ্চল আত্মা। ঈশ্বর বুঝি এদের জন্য মরেন নি! মানবসমাজ এদের জন্য বুঝি ক্রুশবিদ্ধ হয়নি।

আনেৎ ছোটবেলা থেকেই এই অঞ্চলকে জানে, তার বাবাও এসেছিলেন। এখান থেকে আগে সে এই শান্তি উপভোগ করেছে। কিন্তু আজ? একদিন এর সুস্থতার সে ঈর্ষা করত। আর আজ? টলস্টয়ের কথাই তার মনে পড়ল—শুধু মেয়েদের পক্ষেই সেকথা সত্য নয়: যে কখনো দুঃখ ভোগ করেনি, রোগে ভোগেনি—যে সুস্থ, বেশি সুস্থ—সে তো এক দানব!···বাঁচা মানেই তো প্রতিদিন মৃত্যুকে বরণ আর সংগ্রাম। এই অঞ্চল মৃত্যুযন্ত্রণায় ধুঁকছে, কিন্তু সংগ্রামের শক্তি তার নেই। তার নিস্তরঙ্গ নদীগুলোর মতোই শান্তভাবে তীরের উপর লুটিয়ে পড়ছে, মরে যাচ্ছে। এর কারণ তো তার স্বার্থান্ধ, ব্যবহারিক বুদ্ধি।

অথচ একদিন ছিল, যখন সারা অঞ্চলে আগুন ধরে গিয়েছিল। বারগাণ্ডির এই পুরনো শহর, গর্বিতশীর্ষ এর তিনটি গির্জা, এর গথিক মিনার, পুরনো বর্মের মতো মরচে ধরা সাদা পাথর আর ব্রঞ্জের গম্বুজের সার, এর বিস্তৃত নদী—সন্তশহীদের মূর্তিগুলি, জমাটবাধা কালো রক্তের মতো জানলার সার, উপাসনা মন্দিরের ধনসম্পদ, হারুনের সময়কার মহার্ঘ কারুকার্য খচিত বস্ত্র, সম্রাট চার্লস্‌, তাঁর পূর্ব ও অধস্তন পুরুষদের আমলের স্বর্ণকারদের সূক্ষ্ম কারুকলার নিদর্শন, ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় গড়া প্রাকার আর ধ্বংসীভূত মিনার—সব কিছুই সেই অতীত জীবনের গরিমাময় রক্তস্রোত, ধর্মযাজকের স্বর্ণদণ্ড, মহান সংর্ঘষ, ডিউক, নরপতি, আর ওরলিনের কুমারীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এখন তার পথঘাট জনহীন। দুধারের মধ্যবিত্তদের দেয়াল-ঘেরা বাড়িগুলোর সদরের সরু দরজা বন্ধ, মাঝে মাঝে পথের অলস পদধ্বনি শোনা যায়। কে যেন এগিয়ে আসছে। উপরে কাকগুলো উড়ে যেতে যেতে ডেকে ওঠে, ক্যাথিড্রালের চূড়ার চারপাশে কালো বৃত্তের মতো দেখায় তাদের।

জাতি মরছে, কিন্তু তবু সে সুখী। বিশাল বিস্তৃতি, স্বাদু মাটি; ক্ষুধার তৃপ্তি। আকাঙ্ক্ষাও তাদের সীমাবদ্ধ। পুরুষের পর পুরুষ ধরে দুঃসাহসিকরা পারী জয়ের উন্মাদনায় ছুটে গেছে। যারা পড়ে আছে, তারা গা এলিয়ে দেওয়ার মতো পেয়েছে বিস্তীর্ণ মাটি। বিছানা যখন শূন্য, পাশ ফেরবার জায়গা সেখানে পাওয়া যায় বই কি। সে বিস্তীর্ণতার পরিধি আরো বেশি করে বাড়িয়ে দিয়েছে যুদ্ধ। ছেলেরা যুদ্ধে চলে গেছে। না, সবাই যায়নি। তাদের কল্পনাও এত জীবন্ত নয় যে, আগেই দুশ্চিন্তা শুরু করে দেবে, কিন্তু তাদের ব্যবহারিক বুদ্ধি আয়ের হিসাব খতিয়ে দেখেছে। সহজ জীবন, ভাল খাবার, চলচ্চিত্র, কাফে,—আদর্শের দিক থেকে ব্যারাকের বিউগল—তাছাড়া সত্যি-কারের দিক থেকে আছে জন্তুর হাট। তারা খুব খুশি। খবরের জোয়ার-ভাঁটা, অগ্রগতি আর পশ্চাৎ অপসরণের কোনো তোয়াক্কাই তারা রাখে না। কিন্তু মূর্খ তারা নয়। জার্মানদের কাছে রুশরা হটছে শুনে তারা মন্তব্য করছে: 'এমনি করে পিছু হটলেই হয়েছে আর কি! ওরা কোন দিন ট্রান্স-সাইবেরীয় ট্রেনে চড়ে আমেরিকা হয়ে এখানে এসে পৌঁছবে!'

ভোগসুখের প্রতি তাদের দৃষ্টি তাদের শক্তি আর নিষ্ঠুরতাকে ঘষে ঘষে মসৃণ করে দিয়েছে। (থাম! একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখ বন্ধু! খুব নিশ্চিন্ত হোয়ো না!···)

হাঁ, শান্ত এই শহর, ঘুমন্ত এই শহর। আনেৎ তুমিও কি অমনি শান্ত নও? তুমিও কি শান্তি চাওনি?

'শান্তি!···জানি না তো। শান্তি?···হয়তো চেয়েছি! কিন্তু এতো আমার মনের সঙ্গে খাপ খায় না। এতো শান্তি নয়···'

শান্তি তো যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয়। এ এক ধর্ম, আত্মার শক্তি থেকেই এর জন্ম।

পাহাড়, আঙুরখেত আর প্রান্তরে ঘেরা অঞ্চল ডুবে গেল শান্তিতে, ডুবে গেল ফ্রান্সের এই সমৃদ্ধ কেন্দ্র—কামানের অস্পষ্ট শব্দ এসে পৌঁছল এখানে—সৈন্যবাহিনীর বন্যা যেন ঘুরে গেল—যেন অনড় পাথরের স্তূপের চার পাশে ঘুরে বয়ে যায় নদী (দুবছর পরে, যখন মার্কিনরা সেখানে ছাউনি ফেলল, অধিবাসীরা প্রথম সোরগোলে খুশিই হোলো, কিন্তু দুদিন পরেই এল ক্লান্তি)। কিন্তু এ শান্তি তো বন্ধ স্কুলঘরের শান্তি, দরজা জানালা সেখানে বন্ধ, স্টোভ গর্জাচ্ছে, আর খুদে মানুষদের আত্মা নিজের রসেই গুমিয়ে গুমিয়ে সিদ্ধ হচ্ছে।

॥ তিন ॥

এদের অধিকাংশই এই অঞ্চলের ছোট ব্যবসায়ী বা বর্ধিষ্ণু চাষীর ছেলে। দু-একজন আছে বনেদী ঘরের। তাদের দেখলেই চেনা যায়। তাদের মুখে পড়েছে ধূর্ততার পালিশ, স্কুলের শিক্ষা আর অধ্যাপকদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধই এজন্য দায়ী। কিন্তু খুদে মানুষগুলো যতই বিভিন্ন হোক, এক জায়গায় তারা এক। যে শিল্পী তাদের জাতিকে এই অঞ্চলের মাটি থেকে রূপ দিয়েছে, তার আঙুলের ছাপ তাদের সবার উপরেই পড়েছে বই কি। তাদের মুখগুলি যেন গির্জার পাথর কেটে তৈরি। দেখলেই বোঝা যায়। শহীদ সন্তদের (সত্যি কি তারা সন্ত?) মূর্তির উপর অনায়াসেই তাদের মাথা কেটে বসিয়ে দেওয়া যায়, কোনো ক্ষতিই তাতে হবে না। তারা ধর্মমন্দিরেরই প্রপৌত্র—এতে সান্ত্বনা আছে, কিন্তু ভরসা খুব নেই। (কথাটা নিজেদের মধ্যে বলেই বলছি, ধর্মমন্দিরের এই সাধুসন্তদের কেউ কেউ ছিলেন সেরা

বদমায়েস। অথবা ছিলেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে।) আনেৎ তার ক্লাসে দু'ধরনের ছাত্রই দেখতে পেল। শুধু ছাপটা অস্পষ্ট। তা তো হবেই। পুরনো মদ পুরনো বোতলে বহুদিন ধরেই যে রয়েছে।

এই বয়সের এই হাড় জিরজিরে, বেঢপ ছেলেদের মুখে রুক্ষতা আর শয়তানির ছাপ দেখে সে অবাক হয়ে গেল। এই মাটিতেই এদের জন্ম। লম্বা বাঁকা ভালোয়া নাক, খুদে শয়তানি ভরা চোখ, হাসবার সময় কপালে অকালপক্কতার রেখা, শেয়ালের মতো চোয়াল, হলদে দাঁতের হাসি, নখ আর কাগজের তাল চিবোনো—সব সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। চেয়ারে বসে আনেৎ-এর মনে হোলো, সে যেন শিকারী, তার সামনে এরা একদল কুকুর। —সে শিকারী, না নিজেই শিকার? শিকার কে হবে? সে আর ওরা দু'দলই দু'দলকে পাহারা দিচ্ছে। পিস্তলের ঘোড়ার উপর আঙুল সব সময়েই প্রস্তুত রাখতে হবে। যে দল প্রথম চোখ নামাবে, তাদেরই ভয়।

ওদের দলই প্রথম চোখ নামালো। প্রথম পরীক্ষা শেষ হোলো দৃষ্টি বদল, অস্ফুট স্বর আর পরস্পরকে কনুই দিয়ে ধাক্কা মারার ভিতর দিয়ে। তারপর চোখের পাতা এল নেমে। কিন্তু তখনও পাহারা চলেছে; সে আরো বিশ্রী। ওদের নাগালে পাওয়া শক্ত হোলো, কিন্তু ওরা পেল নাগালে। আনেৎ-এর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীর উপর রাখল নজর, সঙ্গে সঙ্গে তারহীন বার্তার মতোই ছড়িয়ে দিল সারা ক্লাসে। কিন্তু বাইরে সে-ভাব গোপন করে রাখল সরলতা (তা ওরা সরল বই কি!) দিয়ে; কিন্তু টেবিলের নিচে তাদের পা কুঁচকে গেল, মেঝেয় পা ঘষল তারা; পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল, কখনো বা অন্যের উরু চাপড়ে দিল, চোখ টিপল; তারা কিছুই দেখল না, আবার সব কিছুই দেখল। শিক্ষয়িত্রীর দৃষ্টি একটু শিথিল হতেই আনন্দে তারা শিউরে উঠল।

শিক্ষকদের কাছে এতো পুরনো ব্যাপার। আনেৎ সবে শুরু করেছে (এতদিন সে গৃহ শিক্ষকতা করত), কিন্তু তবুও সে প্রকৃতিস্থই রইল; তার রক্তে শাসনের সহজাত প্রবৃত্তি। এমন কি আনমনা হয়েও সে বিপদ বাঁধাল না। বিপদের সামান্য সাড়া পেয়েই সে প্রস্তুত হয়ে গেল। তার এই অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে খুদে নেকড়ে আর শেয়ালেরা জিভ লকলকিয়ে, হাঁ করে ধেয়ে এল বটে, কিন্তু উদ্ধত চোখের আগুন দেখে তারা থেমে গেল, ভয় পেল। অথচ তারাই না তাদের শিক্ষয়িত্রীকে নিয়ে তামাশা করতে গিয়েছিল!

এই খুদে মানুষরা জানত, মেয়েদের একটা নিজস্ব স্থান আছে। সে তার

নিজের বাড়ি। সেখানে সে কর্ত্রী। ওর মুখখানা (সুন্দর সে মুখ), ওর হাত (হাত দুখানা ভারি চেপ্টা) তারা দেখেছে। হয়তো ওর শরীরের নিচের দিকটা আরো চমৎকার। ওরা যেন তারই ইশারায় মাতাল হয়ে উঠল। অথচ কেউ কিছুই জানত না। দু'এক জনের প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল; কিন্তু কেউই নিজেকে অনভিজ্ঞ বলে স্বীকার করতে চাইল না। এই খুদে ভাঁড়রা এই নিয়ে আলোচনা শুরু করল।

মেয়েরা যদি জানত কিশোরদের দলে তাদের নিয়ে কি সব আলোচনা হয়! হাঁ, যারা তাদের মুগ্ধ করেছে, তাদের দৈনন্দিন সংকীর্ণ বৃত্তের ভিতরে জাগিয়েছে কল্পনার সাড়া, তাদের নিয়েই তারা আলোচনা করে। বোন, বিবাহিতা, অবিবাহিতা স্ত্রীলোক, কর্ত্রী, যারাই ঘাঘরা পরে—কেউই বাদ পড়েনা, এমন কি ভগবানের কাছ থেকে সে-ঘাঘরা এলেও না। মা-ই একমাত্র গোপন সন্ধির শর্তে রেহাই পান—সব সময় বুঝি বা পানও না। তাই যখন এমন কেউ এসে দেখা দেয়, যার কোনো বন্ধন নেই, কোনো রক্ষক নেই (যাকে কেউ দাবী করে না), যার স্বামী, ছেলে বা ভাই নেই—সে হয়ে ওঠে তাদের কাছে জবর শিকার। দিকবিদিকে ছোটে তাদের কল্পনা, আর কীই বা তারা না বলে!

আনেৎ শিকার বটে, কিন্তু তাকে সামলানো শক্ত। কে প্রথম শুরু করবে, কেমন করে শুরু করবে—এই হোলো প্রশ্ন।

অদ্ভুত মেয়ে! তারা হাত আড়াল করে তাকে ঠাট্টা করল, চোখের দৃষ্টি দিয়ে তাকে বিঁধল, কিন্তু কি কঠোর বিদ্রূপ ভরা চোখ! তাদের বিদ্রূপ ঠোঁটের সঙ্গেই লেগে রইল। তারা অবাক হয়ে গেল, যখন সে তাদের মনের কথা ধরে ফেলল!

'পিল্‌ওয়া, মুখ মুছে ফেল! গন্ধটা ভারি খারাপ!'

'কি ব্যাপার?'

'এই যে এই মাত্র যা বলছিলে।'

পিল্‌ওয়া প্রতিবাদ জানালো, না সে কিছু বলেনি। খুব আস্তে আস্তেই তো বলেছিল, আনেৎ শুনতে পাবে, এ কল্পনাই সে করেনি।

'আমি শুনেছি। ওসব বলতে হলে বাইরে যাও। যদি নিজের চিন্তাকে বাগ না মানাতে পার, অন্তত মুখখানা পরিষ্কার রাখবে এই আমি চাই।'

মুহূর্তের জন্য সবাই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। এমন দৃষ্টি, এমন কণ্ঠস্বর

সে কোথায় গেল? এ তো উত্তর নয়, যেন থাবড়া এসে গালে পড়ছে। অসহিষ্ণু সে হোলো না, ভ্রূর উপর হাত খানা একবার বুলিয়ে নিল। আবার দৃষ্টির বৃত্ত তাকে ঘিরে ফেলেছে। তার কান থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত তারা আবিষ্কার করতে চাইছে। সে তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবিরাম একটার পর একটা প্রশ্ন করে গেল, তাদের চিন্তাকে দিগবিদিকে ছুটতে দিল না। বুঝতে পারল ঐ ফাঁপা খুলিতে কি ঘটছে···একঝাঁক মাছি যেন ভন ভন করছে। সে বুঝতে না পারলে তারা তাকে সে-কথা বুঝিয়ে তবে ছাড়ত।

শাঁঞেওয়া বয়সে বছর পনেরো। বাপ ঘোড়ার ব্যবসায়ী। তাকে দেখলে সতেরো বছরের ছেলে বলেই মনে হয়। বেশ গাট্টা-গোট্টা, মুখে দাগ, চুলগুলো স্থন্দর, শুয়োরের মতোই চাঁচা-ছোলা মুখ, চওড়া হাতের নখগুলো দাঁত দিয়ে কাটা। ছেলেটা ভারি ধূর্ত, একটা না একটা ঝগড়া বাঁধিয়েই বসে আছে। আনেৎকে দেখেই তার কামনা জেগে উঠল। আনেৎ-এর কমনীয়তা আর দীর্ঘ দেহ তাকে মুগ্ধ করল। অভিজ্ঞের মতোই সে ঠোঁট চাটল, বাজি রাখল সে তাকে তার প্রেম জানাবে। আনেৎ যখন তার সঙ্গে কথা বলল, মাছের মতো চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে দেখল। আনেৎ তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে সবাইকে হাসালো। সে এবার রেগে উঠে প্রতিজ্ঞা করল, এই বেয়াড়া মেয়েটাকে সে শিক্ষা দেবেই। একদিন অশ্লীল ছবি আঁকতে গিয়ে ইচ্ছে করেই সে ধরা পড়ল। কি ফল হয় দেখবার জন্য তখন সে উৎসুক। কিছুই হয়নি এমনি তার মুখের ভাবখানা, অথচ পেটে তখন হাসিতে খিল ধরে গেছে। ক্লাসের খুদে কুকুরছানাগুলো আগেই ব্যাপারটা জানত, তারা আগেই হাসতে স্থরু করে দিল। তাদের চোখ রইল আনেৎ-এর দিকে। সে তখন প্যাডখানা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটুও আশ্চর্য হোলো না। কাগজখানা ভাঁজ করে সে আবার শুরু করল শ্রুতলিপি। শাঁঞেওয়াকেও লিখতে হোলো।

শেষ হয়ে গেলে সে বলল: 'শাঁঞেওয়া, তোমাকে কয়েক সপ্তাহের জন্য তোমার বাবার ওখানে যেতে হবে। তুমি অসুস্থ। ঘোড়াগুলোর সঙ্গী হয়েই তোমার দিন ভালো কাটবে—ঐটেই তোমার উপযুক্ত জায়গা।'

শাঁঞেওয়া হাসল না। বাপের লাথি খেতে তার ইচ্ছে নেই। সে প্রতিবাদ করল, তর্ক করল, কিন্তু আনেৎ শুনল না:

'যাও, চলে যাও! এখানকার আস্তাবলটা বড় ছোট। ওখানে গিয়ে ভালোই কাটবে। এই যে অনুমতিপত্র—, নাও, নিয়ে চলে যাও!'

সে কাগজখানার উপর লিখল—'স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোলো।' তারপর ক্লাসে সে বলল: 'তোমরা শুধু তোমাদের সময় নষ্ট করছ। ভেবেছ আমি স্ত্রীলোক বলে তোমরা আমাকে ভয় দেখাবে। তোমরা দেখছি, কয়েক শতাব্দী পেছিয়েই আছ। আজকাল মেয়েরা পুরুষদের মতো কাজ করতে পারে, তারা পুরুষদের সমান। পুরুষদের নিজেদের আছে বিশিষ্ট স্থান। সেখান থেকে তাদের সরিয়ে দিতে মেয়েরা চায় না, বা পারে না, কিন্তু তারা তাদের সামনে চোখ নামিয়ে নিতেও রাজি নয়···তোমরা তো মানুষ হতেই চলেছ! ধৈর্য হারিও না। সে-আকাঙ্ক্ষা খুব কম লোকেরই পূর্ণ হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, তোমরা সৎ হতে চাও কি না, জীবনে উন্নতি করতে চাও কি না? আমরা সেই জন্যেই তো তোমাদের সাহায্য করছি। তোমরা যদি সে-সাহায্য না চাও, আমরা জোর করব না। হাঁ কি না, বল: কি, তোমরা সাহায্য চাও? আচ্ছা, তা হলে এস এগিয়ে!'

আরো কয়েকবার চেষ্টার পর তারা বুঝতে পারল, শক্তি তাদের নেই। তারপর হোলো সন্ধি। কিন্তু সীমান্তরক্ষার প্রয়োজন তো আছেই। নইলে সন্ধিপত্র তো একতাড়া কাগজেই পর্যবসিত হবে। হাঁ, সীমান্তে বসল পাহারা, তারই উপরে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠল। প্রতিষ্ঠিত শাসনের বিরুদ্ধে তারা আর তর্ক তুলল না। তাদের একতারও আর উদ্দেশ্য রইল না, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। আগেও তাইই ছিল। আনেৎ এবার এই জাতির মধ্যে পেল ব্যক্তিত্বের সন্ধান। ছটা ক্লাসের ভিতরে মাত্র তিন চার জন পেল তার সহানুভূতি। কিন্তু সহানুভূতি দেখাতে সে পারল না। ছোট ছেলে, কোমল তাদের মন, একটু আধটু ভাবতে শিখেছে, তাদের চামড়ার নিচে চিন্তার লজ্জারুণ আভাস; স্বভাবতই তারা একটা কথা, একটু দৃষ্টিতেই উদ্বেল হয়ে ওঠে। অন্যরা তাদের সন্দেহ করে, এমনকি তারা নিগৃহীতও হয়। তাদের বনেদী পরিবার জাতির প্রকৃতিগত শত্রুতার আবরণ তাদের উপর টেনে দিয়েছে। তাছাড়া তাদের স্পর্শাতুর স্বভাবের জন্যই কষ্ট সহ্য তারা করে। একটু পক্ষতাতিত্ব দেখালে তাদের অপকারই হয়। কখনো কখনো তারা তারই নেয় সুযোগ। কেউ যদি তাদের দিকে আগ্রহ দেখায় তারা নিজেদের কৌতূহলের বস্তু বলেই মনে করে, তারা তাইই হতে চায়, প্রকৃতি তাদের

মিথ্যা ছলনায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। একই প্রজাতি থেকে তারা এসেছে, সরল উচ্ছৃঙ্খল তারা। আনেৎ নিরপেক্ষ হতেই চেষ্টা করল। কিন্তু মনে রইল যে কোনো একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরার কামনা, অমনি করেই সে তার অভাব ভুলে থাকতে চাইল। মার্ক রইল তাকে ঘিরে। সে তাদের প্রতিজনের ভিতরে তাকে খুঁজল, তুলনা করল; কিন্তু খুঁজে পেল না। মার্ক? তার সমান কি ওরা! সে নিজেকে ঠকালো। সে তাকে এনে কল্পনায় বসালো ওদেরই জায়গায়। সে দেখল তাকে। ওদের মনে সে পড়ল মার্কের মনের কথা। ভালো আর কোথায় পাবে, তাই ওরা হোলো তার আরশি, আর তাতে ঝলসে উঠল তার হারানো ছেলের, উচ্ছৃঙ্খল ছেলের ছায়া। সে-ছায়ায় বিকৃতি বেশি নেই। কিন্তু আর কিছু সে-আরশিতে কি ফুটে উঠল?

হাঁ, উঠল বই কি! সে এই এদেরই পূর্বপুরুষের ছায়া। তাদের আদর্শ পূর্বপুরুষের ভাবধারা থেকে বিন্দুমাত্র এগোয়নি (এই তো অগ্রগতি! অতীতের এই শক্তি পিছু হটেই চলেছে)। জন্মাবার সময়ে তাদের চেহারায় নিশ্চয়ই বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু স্কুলে ঢোকবার আগেই তাদের সে পৃথক সত্তা তারা বিসর্জন দিয়েছে। তাদের মনিবের, তাদের বাবার সীল-মোহরের ছাপ পড়েছে। তাদের বাবারাও বাদ পড়েননি, তাঁদের উপরে পড়েছে গোষ্ঠীর ছাপ। তারা এখন নিজেদের সম্পত্তি নয়, তারা এখন সেই নাম-হীন শক্তির দাস, যে যুগের পর যুগ ধরে শহরে শহরে এই পথের কুকুরদের জড়ো করেছে, তাদের একই ভাবভঙ্গী, একই ডাকের পুনরাবৃত্তি করিয়ে একই ভাবধারার কুঠরি তৈরি করেছে। এই ভাবধারার যন্ত্রটাকে প্রথমে চালাতে শেখায় স্কুলের কারখানা। একার প্রচেষ্টায় তাদের মুক্তি অসম্ভব। তারা যাতে পূর্বপুরুষের ভাবধারার জুতোয় পা না গলায় সেইটাই প্রথমে তাদের শেখাতে হবে।

কিন্তু তারা তো পূর্বপুরুষের ছদ্মবেশ পরেই খুশি! যতই কম ভাবতে হয় ততোই তারা সুখী, গর্বিত! ভগবান জানেন—ওদের পূর্বপুরুষের পক্ষেও হয়তো একথা সত্য! ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিলেই তারা গর্বে স্ফীত হয়ে ওঠে (এক বিশ্রী ব্যাপার!)। জনতার বিশ্বাস—তাকে স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, গির্জা, রাষ্ট্র, পিতৃভূমি, যাই-ই বলনা—হয়তো তার কোনো নামও নেই—তেতো প্রজাতি ছাড়া কিছুই নয়। এই প্রজাতি এক নিষ্প্রভ চক্ষু দানব, তাকে

মানুষ দৈবশক্তির অধিকারী বলেই জানে। যে জলাভূমি থেকে সে উঠেছিল তারই পাঁকে সে তার শুঁড় ডুবিয়ে লুটোপুটি খায়, একদিন আবার ওরই ভিতরে সে ডুবে যাবে (কত হাজার হাজার প্রজাতি তো ডুবে গেছে! আমরা কি আমাদের প্রজাতিকে বাঁচাতে পারব না?)।

জলাভূমির উপর জ্বলজ্বল করছে আলেয়ার আলো। ছোট ছেলেমেয়েদের চোখে সেই আলো-দেখার-মোহ অনেকেরই আছে। আনেৎও মোহগ্রস্ত, সে আলেয়ার আলোই দেখতে চাইল। তারা জীবন সম্বন্ধে কি ভাবে? মৃত্যু সম্বন্ধে কি ভাবে? এই যুদ্ধ-ঝড় পাহাড়ের ফটকে এসে ঘা দিচ্ছে—দিগন্তে তার সাড়া জেগেছে—কিন্তু এই খুদে মানুষদের মগজে কী প্রতিধ্বনি সে জাগালো?

কোনো প্রতিধ্বনি এল না, শুধু এল রাটা-টা-টা বিউগলের ধ্বনি, বোমা আর লা ইলাস্তেসিয়ঁর ছবি, এক সুদূরের দৃশ্য হিসেবেই এল। তার দীর্ঘ স্থায়িত্বে এল তাদের বিরক্তি। (তারা আনন্দের আতিশয্যে তখন ক্লান্ত) মারবেল আর বাজি রাখা, অথবা ক্লাসের ষড়যন্ত্রের আকর্ষণ তখন তাদের কাছে ঢের বেশি। যখন বড় হবে, তখন আসবে ব্যবসা, লাভ আর খতির খতিয়ান।

কিন্তু তবুও তাদের স্বজনরা গেল ট্রেঞ্চে, কেউ কেউ বা মারা গেল। তাদের কথা কি ওদের মনে পড়ল না?

হাঁ, পড়ল বইকি! কিন্তু অনুভূতি রইল না। শুধু গর্ব করবার জন্যই তাদের প্রয়োজন হোলো। তারা নিজেরাই যেন এক একজন বীর। সীমান্ত থেকে খবর এসে পৌঁছলে ওরা সেই দুঃখদুর্দশা তামাসা বলেই ভাবল। বেস্থিঁ তো একদিন হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল: 'আমার ভাই বলছিল, ওদের তো নাক অবধি পাঁকে ডুবে গেছে!' কর্ভো বলল: 'ওরা হুনদের হত্যা করছে।' কি করে হত্যা করে সে দেখালো। সে একদিন একটা শুয়োর মারতে দেখেছিল।

তারা কামানের গোলার কথা বলল। তাদের মনে ভেসে উঠল গির্জার গম্বুজ, গাছপালা, নাড়িভুঁড়ি আর নরমুণ্ডের ছবি। রক্তমাংসের জীবন্ত ছবি গড়ে তুলল তারা। জঞ্জাল ঘেঁটে যেমন ছেলেরা সুখ পায়—তেমনি সুখ পেল তারা। কিন্তু তার নিচে আত্মার প্রতিবাদের কথা কারো মনে পড়ল না।

যারা যুদ্ধ থেকে ফিরে এল, তারাও জাগিয়ে তুলল না সেকথা।

কর্ভোর ভাই ছুটিতে এল। সে ছেলেদের ডেকে বলল: 'আমার এক বন্ধু কামানের গোলার পলতে বেচে বেশ দু'পয়সা করেছিল। হাত দিয়ে পলতে খুলে নিতে ছিল সে ওস্তাদ, গোলাটা ঠাণ্ডা হবার আগেই সে খুলে নিতে পারত। আমি তাকে একদিন বললাম, দেখো, সাবধান! সে উত্তর দিল: আরে না, না, ওরা আমাকে চেনে। একদিন ওর পেছনে পেছনে গেলাম, লুকিয়ে রইলাম গাছের আড়ালে। চিৎকার করে বললাম: খবর্দার, ওটা ছুঁয়ো না, কি জানি হঠাৎ ফেটে যেতে পারে। সে বলল: তুমি ভারী ভীতু! ব্যস তার পরেই গোলা ফাটল। ঠিক লাগল গিয়ে বেচারার গায়ে! একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।'

হো হো করে হেসে উঠল সে, সঙ্গে সঙ্গে হাসল ছেলের দল।

আনেৎ শুনল, স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই হাসির পিছনে কি আছে? কোনো ঠাট্টার স্মৃতি কি? না স্নায়বিক উত্তেজনা? না আর কিছু?

সে তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল: 'কিন্তু কর্ভো, এর ভেতরে হাসির কি পেলে?' সে তার দিকে তাকাল, ঠাট্টা করতেই চেষ্টা করল। কিন্তু আনেৎ হাসল না। কর্ভো বলল: 'সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা খুবই ভয়ানক!'

আরো কয়েক মুহূর্ত পরে তার তিক্ত অভিজ্ঞতার কাহিনী সে শোনালো।

'কিন্তু একথা ওদের বলছ না কেন?' আনেৎ জিজ্ঞেস করল।

সে হতাশার ভঙ্গী করে বলল:

'না, তা পারি না। ওরা বুঝবে না। আর ওদের ভালোও লাগবে না। তাছাড়া ওতে লাভই বা কি? এর তে কোনো উপায় নেই।'

'উপায় চাও না বলেই নেই।'

'আমরা কে যে উপায় চাইব?'

'তোমরা না চাইলে কে চাইবে?

সে হতবাক: 'কেন, যারা এই যুদ্ধ নিয়ে এসেছে, যুদ্ধ চালাচ্ছে?'

আর এগুনো চলে না, সে নিজেই যে তাদের যুদ্ধ চালাবার ভার দিয়েছে—একথা ওকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বৃথা। তারা তো তারই নির্বাচিত।

সেইদিন সন্ধ্যেয়ই সে শুনতে পেল কর্ভো আবার গর্ব করছে তার বীরত্বের। তার কাছে এর যেন প্রয়োজন আছে। সে তো অন্যকে ভুলাতে চাইছে না, নিজেকেই ভোলাচ্ছে সে।

এরাই যদি সত্যকে দেখতে না চায়, এড়িয়ে যেতে চায়, তাহলে যারা এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে রেহাই পেল—সেই ছোট ছেলেমেয়েরাই বা তাকে জানবে কি করে ?

তারা কিছুই বুঝল না। শব্দসমারোহে বিভ্রান্ত তারা। কথার মিষ্টি বোল যতক্ষণ শোনা যায়, মানে নিয়ে মাথা ঘামাবার তো প্রয়োজন নেই। আনেৎ তাদের আদর্শ সম্বন্ধে ক্লাসে লিখতে বলল। ব্রাঁ তার পূর্বপুরুষদের মতোই সামরিক কর্মচারী হতে চায়—সে গর্বভরেই লিখল : 'নদী কী তার উৎপত্তি স্থানেই আবার ফিরে যেতে চায় না ?'

যুদ্ধ নিয়ে গর্ব করল তারা। যুদ্ধ আরো এক কি দু'বছর চললে হয়তো যাদের যেতে হবে, তারা পুরনো যুদ্ধবিশারদদের মিথ্যা গর্বোক্তির প্রতিধ্বনি করল : 'গুলি গিয়ে তোমাদের বুকে ঢুকবে, কিন্তু আঘাত পাবে না। মৃত, জাগো, জাগো !' তাদের ভবিষ্যৎ বীরত্বের সম্ভাবনা বর্তমানকে দিল পঙ্গু করে। কিছুরই তোয়াক্কা তারা রাখল না। তারা বলল : 'যুদ্ধের পরে টাকার জন্যে আর ভাবতে হবে না। হুনরাই টাকা যোগাবে। আমরা ওদের ঠিক গেঁথে তুলব। আমার বাবা তো বলেছেন, ওদের জন বারোকে কিনে নিয়ে ওদের নোংরা পায়ে ঘোড়ার নাল পরিয়ে দেবেন। হা, হা !...'

ওদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট বা আইনজীবীদের শিক্ষিত ছেলেরা খবরের কাগজের মিথ্যা আড়ম্বরে ভুলে গেল। লাভঁ্যা তখন তাদের কর্নেলি আর কাপুস য়্যগো। অন্য সবাই সচিত্র মাসিক বা সাপ্তাহিকের মিথ্যে ছবি দেখেই সন্তুষ্ট।

আনেৎ একটা পরীক্ষা করল। সে তাদের পড়ে শোনাল 'সংগ্রাম ও শান্তি'র এক পরিচ্ছেদ। ছোট্ট পেতিয়ার মৃত্যুর দৃশ্য—সেই কয়েকখানা পাতা অক্টোবরের কুয়াশায় আর কিশোরের স্বপ্নে ভেজা। কিশোর আর জেগে উঠল না। 'শরতের এক বিষণ্ণ, বৃষ্টি-ঝরা দিন...আকাশ আর দিগন্ত যেন ধূসরতায় মিশে গেছে। ঝরছে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি...'

প্রথমে তারা বোধ হয় শুনলই না। রুশ নাম শুনে হাসল। এই তরুণ নায়ক যোগাল তাদের হাসির খোরাক। তারপর ধীরে ধীরে মাছির ঝাঁক পাত্রের কাণায় এসে বসল। সবাই চুপচাপ, কেউ কথা বলতে গেলে তাকে থামিয়ে দিল তারা। একজন ছেলে শুধু নাম শুনে বারে বারে হেসে উঠল। আর সবাই তখন মন্ত্রমুগ্ধ। যখন শেষ হয়ে গেল

পড়া, দু'একজন হাই তুলল। কেউ বা মুরুব্বীয়ানা করে বলল: 'রুশরা অমনি পাগল!' কেউ বা কথা খুঁজে না পেয়ে বলল: 'মাথা ঘুরিয়ে দেয়…' কেউ বা কিছুই বলল না। এদের মন স্পর্শ করেছে। কিন্তু কতটুকু স্পর্শ করেছে, কেন করেছে, একথা বলা শক্ত। মুখ থেকে একটা কথাও বেরুল না।

আনেৎ একজন শ্রোতার দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে ছিল। পাতলা, ফুটফুটে ছেলেটি, লম্বা নাক, চমৎকার চেহারা, শীর্ণ বুক। সে কেসে চোখ ফিরিয়ে নিল। বুদ্ধিমান ছেলে, সরলও খুব নয়। দুর্বল বলেই বুঝি কোনো কথা বলতে চায় না। আনেৎ-এর মনে হোলো, ওর আত্মায় জেগেছে সাড়া। পড়বার সময়, সে একবার বই থেকে চোখ তুলতেই ওর বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি তার চোখে পড়েছিল। লাজুক ছেলেটি, বই আর খাতার ভিতরেই মুখ লুকিয়ে ছিল। সে নিজে রুগ্ন আর দুর্বল বলেই বুঝি দুঃখ দুর্দশার কথা ভেবেছে। আত্মকেন্দ্রিকতাই তো করুণার চাবিকাঠি। যে নিজে ভুগেছে, সেই তো অন্যের দুঃখ বুঝতে পারে।

আনেৎ ক্লাসের পরে তাকে আটকে রাখল। জিজ্ঞেস করল, পেতিয়াকে কেন তার ভালো লেগেছে। ছেলেটি লজ্জা পেল, অপ্রতিভ হোলো। আনেৎ-এর মনে পড়ল সেই ভাবপ্রবণ কিশোরের শেষরাতের কথা। কি সুন্দর সেই জীবন! যে জীবন তার হতে পারত, কিন্তু হোলে না।… ও কি বুঝতে পেরেছে সে-কথা? ছেলেটি মাথা নাড়ল, চোখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু তার চোখে ঝলসে উঠল আলো—আনেৎ সে-আলো দেখতে পেল।

'আচ্ছা, তুমি যদি পেতিয়া হতে?'

'না, আমাকে তো যেতে হবে না। আমার শরীর ভালো নয়। ওরা বলেছে আমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

ছেলেটি তার রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য গর্বিত—এ যেন তার সান্ত্বনা।

'কিন্তু তোমার আর সব সঙ্গীদের কি হবে?'

তাদের সম্বন্ধে সে উদাসীন। সে তার স্মৃতি থেকে খুঁজে বার করল সেই গালভরা কথাটা: 'নিজের দেশের জন্য মরা—দেশের জন্য! সবাই চলে যাক, তারা মরুক!' সে যেন তার ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে। চোখের আলো তখন নিভে গেছে…

॥ চার ॥

আনেৎ অবিবেচনার কাজই করল। আশার কোনো কারণই সে খুঁজে পেল না। কিন্তু কারণ ছিল বই কি!

এই আত্মকেন্দ্রিক, অতীত রোমন্থণকারী জনগণের একটু-আধটু ঘুমোবার অধিকার আছে। বহুদিন তো তারা কুচকাওয়াজের উপরই ছিল। তারা ক্রুসেডে যুদ্ধ করেছে, শতবর্ষের যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। তারা অনেক কিছু দেখেছে, করেছে, আর সয়েছে। তাই তারা এখনো হাসতে পারে। চমৎকার! যারা হাসতে পারে তারাই তো বাঁচে, তারা তো জীবন বিসর্জন দিতে রাজি নয়।

পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তারই বিরুদ্ধে মানুষের অসন্তোষ, কিন্তু ওদের সে অসন্তোষ নেই। যা আছে তাই নিয়েই ওরা সন্তুষ্ট। প্রতিবেশীকে ঈর্ষা বা ঘৃণা ওরা করে না; আর জানে বাড়ির চাইতে সেরা কিছু নেই, তাই সেখানেই থাকতে চায়। যুদ্ধ ওরা পছন্দ করে না, পঁয়তাল্লিশ বছরের শান্তির পর ওদের জীবন এখন সহজ সরল হয়ে এসেছে। কিন্তু একদিনের নোটিশে সেই ওরাই কিনা গায়ে চাপাল সৈনিকের উর্দি, বিন্দুমাত্র বিদ্রোহ করল না! কেমন শান্ত! গোলমাল না করে সব কিছু উৎসর্গ করতে তারা এগিয়ে গেল। কারণ, পাশার দান তো পড়ে গেছে, উপায় নেই! এমনি দান চিরদিনই পড়ে এসেছে, উপায় মেলেনি। ওদের দেখে হাসি পায়, কখনো বা মনকে ওরা ছুঁয়ে যায়। এ শুধু দৃষ্টিকোণের তফাৎ। ওদের যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে, হয় হাস্যকর, নয়তো মর্মস্পর্শী বলেই মনে হবে। ওদের এই ভালোমানুষী, এই উদাসীন বশ্যতার মূলে আছে শূন্যতা। কিছুটা মহনীয়তাও বুঝি!

আর ছোট ছেলেমেয়েদের কথা—ওদের সম্বন্ধে কে জানে? উপরে যা দেখা যায় সে তো শুধু খেলা। নিচে চলে সত্যিকারের কাজ। বাপ মা আর শিক্ষকের চোখ নিচে গিয়ে পৌঁছয় না। যারা বলে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে জানে, তারা মিথ্যে কথাই বলে। সে তো জানা নয়, নিজেদের চিন্তারই আরোপ মাত্র। তারা সেই শাশ্বতকে দেখতে পায় না। তার তো কোনো বয়েস নেই, তার আগুন ধুঁইয়ে উঠেছে ছেলে আর বুড়ো সকলেরই ভিতরে। কেউ জানে না কখন সে-আগুন জ্বলে উঠবে। তার জন্য চাই বিশ্বাস, চাই ধৈর্য!

আনেৎ-এর এদুটোর একটাও ছিল না। সে যেন একজন জোয়ান সাঁতারু, নদী পার হতে গিয়ে স্রোতের বিরুদ্ধেই সাঁতরে চলেছে। সে যেন যাযাবর পাখী, হাওয়ার বিরুদ্ধে চলেছে উড়ে।

যখন পারীতে তার চারদিকে জ্বরের ঘোর সে অনুভব করত, সে চাইত এক ঝলক হাওয়া। শান্তির কামনায় সে তারই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত। এখানে এসে দেখল মন্থর উদাসীনতা, তার কানে বাজল দুঃখের আহ্বান।

অস্থির হয়ে উঠল সে। সবার উপরে সে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল, তার নিজেরই ভিতরে এল অসন্তোষ। অন্য সবাই তাদের স্বভাব অনুযায়ী চলেছে, বদলে গেছে। কিন্তু সেও কি চলেছে তার স্বভাবের অনুজ্ঞায়? একবছরের বেশি হোলো সে অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। অদৃষ্ট ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার প্রিয়জনদের, তার জাতিকে। প্রথমে সে ওরই ভিতরে এক উদ্দাম আনন্দ খুঁজে পেয়েছিল। তার পর সে-উদ্দামতা থিতিয়ে গিয়ে পরিণত হোলো অভ্যাসে। এখন—এখন তো ক্লান্তি। তার অন্তর্নিহিত এক গোপন শক্তি বুঝি প্রতিবাদও জানাল। খুব পরিষ্কার বুঝতে পারল না। সব যেন কেমন গোলমেলে মনে হলো, দুঃখ সে ভোগ করল, দোষী বলেই নিজেকে মনে করল। এই আবছা দুঃখের বোঝা যেন তারই দিকচক্রে সীমাবদ্ধ—এই পৃথিবীর উপর—এই খুদে মানব সমাজের উপর চেপে বসেছে। সে এদের মুখে খুঁজে পেল মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি। চোখের সামনে দেখতে পেল তাদের অদৃষ্ট, তাদের ভবিষ্যৎ, তাদের জীবনের অন্ধ অলি-গলি।

তার নিজের ছেলে হারিয়ে গেল সেই নামহীন ভীড়ে, মিশে গেল সেই ঝাঁকে। নদীর মতো ছুটে চলল সেই জনতার ধারা, কোথায় গিয়ে পৌঁছুবে সে নিজেই জানতে পারল না। নিজেকে তার মনে হোলো এক মজুর-পিঁপড়ে, নিঃসন্তান সে···আনন্দ নেই, যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছে···। এই ছেলে মেয়েরা, এমনকি তার নিজের ছেলেও—এক বুদ্ধিহীনা রাক্ষসী রাণীর গর্ভে জন্মেছে যেন। সে রাণী প্রকৃতি।

তিক্ততায় ভরে গেল মুখ, আত্মায় কটু গন্ধ। সবকিছুরই তার অভাব। সে তো শুধু তার সন্তানকেই হারায়নি, নিজেকেও সে হারিয়ে ফেলেছে।

তার ছেলেও তাকে হারাল, কিন্তু স্বীকার করল না।

সে তাকে ছেড়ে চলে গেছে, তাকে জেলখানায় শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে গেছে।

চার সপ্তাহ চলে গেল, ছেলে চিঠি লিখল না। আনেৎ তাকে একখানা, দু'খানা তিনখানা চিঠি লিখল। প্রথমে তাতে ফুটে ওঠল মাতৃত্ব আর কঠোরতা—তাকে বুঝিয়ে দিল, সে শোধরালে ক্ষমা করতে মা রাজি (তাকে ক্ষমা! তাকে! সেই তো ওকে ক্ষমা করবে না!)। উত্তর এল না, আনেৎ আবার উদ্বিগ্ন হয়ে চিঠি লিখল, খুবই অস্থির হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত ঘষলো মার্ক। সিলভী স্কুলে এসে তাকে না খোঁচালে সে উত্তর দিতে রাজি হোত না। তার কাছেই উৎকণ্ঠিত আনেৎ ছেলের খবর জানতে চেয়েছিল। এবার সে উত্তর দিল। শুষ্কতার এক চমৎকার উদাহরণ! অনুযোগ নেই, নেই ভৎর্সনা। এমন কি তিক্ততাও নেই (তিক্ততায় হয়তো তার হৃদয়ের জ্বালা কিছুটা প্রকাশ পেত!)। নিরুত্তাপ ভদ্রতা, এক বর্ণহীন চিঠি। এখন থেকে নিয়মিত এক পক্ষ পরে চিঠি লিখতে লাগল মার্ক। সেখানে রইল না তার জীবনের কথা—তার নিজের কথা। গন্ধ আর বর্ণহীন চিঠি। আনেৎ বিস্তারিত জানবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করল। বুঝতে পারল, মার্ক তার বিদ্বেষ দেখাতে চাইছে। এবার আনেৎ-এর চিঠিতেও ফুটে উঠল তেমনি বিদ্বেষের সুর, তেমনি অনমনীয় দৃঢ়তা। কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে তার অবদমিত ভালোবাসা চিঠির ছত্রে ছত্রে উৎসারিত হয়ে পড়ল। ছেলে এরই প্রতীক্ষায় ছিল, জয়লাভের আনন্দে সে তখন বিহ্বল। আনেৎ-এর এবার হোল অনুতাপ। উচ্ছ্বাসের প্রতিদানে এল ছোট, আরো ছোট চিঠি—উদাসীনতায় ভরা। চিঠি খোলবার আগেই বোঝা গেল কি আছে সে-চিঠিতে। কিন্তু তবু রইল আশা। হতাশই হতে হোলো তাকে। প্রতীক্ষায় তখন সে ক্লান্ত। এবার চিঠি লেখার এল তারিখ (মার্ক মার চিঠি পেলে উত্তর দিত বইকি)। সে এক দিন পিছিয়ে দিল, তারপর দুদিন, তিনদিন। আবার ভালোবাসা আর ভৎর্সনার বিস্ফোরণ! নিজেকে সংযত করতে পারল না আনেৎ।

তারপর চলল দীর্ঘ বিরতির পালা। একমাস সে রইল নীরব। ছেলের কাছে তো সবই সমান!

কিন্তু তার একমাসের নীরবতা ছেলেকে অস্থির করে তুলল। সে বুঝতে পারল এতদিন সে ভান করেই এসেছে যে, সে শক্তিমান, সে মার চিঠি পেতে চায় না। এবার সে রইল চিঠির প্রতীক্ষায়। কি উন্মুখ প্রতীক্ষা! শুধু গর্ব আর প্রতিশোধস্পৃহাই তাকে বলল: 'না, না, আমাকে ছাড়া মার চলবেঁ না!'

ভালোবাসার এই নিশ্বাসটুকু না পেয়ে ওরও টেকা দায় হয়ে উঠল।

সুদূর প্রান্তর থেকে হাওয়া ভেসে এল তার কাছে। যতদিন নিয়মিত চিঠি আসছিল, উদাসীনতার ভান করেই সে তা গ্রহণ করত। কিন্তু এবার খেয়ালী বিরতির পালায় সে বুঝতে পারল এ চিঠি হারালে তার চলবে না। সে অস্থির হয়ে উঠল, চিঠির কামনায় উদ্বেল হয়ে উঠল। যখন চিঠি এল, সে পাগলের মতো তাকে উপভোগ করল (কিন্তু সে স্বীকার করতে চাইল না। ভানই করল। মনকে বোঝাতে চাইল তার গর্বই তাকে এ আনন্দ দিচ্ছে: "হাঁ, আর একবার মাকে কাবু করেছি!')।

কিন্তু আনেৎ চিঠি লেখা ছেড়ে দিতে সে অপমানকর সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হোলো যে, সে মাকে চায়। ('স্বীকার? না, না!···আমি কিছু দেখিনি, কিছু জানি না, স্বীকার করবারও কিছু আমার নেই!')

রাতে মাকে স্বপ্ন দেখল সে। স্বপ্নে সে বার বার ঘুরে ঘুরে এল। স্নেহ নেই, নেই তার ভালোবাসা। উদ্ধত, কঠোর, বিদ্রূপময়ী আনেৎ, তাকে ব্যথা দিল, অপমান করল। সে জেগে উঠল ঘুম থেকে। মন তখন তিক্ততায় ভরে গেছে, জ্বলছে জ্বালায়, কিছু করতে চাইছে···কী? তাকে নিষ্ঠুর কথা ছুঁড়ে মারতে সে চাইল, চাইল তাকে নিজের মুঠোয় আনতে, তার উপর প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু কল্পনায় সে-স্পর্শের কথা ভেবে শিউরে উঠল—দূর করে দিল কল্পনাকে।

কল্পনা ফিরে ফিরে এল। সেই সুন্দর মুখ, ঘৃণার ব্যঞ্জনা···কল্পনায় সে-মুখকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে চাইল, পাশবিকতায় উদ্দাম হয়ে উঠল। স্বাধীন জীবন সে কাটিয়েছে, আর সে-জীবন থেকে বঞ্চিতও করেছে তার সন্তানকে। স্বপ্নে আরো মেয়ে এল তার কাছে, আনেৎ-এর সঙ্গে তাদের দেহের মিল নেই, মুখের মিল, বয়সের মিল, কিছুরই মিল নেই। তবু বিনা দ্বিধায় সে তাদের আনেৎ বলেই গ্রহণ করল। তারা তাকে বিলিয়ে দিল দেহ। যেন তারই বিরুদ্ধে তাদের প্রতিশোধ শুরু হোলো। অন্ধকূপে অবদমিত কামনা—শতশিরা হাইড্রা ফুলে ফুলে দুলে উঠল···

কটা মাস! এই পশুর খোঁয়াড়ে বন্ধ, অস্থির হয়ে কাটল কটা মাস! বন্দী, বন্দী!

॥ পাঁচ ॥

কামনা আর উষ্ণদেহের বন্দিত্ব! বোর্ডিং স্কুল তো নয়, জেলখানা। পথের থেকেও সাংঘাতিক। বিরক্তিতে মন তখন আচ্ছন্ন। উদ্বেগ, প্রতীক্ষা, কামনা, ভয় আর নিষ্ঠুরতা এই খুদে জন্তুদের উপর চেপে বসেছে। নগরীর দুঃখের মেঘে তাদের মগজ তখন নিস্ক্রিয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিষাক্ত। মেঘে ঢেকে গেল বোর্ডিং, সজাগ পাহারা সেখানে শিথিল হয়ে এল। বোর্ডিংএর সহকারী সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট দেখালো প্রথম উদাহরণ। প্রতি তৃতীয় রাত্রে পাহারাওলার সাহায্যে সে বাইরে যেতে শুরু করল। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট দিব্যি পাশের ঘরে নাক ডাকাতে লাগলেন। নিঃশব্দে সব কিছু ঘটে গেল, মার্ক সব দেখল। তার তখন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এসেছে, একদিন সেও রাতে স্কুলের বাগানে জানলা গলিয়ে লাফিয়ে পড়ল—জেলখানা থেকে পেল মুক্তি।

আঁধার রাত। চারদিকে দেয়াল, উপরে মেঘে ঢাকা আকাশ। সন্ধানী আলোর রেখা ছায়াঘন শহরের উপর দিয়ে বুলিয়ে বুলিয়ে যাচ্ছে। আর এক জেলখানায় এসে পড়ল মার্ক।

সে দেয়ালের উপর উঠে এল। জনহীন পথ। আঁধার বাড়ির সার। মধ্যবিত্তদের মহল্লা নিঝুম। বাসিন্দারা বেশির ভাগই পারী ছেড়ে চলে গেছে। মার্ক ঝুঁকে পড়ল। বড় বেশি উঁচু! পা ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু তবু ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তার পরে মুক্তি। দেয়ালের উপর সে পা ঝুলিয়ে দিল, হাত দিয়ে দেয়াল ধরে ঝুলে রইল, পা রাখবার জন্য খুঁজল দেয়ালে কোনো গর্ত। পথে কার একটা পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। উঠে পড়তে সে চেষ্টা করল। দেরি হয়ে গেছে। লোকটাকে দেখা যাচ্ছে। আঁধারের ভিতর থেকে একটি স্বর: 'লাফিয়ে পড়তে চাইছ?'

মার্ক জিজ্ঞেস করল: 'তুমি?'

এরই মধ্যে দুখানা হাত পা ধরে ফেলেছে। শোনা গেল তার স্বর: 'এ[illegible]! তোমাকে ধরে ফেলেছি।'

সে পথে পা দিল। চারদিকে বাড়িগুলির দেয়ালের সার। উপরে রাত। নিচে একজন অপরিচিত।

এ যেন এক দুঃস্বপ্ন। ছোট ছোট খুপরিওয়ালা বাক্স। তুমি বাইরে

গেলে, ফিরে এলে, একটা থেকে আর একটা খুপরিতে গিয়ে পড়লে; কিন্তু উপরের বড় ডালাটা বন্ধই আছে।

একজন অপরিচিত লোক তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ছুঁয়ে আছে। দু'জনেই প্রায় সমান লম্বা। অপরিচিত লোকটি একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালল, মুহূর্তের জন্য দুখানি মুখেই আলো এসে পড়ল। লোকটি অল্পবয়সী মজুর, মার্কের থেকে বড় হবে কিনা সন্দেহ। দাড়ি নেই। চামড়ার রং ধূসর, পাতলা চেহারা, বাঁকা ভ্রূর নিচে দুটি জীবন্ত চোখ, সে-চোখের দৃষ্টি ছুঁয়ে যায়, কিন্তু কোথাও নিবদ্ধ হতে জানে না, আর আছে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। আবার আঁধার ঘনিয়ে এল। কিন্তু এরই মধ্যে তারা পরস্পরকে দেখে নিয়েছে। মজুরটি মার্কের হাত ধরে বলল: 'কোথায় যাচ্ছ?'

'জনি না তো!'

'তাহলে আমার সঙ্গে এস।'

মার্ক ইতস্তত করল। তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে সাবধান করে দিল: অরণ্যের বিপদ সে জানে বই কি! ওই লোকটার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না, কিন্তু এটুকু তো জানে, ও অরণ্যেরই আমদানি। বুকে জাগল স্পন্দন। কিন্তু কৌতূহল ভয়কে দিল নিশ্চিহ্ন করে। তাছাড়া সাহসী না হোক, সে উচ্ছৃঙ্খল, (সাহস তো আসে পরে, যখন মানুষ নিজের শক্তি বা দুর্বলতার ওজন করতে শেখে। সে এখনো ওজন করে দেখেনি!) সে বিপদ বরণ করে নিতে চাইল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লোকটির হাত দু'হাতে ধরে চেপে বলল: 'চল আমরা যাই!' কোথায় যাবে জিজ্ঞেস করল না।

সারারাত ঘুরে বেড়াল তারা। হাতে হাত রেখে পরস্পরের ছোঁয়া তারা আগেই পেয়েছে, এবার অনুভব করল মন। দু'জনেই দু'জনকে ভয় পেল; কিন্তু কেউ বুঝল না যে অপর পক্ষ ভয় পেয়েছে। শারীরিক ভয় এ নয়। প্রথম স্পর্শেই মার্কের সে-ভয় প্রায় চলে গিয়েছিল। কিন্তু দু'জনে নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে তারই ঝাপ্টা যেন পেল। মার্ক পকেটে হাত দিয়ে ছুরিটা অনুভব করল। অস্ত্র হিসেবে একেবারে নিরীহ, আর তার ব্যবহারও সে জানে না। আবার তারা কথা বলতে শুরু করল। কথায় পেল তারা ভরসা, নিশ্চিন্ত হোলো।

দিনের আলোয় হলে আস্তে-আস্তেই এগুতে হোতো, কিন্তু রাতের এই পথে, এই শোকাচ্ছন্ন আবহাওয়ায়, যেখানে মঞ্চের উপর শবাধার দেখাবার

জন্যেই যেন আলোগুলোর উপর আবরণ টেনে দেওয়া হয়েছে, সেখানে তারতম্য তো মুছে যাবেই। তারা তো একই পালের জন্তু। একই কামনা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, একই বিপদ তাদের আশঙ্কিত করে তুলেছে। ক্লান্ত হয়ে, আরো এগোবার আগে দু'জনকে ভালো করে চেনবার জন্যেই ওরা ছায়াঘন পার্কের এক বেঞ্চে বসে পড়ল।

লোকটি নিজের নাম বলল কাজিমির। একটা সিগারেট পাকিয়ে মার্ককে দিল। ধূমপান করতে তার ভালো লাগে না, তা ছাড়া সে খুব খুঁতখুঁতেও। তবু মার্ক সিগারেট নিয়ে টানতে শুরু করল। কি লজ্জা! তার নিজের পকেটে টাকা নেই, তামাক নেই—কিচ্ছু নেই। তার পালা এলে সে কি করবে? এই কথা ভাবতে গিয়ে প্রথমে ওর কথা শোনাই হোলো না! কিন্তু সে আর কতক্ষণ। আবার মন দিয়ে সে শুনল, কৌতূহল ফিরে এল। বিশ্বাসের বিনিময়! তারা পরস্পরকে সব কিছু খুলে বলল।

কাজিমির ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, একটা যুদ্ধের কারখানায় কাজ করে। রোজ যে মজুরী সে পায় তার অঙ্কটা শুনে মার্ক অবাক হয়ে গেল। মার্কের তো সম্বলই নেই, রোজগারও সে কিছুই করে না, ব্যয় করা ছাড়া কিছু করবার যোগ্যতাও তার নেই। কাজিমির তার এই কর্তৃত্বের সুযোগ নিল না। এতে সে অভ্যস্ত; হয় তো মধ্যবিত্ত হীনতাকে এর বদলে বরণ করে নিতেই সে প্রস্তুত।

তার জন্ম থেকে এই হীনতাকে অবজ্ঞা আর হিংসা করে আসছে। কিন্তু আজকের রাতে সে তাকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করল না। আকর্ষণ তখন গভীর। এই মুখে সে পেল অজানা এক জগতের সন্ধান। মার্কের পক্ষেও তাই। তারা দু'জনে দু'জনকে আবিষ্কার করতে চাইল। বাধার প্রাচীর এল নেমে। মার্ক কি এই মাত্র তার শ্রেণী থেকে পালিয়ে আসেনি (যার বাপ নেই, এমন ছেলে কোন শ্রেণীতে পড়ে?)? তারা এখন সমান।

কাজিমিরই বড়। বয়সের প্রশ্ন এ নয়। দু'এক মাসের বেশি কম, ওতো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কাজিমিরের শ্রমিক জীবনের অভিজ্ঞতা আছে—সেই হিসেবেই সে বড়।

মার্ক চুপ করে রইল, উদগ্রীব হয়ে শুনল তার কথা। চুপ করে থাকাই তো ওর পক্ষে ভালো। কাজিমির যা জানে না, তা জানার ভানটুকুও তো তাকে করতে হবে। যখন সাহস করে কথা বলল, ভাঙা ভাঙা, ঠাট্টার আমেজ-মাখানো কথা বলেই সে তাকে ঠকাল।

কিন্তু এ প্রতারণা বেশিক্ষণ চলল না। কাজিমির তাকে একটা কাফেতে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে ধরা পড়ল তার প্রতারণা। বাতির আলোয় ওর মেয়েলি মুখখানা ওর নিজেরই সঙ্গে করল বিশ্বাসঘাতকতা। ওর অপ্রতিভতা, ওর সারল্য, কাজিমিরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সুমুখে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। সে-দৃষ্টি তাকে আঙুরের লতার মতোই আঁকড়ে ধরল, তাকে পাহারা দিল। অপ্রতিভ হোলো মার্ক, আকৃষ্ট হোলো কাজিমিরের দিকে। তার একবার মনে হোলো পালিয়ে যায়, আবার রুখে দাঁড়াবার চেষ্টাও সে করল! দোটানায় পড়ে গেল। কোনোটাই সে করল না, করতে পারল না। সে ধরা দিল, কাজিমিরের হাতে সঁপে দিল নিজেকে···

॥ ছয় ॥

কাজিমিরের সঙ্গে সে ঘুরে বেড়াল এই জনারণ্যে। আনেৎ যদি জানত তার সন্তানের চোখ, হাত, তার শরীর কি ছুঁয়ে এল! কিন্তু একটা দিকে ভালো এই যে, তাদের আত্মায় ধরল না কলঙ্ক-রেখা। তাদের কৌতূহল যে ধ্বংসকে টেনে নিয়ে এল, তার থেকে নিষ্কৃতি পেল তারা। তারা জানতে চাইল, দেখতে চাইল, চাইল স্পর্শ করতে···'হাঁ, কিন্তু ছুঁয়ো না, আমাকে ছুঁয়ো না!' তারা নিজেদের ছুঁতে দিল না।

···'আমি ছুঁয়েছি। আমি চলে যাচ্ছি। তোমার কাছে আমি তো অপরিচিত। তোমাকে জানার আগেও তো তাই ছিলাম। এখন তো আরো অপরিচিত হলাম। তোমার উপর ঘৃণা হচ্ছে, আমার নিজের উপর ঘৃণা হচ্ছে তার চাইতেও বেশি। আমার দেহ, আমার হাত, আমার চোখ আমি কলঙ্কিত করেছি। আমি ধুয়ে ফেলব, মুছে ফেলব কলঙ্কের দাগ। কিন্তু হৃদয় এখনো ঠিক আছে। কাদা সেখানে লাগেনি।'

···'আর পারীর এই কাদায় কি রত্নই না আমি খুঁজে পেয়েছি!'

এই পথ আর কারখানার ছেলেটি আর তার সঙ্গীদের ভিতরে, আমাদের বিরাট শহরগুলির চাপবাঁধা আত্মায়, ভালো আর মন্দ একই

সঙ্গে মিশে আছে। আছে নৈতিক চরিত্রের দুর্বলতা আর বিষাক্ত নোনা হাওয়া।

চার পাশের আবহাওয়ায় এদের যৌনবোধ প্রখর হয়ে ওঠে, এই মানুষের পাল জ্বরের ঘোরে যেন আচ্ছন্ন হয়ে যায়—জেগে ওঠে তাদের সুপ্ত ইন্দ্রিয়, কিন্তু পূর্ণতার আগেই শুকিয়ে যায়, ভোঁতা হয়ে যায়। এ এক বর্বর কৌতূহল, কামনাকে উলঙ্গ করে দেয়, খুঁচিয়ে জাগিয়ে দেয়, তারপর তাকে বিবশ করে ফেলে—উর্বর করবার আগেই উদ্দামতা শান্ত হয়ে যায়—সব চেষ্টা তখন শেষ, শক্তিও ফুরিয়ে গেছে। মাংসের ফুল কুঁড়িতেই শুকিয়ে যায়, আত্মার পালকের উপর চলে নির্দয় পীড়ন, পিষে যায় ঘাস, দেহে পড়ে উপভোগের কলঙ্ক। এইখানেই তার ভীষণতা। কামনার দানব জাতির স্তন এমনি করেই চুষে শুষে নেয়···তার উর্বরতা, তার কর্মপ্রেরণা নিঃশেষ করে দেখা দেয় দুষ্ট স্ফোটক। কিন্তু বিধ্বস্ত প্রান্তরের উপর দিয়েও বয়ে যায় হাওয়া। আবার নতুনের সমারোহের ইঙ্গিত। এক পশলা বৃষ্টি হলেই এখানে ওখানে ঘাস গজিয়ে ওঠে, আবার ঝলমলিয়ে ওঠে শ্যামল আভাস। স্বাধীনতা যেন একিল্লিসের বর্শা। সে হত্যা করে বটে, কিন্তু আবার জীইয়েও তোলে।

কাজিমিরের জন্ম তাকে এনে সমাজের যে হাপরে ফেলেছিল, সেখানকার জলন্ত নিশ্বাসে সে অকালেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল—দুঃখ আর আনন্দের অনুভূতি তার প্রখর হোলো। এই পরিবেশে, এই জীবাণুভরা আস্তানায়, দৈহিক আর নৈতিক আবর্জনার মাঝে সে হুটোপাটি খেল; তার ভাগ্যে জুটল কঠোর পরিশ্রম আর অস্বাস্থ্যকর খাদ্য আর পানীয়;—কাজিমির এমনি করেই নিজেকে ফুরিয়ে ফেলেছিল।

দেহের চাইতে মনের বিপদই তখন বেশি ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু মন অনেক উর্বর তাই সে দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গড়ে তুলল এক অদ্ভুত সাম্য—অপূর্ণ সত্তাকে সে গ্রাস করল, তার কর্মশক্তি দিল নিঃশেষ করে। তবে লালসার গহ্বরে সে তাকে তলিয়ে যেতে দিল না। হাঁ, কামনার এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ, অপস্মারগ্রস্ত নীতি আর সংস্কার-বিবর্জিত স্বাধীনতা তার এই চঞ্চল আত্মাকে সূর্যের আলোয় পৌঁছে দিল। সেখানে ঝোপে ঝোপে দুলছে ভাবধারার কুঁড়িগুলি। খুদে ছাগলছানা সেখানে পড়ে রইল না, এক লাফে সে নেমে এল নিচে, কিন্তু মুখ ভর্তি রইল তার তিক্ত তেজস্কর ঔষধি।

কাজিমির বিদ্রোহী। সে সেই দলের লোক, যাদের গর্ব তাদের বদহজমী

জ্ঞান, আত্মকেন্দ্রিকতা আর নাটুকেপনায়; যাদের ঝোঁক ফাঁকা তর্ক আর যৌন-বিচ্যুতির দিকে। তারা চায় প্রচলিত মূল্যমানের ধ্বংস। দুর্নীতি নিয়ে তারা গর্ব করে, ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে, প্রতি দলের প্রতি, প্রতি ব্যক্তির প্রতি থাকে পরস্পরের হিংসা। যে উচ্চ বেদী রেক্লুস বা ক্রপটকিনের পবিত্র হৃদয় ছাড়া গড়ে তুলতে পারেনা, সেই বেদীকে তারা ধ্বংস করে ভেঙে চুরমার করে দেয়। সেখানে শুধু আত্মস্থ সম্ভ্রান্তের দলই বুঝি বাস করতে পারে। জনতা তো তাকে দলে-পিষে দিয়ে চলে যায়, তাকে অপমানই করে। এমনি করে ওরা যীশুকেও অপমান করেছে। তার বেদীতে এনে কতগুলি ছোটখাট দেবতাকে বসিয়েছে, বসিয়েছে ভগবানের দালালদের।

'স্বাধীনতা' এ কথাটার একটা যাদু আছে। এমন কি যারা নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার পাঁকে তলিয়ে গেছে তাদের কাছেও এর আবেদন আছে বৈ কি। এ যেন বীরত্বের একটু নিশ্বাস, (মোহ নাকি? তাতেই বা ক্ষতি কি!) দাসত্বকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই দাসত্বই তো এতদিন তাদের বেঁধে রেখেছিল…অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়ায়। আবর্জনার স্তূপে প্রমিথিউসের পূত পাবক জ্বলে ওঠে।

মার্ক সেই পবিত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পেল।

এ এক অদ্ভুত সময় বটে! যারা এতদিন যুদ্ধের বিরুদ্ধতাই করে এসেছে, সেই এনার্কিস্ট, সোশালিস্ট, সিণ্ডিকালিস্টরা আত্মকলহ ভুলে গিয়ে একই মঞ্চে এসে জমায়েৎ হয়েছে

সংখ্যায় তারা কত কম! সামান্য কয়েকজন মাত্র। অন্য সবাই তখন দল ছেড়ে দিয়েছে। কেউ বা ছেড়েছে জনমতের প্রতি দুর্বলতায়, কেউ বা ধরা পড়বার ভয়ে, কেউবা ছেড়েছে দেশাত্মবোধের গর্বে। কারো বা রক্তের স্বাদ নেওয়ার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছে। সবার উপরে আছে গণতন্ত্রের ভাব-ধারার জট-পাকানো বাগ্মিতা। এমনকি জেসুটরাও বুঝি তাদের যখন সুদিন ছিল, ন্যায়শাস্ত্রের ফাঁকির এমন সুষ্ঠু ব্যবহার দেখিয়ে হতভম্ব করে দিতে পারেনি। হাঁ, হতভম্ব করা বৈ কি! যার উপরই তুমি এ ফাঁকি প্রয়োগ কর না, তা-ই মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়ে যাবে, সব কিছু গোলমাল হয়ে যাবে। সংগ্রাম ও শান্তি, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-বিসর্জন—সব একাকার হয়ে যাবে। আর গেলও তাই। ফলে এই হোলো যে, যে ক'জন স্বাধীন হবার চেষ্টা করছিল তারা আবার ফিরে এল কয়েদীদের জায়গায়। উদ্যত খাঁড়ার নিচে নুয়ে পড়ে দাঁড়

আবার বাইতে হোলো। ১৯১৪ সালের শেষ দিকে এমনি স্বাধীনতাকামী পারীতে খুব কমই ছিল, তাদের সংখ্যা বোধহয় বারোজনও হবে না। ক্রমে তাদের সংখ্যা বেড়ে গেল, নিজেদের তারা ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিল। এদের মধ্যে লা ভী উভ্রিয়েঁরই সবচেয়ে সেরা দল।

মার্ক কয়েক রবিবারে তাদের অধিবেশনে যোগ দিল। তাদের আলোচনা শুনে সে উঠল জেগে।

এতদিন যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই তার মনে জাগেনি। তার নিষ্ঠুরতা, অন্যায়, এমনকি তার হাস্যকর দিকটা সম্বন্ধেও সে সচেতন ছিল না। তার মনে হোতো যুদ্ধকে বরণ করে নেওয়াই পুরুষত্ব। তার বয়সে পুরুষত্বই সব চাইতে বড় গুণ। আর তার আবেদনও তার কাছে সব চাইতে বেশি—হাঁ, পশুশক্তির এই ভয়ংকর আবেদন! সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার যে নিষ্ঠুর আইন মানুষকে চিরন্তন-সংঘাতের খোলার ভিতরে পুরে রেখেছে তারই গর্ব সে করে বেড়াতো। কোমল হলে চলবে না। শক্তিমান হও! সে নিজে দুর্বল, তাই সে বিদ্রূপের খোলস পরে নেমেছিল আসরে। আনেৎ-এর প্রতিও সে হোলো বিরূপ।

'আমার পক্ষেও ব্যাপারটা সমান খারাপ। যারা যুদ্ধে মরল তাদের পক্ষে তো বটেই! আমাকে উপরে উঠতেই হবে, ছলে বলে কৌশলে যে করেই হোক, উঠতে হবে!'

এই অমানুষিক বর্বরতার বিরুদ্ধে মার ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ শুনে সে হাসল, ঘৃণা হোলো।

'এ তো ভাবপ্রবণতা! প্রাণহীণ প্রতিবাদ! মেয়েলী ব্যাপার! ওসব মুখে আনছ! শুনলেও রাগ হয়!'

আনেৎ তখন একেবারে তলিয়ে গেছে গোলমালে। সে তখনও যুদ্ধকে বিশ্বাস করছে, কিন্তু হত্যাকারীর দুর্গন্ধ নিশ্বাস সইতে রাজি নয়। চিন্তার মাঝ পথে থেমে গেছে, শেষ দেখবার সাহস নেই। কিন্তু তার এই বিদ্রোহের কারণ সে খুঁজে বার করতে পারল না। সেখানে প্রয়োজন ছিল তার বিবেকের, সে তাকে চালিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু মার্কের পক্ষে তার দরকার হোলো না। সত্যি আর মিথ্যে হোক, মানুষ চায় তার উদ্দাম ভাবাবেগের উপর সুষ্ঠু ভাবধারার সাহায্যে লেবেল এঁটে দিতে।

মার্ক এই শ্রমিক ভাবধারার নৈয়ায়িকদের মধ্যে সেই চিন্তাধারার কিছুটা

খুঁজে পেল। তাদের বিদ্রোহগুলি কঠোরভাবে বিশ্লেষিত, তত্ত্বের উপরই গড়ে উঠেছে তাদের প্রাকার। মরিসের বক্তৃতা সে শুনল। আস্তে আস্তে হাতড়ে বেড়াচ্ছে ঠিক শব্দ। চিন্তাধারা শব্দসমারোহে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে না, কেমন যেন একঘেয়ে, তবু সাধুতায় মহান—এ যেন বাগ্মিতার কুঠার। তা ছাড়া আছে শান্ত মনাৎ, ইস্পাতের মতো সে সুনিশ্চিত, আর আছে রোজমারের দৃঢ়ীভূত ভাবাবেগ; তার ভয় সে যদি ভাবাবেগের রাশ না টেনে ধরে তাহলে তার ভাবধারার প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতাই করবে। তার জমাট বাঁধা উত্তেজনা এই সন্দিগ্ধ, ক্ষুধার্ত, উদ্দাম কিশোরকে অভিভূত করে দিল। গুপ্তসভা, প্রতিনিয়ত বিপদের আশঙ্কা, সত্য আর ন্যায়ের অনুসন্ধিৎসুদের উপর বিরাট জাতিগুলির দাবি এই বিদ্রোহের ভিতরে তুলল ধর্মের উন্মাদনা জাগিয়ে। যদিও নেতারা তখনো উত্তেজনাহীন। বাতিঘরের ঘূর্ণায়মান আলোর মতোই তাদের নির্জীব মুখে আর ক্লান্ত চোখে অপূর্ব জ্যোতি ঠিকরে পড়ল।

এরা মজুর হলেও হৃদয়ের মহত্বে তাকে ছাড়িয়ে গেছে দেখে এই খুদে, গর্বীত বুর্জোয়া লজ্জিত হোলো—।

॥ সাত ॥

পিতাঁ, বুড়ো পিতাঁ বলেই সবাই তাকে ডাকে। বয়স এখনো চল্লিশ পেরোয়নি, মাথাটা শরীরের চাইতে মস্ত বড়, উপস্থিত বুদ্ধিও তার প্রখর। প্রথমেই নজরে পড়ে তার দাড়ি, সারা মুখখানা ছেয়ে আছে, পুরু ঠোঁটদু'খানা ঢাকা পড়েছে চুলে। রংটা তার হলদে, নাকটি বোঁচা, চোখ দুটো মখমল-ধূসর। ঠিক স্পানিয়েলের মতো।

সভায় গিয়ে মার্ক-এর প্রথমে এই চোখদু'টিই নজরে পড়ল। কমরেডদের মধ্যে পিতাঁই বোধ হয় একমাত্র লোক যে মানুষের ভাবধারা দেখেই (অথবা তার নিজের স্বার্থে) তার প্রতি আকৃষ্ট হোতো না। সে আকৃষ্ট হোতো মানুষের প্রতি ভালোবাসায়—ঠিক কুকুরের মতোই। এই খুদে বুর্জোয়া তাকে আকর্ষণ করল। মার্কের মনে হোলো, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের

কুকুরটি স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতরে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। তাদের বন্ধুত্ব হতে দেরি হোলো না।

পিতাঁ চিনেমাটির বাসন মেরামত করে। পারীর উপকণ্ঠে তার দোকান। সে পাকা কারিগর। পাথর আর কাঠের জিনিসও মেরামত করে। স্বাধীন শ্রমিক হিসেবে তার কারখানার শাঙাৎদের চাইতে একটু বেশি সময়ই সে হাতে পায়, সেই সময়টুকু লাগায় পার্টির কাজে। সভার বিজ্ঞাপন, ইস্তাহার নিয়ে পারীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়ায় সে। বিস্মৃতকে সে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চায়, ঘুমন্তকে চায় জাগিয়ে তুলতে, অস্ত্রের আহ্বান জানাতে। মার্ক স্কুলের ছুটির পরে কয়েকদিন বিকালে পিতাঁর সঙ্গ নিল। শীগগিরই ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। কিন্তু পিতাঁর ক্লান্তি নেই। বিশ্রী আবহাওয়া আর দূরত্ব তার কাছে কিছুই নয়। কাজ শেষ হবার আগে সে এক মুহূর্ত বিশ্রাম করে না, কখনো মদ খায় না। তার এই মিতাচার আর চরিত্রের পবিত্রতা নিয়ে সবাই ঠাট্টা করে। কোনো প্রেমঘটিত ব্যাপারে সে জড়িয়ে পড়েনি, বিয়েও তার হয়নি। সে থাকে তার বুড়ি মার সঙ্গে, তাকে সে যেন সকলের কাছ থেকে লুকিয়েই রাখে, আর মা তারই সুযোগ নিয়ে তার উপর হুকুম চালান। তার বাবা ছিল মাতাল, ছেলেবেলা থেকেই ঐ সর্বনাশা নেশার সঙ্গে তার পরিচয়। তার রুগ্ন শরীরে তারই অদৃশ্য সে জীবাণু বহন করছে। এরই জন্য সামরিক চাকরি থেকে পেয়েছে সে অব্যাহতি। এরই জন্য বিয়েও সে করেনি। জীবনে যদিও ফূর্তি তার নেই, কিন্তু সে নিজেকে সুখী বলেই মনে করে। কিন্তু স্পানিয়েলের মতো চোখের কোণে বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছে। এক এক সময়ে ভীষণ ক্লান্তি আসে, সে তখন ছুটে গিয়ে ঘরে লুকিয়ে থাকে। কথা বলতে পারে না, মগজ তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। আবার কয়েক সপ্তাহ পরে তাকে দেখা যায়। তেমনি কর্মব্যস্ততা, তেমনি হাসি। তার শাঙাৎরা এতদিন তার খোঁজ-খবরও নেয়নি, এবার তারা পার্টির কাজ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। পিতাঁ আবার ছুটে বেড়ায়, রাতে ফেরে, কখনো বা মাঝরাতে, তখন শেষ ইস্তাহারখানাও বিলি হয়ে গেছে, আর সে গেছে ভিজে চুপচুপে হয়ে। কিন্তু তাতেই তার সন্তোষ।

মার্কের ধাতে এতটা সহ্য হোলো না। পিতাঁ তার জন্য দুঃখিত, কিন্তু সে-ভাব দেখাল না। সে থেমে পড়ল।

পিতাঁর শান্ত, ধীর স্বর ঝরে পড়ল—দুই দীর্ঘ বিরতির মাঝখানে যেন তারা

বন্দী ছিল, এবার বেরিয়ে এল খালের নিস্তরঙ্গ স্রোতের মতো। মার্ক তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করল। পিতাঁ হেসে তাকে বলতে দিল তার কথা, এক সময়ে সে নিজের চিন্তাধারারই ব্যাখ্যা করল। বিদ্রূপের হুল লাগল না তার গায়ে। নিজের কথাগুলোর মূল্য সে খুব দেয় না। তার কাছে ভাবনা প্রকাশ করার জন্যই কথার প্রয়োজন। নীরবতার কাদায় তার মন বসে গেছে, তাকে তুলে এনে কথা দিয়ে সাফ করে নিতে হবে। এই অন্তর্নিহিত জীবন তো কাদায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে গেছে, তাকে হাওয়া দিয়ে তুলতে হবে ফুলিয়ে। ভাবনা তার কাছে কথা, শুধু কথা। তাই তার চিন্তার চাই সঙ্গী। এই নিঃসঙ্গ মানুষটি ভ্রাতৃত্বের এই সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মেছে।

কিন্তু কথা বলতে গিয়ে কোনো কিছু দেখতে বা শুনতে সে ভুল করে না। মার্ক বহুদিন পরে বুঝতে পারলে, সে যা কিছু বলেছে পিতাঁর মনে আছে। সে তাই নিয়ে ভেবেছে, যেন শাবল দিয়ে বারে বারে উলটে-পালটে দিয়েছে।

মার্ক পিতাঁ ও আর সকলের কাছে নিজেকে খুদে বুর্জোয়া হিসেবেই জাহির করল। সে জাঁক করে বেড়াল তার দুঃখ-দুর্দশার। স্কুলের ছেলে সে, তার শ্রেণীর কুসংস্কার, বাধা আর শাসনের থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে এনেছে। কাজিমির আর তার সঙ্গীরা এ কৃতিত্বটুকু স্বীকার করে নিল বটে কিন্তু কর্তৃত্বের ভাবটুকু তাদের বজায়ই রইল। ভাবখানা যেন মার্ককে ভালো নম্বরই তারা দিয়েছে। মার্কের একটু গর্ব হোলো, কিন্তু আবার দমেও গেল। পিতাঁ প্রশংসা বা ঘৃণা কিছুই করল না। মার্ক যখন তার কথা বলল, সে মাথা নাড়ল, তখন তার স্বগতোক্তি চলেছে। কয়েকদিন পরের কথা। কারখানা থেকে কিছু দূরে পিতাঁ দাঁড়িয়ে ছিল। দু'ধারে উঁচু দেয়াল, তারই উপরে বিরাট চিমনিগুলো লাল গলা বাড়িয়ে আছে, ধোঁয়া উড়ছে। পিতাঁ কোনো ভূমিকা না করেই বলল :

'মঁসিয়ে রিভিয়ের, আমার মনে হয়, বাড়িতে ফিরে যাওয়াই আপনার উচিত ছিল।' (সে-ই একমাত্র লোক যে তাকে নাম ধরে ডাকে না)।

মার্ক অবাক : 'বাড়ি? কোথায়?'

'আপনার স্কুলে।'

সে প্রতিবাদ জানাল : 'পিতাঁ, তুমি কি মনে কর, তোমার সঙ্গে এসে আমি ভুল করেছি? আমি জানতে চাই তোমরা কি ভাব, কেমন ভাবে তোমরা থাক।'

'না, ভুল করেননি। আমরা কি, সে-কথা জানতে চাওয়া তো অন্যায় নয়। কিন্তু মঁসিয়ে রিভিয়ের, আপনি তো আমাদের কখনও জানতে পারবেন না, চিনতে পারবেন না!'

'কেন?'

'কারণ আপনি তো আমাদের কেউ নন।'

'পিতাঁ, তুমি একথা বলছ? আমি তোমার কাছে এলাম, আর তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ!'

'ভুল, মঁসিয়ে রিভিয়ের, ভুল! আপনি এসেছেন, এতে আমি খুশিই হয়েছি। আপনার এই সহানুভূতির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু তাতে তো এ সত্য পাল্টে যাবে না যে, আপনি আমাদের অচেনাই আছেন, আর চিরদিন অচেনা হয়েই থাকবেন।'

'কিন্তু তুমি তো আমার কাছে অচেনা নও!'

'এই দেখুন না। এই কারখানায় বহু মজুর আছে। এদের সম্বন্ধে আপনি কতটুকু জানেন? অথচ আমরা আপনাকে বলে দিতে পারি, এরা কি করে, কি চায়, কি ভাবে—এমন কি এদের দুঃখের কথাও বলতে পারি। কিন্তু আপনি পারবেন কি? আমার দাঁতে ব্যথা হলে আপনি আমার কষ্ট দেখে দুঃখ পাবেন, কিন্তু আপনি যে-দুঃখ ভোগ করেননি, সে-দুঃখ কি করে অনুভব করবেন, বলুন তো?'

'আমার নিজেরও তো দুঃখ আছে, পিতাঁ?'

'হাঁ, আছে বই কি! যারা বলে, দরিদ্রের অভিশপ্ত জীবনের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে তুলনা করলে ধনীর দুঃখ তো অলস বিলাস বলেই মনে হবে—আমি তাদের দলে নই। হয়তো এ এক বিলাস—অবশ্য মৃত্যু আর রোগ বাদ দিয়ে—কিন্তু তাও তো সকলের জন্য সমান নয়।'

'সমান নয়?'

'না। অসুখে পড়ে নিজের বিছানায় শুয়ে শান্তিতে মরছেন, নিজের পরিবারের কি হবে সে-সম্বন্ধে একবারো ভাবতে হচ্ছে না—তেমন মৃত্যু তো বিলাস। যারা বিলাসের ভিতরে বেড়ে ওঠে, তারা কখনো একথা ভেবে দেখে না। কিন্তু দুঃখ সত্যিই হোক, তৈরিই হোক—সে দুঃখই! তাই আমি আপনাদের আমাদের, সকলের দুঃখেই ব্যথা পাই। সকলেরই নিজের মাপসই দুঃখ আছে। কিন্তু সে-দুঃখ এক নয়।'

'আমরা তো সবাই এক, পিতাঁ।'

'জীবন কিন্তু তা নয়। দেখুন না, আপনাদের কাছে পরিশ্রমের মূল্য কি? আপনি বলবেন, আমরাও তো কাজ করি—হাঁ, যে শোষক অন্যের পরিশ্রমের উপর বেঁচে থাকে, সেও কাজ করে বই কি! বলবেন: কাজ সুন্দর, কাজ পবিত্র; যে কাজ করে না, তার বাঁচবার অধিকার নেই। ঠিক কথা। কিন্তু কখনো বাধ্য করে কাজ করাবার কথা ভেবে দেখেছেন কি? সেখানে এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই, নেই মুক্তির আশা—এক অন্ধ, বিষাক্ত কাজ—ঘানিতে যেমন করে জানোয়ারকে জুড়ে দেওয়া হয়, তেমনি করে ব্যবসার ঘানিতে জুড়ে দিয়েছে মানুষকে—অবশেষে একদিন আসবে তার মুক্তি, সে-মুক্তি মৃত্যু। সে-কাজকে কি ভালো বলবেন? পবিত্র বলবেন? এই জন্যেই, যারা কাজকে ঘৃণা করে, অথচ তারই উপস্বত্বে বেঁচে থাকে—তারা আমাদের চিরদিনের অচেনা, অজানা—এ কথা কি আপনারা বুঝতে পারেন না?'

'কিন্তু আমি তো ওদের মতো নই!'

'হাঁ, আপনিও ওদেরই মতো। এই যৌবনে খিদের ভয় কখনো পাননি। আপনার আছে স্কুল আর বিশ্রাম, শান্তিতে বছরের পর বছর ধরে পড়াশুনো আপনি করবেন। দিনের রুজি-রোজগারের কথা আপনাকে ভাবতে হবে না।'

নিজেকে সমর্থন করবার জন্যই হঠাৎ মার্কের মনে পড়ল—এ কথা সে আগে কখনো ভাবেনি—

'আমি তোমাদের শ্রমের উপর নির্ভর করে বেঁচে নেই, আমি বেঁচে আছি আমার মার কাজের উপর নির্ভর করে।'

পিতাঁর কৌতূহল হোলো। সে তার কাছ থেকে শুনল তার মার জীবনের কথা। দুঃসাহসিক তার জীবন। বলতে বলতে মার্ক যেন মাকে আবিষ্কার করল। কিন্তু তার গর্ব এসে মাঝে মাঝে বাধা দিল। পিতাঁর কথায় সে-বাধা দূর হোলো। তার বলা শেষ হলে শান্ত স্বরেই পিতাঁ বলল:

'বন্ধু, হাঁ, আপনার মা আমাদের মতোই জীবনে ঠকেছেন, তাকে ওরা শুষে নিয়েছে।'

মার্কের কথাটা ভালো লাগল না। বললে:

'সে আমার ব্যাপার, পিতাঁ। তোমার নয়!'

পিতাঁ হাসল।

মজুররা এবার কারখানা থেকে বেরিয়ে এল। সে তাদের কাছে গেল।

কুঁচকে যাচ্ছে—মনে হয়, কে যেন আকাশের ঘোলাটে টবটায় কাপড় নিঙড়ে নিচ্ছে ; পিছনে ঝাঁকে ঝাঁকে বাড়ির সার, হাজার হাজার জীবনের স্পন্দন। মহানগরী—এ-যেন এক কঠোর বিয়োগান্ত নাটক। পিতাঁ, সুখী পিতাঁ, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল : 'নীরবতা মানুষকে জানিয়ে দেয় যে, সবাই সবায়ের ভাই।'

'আর মানুষ একজন আর একজনকে গ্রাস করে।' মার্কের স্বরে ফুটে উঠল তিক্ততা।

'তাদের খেতে হবে তো!' পিতাঁ উত্তর দিল : 'এই তো নিয়ম। এস, আমরা আমাদের নিজেদের খাদ্য হিসেবে এগিয়ে দিই। এরই জন্য তো আমরা জন্মেছি। আমার তো মনে হয়, সেই সব চাইতে ভালো!'

মার্ক এই চীনেমাটির বাসন মেরামত করিয়ে লোকটার শুকনো মুখের দিকে তাকাল। আত্মার আগুনে ঝলমল করছে সে-মুখ। নিজেকে খাদ্য হিসেবে আহুতি দেওয়ার স্বপ্নে যে এক অপূর্ব সুখ আছে, একথা ভেবে সে অবাক হয়ে গেল। তার মনে হোলো, ঈশ্বর নিজেকে আহুতি দিতেই আজ বুঝি নেমে এসেছেন। হায় কি বর্বর এই মানুষ! এর মহনীয়তাও যে সে দেখতে পেলনা তা নয়, কিন্তু সে এত ছোট যে সেখানে পৌঁছবার আশা করা বৃথা।

না! খাদ্য সে হতে চায় না। সে খেতে চায়, গ্রাস করতে চায়!

আট

ওপারের মানুষদের দেখে সে হতাশ হোলো, কিন্তু নাড়া লাগল তার মনে। ওপারে দাঁড়াবার ঠাঁই পেল না। সে যেন একটা পাখী, আকাশ আর পৃথিবীর মাঝখানে উড়ছে, কোথায় যে নামবে জানে না। নিজের আশ্রয় থেকে পালিয়ে এসেছে, সেখানে আর ফিরে যেতে সে চায় না। নিজে যে একটা আশ্রয় তৈরি করে নেবে, সে-সামর্থ্যও তার নেই। আর কোথায়ই বা গড়বে তার বাসা? নিজের বাসা গড়বার সময় আসার আগে তো একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই খুঁজে নিতে হবে। কোন ডালে সে নেমে পড়বে? সন্দেহ এসে তার

আগেকার কুসংস্কারগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, এখনও সে সেগুলিকে আঁকড়ে ধরে আছে, তাদের জায়গায় আর কিছুকে এনে বসাতে পারছে না বলেই বুঝি আঁকড়ে ধরে আছে। কিন্তু সে তো নিজেই জানে, তারা আজ ভাঙনের মুখে। তাই ভাবধারার জগতে এই পনেরো বছরের কিশোর একা পড়ে রইল, হারিয়ে গেল। অথচ তার উত্তপ্ত মগজের কারখানায় তখন ভারধারারই দাম বেশি। সে এমন কিছু খুঁজে পেল না, যাকে সে আঁকড়ে ধরতে পারে।

আবার পেরের মেয়ের সঙ্গে তার দেখা। তারই মতো সেও বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।

মার্সলিন—ঝুলে-পড়া ঠোঁট সেই মার্সলিন। এবার সে ঠোঁট দু'টির নিল আস্বাদ। আবার তারা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল—সিঁড়ির নিচের পুরনো দেখাশুনো নিল ঝালিয়ে। মার্ক তাকে খুঁজে পেল আশ্রয় হিসেবে। বাড়ি-থেকে-বিচ্ছিন্ন মার্সলিনও তাকে পেল বাড়ি আর তার মধ্যে দূত হিসেবে। একই বাড়ি থেকে তারা এসেছে, একই নর্দমার ধারে বসে তারা দুজনে তুলেছে কুজন-গুঞ্জন। নগরীর এই বিরাট বিস্তারের ভিতরে দুই পলাতক পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল, তাদের পালক নিল গরম করে। তার এই কিশোর প্রেমিকের কম্পিত ঠোঁটদুটিতে মার্সলিন খেল চুমু। কিশোরও তখন উদ্দাম। সে আগুনের শিখায় নিজেকে পোড়ালো, তার নতুন আবিষ্কার-করা এই ভোগ আর বেদনার জগতে সে ডুবে গেল, গেল তলিয়ে। মার্সলিনও পেল চপল আনন্দ। কিন্তু নীতিবোধহীন এই লজ্জারুণ সুন্দর কিশোরের জন্য তবু তার মায়া। কেমন যেন বাৎসল্য জাগল। নিজের পরিবারের মায়া যে কাটিয়ে এসেছে, সে অনুভব করল এই কিশোরের প্রতি তার দায়িত্ব। সে তাকে চেপে ধরল তার বুকে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তার বিবর্ণ গাল আর জ্বরার্ত চোখদুটির দিকে। তার এই নৈশবিহার নিয়ে প্রথম সে ঠাট্টা করল। কিন্তু তারপর এল আশঙ্কা। ভোরে তাকে ঠাণ্ডার ভিতরে ছেড়ে দিতে ভয় হোলো তার। গরম কাপড় সে পরেনি, কাণ্ডজ্ঞানও কম, একটা শুকনো কাসি তার আছে। তাছাড়া আছে উদ্দামতা। হাওয়ার ঝাপ্টায়ই হয়তো সে এলিয়ে পড়বে। মার্সলিন ভয় পেল, তবু আলোর শিখাটা দিল উস্কে, তাকে নিয়ে খেলা চলল তার। তখন সে ঈর্ষান্ধ, আর তারই সুযোগ নিয়ে সে তাকে দিল ব্যথা। অবশ্য তাকে বিরক্ত করার ইচ্ছে তার ছিল না। নীতিবোধের

খোঁচা লাগছিল তার মনে, কিন্তু একরকম নিজের মৃত্যুই সে ডেকে নিয়ে এল।

ঠিক এই সময়ে বাধা দিল পিতাঁ। সবাইকে সে চেনে, তারা তার ভালোমানুষি আর নিরীহভাব দেখে ঠাট্টা করে বটে, কিন্তু একটা সুবিধেও তার আছে। অপ্রিয় সত্য শুনিয়ে দিতে সে ছাড়ে না। তারাও কান পেতে শোনে, মানুক আর নাই মানুক, রাগ করে না। পিতাঁ মেয়েটিকে ডেকে বলল: 'মম্‌জেল মার্সলিন, বেশি দিন তো ওকে ধরে রাখতে পারবে না। ও যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে, দেখছ না!'

মার্সলিন উত্তর দিল: 'সে জানি গো বুড়ো কর্তা, জানি! আর তাইতো হয়েছে আমার মুস্কিল। আমি তো চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি ও নিজেকে নষ্ট করে ফেলছে। কিন্তু কি করব বল তো? আমার কথা তো শুনবে না। ওর তো এখন আর চোখ আর কানের বালাই নেই। আছে শুধু মস্ত বড় এক হাঁ—একেবারে খিদেয় ভর্তি। মার দুধ যখন ছোটছোট ছেলেমেয়েরা খায়, তখন কি আর একটুতেই তেষ্টা মেটে! ও ঠিক তেমনি। ওর মনের অসুখ কিছুতেই তো সারবে না।'

'কিন্তু আমাদের ভিতরে তো ওর জায়গা হবে না। ওর এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার।'

'ও যাবে না।'

'জানি, জানি। এখন ওর বিদ্রোহের বয়েস কিনা!'

'আমাদের সকলেরই তো তাই—'

'মম্‌জেল মার্সলিন, নিজেকে অমন করে ভোলাতে চেষ্টা কোরো না। মনে মনে তুমি সেইদিনের জন্য বসে আছ, যেদিন এই খুদে বিদ্রোহীদের গোটা দলটার গালেই থাবড়া কষিয়ে দিতে পারবে।'

মার্সলিন হেসে বললে: 'হাঁ, এরই মধ্যে ওদের গোটাকয়েক থাবড়া পাওনা হয়েছে বটে!'

'আর সবার কথা থাক। এবার, এই বিদ্রোহীটির কথায়ই আসা যাক।'

'ওঃ, ওর কথা! কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো কিছু হবার যো নেই! তুমি যেই উপদেশ দিতে যাবে, দেখবে টাট্টু ঘোড়ার মতো তোমার নাকের উপর ও তখন চাট ঝাড়ছে।'

'আচ্ছা, তুমি তো ওকে জানো। এমন কি কেউ নেই, যার হেফাজতে ওকে রাখা যায়?'

'ওর মা তো এখন বহুদূরে আছেন।'

'সে আমি জানি। ছেলের জন্য তিনি চাকরি করতে গেছেন। এখানে কি ঘটেছে, তিনি তো জানেন না। ভেবেছিলাম, তাঁর কাছেই চিঠি লিখব। কিন্তু মা আর ছেলের ভিতরে তো সদ্ভাব নেই। ওদের ঝগড়া, সেকথাও আমি জানি। এর কারণ, ওরা দুজনে এত ঘনিষ্ঠ যে কেউ কাউকে বুঝতে পারছে না। একে তো তিনি খুব খাটছেন, তাছাড়া নিজের আছে মানসিক অশান্তি। তাঁকে শুধু শুধু খানিকটা উদ্বিগ্ন করে লাভ কি। আচ্ছা, এখানে ওর কোনো আত্মীয় নেই যার হাতে ওর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়?'

'হাঁ, হাঁ, আছে বই কি। এক মাসী আছে। আমি তাকে চিনি। আর যাই হোক, সে ন্যাকা মেয়ে নয়। সবই বুঝতে পারবে।'

'বেশ তো, ওর কাছে গিয়েই সব কথা বল না।'

মার্সলিন মুখ বিকৃত করল। এই ছোট্ট পায়রাটিকে ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে তার ছিল না। মেয়েটি কিন্তু ভালো বলেই বলল: 'ওর মা কাছে নেই, এখন আমি ওর মা। ওর মা হলে আমি কি করতাম? আমি ওকে আটকে রাখতে পারব না জানি। ওকে বাঁচাবার একমাত্র পথ আছে। আমাকে যেতে হবে···'

আর এক রাত সে তাকে জড়িয়ে ধরে রইল, তারপর সিলভীর সঙ্গে দেখা করে তার হাতে সঁপে দিয়ে এল।

নয়

সিলভীর জীবনে তখন সংকট মুহূর্ত উপস্থিত। তার ছোট্ট মেয়েটি মারা যাওয়ার পর এমন সংকট আসেনি। সে ভুলতে চেয়েছিল তার দুঃখ, একেবারে নিঃশেষে ভুলতে চেয়েছিল, ঠিক এই সময়ে যুদ্ধ এসে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল উত্তেজনা আর আনন্দের আবর্তে। কিন্তু এবার এল বাস্তবের প্রচণ্ড আঘাত, উত্তেজনা থেকে সে জেগে উঠল। এরই আশঙ্কার

কথা সে আগেও ভেবেছে, কিন্তু আঘাত যে এত নিদারুণ হয়ে উঠবে, একথা কল্পনাও করেনি। খবর এল : তার স্বামী লিওপোল্ড জার্মানীর কোনো হাসপাতালে বন্দী অবস্থায় মারা গিয়েছে। এর আগেই বেচারী লিওপোল্ড চিঠিতে তার আসন্ন মৃত্যুর খবর দিয়েছিল।

'প্রিয়া আমার,

তোমাকে যদি ব্যথা দিয়ে থাকি, ক্ষমা কোরো। শরীর খুব ভালো নয়। ওরা আমাকে হাসপাতালে রেখেছে, এখানকার বন্দোবস্তও ভালো। অভিযোগ করবার কিছু নেই। ঘরগুলো বেশ গরম, বাইরে এখনো বেশ শীত কিনা। ওরা বলছিল, কয়লার অভাবে ওখানে নাকি তোমরা ভারি কষ্ট পাচ্ছ। আমি যেন কারখানায় তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি; ভিতরে বসে তুমি কাজ করছ, জানলার উপরে পড়ছে বরফ। সেলেস্তিন-এর হাতের আঙুলগুলো অবশ হয়ে গেছে, পাশের বিড়ালটার গায়ে হাত ঘষে ঘষে গরম করে নিচ্ছে। তোমার কখনো ঠাণ্ডা লাগে না। তুমি তো সারাক্ষণই ঘুরে ঘুরে কাজ দেখছ। কিন্তু আমাদের সেই বড় বিছনাটায় যখন একা ঘুমোতে যাও, বিছনাটার চাদর নিশ্চয়ই খুব ঠাণ্ডা লাগে। যাক, দিনের বেলা তবু তোমরা ঘুরে বেড়াতে পার। হায় আমি যদি তা পারতাম! ডাক্তাররা বলেছেন, উরুতের কাছ থেকে আমার পা কেটে বাদ দিতে হবে—হাঁ, একথা তোমাকে লিখতে হোলো। কি করব আমি? আমি কিছুই জানি না, ওরা যা করবে তাই তো ভালো। কিন্তু ওদের হাতে মরতে আমার ভারি ভয়, তাই তোমার কাছে চিঠি লিখতে বসেছি। তোমাকে জড়িয়ে ধরতে যদি পেতাম! এখনো আশা আছে হয়তো এসব কিছুরই দরকার হবে না। হয়তো ফিরে আসব তোমার কাছে, আবার না-ফিরতেও পারি। প্রিয়া আমার, তুমি আমার জন্য ভেবো না। আমি ফিরে আসতেই চেষ্টা করব। যদি না আসি, তোমার এখনো অল্প বয়েস, তুমি আবার বিয়ে কোরো। আমি তো আর অসাধারণ কেউ নই, আমার মতো লোক তুমি ঢের খুঁজে পাবে। শুধু দেখবে, সে সৎ আর পরিশ্রমী কিনা, সে তোমাকে সম্মান করে কিনা! তোমাকে অন্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ভাবতে আমার ভালো লাগছে না। কিন্তু তোমাকে আমি সুখী করতে চাই। কি হবে কে জানে, তাই আগেই বলে রাখলাম আমার কথা। সিলভী, অনেক ওঠানামার ভিতর দিয়ে আমরা জীবন কাটিয়েছি।

দু'জনেই খুব খেটেছি, কখনো বা ঝগড়া করেছি। কিন্তু আমরা দু'জনে ছিলাম বন্ধু। কতবার তোমাকে জ্বালিয়েছি, বুঝতে পেরেছি, আমি তোমার অনুপযুক্ত। কিন্তু তবু আমি উপযুক্ত হতে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। যতটা চেয়েছিলাম, ততটা সফল হতে পারিনি বলে আজ আর রাগ কোরো না। আনেৎ আর মার্ককে ভালোবাসা জানিও, তুমিও ওদের ভালোবাসতে চেষ্টা কোরো। ওদের জন্য যতটুকু করা উচিত ছিল, আমরা করিনি। ছেলেটির দিকে একটু দৃষ্টি দিও। আমাদের তো সন্তান নেই। ওকে পরে ব্যবসায় নিয়ে নিও। আর লিখতে পারছি না। আমি এখনো দুর্বল, আর চিঠিতে কীই বা বলা যায়? তুমি আমার ভালোবাসা জেনো। সিলভী, তোমার হাত দু'খানা যদি ধরতে পেতাম, ছুঁতে পেতাম! বিদায় সিলভী! সিলভী, আজকের মতো বিদায়! তোমার স্বামী তোমার কথাই ভাবছে, দূর থেকেও সে ভাববে তোমারই কথা—কবরের নিচে শুয়েও তার সে ভাবনা বুঝি যাবে না। নিজেকে মাঝে মাঝে বলি, দূরে হোক আর কাছে হোক, আমরা তো এখনো একই পৃথিবীতে আছি—তোমার আর আমার পা তো একই মাটিতে পড়ছে। বিদায়, প্রিয়া আমার, বিদায়! সবকিছুর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাহস হারিয়ো না। তোমার কাছে বিদায় নিতে দুঃখ হচ্ছে। হা ভগবান!

—লিওপোল্ড

পুঃ, গ্রিবল্যাঁর কাছে একশ পনেরো ফ্রাঁর একটা বিল আছে, ১৯১৪ সালের জুনে দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখনো পাওয়া যায়নি।'

শেষ লাইনকটা আবছা হয়ে গেছে। কয়েক ফোঁটা জল পড়েছিল, বুড়ো আঙুল দিয়ে মুছে নিয়েছে।

চিঠির সঙ্গে সঙ্গেই এল লিওপোল্ডের মৃত্যুর খবর।

বারো বছর ধরে যার সঙ্গে কাটিয়েছে, তাকে সে কতখানি ভালোবাসে, সিলভী বুঝতে পারল। তাকে কোনোদিন নিরীহ ভালোমানুষ আর ব্যবসার অংশীদার ছাড়া তার মনেই হয়নি। কিন্তু মৃত্যু এসে জানিয়ে দিল, ব্যবসার সম্পর্কই সব নয়, আরো এক গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরস্পরের জীবনের ধারা এক হয়ে গিয়েছিল, তারা যেন নিজেদের এমনভাবে জট পাকিয়ে ফেলেছিল যে, আজ দরজীর সুদক্ষ হাতেও সে-জট ছাড়ানো সহজ নয়। সিলভী বুঝতে পারল জীবনের সুতো ছিঁড়ে গিয়েছে; শুধু

বুঝতে পারল না, সে-সুতোটা তার, না, লিওপোল্ডের। সমস্ত সুতোর গুটিটাই বুঝি ছিঁড়ে গেল।

স্বামীর প্রতি সে এতদিন অবিচারই করে এসেছে। তার স্বামীর স্নেহপ্রবণ হৃদয় কি পেল তার কাছে? মাপা ভালোবাসা, কৃপণ ভালোবাসা! তার বিশ্বাসঘাতকতার কথা সে সন্দেহ করলেও, কখনো বুঝতে পারেনি৷ কিন্তু স্বামী জানতে পারেনি বলেই কি অনুতাপ থেকে রেহাই আছে? সে নিজে তো জানত। সিলভী যেন লিওপোল্ডের সত্তা অনুভব করল তার ভিতরে। তার মনে জাগল কুসংস্কার; মনে হোলো, মরবার সময় সে জানতে পেরেছে তার কথা, চাবি দিয়ে তার মনের গুপ্তদরজাটা খুলে সে সবই দেখেছে, পড়েছে তার হৃদয়ের ভাষা। সেই রাতে যেদিন মৃত্যু-সংগ্রামের ভিতরে সে তার হাত ধরতে চেয়েছিল, সে-রাতে কি করেছে সিলভী? সিলভী তারিখ মিলিয়ে দেখে শিউরে উঠল। নিজেকে সে বৃথাই বোঝাল···আমি তো আর জানতাম না···বৃথাই সে বলল: ও ব্যথা পায়নি···মনকে বোঝাল: ও কথা নিয়ে ভেবে কি হবে? অতীতকে তো আর বদলানো যাবে না।···হাঁ, তাই তো! জীবিতের অনিষ্ট করলে তার শোধরাবার উপায় আছে।···বেচারী, বেচারী স্বামী, তুমি যদি আজ ফিরে আসতে, এমনি করে তো নিজেকে ভর্ৎসনা করতে হোতো না! আমি যা করেছি, তার দাম কিছুই নয়। কিন্তু ক্ষতিটুকু পূরণ করেই দিতাম; হাঁ, ভালোবাসা দিয়েই পূরণ করতাম। কিন্তু তুমি তো চলে গেছ, ক্ষতিপূরণ করবার উপায়ও যে আর নেই! তাই তোমার প্রতি অবিচারের কথা আমি ভুলতে পারব না। ঋণ তো পরিশোধ হোলো না, আমি নিজেকে চোর বলেই মনে করব!

পারীর অধিকাংশ লোকের মতোই সিলভী এই অবিচারবোধ থেকে কষ্ট পেল। তাদের প্রতি যে অবিচার হয়েছে, সে তো আছেই। তারা যে অবিচার করেছে, তার নিগ্রহ বরং বেশি করে বাজল বুকে। সিলভী তো অভিভূতই হয়ে পড়ল। তার প্রিয়তমের কাছে রইল তার ঋণ, সে-ঋণ তো আর শোধ হবে না।

বয়স কম হলে এতটা অভিভূত সে হোত না। যাকে বদলানো যায় না, তা নিয়ে এমন করে ভাবতে সে বসত না। যখন জীবন তোমার পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে, যদি হোঁচট খাও তো বলতে পার, আমি শুধরে নেব। তুমি যে অবিচার করলে কারো কাছে তাইই উপকার হয়ে দেখা দেবে।

কিন্তু জীবনের প্রায় সবটা পথই যখন পিছনে ফেলে এসেছ, তখন ভুল করলে সে-ভুল তো তোমারই রইল। ভুল পথ তখন বেছে নিয়েছ, আর শোধরাবারও উপায় নেই। লক্ষ্যে পৌঁছানো তোমার হোলো না।

সিলভী অতীতকে খতিয়ে দেখল। অতীতকে সে মেলে ধরল তার চোখের সুমুখে। তাদের বিয়ের প্রথম দিন, শিশুর জন্ম, আনেৎ-এর সঙ্গে ঝগড়া, তারপর ইভান। তারপর এল ঝড়; আবার জীবন বয়ে চলল; লিওপোল্ড, ভালোমানুষ লিওপোল্ড, তাকে সে বুঝতে পারল না। তারপর যুদ্ধ আর তার প্রেমিকের দল···বেচারী স্বামী তখন মরছে—শত্রুর হাসপাতালে।···না, জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে! সে এবার আনেৎ আর মার্কের ভিতরে খুঁজে নেবে শান্তি।

চিন্তার এই পর্যায়ে এসে ঘরে ঢুকল মার্সেলিন। সে সরলভাবেই সব স্বীকার করল।

সিলভী ভয় পেল। সে সন্ধ্যের দিকে মার্কের খোঁজে তার স্কুলে যাবে বলে বেরুচ্ছে, এমন সময় মার্ক এল তার কাছে। কর্তৃপক্ষ স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন মার্ককে।

দশ

তাড়াতাড়িই ব্যাপারটা ঘটেছে। এক রাতে নিঃশব্দে মার্ক যখন স্কুলে ঢুকছিল, সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। তিনিও তখন ফিরছিলেন। ধরা পড়ে মার্ক মুখে মুখে জবাব দিল, ঔদ্ধত্য ফুটে উঠল তার কথায়। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্তব্যের দিক থেকে তাকে কঠোর শাস্তি দিতে চাইলেন, আবার আর এক দিকে মনে তাঁর ভয়ও হোলো। কি জানি, ছেলেটা তো খেয়ালী, যদি সব বলে দেয়, তাহলেই তো সর্বনাশ। তাঁর কর্তব্য আর গর্বেরই শেষে জয় হোলো। মার্কের তলব পড়ল প্রধান শিক্ষকের কাছে, তিনি তাকে তাড়িয়ে দিলেন। মার্ক একটি কথাও বলল না, ক্ষমা চাইল না, অভিযোগ করল না।

সিলভী তাকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। তার নিজেরও

একটা দায়িত্ব ছিল ; আনেৎ তারই হাতে মার্কের ভার দিয়ে গিয়েছিল। সেও বলেছিল, মার্ককে দেখাশুনো করবে, সে কেমন থাকে সে-খবরও সে তাকে দেবে। স্কুলের বাইরে এলে সে হবে তারই অভিভাবিকা, রাশ ধরেই টেনে রাখবে। কিন্তু সিলভী তার বোনের কঠোরতায় বিশ্বাস কখনো করেনি, বরং মার্কের পক্ষই সে নিয়েছে। তাই সে মার্কের রাশটা আলগা করেই দিয়েছিল। সে নিজেই ভেবে ঠিক করেছিল যে, তরুণদের অভিজ্ঞতা দরকার। ভুল করলেই ওরা ভালো করে শেখে, তাতে যদি খানিকটা চামড়া কাঁটাঝোপে আটকে থাকে তাকে স্বাস্থ্যকরই বলতে হবে। কেননা তারুণ্য এমন বোকা নয় যে, নাচবার পর মেঝেয় আর সোজা করে পা ফেলতে পারবে না। তাই সে একদিন মার্ককে ডেকে বলেছিল— (পরিণাম একেবারে ভেবে দেখেনি তখন) :

'আমার কথাই ধর না, নিজে ঠিক বেরিয়ে এসেছি। তোমারও তো আমার মতোই ঠোঁট আর নখ আছে, তাছাড়া বোকাও তুমি নও। নিজেকে রক্ষা করতে জানো। তোমার চোখও আছে, আর ঐ যে বাঁদরগুলো ডেস্কে বসে আছে, ওদের চোখ দু'টোতো গঁদ দিয়ে ব্ল্যাক বোর্ডের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহের ছ'দিন লাতিন আর গ্রীক পুথির সামনে তোমাকে বেধে রাখলেও তোমার পা দু'টো বেশ লম্বাই আছে। সাত দিনের দিন ঠিক হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে নিতে পারবে। আমার কথা হচ্ছে, ছুটোছুটি কর, যা-কিছু দেখবার দেখে নাও। সবকিছুর রহস্য খুঁজে বার কর। একটু-আধটু পুড়ে গেলেই বা ক্ষতি কি! আঙুলে ফুঁ দিতে দিতে বেরিয়ে আসবে'খন। আগুনের সঙ্গেও পরিচয় হবে— ভবিষ্যতেও একেবারে পুড়ে যেতে হবে না। এতো এক রকমের বীমা— কী বল ?'

. সে তখন ভেবে দেখেনি যে বাড়ি পুড়ে গেলে পর বীমা করতেই সে বলছে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। সাধারণ মানুষ যে-কথা বলে, সেও তখন তাই বলেছিল : 'প্রকৃতিকে তার নিজের মতো চলতে দাও !'

তাই বোনপোর জন্য সে দুঃখিত হয়নি। তার নিজেরও তখন বহু ব্যাপার চলেছে। মার্কও তা জানত। সে কখনো বলেনি বটে, কিন্তু গোপন করার স্বভাবও তার নয়। মার্ক কোনো কোনো রবিবারে মাসীর সঙ্গে দেখা করতে এসে জেনেছে, রাতে সে বাড়ি ফেরেনি। সিলভীরও ফুরসৎ হয়নি,

চিঠি লিখেই মার্কের খপরদারী সে করেছে। তার ফুর্তির জন্য টাকা যুগিয়েছে। কখনো কখনো তিন সপ্তাহ চলে গেছে, ওদের দেখা হয়নি।

সিলভী ভণ্ড নয়, তাছাড়া নেই তার ন্যাকামি। বোনের কাছে এমনিভাবে প্রতিশ্রুতি ভেঙে সে কখনো তাকে ঢাকবার ভান করেনি। সে কতবার নিজেই তো বলেছে, তার মাথাটা বিগড়ে গিয়েছিল। ছ'মাস ধরে সে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল, তার সেই ফুর্তির আনন্দে অভিভাবকত্বের প্রতিশ্রুতি সে ভুলেই বসেছিল।

তার ফ্যাকাশে মুখ, অস্থির ভঙ্গী দেখে, তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনে সিলভী তাকে কিছু বলল না। মার্ক আশা করেছিল সিলভী তাকে রেগে উঠে ভৎর্সনা করবে। সে অবাক হয়ে গেল তার নীরবতা দেখে।

'তুমি এ-সম্বন্ধে কি বল?'

সিলভী উত্তর দিল: 'এই মুহূর্তে আমার কিছুই বলবার নেই। নিজেকে নিয়েই আমি ব্যস্ত।'

মার্ক তাকে কখনো চিন্তা করতে দেখেনি, তাই সে বললে: 'কি হয়েছে তোমার?'

'কি আবার হবে! আমার জীবন আমি নষ্ট করেছি, আমার স্বামীর জীবন নষ্ট করেছি, এবার তোমার জীবন নষ্ট করতে চলেছি।'

'আমার জীবনের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। সে আমার নিজের ব্যাপার। আমার যা খুশি করব। আর জীবনের দামই বা কি?'

'দাম আছে বই কি। অসম্ভব দাম, চড়া দাম!'

'ওরা জীবন নিয়ে কি করছে দেখছ তো? ট্রেঞ্চে গিয়ে দেখ! কতটুকুই বা দাম দিচ্ছে ওরা—'

'তা জানি। জীবনের দাম ওরা দেয় না। লিওপোল্ডের জীবন ওরা কেড়ে নিয়েছে। আমার লিওপোল্ডের জীবন!'

মার্ক জানত না, খবরটা আঘাত হয়ে বাজল তার বুকে। সিলভীর গাম্ভীর্যের এবার হদিস পেল। কিন্তু লিওপোল্ড যে এমনি করে মাসীর বুকখানা জুড়ে বসেছিল, মার্ক তা বুঝতে পারেনি। সে শুনে অবাক হোলো, সিলভী বলছে: 'আজ আমি জীবনের মানে বুঝতে পেরেছি—ওরা কি খুনটাই না করছে, আর আমিও তো ঐ দলে—'

'তুমি ঐ দলে?'

'হাঁ। সেই জীবন, সেই ভালোবাসা নিয়ে আমিই বা কি করলাম! কি লজ্জা! যাক, যা হয়ে গেছে, ভেবে আর কি হবে! কিন্তু এখন তো কিছু করা উচিত। এই তো তুমি রয়েছ, এবার ভুল শুধরে নেব।'

'কি বললে?'

'যে-ক্ষতি আমি তোমার করেছি, তোমাকে করতে দিয়েছি—। (একই কথা, আমাকে বাধা দিও না!) তুমি তো আমাকে জানো। আমার কাছে ভান কোরো না। আমি তোমার মা নই। তোমার সব কিছু আমি জানি। গর্ব করবার তোমার কিছুই নেই।'

'লজ্জায় লাল হয়ে ওঠবার মতোও কিছু আমি করিনি।'

'হয়তো করনি। তোমাকে লজ্জা দিতে আমি চাই না। আর আমার সে-অধিকারও নেই, আমি তো তোমার চাইতেও খারাপ। জানি, সব সময়েই তা রোখা যায় না। হয়তো নিষ্ঠুরতাই হয়। কিন্তু বিপদও আছে। আর সে-বিপদের কথা আমি জানি, তুমি জান না, কখনো জানতেও পারবে না। তুমি আর এক ধাতুতে গড়া। ঠিক তোমার মার মতো। কোনো কিছুকেই সহজভাবে নিতে তোমরা পার না!'

'আমি তো কিছুই বিশ্বাস করি না।'

'সেইটেই তো সব চাইতে খারাপ। আমি কোনো কিছু নিয়ে ভাবি না। বর্তমানে আমি বেঁচে আছি, আর তাতেই খুশি। তার মানে কি জানো?—পায়ের দিকে আমার নজর আছে, যদি পড়ি তো উঁচু থেকে পড়তে হবে না। কিন্তু তোমাদের কথা আলাদা। তোমরা কোনো কিছু আধখানা করে ফেলে রাখতে জান না, তাই তোমরা যখন পড়বে, আর উঠতে পারবে না।'

'নিশ্চয়ই! আমি, আমিই। যদি উঠতে না পারি তো কি হবে? সবই আমার কাছে সমান।'

'কিন্তু আমার কাছে সব সমান নয়। আমি তোমাকে নষ্ট হতে দেব না।'

'কোন্ অধিকারে দেবে না বল?'

'তুমি আমার—এই অধিকারে। তুমি তোমার একার নও—আমি আর তোমার মা রয়েছি। সে নিজে মুখ ফুটে কখনো বলবে না জানি, কিন্তু তার আত্মোৎসর্গ তো তোমারই জন্য। হাঁ, তার জবানি আমি বলছি। আমরা তোমাকে পালন করেছি, ষোলো বছর ধরে তোমার জন্য খেটেছি—এক দিনে, এক ফুঁয়ে তাকে ধ্বংস করতে আমরা দেব না। আগে মানুষ হও,

আমাদের ঋণ শোধ কর, তারপর নিজেকে নিয়ে যা খুশি করো। আমাদের দেনা শুধতে হবে,—হাঁ, শুধতে হবে!'

মার্ক চিৎকার করে উঠল। সে কারো কাছে ঋণ চায়নি, বাঁচতেও সে চায়নি।

'কিন্তু তবু তুমি বেঁচে আছ। যত খুশি রাগ কর, কিন্তু সিধে চলতে হবে। আমার চোখ রইল সজাগ।' আর সে তর্কবিতর্ক বাড়তে দিল না, বলল: 'যথেষ্ট হয়েছে। এখন যাও। এক হয়, তুমি যদি তোমার মার কাছে যাও।'

'না, না, আমি যাব না। আমি তাকে ঘৃণা করি!' মার্ক চেঁচিয়ে উঠল।

সিলভী তার দিকে তাকাল; কৌতূহল তার চোখে। সে কোনো কথা বলল না, ভাবল: মূর্খ…পরিবারশুদ্ধ মূর্খ!…

সে ধীরে ধীরে বলল: 'এখন একটা পথই আছে। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, আর একটা স্কুলে তোমাকে ভর্তি করে দেব। তুমি বোধহয় মাকে এসব ব্যাপার জানাতে চাও না? আচ্ছা, সে-ব্যবস্থা করব'খন। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা জানিয়ে দিচ্ছি। মনে রেখ, আমিই এখন তোমার অভিভাবক, কৌশলগুলোও সব জানা আছে আমার। আমার কাছে লুকোতে চেষ্টা কোরো না, তোমাকে আমি ছুটিও দেব, আমি অত্যাচারও করতে চাই না। তোমার প্রয়োজন আর দাবির খবর আমি রাখি। তোমার কাছ থেকে বেশি প্রত্যাশাও করি না। কিন্তু আমাকে সন্তুষ্ট তোমাকে করতেই হবে। আমি যে তোমার মহাজন!'

॥ এগারো ॥

আনেৎকে সিলভী লিখল, হঠাৎ অসুখ দেখা দেওয়ায় বোর্ডিং-এর ছেলেদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে তাই মার্ককে তার নিজের কাছে এনে রেখেছে। আনেৎ এ-খবরে নিশ্চিন্ত হতে পারল না। সপ্তাহের শেষে ছুটি নিয়ে মার্ককে সে দেখতে এল। তার এই সাক্ষাতের কারণ বুঝতে সিলভীর দেরি হোলো না। নিজেই মনে মনে স্বীকার করল, ছেলের অভিভাবিকা হিসেবে তার উপরে আনেৎ-এর সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। সে আনেৎ-এর

কাছে আগের ভুলগুলো স্বীকার করে নিজের দায়িত্ববোধের পরিচয় দিল। আনেৎ শান্ত হোলো। তারপর চলল লিওপোল্ডকে কেন্দ্র করে কথা···পুরনো স্মৃতির রোমন্থন। ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল তারা।

আনেৎ কিন্তু ছেলেকে দেখে খুব ভরসা পেল না। তার বিবর্ণ মুখ দেখে সে ভয়ই পেল। সিলভী তাকে ভরসা দিল, তিনমাসের ভিতরে সে আবার তাকে সুস্থ করে তুলবে। ছেলে মায়ের কাছ থেকে দূরে দূরেই রইল। তার একগুয়েমি, তার গাম্ভীর্য আরো বেড়ে গেল। সিলভী আনেৎকে একপাশে ডেকে ওকে ঘাঁটাতে নিষেধ করে দিল। মার সঙ্গে কথা বলতে হবে বলে সে বাড়ি থেকে রবিবার দিন বেরিয়ে যাচ্ছিল, সিলভী তাকে অনেক বুঝিয়ে বাড়িতে আটকে রাখল। প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, মার্ক অন্তত উপরে ভালো ব্যবহারই করবে, মুখপাতটা ঠিক রাখবে। বাকি সব···সে পরে দেখা যাবে। তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে বলে দিলে: ছোট ছেলে মেয়েদের একগুয়েমি দূর করতে হলে চাই কৌশল। এইটেই মার্কের সেরা দোষ। সিলভী প্রতিজ্ঞাও করেছে, এ-দোষ সে সারাবেই। কিন্তু প্রথমে ভান করতে হবে যেন ওদিকে তার নজরই পড়েনি। আনেৎ এত রেগে গেছে যে, ওসব কৌশল বুঝতে পারবে কিনা সন্দেহ। তাই সিলভী এসম্বন্ধে কোনো কথাই বলল না। সেও তো আহত, তারও ক্ষত সারানো দরকার। কিন্তু ওকে সারাবার ভার সে নিতে পারবে না। আনেৎ হবে তার নিজের চিকিৎসক।

সিলভী শুধু দেখবে মা আর ছেলের সম্পর্কটা আরো জটিল না হয়ে ওঠে।

আনেৎও ছেলের এই বিদ্বেষের কারণ আবিষ্কার করতে চাইল না। সে রবিবার রাতেই পারী থেকে রওনা হোলো। তার দুঃখের মধ্যে এই সান্ত্বনাটুকু নিয়েই সে ফিরল যে, চঞ্চল ছেলেকে সে উপযুক্ত লোকের কাছে রেখে এসেছে।

॥ বারো ॥

এই ছোট্ট জন্তুটিকে পোষ মানাবার জন্য সিলভী তার সমস্ত অভিজ্ঞতা আর কূটকৌশল ব্যবহার করল। তাছাড়া পারীর বিলাসিনীর ছলাকলাও বাদ পড়ল না। সে নিজের ঘরের পাশেই তার থাকার বন্দোবস্ত করে দিল। সেখান থেকে সদরে পৌঁছবার একটিমাত্র দরজা, সে-দরজার চাবি রইল তার কাছে। মার্কের বন্ধুবান্ধব এলে সে-দরজা খোলা হোতো। মার্ক এ-ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাল না। সে শুধু তাকিয়ে দেখল, একজোড়া চোখ তাকে পাহারা দিচ্ছে কিনা। না, সে-বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত। ভগবান আর শয়তান—যার সঙ্গেই হোক সিলভী কখনো চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধ করেনি। মার্ক তার ঘরে বসে কি করছে, পড়ছে না লিখছে—তাও সে জানতে চেষ্টা করল না। মার্ক নিজের এলাকায় স্বাধীনভাবেই রইল। সিলভী মেনে নিল তার অধিকার, কিন্তু বাইরে যাওয়ার হুকুম সে পেল না। চুক্তির শর্ত অনুসারে তাকে সিলভীর শোয়ার ঘরের ভিতর দিয়ে বাইরে যেতে হবে। অন্য পথ বন্ধ। একবার বাইরে যেতে পারলে সে হয়তো ফিরত কিনা সন্দেহ। এই নিয়ে সে একদিন ঠাট্টা করে সিলভীকে শাসাল—সিলভীকে পরীক্ষা করাই তার ইচ্ছে। সেও ঠাট্টা করে জবাব দিল: 'বাছা তার ফল তোমাকেই ভুগতে হবে।'

'কি করবে তুমি?'

'ঐ বাউণ্ডুলের দল থেকে তোমাকে খুঁজে বার করব। সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার। যেখানে যাবে, সেইখানেই আমার লোক আছে। ঠিক জেলখানায় নিয়ে পুরবে।'

'তাহলে পুলিসের সঙ্গেও তোমার এখন ভাব?'

'দরকার হলে তাও করতে হবে বই কি। কিন্তু দরকার হবে না। আমার নিজেরই পুলিস আছে। তোমার বন্ধুরা আমি বললে সব কিছু করবে।'

মার্ক রাগে লাফিয়ে উঠল: 'কে? কে? না, না, এ সত্যি নয়! তাহলে ওরা বিশ্বাসঘাতক? কাউকে বিশ্বাস করতে পারি এমন কি কেউ আমার নেই।'

'আছে বইকি! এই তো তোমার কাছেই রয়েছে।'

'কে—?

'কেন, আমি।'

মার্ক রাগে মুখ ফিরিয়ে নিল।

'ওঃ, আমাকে নিয়ে বুঝি চলবে না? খুদে শয়তান, তা আমি জানি। কিন্তু এই তোমার প্রায়শ্চিত্ত। শোন, আমি তোমার ভালোবাসবার বা ভালোবাসা পাওয়ার দাবি নিয়ে তর্ক করছিনে। প্রতি জীবন্ত আত্মার সেই তো দৈনন্দিন খোরাক। কিন্তু ও খোরাকই তো সব নয়, রুজি রোজগারের তাগিদও তো আছে। প্রথমে তোমাকে তোমার দিনের রুজি রোজগার করতে হবে। কাজ কর, মানুষ হও। রিভিয়ের বংশে তুমিই কি একমাত্র পরগাছা হয়ে থাকতে চাও? আমার আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ। ছুঁচের কত ফোঁড় খেয়েছি। এই হাত দু'খানাকে আমিও ভালোবাসি, অন্যের ভালোবাসার স্বাদও এরা পেয়েছে, কিন্তু তাই বলে আমি তো তাদের রেহাই দিইনে। আমি ভণ্ড নই। জীবনকে আমি উপভোগ করেছি। কিন্তু জীবন আমার কাছে যেচে এসে ধরা দেয়নি, আমি তাকে প্রতিদিন কিনে নিয়েছি। কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমি চাই তুমিও তাই কর। অমন গোমরা হয়ে থেক না! তোমাকে তো আমি আমার সমান বলেই মনে করি, তাই একথা তোমাকে শোনালাম। দাও, ধন্যবাদ দাও। তারপর মুখটি বুজে থাক!'

দু'খানা হাত তার গলার শেকলে ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে জানিয়ে দিল দু'টি স্ত্রীলোকের কাছে তার ঋণের কথা। তাদের রুটি সে খেয়েছে, ঋণ পরিশোধ করবার আগে তাদের সেই অপমানজনক দাসত্ব থেকে তার মুক্তি নেই। তার ইচ্ছে হোলো ঐ হাত দু'খানা সে কামড়ে দেয়, কিন্তু সেখানে তার বিচারবুদ্ধি, রিভিয়ের বংশের বিচারবুদ্ধি তাকে বাধা দিল। বিচারবুদ্ধি হয়তো নয়, এ এক অজ্ঞতা; কিন্তু এ অজ্ঞতাই তাকে মেনে নিতে বাধ্য করল। সে সিলভীর স্পর্ধার কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। হাঁ, মানুষ হিসেবে তার আত্মসম্মান বাঁচাতেই হবে।

আর একটা কারণ ছিল বইকি। কিন্তু স্বীকার করতে সে চাইল না। যেহাত সে কামড়াতে চেয়েছে, তারও আছে মোহ, আছে সৌন্দর্য। সিলভী তার ভিতরে এক মোহ জাগিয়ে তুলেছে।

সিলভী সেকথা বুঝতে পারল বইকি! এতো তার আর এক অস্ত্র, অবহেলা করবার তো উপায় নেই।

পারীর প্রতি-স্ত্রীলোকের দুটি কি তিনটি করে পোষা তরুণ আছে। হয়তো ফরাসী মেয়ে না হলে আরো বেশি রাখত, সংখ্যা গিয়ে কোথায় ঠেকত কে জানে! সিলভীর এখন দ্বিতীয়ের পালা চলেছে, কিন্তু ভালো লাগছে না। সে এখনো যে-কোনো তরুণের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মার্কের মাথা ঘোরাবার তার ইচ্ছে নেই, তবে নিজের শাসন বজায় রাখতে যতটুকু দরকার, ততটুকু সে করল বইকি—মাত্রা ঠিকই রইল। আর একটু চড়লেই বিপদ হোতো। কিন্তু সিলভীর মতো মেয়েরা কখনো সীমা ছাড়িয়ে যায় না।

সে বুঝতে পারল তরুণ মার্ক বিবশ হয়ে পড়েছে, তার কামনা, গর্ব আর স্কুলে-শেখানো বুদ্ধির বুলি তাকে তৃষ্ণার্ত করে তুলেছে। সে সোহাগ চায়, চায় সেই মূল খুঁজে পেতে যেখানে অস্থৈর্য আর শান্তি পাশাপাশি রয়েছে। হাঁ, সেই মূল সে খুঁজে পেতে চায়, স্বপ্নে সুগোল কোমল বুকের উষ্ণতায় তার জ্বরার্ত কপালখানা চেপে ধরতে সে চায়—বসন্তের ফুলন্ত বাগানের মতোই তার সুগন্ধি···আর চায় সবার সেরা ফুল সেই কমনীয় নারী দেহ। এই উদ্দাম নেকড়েবাঘগুলোর জীবনের ক্ষুধার্ত কৌতূহলের কথাও সিলভী জানে। এদের কাছে উপভোগের মানে তো জ্ঞান ; প্রায়ই জানতে গিয়ে তারা উপভোগ করতে পারে না। জানতে চায়, তারা জানতে চায়! হাঁ, তাই তাদের এই পশ্চাদ্ধাবন! আর জীবনটাই তো শিকার!···

(···হাঁ, হাঁ, দৌড়ও! আমিই তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছি। পেছনে তাড়া করতে গিয়ে শিকারের কথা তো ভুলেই যাবে!···)

রাতে সিলভীর ঘরে টেবিলের ধারে এসে বসল মার্ক। তার কাজ শেষ করেই সে এসেছে। ঘুম পাচ্ছে না। সিলভী একটা শিরস্ত্রাণ তৈরি করছিল। সে ওর দিকে তাকিয়েও দেখল না। মার্ক ওর দিকে তাকিয়ে আছে, বুঝতে পারল।

(···দেখ! দেখতে আমি ভালই, কিন্তু আমার কথা শুনতে আরো বেশি ভালো লাগবে!···)

মার্ক তার পা-র নখ থেকে কানের লতি পর্যন্ত চোখ ভরে দেখে নিল। কিন্তু সিলভীও সাবধানী। নিষিদ্ধ ফল পেকে ওঠবার সময় সে তার মনকে দিল না। ছেদ পড়ল না তার কথার স্রোতে। সে যেন তাকে সোনার শেকলে বেঁধে রাখল, টেনে নিয়ে চলল। কিন্তু একবারও মার্ককে কিছু জিজ্ঞেস

করল না, তার মনের রহস্য জানতে চাইল না। রহস্য জানতে হলে জিজ্ঞেস না করাই ভালো। সে বলে গেল তার অতীতের দুঃসাহসিকতা আর ছলনার ইতিহাস। ধর্ম সে হারিয়েছে বটে, কিন্তু সম্মান হারায়নি। দাঁত দিয়ে সুতো ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে বলে গেল—ফুটে উঠল মুখের সার, তাদের ভাব ভঙ্গী নিয়ে সে বিদ্রূপ করল, এমন কি নিজেকেও বাদ দিল না। মার্ককে সে গ্রহণ করল বিশ্বাসী বন্ধু হিসেবেই। কত জটিল পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে সে তাকে নিয়ে গেল, কিন্তু সব কিছু সে বাঁচিয়ে চলল। সে তার নির্বুদ্ধিতা আর ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতার বিশ্লেষণ করে দেখাল। এত সহজ ভাবেই সে বলে গেল যে, মার্কের মনে দুর্নীতির কোনো প্রশ্নই জাগল না। এ এক বিস্ময়কর দৃশ্য! এখানে হৃদয় আর ইন্দ্রিয়ের থেকে বড় হয়ে উঠল বুদ্ধির দীপ্তি। মার্ক শুনে গেল—মন্ত্রমুগ্ধ সে। কখনো বা বিদ্রোহে ফুঁসে উঠল, হাসিতে ফেটে পড়ল। আবার কখনো বা শিউরে উঠল। জীবনের এই হাস্যকর প্রেমের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। অথচ সিলভীর কাছে এ-যেন গল্প। চমৎকার সঙ্গী তারা! এক রাতে মার্ক পাগল হয়ে উঠল কামনায়, সে সিলভীকে চুমু খাবে! কিন্তু দানা বাঁধবার আগেই কামনা মিলিয়ে গেল। এক মুহূর্তে সিলভীর চোখের বিদ্রূপদৃষ্টি তার কামনাকে দমিয়ে দিল। না, না, মোহ এখানে নেই! ওর দৃষ্টির সামনে সে গম্ভীর হয়ে থাকতে পারে না বলে তার নিজের উপর রাগ হোলো। কিন্তু রাগ রূপ পেল হাসিতে। হাসির ভিতর দিয়ে পরস্পরকে জানা—সে কত মধুর! তাছাড়া হাসি তো গর্বেরই প্রতিষেধক। তরুণদের বিনম্রতা সব কিছুর উপরই দাবী জানায়, আবার তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেও দ্বিধা করে না। তাই এই প্রতিষেধকই তো চাই। তার স্ফীত কামনা তার দেহের মতোই বেড়ে চলছিল, সেখানে শিশু আর পুরুষ দুইই পরস্পরকে ছাপিয়ে উঠতে চাইল—বিয়োগান্ত পরিণতির দিকে মোড় ঘুরতে যাবে এমন সময় জীবনের সেই বাঁকা দিকটা শুধরে দিল এই বুদ্ধিদীপ্ত হাসির ঝঙ্কার। এ-যেন কোনো সুদক্ষ দরজীর হাতে মখমলের টুপির বাঁকা দিকটা সমান হয়ে যাওয়া। অবশ্য সিলভীর এই রীতি অন্য কাউকে গ্রহণ করতে বলছি না। যে ব্যবহার করবে তার কাছেই সেই রীতির দাম। এই রীতি গ্রহণ করতে যে সাহসী হবে, তার চাই সিলভীর মতোই দক্ষতা, তা না হলে অনুতাপ করতে হবে বইকি! এতো খাঁটি পারীর জিনিস।

মাসী আর বোনপো পারীরই মানুষ। তাই সদ্ভাব হতে দেরী হোলো না।

স্বাধীনতা আর বিশ্বাস মার্ককে সিলভীর কাছে টেনে নিয়ে এল। সে বলতে শুরু করল তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা, সিলভী হেসে উঠল, অভিমানী মার্ক রাগল না। অতীত আর বর্তমানের ঘটনা সে বলল, কোনো নির্বুদ্ধিতার কাজ করতে যাওয়ার আগে সে চাইল তার পরামর্শ। সব সময়ে পরামর্শ শুনল না বটে, কিন্তু সে যে কিছু জানে না এই সম্বন্ধে তার আর সন্দেহ রইল না। সিলভীও তাকে বাধা দিল না, শুধু বলল: 'বেশ তো যাও না! কিন্তু বোকারাম, একটু দেখেশুনে চোলো!'

নির্বুদ্ধিতার পালা শেষ করে ফিরে এলে সিলভী জিজ্ঞেস করল: 'কি হোলো বোকারাম?'

মার্ক উত্তর দিল: 'আমি একটা গাধা! তুমি ঠিকই বলেছিলে।'

তারা দু'জনে এবার পারীর পথে পথে ঘুরল। সিলভী সব কিছুই জানে, গোপন সে কিছুই করল না!···'সত্যিকে সত্যি বলতে আমি ভয় পাই না।···'

মিথ্যে আবরণ তাদের ছিল না। সিলভীর স্পষ্ট কথা, তার কাজ, তার সততা, তার জীবনের শৃঙ্খলা আর স্বাধীনতার ভিতরে একটা সাম্য গড়ে তুলল। আর সেই সাম্যের ভিতরে এই ছন্নছাড়া ছেলেটি খুঁজে পেল তার নিশ্বাস নেবার জায়গা, তার আত্মবিশ্বাস। এই ঘনিষ্ঠতা থেকে এক সরল সহজ বন্ধুত্ব গড়ে উঠল—ভীরু চোখ তাকে হয়তো বিপদ বলেই মনে করবে। কিন্তু এর ভিতরে অভিজ্ঞ আর অনভিজ্ঞের বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

যদিও এ-স্নেহের দাম তার কাছে খুব বেশি নয়, তবুও এরই ভিতরে সে খুঁজে পেল ভাবনা থেকে মুক্তির আনন্দ।

॥ তের ॥

সিলভী আনেৎ সম্বন্ধে মার্ককে কোনো কথাই বলল না। দু'জনের চিঠি লেখালেখি চলল। মার্ক ভাবল: মাসী সপ্তাহে একটা করে মার্কের সম্বন্ধে রোজনামচা পাঠাচ্ছে। চতুর সিলভী বুঝতে পেরে এক খাসা চাল চালল। একদিন একখানা চিঠি সে তার টেবিলের উপর ফেলে রাখল। সে জানত

মার্ক ঠিক পড়বেই। মার্ক পড়ে দেখল, চিঠিতে তার কোনো উল্লেখই নেই। সন্তুষ্ট হওয়াই তার উচিত ছিল, কিন্তু সে বিরক্তই হোলো। একেবারে উল্লেখ থাকবে না,—একথা সে ভাবতেই পারেনি। সে অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল : 'দু'জনে দু'জনকে কি লেখ বল তো ?'

'আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসি, এইকথা—' সিলভী উত্তর দিল।

'অদ্ভুত পছন্দ !'

সিলভী হাসল : 'কার অদ্ভুত পছন্দ ?'

'দুজনেরই।'

সিলভী মার্কের কান মলে দিল : 'হিংসে হচ্ছে বুঝি।'

সে প্রতিবাদ জানাল।

'কেন, হিংসেই তো ভালো। ওর চাইতে বড় ওষুধ আর নেই।'

মার্ক ঘাড় নাড়ল। সে বিশ্বাস করতে পারেনি, কিন্তু কৌতূহলী হোলো। এই ভিন্ন প্রকৃতির দুটি স্ত্রীলোক—কি করে পরস্পরকে ভালোবেসেছে? আবার তার মার কথা তাকে পেয়ে বসল। রহস্যময়ী তার মা !

আনেৎ আত্মসমর্পণ করল। সে আর মার্ককে তার উদ্বেগ-আকুল স্নেহ দিয়ে উত্যক্ত না করে সিলভীর পরামর্শেই চলেছে, যা-কিছু বলার সিলভীকেই বলবে। মার্কও মার দিক থেকে আভাস না পেয়ে মনে মনে তারই অভাব অনুভব করছে। তাই গ্রীষ্মের ছুটি আসতেই সে সিলভীর কথায় মার সঙ্গে দেখা করতে ছুটল।

কিন্তু দু'জনের পক্ষেই পরীক্ষাটা একটু তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে এল। দূর থেকে আনেৎ তার স্নেহকে দাবিয়ে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু আর সে বাগ মানল না। কি করে মানবে, কতদিন ধরে সে বঞ্চিত হয়ে আছে! মাসের পর মাস ধরে যে তৃষ্ণায় মুমূর্ষু হৃদয় এক ফোঁটা—না এক ফোঁটা নয়, ভালোবাসার ঘন বর্ষণের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে! কতবার বৃথাই সে সিলভীর কথা আউড়েছে : 'যদি ভালোবাসা পেতে চাও, অত ভালোবাসা দেখিয়ো না।'

কিন্তু একে কি গোপন রাখা যায় ? যদি কেউ রাখে সে তো সত্যিকারের ভালোবাসে না। না, না, আধা ভালোবাসা নয়! হয় তারা পরস্পরকে পূর্ণভাবে ভালোবাসবে, নয়তো তারা চায় না এই ভালোবাসা। আনেৎ পূর্ণভাবেই ভালোবাসল, কিন্তু মার্কের বুকে তখনো ভালোবাসা জাগে নি।

তবে দ্বন্দ্ব চলেছে, অনুভূতির দ্বন্দ্ব—বিদ্বেষ আর আকর্ষণ তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে, উৎসারিত হতে চাইছে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মতো। মার সঙ্গে দেখা হতেই তার আত্মার দমকা হাওয়া এসে লাগল। আগুন লুকোল মেঘে, আকাশ তখন নির্মেঘ। যে-স্নেহ তাকে আঁকড়ে ধরবার জন্য এগিয়ে আসছিল, পরস্পরের হাতের স্পর্শে, কথায় আর দৃষ্টিতে, সে মিলিয়ে গেল। মার্ক গেল পিছিয়ে।···

(···'থামো, থামো! আমাকে ছুঁয়ো না!')

(···'সে কি! যারা তোমাকে ভালোবাসে তাদেরও···?')

(···'হাঁ, তাঁদেরও আমি ছুঁতে দেব না।')

নিজেকেই সে বুঝতে পারল না, কিন্তু বুঝল প্রকৃতি। নুয়ে সে পড়বে না। এখনো সময় আসেনি।

আনেৎ লোলুপ হয়ে তখন পান করছে: জল চলে গেছে, আঙুল দিয়ে বালি খুঁড়ে দেখ, মুখ লাগিয়ে খোঁজ সেই হারানো উৎস···

অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সে। মার্কের মনে হোলো, একে একে সে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুঁজে দেখছে। সব মার মতোই সে তার স্বাস্থ্য দেখে দেখে উদ্বিগ্ন হোলো। প্রশ্নে সে তাকে অস্থির করে তুলল। ছেলে অবজ্ঞার হাসি হাসল। মুখের শ্রী তার বিবর্ণ, কিন্তু স্বাস্থ্য তার ভালোই আছে। মাথায় সে বেড়েছে, মুখখানা শুকিয়ে গেছে—তাই বুঝি তাকে এমন ক্ষুধার্ত, এমন কৃশ দেখাচ্ছে। তার ঠোঁটের উপর সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। মানসিক অশান্তি তার মুখের উপর ফেলেছে রুগ্ন ছায়া। মা বুঝতে পারল না ও কি ভাবছে—ওদের সম্বন্ধ তো ছিন্ন হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে। সে শুধু দেখল ওর মুখে, চোখে, কপালে অকাল পরিণতির ছায়া আর অভিজ্ঞতার ছাপ। কঠোর সে হয়ে উঠেছে, বিদ্রূপের শানিত ঝলসানি তার স্বরে ফুটে উঠছে। তার বুকখানা গুমরে উঠল ব্যথায়, না জানি কি সে করেছে, কি সে দেখেছে!

হয়তো তরুণের পবিত্র রক্তে এসেছে পাপের জীবাণু—সে শিউরে উঠল, নিজেকে দায়ী করল। কেন, কেন সে তাকে ছেড়ে এসেছিল? কিন্তু ছেলে তো তাকে চায়নি। যার আত্মা এমনি করে বন্দী হয়ে বসে আছে, তাকে কি করে রক্ষা করবে? জোর করে ঢুকবে তার আত্মার বন্দীশালায়? এই বিরাট বাধার উপর সে তো আছড়ে পড়েছিল, আহত হয়েছিল। সে তো

তারই কঠিন উপাদানে তৈরি। আর সেখানে ঢুকলেই বা সে কি দেখত? সে ভাবতেও ভয় পেল।

মার্ক গম্ভীর। সে একবার ভেবেও দেখল না যে, তার মাকে একটি মাত্র আলোর রেখা থেকে বঞ্চিত করছে, মাতৃস্নেহের ফুলকে সে কুঁড়িতেই ঝরিয়ে দিচ্ছে। আনেৎ-এর হৃদয়ে তখন চলেছে নাটকীয় সংঘাত, সে তার হাত থেকে পালাতে চাইল, কিন্তু পারল না। তার মানসিক অস্থৈর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ল। মার্কের মনে হোলো, এর সঙ্গে যেন কোথায় তার মিল আছে, সেও অস্থৈর্যের ভাগ নিতে এগিয়ে এল।

এই ছোট্ট শহরে ঘুমন্ত একঘেয়ে আবহাওয়ায় বাড়ির ছায়া ছেড়ে সে পেল না ফুর্তির সন্ধান। অগাস্টের রোদে সারা শহর যেন এক হরিদ্রাভ পরিণতিতে ঝিমুচ্ছে। যদি সেই সমৃদ্ধিকে সে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে পারত, তাহলে বুঝি শান্তি পেত, পেত আনন্দ। কিন্তু পারীর এই খুদে বাসিন্দা তখনো প্রকৃতির রহস্য জানতে পারেনি। তার ইন্দ্রিয় আর মনের উপর অন্য জিনিসের আনাগোনা চলছে। এখনো সে-মুহূর্ত আসেনি, যখন তার চোখ ফুটবে, প্রান্তরের পুথির পাতায় পাতায় পড়বে নিঃশব্দ সংগীত। প্রান্তরের গান আর ভায়োলেটের গন্ধ শুঁকতে হলে চাই মনের পরিণতি। সে অনুভূতি আসবে অনেক পরে।

আনেৎ তাকে নিয়ে বেড়াতে বার হোলো। কিন্তু একজনের উপস্থিতিও প্রকৃতির সঙ্গে আলাপে বাধা জন্মাতে যথেষ্ট। আনেৎ বেড়াতে বেড়াতে মাটি আর হাওয়া নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল, কিন্তু বুঝতে পারল না যে মার্ক আর প্রকৃতির মাঝখানে সে বাধা হয়েই দাঁড়িয়েছে।

(…'আমার রোদটুকু থেকে সরে দাঁড়াও!')

আনেৎ চলছিল। মার্ক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তার দৃঢ় পদবিক্ষেপ, চলার ছন্দে ছন্দে যৌবন যেন জেগে উঠছে, নাচছে রক্ত। সে তাকে ছুটে যেতে দেখল ফুলের কাছে, ফড়িঙের কাছে। কি তার উৎসাহ! পরে পারীতে এই দিনের ছবিই তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। হাঁ, এই আনন্দ, জীবনের এই স্রোত, এই মুখ, এই চোখ, আর এই স্পন্দিত বক্ষ (একদিন মা তাকে উন্মত্তের মতো জড়িয়েও ধরল, এই অন্তরঙ্গতা মার্কের ভালো লাগল না।)। কিন্তু মুহূর্তের জন্য সে শিউরে উঠল। তার নিশ্বাস ফুরিয়ে এল, অপমানিত হোলো সে। তারপর থেকে বেড়াতে যেতে সে আর রাজি হোলোনা।

এবার এল বিরক্তি, অসহ্য বিরক্তি। সে-বিরক্তি সে দেখাল বই কি। কিন্তু অভিযোগ করে নয়। না, না! সে কিছু বলল না। নিজেকে সে উৎসর্গ করল তার মার কাছে।

কিন্তু আনেৎ সহ্য করতে পারল না, মনে মনে বলল: 'বাছা, নিজেকে কেন উৎসর্গ করছ? আমি তো তা চাইনি। তার চাইতে না হয় তোমাকে ছেড়েই…'

সে শেষচেষ্টা করল। ভাবল: 'পারীর জন্য নিশ্চয়ই ওর মন অস্থির হয়ে উঠেছে। বেশ তো, পারীতেই ফিরে যাব।'

সে তার গ্রীষ্মের ছুটির শেষ তিন সপ্তাহ ইচ্ছে না থাকলেও পারীতেই কাটিয়ে দিল, প্রাণ তখন হাঁফিয়ে উঠেছে।

প্রায় একবছর হোলো সিলভী ছাড়া একজনের সঙ্গেই সে সম্বন্ধ রেখেছে। সে সেই বিধবা-কুমারী লিদিয়া মুরিসিয়ের। ইদানীং তার চিঠিও ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। ওরা পরস্পরকে ভালোবেসেছে, কিন্তু ভাবের আদান-প্রদানে হোঁচট খেয়েছে, কথা খুঁজে পায়নি। অথচ দু'জনেই জীইয়ে রেখেছে, দেখা হলে দু'জনে গলা জড়িয়েও ধরবে। কিন্তু দেখা হওয়া তারা চায় না, তাহলেই তো নিজের ব্যবহারের জবাবদিহি করতে হবে। আনেৎ পারীতে ফিরে শুনল, লিদিয়া ওখানে নেই। সে নিরাশ হোলো বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পড়ল স্বস্তির নিশ্বাস। কিন্তু এ ভাবনা তো কিছু নয়। অন্য সবাই তো আছে। তাদের কথা আগেই সে ভাবতে চাইল না।

তার দরকার নেই বলে আলেক্সিস আর আপলিনকে সে অন্য ঘরগুলো ছেড়ে দিয়ে শুধু শোয়ার ঘরটা নিজের আর ছেলের জন্য রেখেছিল। ফিরে এসে দেখল, তারা সবগুলো ঘরই দখল করে বসেছে। এখন তারাই যেন মনিব। আনেৎ-এর নিজেকে অনধিকার প্রবেশকারী বলে মনে হোলো। তারা যেন দয়া করেই তাকে আশ্রয় দিল। 'দয়া' কথাটা আপলিনের অমন গুরুগম্ভীর চেহারার সঙ্গে খাপ খায় না। আনেৎ দু'তিন সপ্তাহ থাকবে শুনে মুখখানার থমথমে ভাব একটু হালকা হোলো। সে জানিয়ে দিল: একখানা ঘরের বেশি তাদের সে ছেড়ে দিতে পারবে না। আর দু'তিন সপ্তাহ মা ও ছেলের একঘরে থাকবার কোনো অসুবিধা হবারও কথা নয়। মার্ক রেগে উঠে আলেক্সিসের জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার ক্ষমতা জাহির করল। তার ঘরদোরের অবস্থা দেখে আনেৎ ব্যথা পেল সব

চাইতে বেশি। ধুলো আর বিশৃঙ্খলা চারদিকে, ভাঙ্গা চীনেমাটীর বাসন, রান্নাঘরে পোড়া হাঁড়িকুড়ির স্তূপ—দেয়ালে জল পড়ে পড়ে রং চটে গেছে ; পর্দা ছেঁড়া, আসবাবপত্রও ভাঙ্গাচুরো। না, এরা কোনো কিছুর উপর মায়া দেখায়নি! আনেৎ-এর ঘর থেকে ভালো বিছানাগুলো নিয়ে এসেছে, যেসব ছবি দিয়ে সে পারিবারিক দিগন্ত গড়ে তুলেছিল, সেগুলি দেয়াল থেকে সরিয়ে নিয়ে মেঝেয় এক পাশে স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে, বা চলে গেছে ভাঙ্গাচুরো জিনিস রাখার ঘরে। তার বদলে দেয়ালে টাঙানো হয়েছে আপলিনের নিজের পরিবারের ছবি, এক ধার্মিক, কুৎসিত পরিবারের ছবি। এমন কি যে-সব বই আর কাগজপত্র সে চাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখে যায়নি, সেগুলি পর্যন্ত রেহাই পায়নি (অথচ আপলিন বই পরে না)। হয়তো কৌতূহলের বশে, নয়তো বা আঙুলের সুড়সুড়িতে সে সব ঘেঁটেছে। বইয়ের প্রতিটি পাতা দোমড়ানো, দাগে ভর্তি হয়ে আছে। সারা ঘরে যেন জানোয়ারের আস্তানার গন্ধ। মার্ক বিরক্ত হয়ে উঠল, ক্ষেপে গেল। সে ওদের নিচের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইল। আনেৎ তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল। আপলিনকে সে দু'কথা শুনিয়েও দিল। কিন্তু আপলিন আমলই দিল না তাকে। কয়েকটা কথা বলেই আনেৎ বুঝতে পারল আত্মিক বিপর্যয় ঘটেছে, সে এসে পড়েছে এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির মাঝে।

ভাই আর বোন এতদিন পরস্পরকে এড়িয়ে চলেছে। তাদের ভিতরে এসেছে ঘৃণা, ক্রোধ আর ভয়। আনেৎ হঠাৎ এসে পড়ায় আবার এক ঘরেই তাদের থাকতে হোলো। রাতে শোনা গেল তাদের ঝগড়া, আপলিন ফুঁসে উঠল ঝোড়ো হাওয়ার মতো, তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। তারপর নিস্তব্ধতা। এক সপ্তাহ ধরে এমনি চলল। একদিন মাঝরাতে আপলিন চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এল। আনেৎ উঠে এল। এসে দেখল আপলিন প্রায় উলঙ্গ হয়ে নখ দিয়ে গা আঁচড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে। সে পাগল হয়ে গেছে। আনেৎ তাকে নিজের ঘরে এনে শান্ত করতে চেষ্টা করল। সে বিছানায় শুয়ে পড়ল, তারই পাশে মেঝের উপর আছড়ে পড়ে আপলিন অশ্লীল কথার স্রোত বইয়ে দিল। আনেৎ মুখে হাত চেপে ধরল, কি জানি পাশের ঘরে মার্ক যদি জেগে ওঠে। মার্কও শুয়ে শুয়ে শুনল। সেই কথার বন্যায় আনেৎ স্তব্ধ হয়ে গেল, বুঝতে পারল কি ঘটেছে···

রাত কেটে গেল। আনেৎ-এর বিছানার পাশে মেঝের উপর আপলিন নিঃশব্দে পড়ে রইল, তারপর চলল প্রার্থনা। কিছুক্ষণ পরে সে হাঁ করে ঘুমিয়ে পড়ল, নাক ডাকানোর শব্দ শোনা গেল। ভোরের প্রথম আলো পড়তেই আনেৎ ঝুঁকে পড়ে দেখল, আপলিন ঘুমুচ্ছে, মাথাটা তার হেলে পড়েছে; মুখখানা যেন তার ভয়ার্ত পশুর মতো। এ যেন এক পুরনো মুখোশ, তেমনি ভয়ঙ্কর, তেমনি অদ্ভুত, চক্ষুহীন এক গর্গনের মুখে যেন নিঃশব্দ চিৎকার ধ্বনিত হয়ে উঠছে। আনেৎ-এর দৃষ্টির স্পর্শে জেগে উঠল গর্গন। সে জেগে উঠেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল। আনেৎ তার হাত ধরল, সে কঁকিয়ে উঠল।

'কি চাও তুমি? আমাকে ছেড়ে দাও! তুমি আমার মুখ থেকে দুর্গিত রক্তমাখা রুটি ছিনিয়ে নিয়েছে, আমার লজ্জা, আমার অমূল্যনিধি তুমি কেড়ে নিয়েছে। আবার কি চাও? তুমি আমাকে ঘৃণা কর, আমিও তোমাকে ঘৃণা করি! আমি জঞ্জাল বইতো নয়, কিন্তু তোমার চাইতে আমি ঢের ঢের ভালো।'

'আমিতো তোমাকে ঘৃণা করি না। তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।'

'নাও নাও, আমার গায়ে থুথু ফেলে যাও!'

'আমি তো তোমার বিচারক নই। সে-বিচার তোমার ভগবান করবেন। তুমি পাগল হয়ে গেছ, এরই জন্য আমি দুঃখিত। আজ সারা পৃথিবীই পাগল। কাল কি হবে কেউ বলতে পারে না। কিন্তু আর এ বাড়িতে থাকা তোমার হবে না।'

'আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?'

'আমার ছেলেকে তো রক্ষা করতে হবে।'

'আমি কোথায় যাব?'

'যাও, কাজ করগে। খুঁজে নাওগে কাজ। আজ পুরো দু'বছর ধরে দেশের এই দুর্দশার ভিতরে কোনো কাজ না করে কি করে আছ তোমরা? শুধু কাজই তোমাকে বাঁচাবে।'

'আমি তো কাজ করতে পারি না।'

'কি বললে? একদিন খামারে কাজ করেছ, আজ কাজ করতে ইচ্ছে নেই বলেই তো সেই কাজের প্রেরণা তোমাকে অস্থির করে তুলেছে। তোমরা খাঁচায় বন্দী নেকড়ের মতোই অলস হয়ে বসে আছ, মাঝে মাঝে

খাঁচার শিকের ভিতর থেকে ভগবানের কাছে জানাচ্ছ প্রার্থনা। ভগবান! কাজই তো ভগবান!'

'না, কাজ করতে আমি পারব না। আমার সেই সম্পত্তি আমাকে ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও আমার জমি! সবকিছুই তো ওরা কেড়ে নিল, ধ্বংস করে দিল। আমার সম্পত্তি, আমার জমি, আমার জাতি সবই গেল! আর কিছুই আমার নেই, শুধু ওই আছে (আলেকসিসের ঘরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল)। আমি ওকে ঘৃণা করি, নিজেকে ঘৃণা করি! যে ভগবান এই দশা আমার করেছে, তাকেও আমি ঘৃণা করি!'

'আমি তো তাঁকে বিশ্বাস করি না, করুণা করি। হাঁ, করুণাই করি। তোমরা তাঁকে প্রতারিত করেছ। ঘৃণা, তোমাদের মুখে শুধু ঘৃণার বুলি! আর কিছুই তোমরা জান না। যদি ভগবান থাকেন, তিনি তো তাঁর ইচ্ছা তোমাদের জানিয়েছেন। এখন তোমরা কি করবে বল?'

'এই অন্ধকূপে, রক্তমাংসের দেহ নিয়ে আমি তো হুটোপাটি খাচ্ছি। আমি তাঁর উপর প্রতিশোধ নিচ্ছি। তিনি তো আমার মধ্যেই আছেন, তাই নিজেকে তিলে তিলে ধ্বংস করছি।'

'তোমার ভগবান তো বিছের মতোই। ধ্বংস করতে না পারলে তিনি নিজেই ধ্বংস হবেন।'

'হাঁ, ভার্দুনের ভগবান, আজকের ভগবান তিনি!'

'যাও, চলে যাও, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তুমি কি আমাকে ধ্বংস করতে চাও?'

'না, তোমার উপর আর বোঝা হয়ে থাকব না।'

আপলিন ছুটে বেড়িয়ে গেল।

সেইদিনই তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। আবার সারা বাড়ি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তাদের উপস্থিতিতে অভিযোগের অন্ত ছিল না। আনেৎ তাদের যেতে বলল বটে, কিন্তু যাওয়ার সময় তার মন খারাপ হয়ে গেল। সে জানতে চাইল ওরা কোথায় যাবে। আপলিন জানাতে রাজী হোলো না। এমন কি আনেৎ টাকা দিতে চাইলে সে 'না' বললে।

ঠিক এই সপ্তাহেই ফিরে এল আনেৎ-এর প্রতিবেশী তরুণ শার্দনে। আটচল্লিশ ঘণ্টার ছুটিতেই সে এল।

দু'টো দিন সে ঘরের দরজা দিয়েই কাটিয়ে দিল। কেউ তার দেখা পেল

না। ঘর থেকে মার্ক শুধু শুনতে পেল তার পায়ের শব্দ। এই নীরব নাটকের অভিনয় সে দেখল।

ক্লারিস আর সে-ক্লারিস নেই। গত বছরের ক্লারিস যেন বদলে গেছে। উন্মত্ততার ঘূর্ণি তার উপর দিয়ে চলে গেছে। আবার সে তার নিজের ঘরে বন্দী, চিন্তার কোটরে অবরুদ্ধ। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে সে যাওয়া-আসা করে, আসবাবপত্রে ধাক্কা লাগে না, এমন কি মেঝেয়ও পায়ের শব্দ শোনা যায় না। নিঃশব্দ নীরব সে। বেড়াল যেন। তার চোখ দু'টো ছোট, মখমলের মতো ঝলসে ওঠে, কিন্তু ভিতর থেকে আলো ঠিকরে পড়ে না। রুজ তার বিবর্ণ গাল দু'টোকে যেন মুখোশে ঢেকে রাখে, সেখানে স্মৃতি আর স্বপ্নের ভাষা মেলে না। উপবাসী স্বামী, তার বাগিচার ফল খেতেই ফিরে এল, সেও যেন আত্মায় সে-স্বাদ আর পেল না। দৃষ্টি তার সূক্ষ্ম না হলেও সে বুঝতে পারল, বাইরেটা ঠিকই আছে কিন্তু ভিতরটা একেবারে বদলে গেছে; কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু, কি হোলো? কি সে খুঁজে পেল? বাইরের হাসি গোপনতাকে প্রকাশ হতে দিল না। বৃথাই হোলো তার আলিঙ্গন। তার চিন্তাকে সে তো নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরতে পারল না, ধরল দেহটাকে। কিন্তু এই দেহটা এতদিন ধরে কি করেছে? আর এই মন, সে-ই বা কি দেখেছে, কি ছিল তার ইচ্ছে? কি জানে সে? কি সে লুকিয়ে রাখছে? না, না, কিছুই সে তো বলবে না, সে কিছু জানতেও পারবে না।

তারা তুচ্ছ জিনিস নিয়ে শান্তভাবে কথা বলে গেল। হঠাৎ পুরুষটির স্বর রুক্ষ হয়ে এল। কোনো কারণ নেই তবুও; সে যেন অনুভব করছিল এই রুক্ষতা, অসতর্ক মুহূর্তে উৎসারিত হয়েও পড়ল। ক্লারিস মাথা নিচু করে রইল। ধরা পড়ে গেছে এই ভেবেই সে লজ্জিত হোলো। আবার রাগও হোলো, ওর মনের গোপন কথা তো টেনে বার করতে পারল না। দু'জনে একই গ্রন্থিতে বাঁধা পড়েছে বটে, কিন্তু সে-গ্রন্থির মাঝখানে দেয়াল। কোনো কথা না বলে সে উঠে বেরিয়ে গেল, দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। ক্লারিস নড়ল না। কিছুক্ষণ পরে মার্ক শুনতে পেল, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

স্বামীর ছুটি ফুরিয়ে যেতে সে চলে গেল, বিদায়ের সময় পরস্পরকে বলবার কিছু রইল না। ওদের পরস্পরের মনের কথা বলতে পারলে

জীবনের এই প্রাকার এক নিমেষে ধ্বসে যেত, কিন্তু তারা তাকে নাড়া দিতে ভয় পেল। সেই বিধ্বস্ত উপত্যকায়, অতীতের প্রাকারের উপর, তারা একদিন যা ছিল—তারই স্মৃতি দিয়ে এখনো বাসা টিকিয়ে রেখেছে, সে-বাসা তো আর টিকত না! তারা পরস্পরকে জানাল বিদায় সম্ভাষণ। ঠোঁট তখনো শুষ্ক। আলিঙ্গন করল, ভালোবাসল। কিন্তু তবু তারা রইল অপরিচিত।

আনেৎ পারীতে থাকতেই লিদিয়া মুরিসিয়েরও ফিরে এল।

পরস্পরকে দেখে আবার পুরনো ভালোবাসা তারা ফিরে পেল। কথা বলবার আগেই মিলল তাদের দু'টি ঠোঁট। কিন্তু যে মুহূর্তে কথা শুরু হোলো, মনে হোলো দেয়ালের দু'পাশ থেকে দু'জনে কথা কইছে। তারা বুঝতে পারল, চাবি থাকলেও দেয়ালের এই বন্ধ দরজা তারা খুলতে পারবে না, পারবে না তার ভিতরে প্রবেশ করতে। এ এক অসহ্য বেদনা; দু'জনের মধ্যে এই বাধার প্রাচীর। তারা দু'জনে দু'জনকে চাইছে, কিন্তু বাধা উড়িয়ে দিতে পারছে না।

লিদিয়া তার সহজ সরলতা হারিয়ে ফেলেছে। সে যেন কবিতার সুষমার মতোই তার প্রতি অঙ্গভঙ্গীকে সুগন্ধিস্নাত করে রেখেছিল। কিন্তু এখন সে তাকে কঠোরভাবে দাবিয়ে রেখেছে, তার উপরে শোকের কালো ওড়না ঢেকে দিয়েছে। সে মৃতের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। প্রথম দিকের শোকের সেই বিহ্বলতা নেই, নেই রহস্যময়তা। সেই মর্মন্তুদ বিষণ্ণতার মন্ত্রমোহও আজ উবে গেছে। কৃত্রিম উপায়েই বুঝি সে-মোহকে রাখা যায়। হৃদয় চায় দয়া, চায় বিস্মৃতি। তাকে বাধ্যতার শাসনে রাখা মানে তো শৃঙ্খলিত করা। এ যেন দাসকে ঘানিতে জুড়ে দেওয়া। ইচ্ছার চাবুক সেখানে উদ্যত। লিদিয়া তার মনের সরসতা নষ্ট করে ফেলেছে, মৃতের স্মৃতি তাকে পেয়ে বসেছে।

···তার স্মৃতি! তার কথা!

···না, তাইতো যথেষ্ট নয়: তারই মতো করে ভাবতেও হবে!

নিজের ভাবধারা জলাঞ্জলি দিয়ে যাকে সে তার বিস্মৃতির গর্ভ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়, তারই ভাবধারা গ্রহণ করেছে···(নিস্তব্ধ রাতের গভীরে মৃত্যুর বিরুদ্ধে ভালোবাসাকে জীইয়ে রাখবার এ এক সংগ্রাম—আত্মার সংগ্রাম!) সে ঝিরের-এর আত্মার শুষ্ক, জ্বলন্ত ভাবধারায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। (হাঁ, সেই ভাবধারাই তো তার ছিল, ছিল তার আত্মার সব কিছু।) তার

সেই সুকুমার মুখখানা থেকেই ঝরে পড়ছে সেই ভাবধারা, শুনতে অদ্ভুতই লাগে, মনে বাজে ব্যথা। আনেৎ প্রস্তরীভূত হয়ে শুনল, উত্তর দিতে পারল না। মনে হোলো, ইচ্ছে করেই মেয়েটা তাকে ঐ কথাগুলো বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করছে, অথচ ও-কথাগুলো সে নিজেই বিশ্বাস করে না। আনেৎ উত্তর দিল না। ওর ঐ মুখোশ খসিয়ে দেওয়া বুঝি অমানুষিক বর্বরতারই পরিচয়। ঐ কোমল, ভেঙেপড়া চারা গাছটা বুঝি এই ঠেক্‌নোকে আঁকড়ে ধরেই কোনোমতে খাড়া হয়ে আছে! আনেৎ কিছু বলল না বটে, কিন্তু লিদিয়া তার মূক ঠোঁটের ভাষা নিল পড়ে, সে দেয়ালের ভেজানো-দরজাটায় খিল এঁটে দিল। বিচ্ছেদ এবার সম্পূর্ণ।

তার সুখ আর জীবনকে যে কেড়ে নিয়ে গেছে, সেই যুদ্ধের মহিমাই সে কীর্তন করল। যে সমস্যাময় ভবিষ্যৎ সে নিয়ে আসবে, তারই কথায় সে মুখর হয়ে উঠল। হাঁ, এক ন্যায় আর শান্তির কুয়াশাময় ভাবধারা এই হত্যা আর অন্যায়ের ভিতর দিয়েই এসে পৌঁছবে, এই শোক দূরে যাবে। তার নিজের প্রিয়তমের রক্ত দিয়ে ঈশ্বরের রাজত্বের এই ভবিষ্যৎকে সে পেয়েছে। এ এক নিরাকার ঈশ্বর, পাশ্চাত্যে যাদের আজ ঈশ্বর হারিয়ে গেছে, তারা তো আজ যে-কোনো মূল্য দিয়ে ঈশ্বরকে এনে তক্তে বসাতে চাইবেই! কি যেন নাম সে ঈশ্বরের? বিশ্বের গণতন্ত্র—তাই না? সুকুমার মুখ থেকে অমন মিথ্যে কথা কি করে ঝরে পড়ল! তোমার শুকনো হাসি তো এক রক্তাক্ত ক্ষত···

সে তার নিজের বিশ্বাস জাহির করল। সে বুঝতে পারল আনেৎ অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে, (অনুভূতি তার ছিল কখনো?) তাই সে ভালো করেই জাহির করল। তার মোহবিচ্যুতিকে সে এই ভাবধারা আর কামনার অবলোপের ভিতরেই ভাগ করে দিল। আনেৎ এতদিন একথা বুঝতে পারেনি, এবার সে বুঝতে পারল এর মূলে রয়েছে সহজাত প্রবৃত্তির বিবাদ। তাদের বিভিন্ন পথের নির্দেশ দিয়ে যেন বলছে: 'হায়, এ পৃথিবীতে আর আমাদের দেখা হবে না!'

কিন্তু এই পৃথিবীতে পালাবার জায়গা কোথায়? ওরা পৃথিবীর কি দশা করেছে?

১৯১৬ সালের গ্রীষ্মের শেষদিকে পারীর পরিস্থিতিতে, পৃথিবীর পরিস্থিতিতে নিশ্বাস ফেলা দায় হয়ে উঠল। পৃথিবী যেন এক বিরাট জন্তুর হাঁ করা মুখ, মৃত্যুর চিৎকার উঠছে সেখানে। তার নিশ্বাসে পচে গলে যাচ্ছে মানুষের শবদেহ। সোম আর ভার্দুন-এর মাংসের স্তূপ তাকে পরিতৃপ্ত করতে

পারছে না। আজটেকরা ধর্মোন্মাদনায় জনগণকে ধ্বংস করবার পর থেকে বুঝি এমন বলির দৃষ্টান্ত আর মেলেনি। আরো দু'টি নতুন জাতি এই মৃত্যু-নৃত্যে এসে যোগ দিয়েছে। দু'বছরে এই নিয়ে বত্রিশবার যুদ্ধ ঘোষিত হোলো। তালে তালে পা পড়ছে নর্তকদের। খবরের কাগজ এই নৃত্যের বৃত্তের বাইরে ওৎ পেতে বসে হাততালি দিচ্ছে, চিৎকার করছে। জার্মানীতে ওরা সন্ত ফ্রান্সিসের এক নতুন গান বেঁধেছে···আমাদের ভগিনী ঘৃণার আর এক স্তব !

বিশ্বাস, আশা আর ঘৃণা। ঘৃণাই তো এদের মধ্যে সব চাইতে বড় আর মহান···

তিরানব্বুইজন বুদ্ধিজীবীর গর্বে গর্বিত ফ্রান্স তার জবাব হিসেবে প্রকাশ করল অসাধু উন্মত্ততার এক বিরাট কীর্তি। সে-কীর্তি 'জার্মান জাতি ও তার বিজ্ঞান'। চিন্তানায়করা (দু'জন অবশ্য বাদ গেলেন) ইয়োরোপীয় বংশাবলী থেকে জার্মানজাতিকে শুধু বাদই দিলেন না, তাদের মগজ আর হাড় পরীক্ষা করে এমনকি মানুষ বলেও তাদের স্বীকার করতে চাইলেন না। একজন সেরা বিজ্ঞানী চাইলেন বার্লিনকে সমভূমি করে দিতে, চাইলেন 'সেই গর্বিত পিতৃভূমি'তে এক ধ্বংসের মরূদ্যান রচনা করতে। একজন আইনজ্ঞ যুক্তি দিয়ে প্রতিশোধকে সমর্থন করলেন, তাকে আইনের পর্যায়ে তুলে আনলেন; ক্যাথলিকদের উদার মতাবলম্বী এক মুখপত্র ফরাসী ক্যাথলিকদের জানালেন অভিনন্দন। তারা যীশুখৃস্টের নামে জার্মানীর ক্যাথলিকদের ক্ষমা করতে রাজি হয়নি। গির্জার এক ধর্মাধ্যক্ষ সম্রাটকে দাবি করলেন লুণ্ঠনের ভাগ হিসেবে। তাকে তিনি জ্যারদ্যাঁ দ্য প্লাঁৎ-এর এক গহ্বরে পুঁতে ফেলতে চাইলেন। যতকিছু কিম্ভূত আর ভয়ংকরের সমারোহ—তারত্যুফ আর পেয়র উব্যু-র মিলন। সব চাইতে খারাপ হোলো এই যে, এই নাটকের সেরা ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করতে এল যত কিম্ভূত জীব। নর্তকের দলের যারা সেরা, তাদের ভণ্ডামি তখন হিমালয়িক উত্তুঙ্গে উঠেছে। পরিষদের এক অধিবেশনে একজন মন্ত্রী অশ্রুরুদ্ধ স্বরে সংবাদ-পত্রের ঔদাসীন্যের কথা বলে গেলেন। চারদিকে হাততালিও পড়ল। আর ওয়েলসের সেই বাগাড়ম্বরকারী লয়েড জর্জ, সেই খুদে ক্রমওয়েল, তার দীক্ষিত ভ্রাতাদের কাছে এক নতুন সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচার করলেন। তাঁর এক হাতে রইল বাইবেল, আর এক হাতে তলোয়ার—অন্যের তলোয়ারই হবে, তাঁর নিজের নয়। প্রথম সৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধকে তিনি করলেন তুলনা। যুদ্ধের

নায়ক হিসেবে তাঁর বজ্র বিস্ফূর্ত হোলো শান্তিবাদীদের উপর। 'এমন অমানুষিকতা নেই, এমন নিষ্ঠুরতা নেই, যাকে তাদের এই যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে তুলনা করা চলে।' ইতিমধ্যে অচঞ্চল, স্থির আমেরিকা, তার পাওনার ভারী বিল নিয়ে পুরনো পৃথিবীকে হত্যার সরঞ্জামে ভরে দিল। ডান হাত যেন জানতে পারল না, বাঁ হাত কি করছে। 'হত্যা কোরো না'—একথা লেখা আছে সত্য, কিন্তু এমন কথা তো কোথাও লেখা নেই যে, 'হত্যার সরঞ্জাম তুমি সাধু উপায়ে তৈরি করতে পারবে না।' হাঁ, তার উপরে যদি ভালো জিনিস হয় আর ভালো দাম পাওয়া যায়!

আনেৎ চোখ কান বন্ধ করে ঘৃণায় সিলভীর কাছে আশ্রয় নিল। সিলভী কিন্তু দিন কাল আর মানুষের ভাগ্য নিয়ে মিথ্যে নিজেকে ভাবিয়ে তুলতে চায় না। তার নিজের সংকীর্ণ বৃত্তে নিজের প্রিয়জনেরা ভালো থাকলেই হোলো। সে বলল:

'ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। ধৈর্য ধরে থাকা ছাড়া উপায় কি। আমাকেই দেখ না! আমিও প্রতীক্ষায় আছি। একদিন না একদিন এই সর্বনাশা ধ্বংস কাণ্ড শেষ হবেই। তাড়াতাড়ি করে লাভ কি! বহুদিন চলবে এই যুদ্ধ। আমার এক তরুণ বন্ধু—এই তো সেদিন মারা গেল—সে বলছিল: আরো এক লাখ জার্মান আমাদের মারতেই হবে।'

আনেৎ সিলভীর চোখের দিকে তাকাল। সত্যিই কি সে একথা বলছে, না, এ তার ছলনা! না, সত্যিই সে বলছে। তবে খুব তলিয়ে দেখেনি। এর ভিতরে কোনো উত্তাপ নেই। যাদের সে আগেই মেরে রেখেছে, তাদের উপর তার রাগ নেই। কিন্তু যখন এছাড়া উপায় নেই, চলুক না হত্যার উৎসব!

'জানো,' আনেৎ বললে: 'ওদের এক লাখের জন্য আমাদের আধ লাখ অন্তত মরবেই!'

'তা তুমি কি আশা কর? কিছু তো মরবেই।'

বিলাসী জগতে আবার প্রাণের স্পন্দন। চা-খানায় ভিড়, সিলভীর দুয়ারে আবার তরুণ প্রার্থীদের জমায়েৎ। গত কয়েক বছরের উদ্বেলতা আর নেই; প্রথম পরীক্ষার সেই পৌরুষ আর নেই, নেই আনন্দ আর ঘৃণার সেই ইন্দ্রিয়গ্রাসী প্রতিক্রিয়া। তার চাইতেও এ ভয়ানক; মানুষের প্রকৃতি এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নতুন অবস্থার সঙ্গে সে আশ্চর্য খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এমনি খাপ খাইয়ে নেবার শক্তি আছে বলেই সহস্র বর্ষ

পরে পরে যে বিক্ষোভ এসেছে, তাতে একমাত্র মানুষই খুদে পোকার মতো ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, অন্যান্য প্রজাতিদের সে-শক্তি ছিল না বলেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই ভয়ংকর পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতার মধ্যে যদি স্বাভাবিকতার কলা-কৌশলকে প্রশংসা করতে হয়, তাহলে পারী সে-প্রশংসার দাবী করতে পারে বইকি।

কিন্তু আনেৎ তাকে সম্মান দিতে রাজী হোলো না। সে তারই ছায়া দেখতে পেল তার সন্তানের মুখে, সে-ছায়া দেখে সে আঁতকে উঠল। এখন আর গত গ্রীষ্মের সেই উদগ্র উত্তেজনা আর বিকৃত হাসি মার্কের নেই; সে এখন নীরব, উদাসীন। তার মুখখানা যেন একটা পুকুর, জ্বর এখন তারই নিচে তলিয়ে আছে। জলে জেগেছে আলোড়ন, কিন্তু তরঙ্গ নেই। উপরের নিথরতায় নিচের আলোড়ন ধরা পড়ছে না। বাইরের ছায়াও পড়ছে না। এখন সে ঘুমন্ত।

হাঁ, এ তার ঘুম বইকি! যে ঝড় তার চারিদিকের গাছগুলোকে বাঁকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, উপড়ে ফেলছে, নিয়ে এসেছে মৃত্যুর ঝাপ্টা, পূতিগন্ধ আর অট্টহাসি—তাকে সে দেখতে পাচ্ছে না, অনুভব করতে পাচ্ছে না, শুনতেও বুঝি পাচ্ছে না। তার মা তো উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছে, ঝুঁকে পড়ছে তীরের উপর। কিন্তু কে বলতে পারে? এই তৈলমসৃণ পাঁকের নিচে প্রসববেদনা শুরু হয়েছে, এখনো উপরে সাড়া নেই। যদি সাড়াই দিতে হয়, মার চোখের মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি তো সে-সাড়া জাগাতে পারবে না!

শুধু সিলভীর কাছেই নিজেকে সে যা প্রকাশ করল। সে তার সঙ্গে সহজভাবে মিশল, শান্তভাবে কথা বলল। আনেৎকে সে চোখে চোখে রাখল। আনেৎও তাই। কিন্তু তাদের আগেকার সম্পর্কের ঔদ্ধত্য আর বিরক্তি এখন আর নেই। সে এখন নম্র। উত্তর না দিয়ে শুনে গেল তার কথা। তার চলে যাবার প্রতীক্ষায় সে রইল।

॥ চোদ্দ

অসহায় আনেৎ ফিরে গেল। সংঘাতের সময়ও তাদের ভিতরে ছিল বন্ধন, সে-বন্ধন আর নেই। এখন তারা অপরিচিত। শত্রুর সঙ্গেও থাকে বন্ধন, শত্রুতার বন্ধন; কিন্তু যে সম্পূর্ণ উদাসীন তাকে তো বাঁধা যায় না। এখন আনেৎ তার কাছে অপ্রয়োজনীয়। সিলভী হলেই তো যথেষ্ট। যারা নিজের জায়গা ছেড়ে দেয়, তারা তো তা হারাবেই। মার্কের জীবনে তার আর ঠাঁই নেই।

তার সন্তানের হৃদয়ে তো নেইই, বিশ্বেও বুঝি নেই। তার চারিদিকে অপরিচিত মুখের ভিড়, তার কোনো আত্মীয় নেই। তাদের বাঁচবার অর্থ, আর বাঁচবার ইচ্ছা, তাদের বিশ্বাস আর বিশ্বাস করবার ইচ্ছা, তাদের যুদ্ধ, আর জয়ের আকাঙ্ক্ষা, তার দেহ থেকে যেন জীর্ণ পোশাকের মতোই খসে পড়ছে। গ্রীষ্মের ঝরা পাতার মতোই যেন খসে খসে পড়ছে। কিন্তু চাওয়ার তাগিদ তো তার শেষ হয়নি স্নায়ুবৈকল্যের অভিজ্ঞতা তার নেই। তার মনের শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, উবে যায়নি। বরং শক্তি তার দেহে সঞ্চালিত, তাকে সে কাজে লাগাতে পারছে না বলেই এসেছে তার বিষণ্ণতা। এই শক্তি নিয়ে সে কি করবে, এই কাজের তাগিদ, সংগ্রাম আর ভালোবাসার তাগিদ নিয়ে সে কি করবে, কি (হাঁ, আমিও)…করবে এই ঘৃণার তাগিদ নিয়ে? ওরা যাকে ভালোবাসে তাকেই ভালোবাসবে? না। ওরা যাকে ঘৃণা করে, সে তাকেই ঘৃণা করবে? না, কখনো না! যুদ্ধ চালাবে? কেন? এই বিশৃঙ্খলার ভিতরে একা সে। কার কাছে, কোন দিকে সে তাকাবে?

এক সপ্তাহ হোলো সে কলেজে ফিরে এসেছে। সেদিন অক্টোবরের এক বর্ষণ মুখর সন্ধ্যা। সে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছিল। বাড়িতে ঢুকতে যাবে, এমন সময় পথে সে চাঞ্চল্য দেখতে পেল। এ এক অনভ্যস্ত চাঞ্চল্য।

সে যেখানে থাকে তার কিছু দূরে একটা নতুন হাসপাতাল (হতভাগ্যদের জন্য) সবে খোলা হয়েছে। ভার্দুন-এর ভাগাড় থেকে উগরে দিয়েছে আহতদের। এই উৎসর্গীত মাংসের আর ঠাঁই মিলছে না। এই শহরের

উপরে প্রথম সেই বোঝা চাপানো হোলো। প্রথম এল জার্মানরা। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত হাসপাতালে শহরের অধিবাসীদেরই স্থান সঙ্কুলান হয়নি। তারা কঠোর পরিশ্রম বা অলসতায় ভেঙেপড়া রোগীদের স্তূপীকৃত করেই রাখত—তারপর সবাই যেত একই আবর্জনার স্তূপে। এই সংকীর্ণ, ভাঙা বাড়ি-গুলোর ভিতরে জমে উঠেছিল সংক্রামক জীবাণু আর আবর্জনা! ডাক্তার বা রোগী—এ নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি। অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন উন্নতির (যুদ্ধের) সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাবধারা (বরং নতুন শব্দ তাকে বলা যায়) এসে দেখা দিল—স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রতিবেধক—এমনি কত কি। সমস্যা হোলো মৃত্যুকে স্বাস্থ্যকর করে তোলা, এদিকে মৃতের সংখ্যা তখন বেড়ে চলেছে। নতুন হাসপাতালের জন্য একটা পুরনো বোর্ডিং স্কুলের বাড়ির বিশ্রী দেয়ালে তারা করল চুনকাম, ফেনাইলের গন্ধ উঠল, তৈরি করল একটা স্নানের ঘর—এইটেই একটা দুর্লভ জিনিস।

এই বিলাসীতার প্রথম স্বাদ পাবে কিনা হুনেরা! সারা শহর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। কিছুদিন হোলো তার উপর দিয়ে পরীক্ষা হয়ে গেছে। গত দু'মাসের যুদ্ধে শহরের ছেলেদের সংখ্যা গেছে কমে। প্রায় প্রতি পরিবারই এখন শোকবিহ্বল। অভ্যস্ত উদাসীনতা এখন ক্রোধে রূপান্তরিত। এমন কি হাসপাতালের কর্মচারীদের ভিতরেও দুটো দল গড়ে উঠল। একদল শত্রুকে সেবা করতে চাইল না। একটি দরখাস্ত লেখা হোলো, হাতে হাতে ঘুরল। কিন্তু তার আগেই এসে পৌঁছল আহত সৈনিকের দল। তারা টেরই পেল না। এবার খবর পেয়ে দলে দলে শহরবাসীরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

এই হতভাগ্যের দল তখন স্টেশন ছাড়িয়ে শহরে ঢুকে পড়েছে। স্টেশনের পথটা কয়েক মুহূর্তে বৃষ্টির জলে ভরা নর্দমার মতোই ভরে গেল। এরা বেশির ভাগই নিরীহ, উদাসীন, একটু হয়তো রুক্ষ, কিন্তু মনটা ভালোই। কিন্তু এবার জ্বলে উঠল নীচ প্রবৃত্তির আগুন। জনতার গর্জন জানিয়ে দিল মিছিল আসছে। দু'গাড়ি জীবন্ত ভগ্নাবশেষ এসে পৌঁছল। অল্প আঘাত যাদের লেগেছে তারা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখ আর হাত নিয়ে সুমুখে চলেছে। একেবারে সামনে একজন লম্বা, রোগা, পদস্থ জার্মান সামরিক কর্মচারী। রক্ষী বেশি নেই। ওদের দেখেই ঘুষি উঁচিয়ে এল জনতা, মেয়েরা এল নখ দিয়ে তাদের ছিন্নভিন্ন করতে। এ এক পবিত্র মিলন। সবাই এক হয়ে গেল,

মধ্যবিত্ত আর দোকানী, এমনকি অভিজাত মহিলারাও। হতভাগ্যরা দাঁড়িয়ে পড়ল, পিছন থেকে এল আবার চলার তাগিদ। ওরা এগিয়ে গেল, ঠেলে ওদের এগিয়ে দিল ; মুখে ভয়ের ছাপ। হয়তো তাদের ওরা হত্যাই করবে। ঢিল পড়ল, জনতার হাতে বেত আর উদ্যত ছাতা। মুখে চিৎকার : 'মৃত্যু, মৃত্যু চাই !' সামরিক কর্মচারীটিই দৃষ্টি সব চাইতে বেশি আকর্ষণ করল। একটা ঘুসি পড়ল তার মুখে, কে একজন ছিনিয়ে নিল তার শিরস্ত্রাণ, ছুঁড়ে ফেলে দিল ; কোনো এক মহিলা থুতু ফেললেন তার মুখে। আঘাতে টলে পড়ল সে···

আনেৎ লাফিয়ে পড়ল সুমুখে।

এতক্ষণ সে তৃতীয় সারের পিছনে দাঁড়িয়ে ভীত চোখে দেখছিল এই বর্বরতা। কি ঘটে গেল সে নিজেই জানে না। সে এগিয়ে এল, উত্তেজিত পুরুষ আর নারী তার পথ রোধ করেছিল, তাদের সে ঠেলে এগিয়ে গেল সুমুখে। জনতা সরে দাঁড়াল, রিভিয়ের বংশের মুঠোর স্বাদ তারা পেল। জার্মান সামরিক কর্মচারীটির কাছে এসে সে ঘুরে দাঁড়াল জনতার সামনে, হাত দুখানা বাড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল :

'ভীরু, ভীরু তোমরা ! তোমরা কি ফরাসী দেশবাসী ?'

এক তীব্র কশাঘাত পড়ল জনতার উপর।

এক নিশ্বাসে সে বলে গেল : 'তোমরা কি মানুষ ? আহতরা সবাই তো পবিত্র। যারা দুর্দশা ভোগ করে ফিরে এল, তারা তো আমাদেরই ভাই।'

জনতাকে সে দাবিয়ে রাখল তার স্বরে, প্রভুত্ব করল। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হয়ে গেল তারা। পিছু হটল। আনেৎ নুয়ে পড়ে তুলে নিল শিরস্ত্রাণখানা। এই এক মুহূর্তই তার প্রভুত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। বিক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ জনতা আবার জড়ো হোলো, এবার তারা বুঝি তারই উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমনি সময়ে রেড ক্রশের লাল পোশাক পরা একটি যুবতী এসে আনেৎ-এর পাশে দাঁড়িয়ে দৃঢ় স্বরে বলল :

'এই মহিলা ঠিক কথাই বলেছেন। আহত শত্রুরা এখন ফ্রান্সের রক্ষণাধীনে। আজ তাদের যারা অনিষ্ট করতে চায়, তারা চায় ফ্রান্সের অনিষ্ট।'

সবাই যুবতীটিকে চিনত। সে এই অঞ্চলেরই সেরা অভিজাত পরিবারের মেয়ে। তার স্বামী সেদিন ভার্দুন-এ মারা গেছেন। তার কথায় কাজ হোলো। আরো দু'জন মহিলা, দু'জন সেবিকা এসে দাঁড়াল তার

পাশে। দু'একজন বুর্জোয়া সবাইকে শান্ত হতে বলল। যে মহিলাটি সামরিক কর্মচারীটির মুখে থুতু ফেলেছিল, সেই আবার একজন আহতের উপর ঝুঁকে পড়ে অনেক মিষ্টি কথাই বলল। জনতা তখনো উত্তেজিত, কিন্তু সরে দাঁড়িয়ে ওদের পথ করে দিল। সদ্য বিধবা যুবতীটি আর আনেৎ রইল সামনে, টলে-পড়া সামরিক কর্মচারীটিকে সে জড়িয়ে ধরে চলল।

হাসপাতালে তারা এসে পৌঁছল, প্রতিবাদ করতে কেউ আর সাহস করল না। এবার বিক্ষোভের পরিবর্তে কর্তব্য আর মানবতা তাদের শক্তি জাহির করল। প্রথমে একটু গোলমালই হোলো, নার্স বেশি ছিল না (সবাই একে একে রাতে ফিরে এল) তাই কর্তৃপক্ষকে বিশেষ বেগই পেতে হোলো। আনেৎ দুপুর রাত পর্যন্ত হাসপাতালেই কাটিয়ে দিল, কেউ তাকে লক্ষ্যই করল না। সেই ভদ্র মহিলাটি যিনি কয়েক ঘণ্টা আগে এদের উপর ক্ষেপে উঠেছিলেন, তারই সাহায্যে আনেৎ আহতদের পোশাক ছাড়িয়ে দিল, ক্ষত ধুয়ে দিল। ভদ্রমহিলা এখন নিরীহ সেবিকাই এবং তাঁর আগের অপরাধের জন্য লজ্জিত। একজন হতভাগ্যকে শেষ জবাব ওরা দিলেও আনেৎ মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার পাশেই বসে রইল।

রোগা ছেলেটি, রাইনদেশের সেমিটিক আর লাতিন বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণের উদাহরণ। এক ভীষণ ক্ষত হাঁ করে আছে। শরীর কুঁচকে যাচ্ছে ব্যথায়, দাঁতে দাঁত ঘষছে; এবার সে চিৎকার করে উঠল। চোখ একবার মেলেই আবার বুজে গেল, কাকে যেন সে খুঁজছে, কিছু যেন খুঁজছে। জাহাজ ডুবছে, একটা কিছু যেন আঁকড়ে ধরতে চায়। আনেৎ-এর চোখে চোখ পড়তেই সে তাকে আঁকড়ে ধরল···দুটি করুণা ভরা চোখ···তার এই দুর্দশার ঘন আঁধারে অপ্রত্যাশিত আলো। সে চিৎকার করে উঠল— অন্তরের গভীর মথিত হয়ে এল স্বর: 'আমাকে বাঁচান!'

আনেৎ নুয়ে পড়ল। সৈনিকটি উঠতে চেষ্টা করছিল, তার মাথার নিচে হাত দিয়ে তাকে শুইয়ে দিল। ঝরে পড়ল করুণা ভরা জার্মান কথা, বৃষ্টিধারার মতোই তার শুকনো জলন্ত চামড়ার উপর ঝরে পড়ল। সে আনেৎ-এর একটা হাত চেপে ধরল, আঙুল যেন চামড়ার ভিতর ডুবে গেল। আনেৎ তার দেহে অনুভব করল মুমূর্ষার শেষ স্পন্দন। সে ফিসফিস করে তাকে অস্থির হতে বারণ করল। সাহসী ছেলেটি

তার গোঙানি চেপে রাখতে চেষ্টা করল, নিশ্বাস বন্ধ করে রইল। তখনো আনেৎ-এর হাত তার হাতে, এই হাত দুটোই বুঝি আঁধার গহ্বর থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আনেৎ-এর চোখ মেদুর হয়ে এল কোমলতায়। নিঃশেষিত হয়ে এসেছে সৈনিকের জীবনীশক্তি। আনেৎ-এর স্বর ঝরে পড়ল: 'বাছা আমার, আমার ছোট্ট খোকা, আমার সন্তান— আহা বেচারী, বেচারী আমার—'

আর একবার কুঁচকে গেল সারা দেহ, ওকে শেষবার ডাকবার জন্যই বুঝি ঠোঁট দুটো খুলে গেল। আনেৎ চুমু খেল তার ঠোঁটে। জীবনের শেষ স্পন্দন পর্যন্ত হাতের আঙুল ক'টা রইল তার মুঠোয়। তারপর সব শেষ।

আনেৎ চলে এল। রাত তিনটে। বরফ পড়ছে। কুয়াশা। নিষ্প্রভ আকাশ। জনহীন পথ। ঘরে এসে পৌঁছল সে। আগুন নেই ঘরে। ভোর না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে বসে রইল। ভয়ার্ত পৃথিবীর স্পর্শ সে পেয়েছে, মন ব্যথায় ভারি। তবু যেন কেমন হালকা লাগছে। মানুষের এই বিয়োগান্ত নাটকের ভিতরে সে তার স্থান খুঁজে পেয়েছে।

॥ পনেরো ॥

সব ভার নেমে গেল, আনেৎ কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল। সে এবার বুঝতে পারল, কি জগদ্দল ভার তার উপর চেপে বসেছিল, তাকে পিষে ফেলছিল।

এতদিন সে মিথ্যে কথাই বলে এসেছে। এমন কি নিজেকেও করেছে প্রতারণা। নিজের চোখের দৃষ্টিও এগিয়ে গেছে। যে ভীষণ চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছিল, তার মুখোমুখি দাঁড়াতে সে পারেনি, ভয়ই পেয়েছে। এই সর্বনাশা যুদ্ধ আর তার দেশের এই মৃত্যুর অভিযানকে সে স্বীকার করে নিয়েছে। আজ হঠাৎ দেখা দিল সেই পশুশক্তির বিরুদ্ধে নিজের আত্মার বিদ্রোহ। বঞ্চিত, রুদ্ধশ্বাস, প্রতারিত, অস্থির আত্মা প্রতিশোধ নিতে চাইল, চাইল মুক্তি। খসে পড়ল নাগপাশ, ছিঁড়ে খানখান হয়ে

গেল, মুক্তির নিশ্বাস পড়ল তার। সে আবার দাবি জানাল—ক্ষমতা, তার আইন, আনন্দ আর দুঃখ সবই তার চাই—আর চাই মাতৃত্ব।

হাঁ—মাতৃত্বের সবটুকুই চাই। শুধু তার ছেলেকে নিয়েই সে সন্তুষ্ট হতে চায় না। 'সবাই তো তোমরা আমার ছেলে। সুখী, আর অসুখী ছেলেরা আমার, পরস্পরকে আঘাত করছ, ক্ষত বিক্ষত করছ। আমি সবাইকে বুকে চেপে ধরেছি। ঘুম তো আমিই পাড়াব—প্রথম আর শেষ ঘুম। দুলে দুলে পাড়াব ঘুম। ঘুমোও, বাছারা ঘুমোও! আমি তো বিশ্বের মা…'

দিনের আলোয় আর-এক মার কাছে সে লিখল চিঠি। তার সন্তানের চোখ দুটি ধীরে ধীরে বুজে এল—সেই খবরই দিল। পাঠাল তার শেষ চুম্বন।

তারপর আনেৎ ক্লাসের বই আর খাতা নিয়ে বসল। আবার দৈনন্দিন কাজ। বিশ্রাম নেই। কিন্তু নতুন শক্তির উদ্দীপনা এসেছে, হৃদয় শান্ত হয়ে গেছে।

তৃতীয় খণ্ড

॥ এক ॥

আনেৎ-এর ব্যাপারটায় ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোলো। প্রতি বাড়িতে চলল আলোচনা। মাদাম দ্য মারেউই যদি বাইরে ব্যাপারটা সমর্থন না করতেন, তাহলে বিনা দ্বিধায় সবাই নিন্দেই করত। তাঁর সমর্থন থাকায় দু'একজন মেনেও নিল। অধিকাংশই উঠল শিউরে। কিন্তু সবাই অনুভব করল এক গোপন বিরক্তি। এমন কি একথা যদি মেনে নেওয়াও যায় যে, সে ঠিকই করেছে, তাহলেও একজন নিতান্ত অপরিচিত এসে সম্মানবোধের কথা এমনি করে তাদের শিখিয়ে যাবে—এ তারা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না।

তারা চুপ করেই রইল, ছোট শহরে জানাজানি হয়ে গেল : মাদাম দ্য মারেউই পরদিনই আনেৎ-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাকে বাড়িতে না পেয়ে, লিখে নিমন্ত্রণ করে এসেছেন। আনেৎ তাহলে এক দুর্ভেদ্য দুর্গেই আশ্রয় পেয়েছে! তারাও তাদের বিদ্বেষ আপাতত জীইয়ে রেখে দিল, পরে দেখা যাবে। কলেজের অধ্যক্ষ মাদাম রিভিয়েরকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাকে সতর্ক করে দিলেন : তার দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে কিছুই প্রশ্ন করবার নেই, কিন্তু সে যেন এমনি করে নিজের ভাবধারা প্রকাশ না করে, এতটা আতিশয্য না দেখায়। 'আপনার যা কর্তব্য, আপনি করে যান, তার বেশি যাবেন না।'

আনেৎ-এর উত্তর শুনে অধ্যক্ষ খুশিই হলেন : 'না, না, আপনাকে আমি ভর্ৎসনা করছিনে। পরামর্শ দিচ্ছি মাত্র।' কিন্তু আনেৎ বুঝতে পারল মনিবের পরামর্শ অভিযোগেরই প্রথম নির্দেশনামা।

জোয়াল ঘাড়ে তুলে নিয়ে খুপরীতে গিয়ে ঢোকা ছাড়া তার তো আর উপায় নেই। সে তাই-ই করল। আগামী কাল আসবে আগামী কর্তব্যের হদিস। আজকের কর্তব্য বাছাই করে নেওয়ার কষ্ট তাকে

পোয়াতে হবে না। সে হাসপাতালে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেল, দরজা বন্ধ। সেখানে এক বিজ্ঞাপন লটকে দেওয়া হয়েছে : স্থানীয় রেডক্রশ বা ফরাসী মহিলা সমিতির সভ্য ছাড়া প্রবেশ নিষেধ (অথচ এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নেকড়ে-কুকুর সম্বন্ধ)। পরে সে জানতে পারল, বিশেষ করে তারই জন্য এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

সেবার এই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলেও, খুলে গেল আর একটা দরজা। তার নতুন মাতৃত্ব পেল কাজের সন্ধান। কিন্তু তার এই নতুন জেগে-ওঠা বিবেক তাকে দুর্গম পথেই টেনে নিয়ে চলেছে—একথা বোঝবার মতো ভবিষ্যৎ দৃষ্টি কারো ছিল না।

মাদাম দ্য মারেউই-র সঙ্গে তার দেখা হোলো। এই বিধবা যুবতী তার শোকের গাম্ভীর্যটুকু বজায় রেখে আনেৎ-এর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তিনি কথায় কথায় বললেন, তাঁর এক আত্মীয় সাংঘাতিক-ভাবে আহত হয়ে পড়ে আছে। বাড়িতেই তার সেবা-সুশ্রূষা চলেছে। মাদাম রিভিয়েরকে দেখার তার খুব ইচ্ছে। আনেৎ রাজী হয়ে গেল।

॥ দুই ॥

জোরম্যাঁ শাভান মাদাম দ্য মারেউই-এর আত্মীয়। মাদাম সেঝি পরিবার থেকে এসেছেন। তারই এক ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর বোনের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যথেষ্টই আছে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিরও অভাব হয়নি। তারা বহুদিন ধরেই পাশাপাশি বসবাস করছেন। খোলাখুলি মতবিভেদ হলেও কখনো সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। শাভানদের প্রজা-তান্ত্রিক ভাবধারার রংটা এখন আবছা; এক সময়ে হয়তো সাবধানে লাল রঙের বার্নিস তাতে দেওয়া হয়েছিল, এখন বিবর্ণ হয়ে গেছে। এখন তাকে খানিকটা আবছা গোলাপী বলা যায়। না, ঠিক সাদা হয়ে যায়নি, তবে মানিয়ে গেছে বটে। এই সম্ভ্রান্ত বংশ দু'টির সমৃদ্ধি পরস্পরের জমিদারির সীমানায় মিল রাখবার জন্য বহু খাত বুজিয়েছে, ফলে তাদের দিগন্ত গেছে সংকীর্ণ হয়ে, (বিত্তবানের সঙ্গে বিত্তবানের ঘনিষ্ঠতা তো হবেই), তারা নিজেদের

জমি খাসে চাষ করিয়েছে—একপাল মুরগীর মতোই সমস্ত অঞ্চলটা লুট করে বিশটা খামারে এনে পুরেছে। তাদের মাটির টান, যদি ধর্মও না হয় তো ধর্মেরই শামিল। আমরা অবশ্য এখানে সেই ধর্মের কথাই বলছি, যে-ধর্ম পাশ্চাত্য শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা জাহির করেছে—সে রোমেরইধর্ম । এরই আর গুণগুলো এসে বর্তেছে এই দ্য মারেউই, দ্য তেসি, দ্য সেঝি আর এই অঞ্চলের খুদে জমিদারদের ভিতরে। তাদের পার্থক্য বলতে বিশেষ কিছু নেই। প্রতি বংশটাই এই ভেবে গর্বিত যে, তার প্রতিবেশীর চাইতে তার মর্যাদা ঢের বেশি। সব মানুষেরই এই দুর্বলতাটুকু আছে। কিন্তু সেঝি আর শাভানরা এত ভদ্র যে তা কোনোদিন বাইরে প্রকাশ করেনি। তারা জানে, এই গোপনতা বিশেষ করে প্রতি পরিবারের উপভোগের জন্য, তাকে বাইরে প্রকাশ করলে তার মাধুর্য নষ্ট হয়ে যাবে।

এই বনেদী সমাজে আনেৎ রিভিয়ের নিমন্ত্রণ পাবে, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। তবে কারণ ছিল। আনেৎ অবশ্য এসব সামাজিক মর্যাদার ধার ধারে না, কিন্তু এই মহল্লা ধারে বই কি। তবে খতিয়ে দেখতে গেলে পারিবারিক নিমন্ত্রণ একে বলা যায় না। কেন না শাভান আর দ্য সেঝি পরিবারের এমন দু'জন লোক তাকে নিমন্ত্রণ করলেন যাদের তখন দুই পরিবারের উপর অপ্রতিহত অধিকার। মাদাম দ্য মারেউই আর জোরমঁ্যা শাভান তখন দেশ আর তাঁদের পরিবারের ঋণ কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দিয়েছেন। নিজেদের সমাজে পেয়েছেন বিশিষ্ট স্থান। আনেৎ ক'দিন যেতে না যেতেই একথা বুঝতে পারল।

ক্যাথিড্রাল থেকে যে পথটা এঁকে-বেঁকে চলে গেছে, তারই উপরে তাঁদের পুরনো বনেদী বাড়িখানা। চারদিকে ধূসর দেয়াল আর নীরবতা দিয়ে ঘেরা। মাঝে মাঝে বিষণ্ণ ঘণ্টার শব্দ আর রুক পাখীর কর্কশ স্বর সে-নীরবতা খান খান করে দেয়। সামনেই ওক কাঠের লোহার কারুকার্য করা সরু দরজা, তারই ভিতর দিয়ে গেলে উঠোন। বাড়ি শুরু হয়েছে তারও পরে। ঘরগুলোর জানলা এই উঠোনটার দিকে মুখিয়ে আছে, একটা গাছের পাতা বা একগাছা ঘাস সেখানে মেলে না। চারপাশে ঘিরে আছে ধূসর দেয়াল। বাড়িখানা দেখলে মনে হয়, এই অঞ্চলের ধনিকরা তাদের জমিদারিতে বছরের প্রায় সবকটা মাস কাটিয়ে শহরে এসে নিজেদের দেয়ালঘেরা কুঠরীতে বন্দী হয়ে প্রকৃতির হাত এড়াতেই

চেয়েছেন। এমনিতে শাভানরা এখানে শীতের কটা মাসই থাকেন; কিন্তু যুদ্ধ, ছেলের অসুখ আর নানা পূর্ত ব্যাপারের তাগিদে এবার শহরে থাকাই স্থির করেছেন। যুদ্ধের অবস্থাটা খানিকটা ভালোর দিকে না গেলে আর শহর তাঁরা ছাড়বেন না।

বর্তমানে পরিবারের মেয়ে ছাড়া আর বেশি কেউ অবশিষ্ট নেই। বাবা মারা গেছেন। যারা একটু সবল—ছেলে আর জামাইরা চলে গেছে যুদ্ধে। সাত বছরের একটি ছেলেই এখন পরিবারের একমাত্র পুরুষ। মাদাম শাভান দ্য সেঝির ছেলে সে। জানলার সার্শিতে নাক লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। কখন ফটকের দরজা খুলে যাবে, আসবে অতিথি। ঘণ্টার শব্দ আর রুক পাখীর ডাকে ভরে ওঠে তার দিবাস্বপ্ন। নিশান, বিবাহের ভোজ আর কবরের স্বপ্নে সে বিভোর। আনেৎ বাড়িতে ঢুকতেই সেই তাকে মুখ বার করে জানালো প্রথম সম্ভাষণ। তারপর যাওয়া আসার পথে প্রায়ই তাদের দেখা হোলো। ছেলেটি একা, আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছে—উদগ্রীব, অলস তার দৃষ্টি।

দোতালার ঘরখানা ছায়াময়। উঁচু ছাদ, গুহার মতো গভীর। নভেম্বরের ঠাণ্ডায় জানলায় বসে আছে এক যুবক। সে মাদাম দ্য মারেউই আর আগন্তুককে দেখে আরাম কেদারা থেকে উঠে দাঁড়াল। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হোলো ঘরে যেন মৃত্যু তার জাল বুনছে, শুধু আহতের মাথাটা বুঝি এখনো সে ঘিরে ফেলতে পারেনি। যুবকটির মুখে মধ্য ফ্রান্সের বৈশিষ্ট্য, উজ্জ্বল, কোমল সে মুখ, ঋজু দেহ, উন্নত নাক, নীল চোখ আর সোনালী দাড়ি। সে আনেৎকে দেখে হাসল, তারপর মাদাম মারেউইকে জানাল ধন্যবাদ।

এবার শুরু হোলো ভদ্র আলাপ—স্বাস্থ্য আর আবহাওয়ার অস্পষ্ট মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। সবাই সাবধানী, কেউ সীমার বাইরে গেল না, কয়েক মুহূর্ত পরে মাদাম দ্য মারেউই অদৃশ্য হলেন।

জোরমঁ্যা শাভান এতক্ষণ চোখ দিয়ে আনেৎ-এর দেহ বিদ্ধ করছিল, এবার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল:

'লুই আপনার সাহসের কথা আমাকে বলেছে। যারা শত্রুকে হারাবার পরও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায় আপনি তাদের দলে নন। আপনার কোমল হৃদয়ে বিজিতের প্রতি সহানুভূতি আছে একথাও আমি শুনেছি।

তাই এই আশাটকু আমি করছি, সহানুভূতির ছিটে ফোঁটা এই বিজিতের ভাগ্যেও মিলবে।'

'আপনার কথা বলছেন?' আনেৎ জিজ্ঞেস করল।

'হাঁ, আমারই কথা। আহত আমি, হেরে গেছি। কিন্তু এখনো গর্ব তো যায়নি।'

'আপনি ঠিক সেরে উঠবেন।'

'না। ও ছলনা দিয়ে আমাকে ভুলোবার চেষ্টা করবেন না। তার জন্যে তো বহু লোকই আছে। আপনাকে আজ সেজন্য প্রয়োজন নয়। যে পরাজয়ের জন্য আজ আপনার আদর চাইছি, সে তো দেহের নয়, আত্মার। বিজেতার প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে সে পরাজয়ের কি মানে হয় আমি জানি না...'

'এমন বিজেতা কে?'

'কেন—যে অদৃষ্ট আমাদের আজ উৎসর্গ করেছে...না, না, হয়ত ঠিক বলা হোলো না। যে-অদৃষ্টের কাছে আমরা নিজেদের আজ উৎসর্গ করছি।'

'দেশের কথাই কি বলছেন?'

'হাঁ, দেশ তো তার অনেকগুলো অভিব্যক্তির মধ্যে একটা। আজ সেই মুখোশই সে পরেছে বটে।'

'আমিও তো হেরে গেছি, কিন্তু বিজেতার উপর তবু তো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করিনি। এখনো পালা সাঙ্গ হয়নি।'

'আপনি স্ত্রীলোক। জুয়াড়ী আপনি। একটা বাজি হেরে গেলেও, স্ত্রীলোকরা বিশ্বাস করে শেষে তারা জিতবেই।'

'কই, আমি তো করি না। হারি বা জিতি—যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে কিছু থাকবে, ঠিক খেলে যাব।'

জোরমঁ্যা আনেৎ-এর দিকে তাকিয়ে হাসল: 'আপনি এদিকের লোক নন।'

'ফ্রান্সের ছাড়া আবার কোন দেশের হব?'

'কোন প্রদেশ?'

'বার্গাণ্ডি।'

'তাই আপনার রক্তে আছে মাদকতা।'

'আর আপনার মদে আছে রক্তের নেশা।

'বেশ তো, আমি ওতেই চুমুক দিতে রাজি। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে

আলাপ করে কিছুটা সময় ব্যয় করবেন কি? ধরুন, যখন আপনি অস্থির হয়ে উঠবেন, অনেকখানি উৎসাহ আসবে মনে, অথচ তাকে ফুরিয়ে ফেলার উপায় খুঁজে পাবেন না—বলুন আসবেন তো?'

আনেৎ রাজি হোলো, ফিরে এল সে। তারা হোলো বন্ধু। শুধু যুদ্ধ এড়িয়ে তারা সব কিছু নিয়েই আলোচনা করল। যুদ্ধ সম্বন্ধে তার প্রথম প্রশ্ন আহত মানুষটি থামিয়ে দিল। পথ বন্ধ। ও বন্ধ। ও পথে যাওয়া চলবে না!

'না, না, ও নিয়ে আমরা কথা নাই বা বললাম। আপনি বুঝবেন না। শুধু আপনাকেই বলছি না, আপনারা যারা এখানে আছেন, আর যারা ওখানে আছে তাদের মধ্যে···দুই পৃথিবী—এই একদিক আর একদিক ওখানে···এমন কি ভাষাও তাদের আলাদা।'

'কিন্তু সে-ভাষা কি আমি শিখতে পারি না?' আনেৎ জিজ্ঞেস করল।

'না, আপনিও পারেন না—অতখানি সহানুভূতি নিয়েও না। ভালোবাসা অনভিজ্ঞতার জায়গা জুড়ে বসতে পারে না। রক্তমাংসের বইয়ে যে কথা লেখা হয়ে গেল, তাকে কি অনুবাদ করা যায়?'

'চেষ্টা করতে দোষ কি? আমার তো ইচ্ছে, বুঝতে চেষ্টা করব—না, কৌতূহল এ নয়, আমি ওদের সাহায্য করতে চাই। তোমাদের ঐ দুঃখের স্পর্শ আমি পেতে চাই।'

'ধন্যবাদ! কিন্তু আমাদের সাহায্য করতে হলে, আপনি সে-পৃথিবীর কথা আমাদের একেবারে ভুলিয়ে দিন না। এমন কি আমরা যারা 'ওখান থেকে' এসেছি, তাদের মধ্যেও ও পৃথিবীর কথা হয় না—আমরা বাদ দিতে চাই ওখানকার কথা। যুদ্ধের গল্প, বই, খবরের কাগজ শুধু আমাদের বিরক্তিই জাগায়। যুদ্ধ তো আর সাহিত্য নয়!'

'জীবনও তো নয়।'

'ঠিক, ঠিক। কিন্তু মানুষকে তবু গান গাইতে হয়। জীবনের নানা অর্থ করে। তারা গান গায়, জীবনের গান।'

সে থামল। দমকা কাসি তাকে থামিয়ে দিল। আনেৎ তার মাথাটা টেনে ধরে রইল। আবার নিশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে এসেছে। সে ক্ষমা চাইল, আনেৎকে জানাল ধন্যবাদ। শীর্ণ মুখে হাসি দেখা দিয়েছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তারা পরস্পরের মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল, স্নেহ ঝরে পড়লো দৃষ্টিতে।

জোরম্যাঁ শাভানের বয়েস ত্রিশের কিছু কম। বুর্জোয়া প্রাদেশিকতার পরিবেশে সে বেড়ে উঠেছে—ন্যায়নিষ্ঠা, উদারতা সেখানে আছে, আছে সংস্কার আর মাটির প্রতি টান। এইগুলি নিয়েই গড়ে উঠেছে এই মধ্য প্রদেশগুলির সুস্থ প্রাকার (যদি তাদের এই সংস্কার না থাকত, তাদের এই সরল সহজ জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতাই বড় হয়ে দেখা দিত।) জোরম্যাঁ এ সম্বন্ধে ভালো করেই জানে। তার দেহের তালটা এখানকার জল আর ময়দা দিয়েই তৈরি, কিন্তু অজানা রুটি-গড়িয়ে ময়দার তালটায় যে তাড়ির মিশেল দিয়েছে, তা এ নিশ্চয়ই নয়।

এই ধনী বুর্জোয়া তরুণের ভবিষ্যৎ তার জন্মের তারিখ থেকেই স্থির হয়ে গিয়েছিল। সে স্বচ্ছন্দ জীবন কাটাল তার জমিদারিতে। তারপর পারীতে পড়তে গেল প্রাচ্যতত্ত্ব ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের স্কুলে। কনসালের পদটা তাকে ততটা আকর্ষণ করেনি, যতটা করেছিল বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ। কিন্তু তবুও দেশের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল বইকি! সে দেশের আকাশ, বাতাস, তার ভাষা, তার অধিবাসীদের ভালোবাসত; তবে তার ভালোবাসা বিলাসীর ভালোবাসা। তার একমাত্র চিন্তাই ছিল দেশের এই কোটর থেকে মুক্তি! চাকরীর প্রতীক্ষায় সে বসে রইল না, ঘুরে এল সারা ইওরোপ। তার ঘরকুণো শহরবাসীদের কাছে ব্যাপারটা একটু কেমন বেখাপ্পাই ঠেকল। কিন্তু কারো রুচি নিয়ে আলোচনা করা বৃথা (বিশেষ করে সে যদি ধনীর রুচি হয়)। এবার এল যুদ্ধ, আর তার ভ্রমণের বিরতি। এখন তো সে রোগশয্যায়। বিষাক্ত গ্যাস তার দেহে সংক্রামিত হয়েছে, তার সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রীগুলি পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এখন বাড়িতে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর উপায় নেই। (না, সে উপায়ও বুঝি নেই! ক'দিন তো সে শুয়েই ছিল।) তার অন্তর্লোকে ভ্রমণ—সে তো সুদূরের ব্যাপার নয়, রহস্যও নেই। এক অজানা দেশ। তার চেতনায় আবিষ্কৃত হয়েছে সে দেশ। আর রহস্যও নেই। কিন্তু কোত্থেকে সে এই নেশা পেল?

সে আনেৎকে বিদ্রূপের সুরেই বুঝিয়ে দিল—তার চিন্তা রইল তারই আড়ালে। 'এইখানেই আমি জন্মেছি। শিকার ভালোবাসি আমি, কিন্তু সে তো শিকারের জন্যই নয়। এই মাটি আর এই জীয়ন্ত জন্তু, ছোট ছোট ঝোপ ঝাড়গুলি আমি ভালোবাসি। ওদের সঙ্গে আমার এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। 'কিন্তু ওদের ভালোবাসি বলে মারতে তো বাধা নেই। আর মারছি বলে

তো ভালোবাসারও কমতি নেই। একটা আহত পাখীকে যখন হাতে চেপে ধরি, তার উষ্ণতা অনুভব করি, একটা খরগোসের পেট চেপে ধরে আমি আনন্দ পাই। মনে হয় ওরা যেন আমার পরম আত্মীয়—আমিও বুঝি আমার এত আত্মীয় নই—কোনো মানুষই বুঝি নয়। কিন্তু দুঃখ তো হয় না। গুলি ছুঁড়তে আনন্দই হয়। আজ ওরা যদি আমার জায়গায় এসে বসত, আর আমি যদি শিকার হতাম, ওরা বাগে পেলে আমাকে ছাড়ত না। কিন্তু ওদের আমি বুঝতে চেষ্টা করি, নিজেকে বুঝতে চেষ্টা করি। তারপর খেয়ে ফেলি। গন্ধ শুঁকি। হাঁ, ভালো করে গন্ধ শুঁকতে হবে বইকি! বাঁধাকপি দিয়ে রাঁধা পাখীর মাংস সে তো দেবতার খাদ্য। তাকে কি আপনি ছুঁড়ে ফেলতে পারেন? কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি দেবতারা বড় অদ্ভুত জীব।'

'হাঁ, ওরা ভয়ংকর জীব!'

'কিন্তু বিচার করতে আমরা না-ই গেলাম। হয় খাব, নাহয় তো হব খাদ্য। (এখন তো আমার পালা) আমরা বুঝতে চেষ্টা করব। দেবতারা? ওরা তো বহুদূরে। আমার নাগালে যাদের পাচ্ছি—তারা মানুষ আর পশু। আমার প্রথম আবিষ্কার কি জানেন? মানুষ আর পশু লাখো লাখো বছর ধরে পাশাপাশি বাস করেছে, অথচ তারা পরস্পরকে বোঝবার কোনো চেষ্টাই করেনি। তাদের চামড়া আর মাংস—তারই হদিস পেয়েছে মানুষ। কিন্তু তারা কি ভাবে, তারা অনুভব করে, তাদের স্বরূপ কি—মানুষ তা-নিয়ে একবার ভেবেও দেখেনি। তাদের কৌতূহল হয়নি, ও নিয়ে মাথাও ঘামায়নি। তাদের নিজেদের চিন্তাধারাকে তারা সম্মান এই তো যথেষ্ট। জন্তরা চিন্তা করতে পারে এ সম্বন্ধে তারা ভাবেনি। কিন্তু যখন আমার চোখ খুলে গেল, কি দেখলাম জানেন? মানুষ নিজেদেরও চেনে না। একই সঙ্গে কি আলাদা থাকুক তারা নিজেদের চিনতে চায় না। প্রত্যেকেই তারা নিজেকে নিয়ে বিভোর, অন্যের জন্য ভাবনা তাদের নেই। ধরুন আপনি আমার প্রতিবেশী—আপনার সঙ্গে আমার মনের ছন্দ মিলেছে, বেশ ভালো কথা। আপনি হলেন আমার বন্ধু! যার সঙ্গে মিল হোলো না সে আমার অপরিচিত বই তো নয়। যদি সংঘাত আসে, তাহলে সে তো শত্রু হয়েই দাঁড়াল। বন্ধুর সঙ্গে আদান প্রদান করলাম ভাবধারা; অপরিচিতের প্রতি রইল আমার সামাজিক সম্পর্ক—তৃতীয়—

শত্রু—তাকে আমি কোনো অধিকারই দেব না। জানোয়ারদের যেমন চিন্তার অধিকারটুকু দিতেও রাজি নই, শত্রুর পক্ষেও সেই একই কথা। (এই হুনরা কি মানুষ?) তারা বন্ধু হোক, আর অপরিচিতই হোক, তাদের আমি চিনতে চাই না। আমি তো স্বয়ং সম্পূর্ণ। নিজে দেখছি, শুনছি, নিজের সঙ্গে চলছে আমার আলাপ। আমি সেই মণ্ডূক—হাঁ, আমিই সেই।...আমার নিজের উদ্দামতা, আর বিশ্বাস যখন আমাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে, তখন মণ্ডূক আমি নই—এক বিরাট বলীবর্দে রূপান্তরিত হয়ে যাই। আমি তখন নিজেকে জাতি বলে জাহির করি, জাহির করি দেশ, যুক্তি আর ভগবান বলে। এ কিন্তু ভয়ানক অবস্থা! তার চাইতে কূপে ফিরে যাও মণ্ডূক! হায় সেখানে কি আর আমার সেই দুর্ভেদ্য বর্ম পরে আমি শান্তিতে ডাকতে পারব! যেদিন থেকে এই কৌতূহলের (সহানুভূতির) দানা আমাকে ভর করেছে, আমি যে সব কিছু জানতে চেয়েছি। না, বুঝতে চেয়েছি—একথা আমি বলব না (কে গর্ব করতে পারে যে বুঝেছে?) কিন্তু আমি স্পর্শ করতে চেষ্টা করেছি, আমার আঙুল তাদের জীবন্ত আত্মাকে ছুঁয়েছে—আহত পাখীর উত্তপ্ত শরীরের মতোই ছুঁয়েছে। আমি তাদের স্পর্শ করেছি, গ্রহণ করেছি। ভালোবেসেছি, আবার হত্যাও করেছি।'

'হত্যা করেছ!' আনেৎ শিউরে উঠল।

'হাঁ, উপায় ছিল না। রাগ কোরো না! কিন্তু প্রতিশোধ তারা নিয়েছে বইকি।' এমনিধারা সে বলে গেল। তার চিন্তাধারার বিয়োগান্ত সুর সে ঢেকে রাখল গলদেশীয় বিদ্রূপের আমেজ দিয়ে। নিরাশা, করুণার সীমারেখার বাইরে তখন তার নিরাশা। সে এক বিষণ্ণ ছায়াময় রাজ্য, কিন্তু পৃথিবীর উপর হাসছে রোদ, জীবনের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে। তার সেই কল্পনার বিশ্ব আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। সে দেখতে পেয়েছে সৃষ্টির আদিমতম ভুল, কিন্তু সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তার জানা নেই। আনেৎ-এর সহজাত প্রবৃত্তি বিদ্রোহ করে উঠল, সে ভালো মন্দ দুইয়েই বিশ্বাস করে, তাদের সে মন থেকে জীবনের তারা-ভরা বিস্তারের মাঝে ছুঁড়ে দিয়েছে। এই বিরাট সংঘর্ষে তার নিজেরও আছে স্থান। হয়তো জিতবে বলে তার বিশ্বাস নেই। আর জেতাই তার লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্য যুদ্ধ। যাকে সে মন্দ বলে জানে, সে মন্দই; আর মন্দই তো শত্রু। শত্রুর সঙ্গে আপোস তার রীতি নয়।

যা কিছু মন্দ অন্যদিকে সরিয়ে দিয়ে ভালোর পথ নিয়ে যখন লড়াই শুরু হয়, সে-লড়াই তো সোজা। জোরম্যাঁর নীল চোখে এই উদ্দীপনাময়ী নারীর প্রতি সোহাগ ঝরে পড়ল বটে, কিন্তু সে তো তারই মতো ভাবতে পারল না। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আর এক যুদ্ধক্ষেত্র। কৃষ্ণ কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। কিন্তু এর পরিণতি ধ্বংস না মৃত্যু সে বুঝতে পারল না। সে বুঝতে পারল তারা দু'জনেই দু'জনের কাছে দুর্জ্ঞেয় রয়ে গেল—পৃথিবীর সবকিছুই বুঝি এমনি দুর্জ্ঞেয়। না, এতে সে ভূমিকা গ্রহণ করতেও রাজি নয়। সে নিজের চিন্তাধারাকে সমর্থন করে বটে কিন্তু পরের চিন্তাধারাকে না বলে উড়িয়ে দেওয়ার সাধ্য তার নেই। সে বোঝে বলেই বুঝি তার উপায় নেই। আর বুঝতেই চায়, বদলে দিতে তো চায় না।

এমন সে ছিল না। জীবন সে শুরু করেছিল ছিনিয়ে নেবার লিপ্সা নিয়েই, অপরকে বোঝার ইচ্ছা তার ছিল না। কিন্তু এল মোহবিচ্যুতি, চোখ খুলে গেল। আনেৎকে শোনালো সেকথা। (একটুও অপ্রতিভ হোলো না। সে যেন তার সখী, জীবনকে সে বুঝেছে, একই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জীবন কাটিয়েছে)।

একটি মেয়েকে সে ভালোবেসেছিল। ভয়ংকর সে-ভালোবাসা, উৎপীড়নেরই নামান্তর। সে তাকে নিজের মতো করে ভালোবাসতে চেয়েছিল, মেয়েটির হৃদয়ের দিকটায় সে নজর দেয়নি। নিজের যা ভালো লাগে, মেয়েটিরও তাই ভালো লাগবে এই ছিল তার অভিমত। পরস্পরকে যখন ভালোবেসেছে তারা কি এক নয়? মেয়েটিও প্রেমে পড়ল, বইকি, কিন্তু কদিন পরেই এল ক্লান্তি। একদিন বাড়ি ফিরে সে দেখল, খাঁচা শূন্য। পাখী পালিয়েছে। কয়েক ছত্রে বিদায়ের কারণ লেখা রয়েছে। তিক্ত অভিজ্ঞতা; কিন্তু অন্তরে গিয়ে পৌঁছল। সে বুঝতে পারল, কেউ নিজের সত্তা বিসর্জন দিয়ে ভালোবাসা চায় না।

'তখন মনে হয়েছিল, কি উদ্ধত সে! তাই না? কিন্তু মেনে নিতে হোলো। তারপর থেকেই চেষ্টা করছি...'

সে ঠাট্টার আমেজ মিশিয়েই বলে গেল।

'যাদের ভালোবাসি তাদের কাছ থেকে,' আনেৎ বলল: 'যা কিছু পেলাম, নাহয় মেনে নিলাম, কেননা দাম দিচ্ছি তো একা আমি। কিন্তু যখন যাদের ভালোবেসেছি, তারাই মূল্য দিচ্ছে, তখন কি সে মূল্য গ্রহণ করব?'

'আপনি কি যুদ্ধের কথা বলছেন ?'

'যুদ্ধ আর শান্তি, ও-নিয়ে কে মাথা ঘামায়। এতো এক বন, এখানে দুর্বলকে গ্রাস করছে সবল, আবার তাদের চাইতেও সবলেরা গ্রাস করছে তাদের।'

'আপনি বোধ হয় মনে করেন সবাই দুর্বল! সবাইকে গ্রাস করে ফেলবে।'

'যাদের গ্রাস করছে আমি তাদের দলের।'

'হাঃ হাঃ হাঃ! আপনি যে জ্যান্ত তারই প্রমাণ দিলেন। কি সুন্দর আপনার দাঁতগুলি!'

'আমার যদি শুধু দু'খানি ঠোঁঠ থাকত তাহলে জ্যান্ত জীবগুলিকে ধরে ধরে শুধু খেতাম। কিন্তু এক অজানা, অচেনা আমার মুখে দিয়েছে এই ধারাল ছুরির সার। তাই আমার সন্তানদের রক্ষা করবার জন্যই আজ তাকে কাজে লাগাচ্ছি।'

'আপনি তো মূর্তিমতী যুদ্ধ।'

'না, না, আমি শুধু আমার সন্তানদের যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাব।'

'সবাই আপনারই মতো। সবাই না হোক, দশজনের মধ্যে ন' জন তো বটেই! কিন্তু ন' জনকে বাদ দিলে, দশম কি করতে পারে ?'

'শান্তির জন্যই যুদ্ধ, ও-কথা আমি বলিনি। তুমি এইসব প্রলাপে নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর না ?'

'না, না, বিশ্বাস করি না। কিন্তু আর সবাই তো করে। আর আমি সে-বিশ্বাস কে সম্মান করি।'

'তাদের বিশ্বাস কর ? তাদের যা কিছু মন্দ—গর্ব, লুণ্ঠন, উচ্ছৃঙ্খলতা—সব কিছু তারা ঐ মুখোশের আড়ালেই তো ঢেকে রাখে।'

'ওর সঙ্গে আর বেশি কিছু জুড়ে দেবেন না যেন।'

'হাঁ, আরো আছে।'

'এগুলি সম্বন্ধে আপনি কি জানেন ?'

'জানি বই কি! এ সব চলতি মাল আমি চিনি। আমারও তো এসব আছে। আমার বুকে তাদের গোপন করে রেখেছি।'

জোরম্যাঁ থামল। শয্যার পাশের এই নারীকে সে দেখল রূপদক্ষের চোখে, তার দৃষ্টি দিয়ে ঢেকে দিল তাকে। শান্তির কথা বলছে এই নারী, কিন্তু নিশ্বাসে তার আগুন। জোরম্যাঁ এবার বলল (সে যা ভাবল ঠিক সেই কথাই সে বলল না):

'আপনার ভিতরে সব কিছু ভালো লাগছে। কিন্তু মাদাম জুডিথ যখন এই হতভাগাকে এতটা দয়াই করেছেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, হঠাৎ থেমে পড়ছেন কেন? আপনার সবকিছু তাদের উপহার দিন, বিলিয়ে দিন।'

'কি বলছ তুমি?'

'বলছি আপনার ভালোবাসা আর সহানুভূতির কথা। আপনি এই লোকগুলোকে, তাদের গোটা দলশুদ্ধ মিথ্যেবাদী বলে বাতিল করছেন। পাপী বলে দেগে দিচ্ছেন। কিন্তু সেতো কতো সোজা! যদি তাই হোতো জীবন তো সরল হয়ে যেত! ওরা অত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারত না। একবার ভালো করে ওদের দিকে তাকিয়ে দেখুন না!'

'আমি ওদের দেখতে চাই না।'

'কারণ?'

'কারণ আবার কি? আমি এমনিই চাই না।'

'আপনি ওদের দেখেছেন কি?'

'হাঁ, দেখেছি।'

'কিন্তু সত্যিকারের চোখে দেখেননি। আমি আপনাকে জানি। ও-ভাবে দেখলে আপনার এই কাজে বাধা পেতেন। কিন্তু কাজ করুন আর নাই করুন, প্রথমে তাকিয়ে দেখুন। আমি আপনাকে, আমার চশমা ধার দিচ্ছি। দেখুন! পরে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পরবেন।'

॥ চার ॥

দেখতে তার ইচ্ছে ছিল না, তবু তাকে দেখতে হোলো। জোরম্যাঁ মানবতার কথায় মুখর হয়ে উঠল না। না, সে-রীতি তার নয়। তার চোখে সাধারণ মানুষের কানাকড়িও দাম নেই। যা চলে গেল, তারই প্রতি তার কৌতূহল। মানুষ কি মুহূর্ত যাই হোক না কেন, তার চোখে, যা এখনও অতীত হয়নি, মরে যায়নি তারা তো জীবন্ত নয়। তারা মৃত।

সে তাকে বলল এই ছোট্ট শহরের কথা, এর পরিবেশকে সে তুলল, ধরল তার চোখের সামনে। ছেলেবেলা থেকে সে তার দপ্তরে খড়ি দিয়ে আঁকা

রেখাচিত্র সংগ্রহ করে এসেছে। পুরনো ফরাসী রীতি অনুসারে ওদের ঐ নাম,—দায়-সারা গোছের প্রতিকৃতি, কিন্তু চিত্রশিল্পী তারই ভিতরে চামড়ার নিচের আত্মাকে আবিষ্কার করেছে। তারা এই শহরেরই মানুষ, এই পরিবেশেরই মানুষ···হাঁ, সে তাদের ভিতর আর বাহির চেনে, মাথা থেকে পা অবধি চেনে। শুধু বাছাই করে সংগ্রহ করাই ছিল তার কাজ। সে তার নিজের সংগ্রহ থেকে কয়েকখানা প্রতিকৃতি বার করে আনেৎকে দেখাল। আনেৎ-এর মনে হোলো সে এদের চিনতে পেরেছে—এদের সংকীর্ণতা আত্ম-কেন্দ্রিকতায় তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। এরা সেই নর ও নারীর দল, যারা বন্দীদের আসার দিনে নেকড়ের মতোই ব্যবহার করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে ভালো খানিকটা আছে, গার্হস্থ্য জীবনের কতগুলো গুণও তারা পেয়েছে। স্বচ্ছ খামের ভিতরে পোরা এই নিস্তরঙ্গ জীবনে ভক্তি বা শ্রদ্ধার ক্ষমতা হারিয়ে যায়নি। এই হাড়ের বস্তাগুলো বহন করছে ক্রুশ অথচ তাদের জন্য কোনো ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ মরেননি। আনেৎ একথা ভালো করেই জানত। কিন্তু তারও তো ক্রুশ বইতে হচ্ছে, তাই তাদের মতো সেও মনে করল তার ক্রুশখানাই একমাত্র সত্যের প্রতীক।

একদিকে সে দেখল ঘাতকদের, অন্যদিকে তাদের বধ্য জন্তুর দল। জোরম্যাঁ তাকে দেখিয়ে দিল, যে-কেউ একই সময়ে ঘাতক আর বধ্যজন্তু দুইই হতে পারে। এই অবিশ্বাসী ফরাসী যুবক তার চোখের সামনে তুলে ধরল অদ্ভুত এক গলগোথার দৃশ্য। ক্রুশবাহীর দল ঢিল আর অপমান ছুঁড়ে মারছে ক্রুশবিদ্ধ মানুষটির দিকে।

'কী ভয়ংকর!' আনেৎ বলল: 'আচ্ছা, ওদের চোখ থেকে কেউ ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলতে পারে না। পরস্পরকে ঢিল না ছুঁড়ে ওদের এখন এক সঙ্গে জড়ো হওয়াই তো উচিত···'

'কার বিরুদ্ধে জড়ো হবে?'

'সেই মহান ঘাতকের বিরুদ্ধে।'

'তার নাম?'

'প্রকৃতি।'

'আমি তো তাকে চিনি না।'

জোরম্যাঁ তার কাঁধ একটু তুলল। সে বলে গেল: 'প্রকৃতি? দেবতার সঙ্গে তবু ব্যবহার করা সোজা। দেবতার বিচার-বুদ্ধি আছে (অন্তত

আমরা তো তাই ভেবেই খুশি!))। কিন্তু প্রকৃতি—তার স্বরূপ কি? কে তাকে দেখেছে? কোথায় তার মাথা, কোথায় তার হৃদয়। আর চোখ?'

'এইতো। এইতো আমার চোখ, দেহ আর হৃদয়। এইতো আমি, এইতো আমার প্রতিবেশী।'

'তোমার প্রতিবেশী? একটু রোসো, একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখ··· না, না, যেও না! একটু অপেক্ষা কর!'

এমন সময় একজন অপরিচিত এল ঘরে। বেশ লম্বা চওড়া একটি ছেলে। মুখখানা তার গির্জার খিলানে-আঁকা দেবদূতদের মতোই দেখতে। সৈনিকের নীল জোব্বা তার পরনে। সে জোরম্যাঁরই এক সাথী, কাছেরই এক শহরের ধনী জমিদারের ছেলে। ছুটিতে এসেছে। বারো মাইল হেঁটে সে দেখতে এসেছে জ্যোরমাঁকে। ঘরে ঢুকেই রোগীকে সে জড়িয়ে ধরল। আনেৎকে শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করতেও ভুলল না। তারপর শুরু হোলো কথা। সুষ্ঠু রসিকতা আর স্বাস্থ্যের দীপ্তি যেন উছলে পড়ছে। সে এদের আর ওদের কথা বলল, বিদঘুটে নামগুলি প্রহসনের ভৃত্যদের কথাই মনে পড়িয়ে দিল। তাদের 'ওখানকার' কমরেডরা কেউ মরে গেছে, কেউ বা বেঁচে আছে। এই প্রদেশের অনুনাসিক উচ্চারণ গল্পকে যেন আরো জীবন্ত আর হাস্যোদ্দীপক করে তুলল। আনেৎ-এর জন্যই সে তার প্রকাশ-ভঙ্গীকে করল মোলায়েম (মহিলাদের শ্রদ্ধা করতে হবে বইকি!)

সে নিজেকে সংযত করল। যখন আনেৎকে সম্ভাষণ করল, তার স্বরে সেই পুরনো দিনের সম্ভ্রম আর কোমলতা দেখা দিল। কিন্তু নিজের পরিবারের কথায় এসেই সে বদলে গেল। রইল না কোনো বাধা। সে সহজ সরল ভাবেই বলল তার মা আর ছোটবোনের কথা—তাদের সে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। সে যেন মস্ত বড় এক শিশু, স্নেহপ্রবণ, চারুশীল, আর সরল।

সে চলে যেতে জ্যোরম্যাঁ আনেৎকে জিজ্ঞেস করল: 'ওকে কেমন লাগল তোমার? একেবারে মাখনের তাল, তাই না? ওকে ইচ্ছে করলে তোমার রুটিতে মাখিয়ে নিতে পার।'

'ওর ভিতরে কোনো ছল-চাতুরী নেই।' আনেৎ উত্তর দিল: 'একেবারে খাঁটি দুধ, সরও আছে। ওর গায়ে যেন কচি ঘাসের গন্ধ।'

'আমার এই প্রিয় বন্ধুটি কখনো মিথ্যে কথা বলতে শেখেনি। একেবারে

খাঁটি সোনা। ওকে যদি তুমি আমার মতো ট্রেঞ্চে সেই আক্রমণের দিনে দেখতে পেতে! উঃ কসাইয়ের ছুরি দিয়ে সেদিন কি কাণ্ডটাই ও করেছিল!'

আনেৎ-এর মুখে ঘৃণার ব্যঞ্জনা।

'না, না, ভয় পেয়ো না। সে-দৃশ্য না দেখাই তো মঙ্গল। আমিও সেকথা শোনাতে চাই না। এই সার্শি বন্ধ করে দিলাম। এখন নিরাপদ আমরা। বাইরে রাত, এই ঘরে শুধু আমরা দু'জন।'

আনেৎ-এর ঘৃণা তখনো যায়নি, সে বলল: 'ও হাসছে কি করে? এখনো ও শান্ত আছে কি করে?'

'এখন ও সেদিনের স্মৃতি ভুলে গেছে।'

'না, না, সে অসম্ভব।'

'আমি এমনি আরো বহু লোককে দেখেছি, দিনের বেলা তারা অমানুষিক কাজ করছে আর রাতে তারাই ঘুমোচ্ছে শিশুর মতো। অনুতাপের চিহ্নমাত্র নেই; যাকে তারা ছুরি মেরেছে এমন শত্রুকে তখন তারা আলিঙ্গন করতেও প্রস্তুত। আবার এই সহৃদয়তা ভুলে যেতেও দেরি হয় না। তাই তো মনে হয়, সব কিছুর ভিতরে সামঞ্জস্য রাখা ভার। অন্তত সে সময় তো তাদের নেই। তারা শক্তিকে জীইয়ে রাখছে বর্তমানের জন্য, তারা যেমন করে হোক বাঁচতে চাইছে। সম্পূর্ণতা তাদের নেই, টুকরো টুকরো অসংলগ্ন জীবন—এক অদ্ভুত হেঁয়ালী যেন।'

'আহা বেচারীরা!'

'না, না ওদের করুণা কোরো না! এই জীবন নিয়েই ওরা খুশি।'

'আমি তো ওদের করুণা করছি না, নিজেকেই করুণা করছি।'

'আবার সেই আত্মম্ভরিতা! তোমার আত্মম্ভরিতা তোমারই জন্য তোলা থাকুক, আনেৎ দেবী।'

'কিন্তু এই ওদের সত্যিকারের স্বরূপ—এ আমার বিশ্বাস হয় না...'

'স্বরূপটা কি শুনবে? সে এক সংশোধিত সংস্করণ, সমাজ তাকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাইতো আমাদের মনে হয়, যুদ্ধ হচ্ছে সহজাত প্রবৃত্তির এক স্বাভাবিক প্রকাশ, প্রথা তাকে শুদ্ধি করছে। হবেও বা। হয়তো মানুষের ধ্বংসাত্মক শক্তির এ এক নিষ্ক্রমণেরই পথ। নিষ্ক্রমণ শেষ হলেই সে শান্ত হবে।'

'তুমি কি শান্ত হয়েছ?'

'আমার কথা বোলো না আমি তো এখন ওসবের বাইরে।'

'না! তোমার কাছ থেকেই আমি শুনতে চাই।'

'একটু সবুর কর এখনো সময় হয়নি। জোরমঁ্যা শাভানের পালা আসছে এবার। তাকে জানতে হলে তার চোখ দিয়েই তোমাকে দেখতে হবে।'

'আমি তার ভেতরটাই দেখতে চাই।'

'ধৈর্য! আমার ধৈর্য খুবই আছে! যে জালে ধরা পড়ে গেছে তার কতখানি ধৈর্য আছে কল্পনা কর! আমরা ধরা পড়েছি বটে কিন্তু প্রতারিত হইনি।'

'তাই যদি হয়, যুদ্ধে যোগ দিলে কেন?' প্রশ্ন করলো আনেৎ।

'হাঁ, তার উত্তরও তুমি পাবে। নিজের বাছাইয়ের পথ তখন বন্ধ। যদি বাছাইয়ের পথ খোলাও থাকত, তাহলেও এই-ই হোতো। আমাকে ঐটেই পছন্দ করে নিতে হোতো। আমি নিজেকে মিথ্যা কথা দিয়ে ভোলাতে চাই না—এখনকার মতো তখন তো ভাবিনি। আমার রোমকূপ দিয়ে আত্মার পর আত্মা সেদিন ঢুকে আমার নিজের সত্তাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। আমরা ফরাসী জাতি, এক সঙ্গে আছি, পরস্পরের সম্বন্ধে আছে আমাদের কৌতূহল, আমরা জোরে চিন্তা করলে সবাই শুনতে পাই। আর চিন্তা আমরা দু'জনে, বিশজনে, হাজার জনেই করি···তাই তো প্রতিধ্বনিরই আমরা শব্দধর যন্ত্র। প্রথম দিনগুলির সে অপূর্ব উৎসাহ আমাদের কেমন করে জাগিয়ে তুলেছিল, সেকথা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। সেই বিদায়ের গান, সে তো আমাদের কণ্ঠ থেকে বার হয়নি, আমরাই উদ্ভূত হয়েছিলাম সেই গান থেকে। সেই গান দেবদূতের মত উড়ে গেল আকাশে, না, না, সে তখন দেবদূতের চাইতেও শতগুণে বুঝি সুন্দর! সে আমাদের ঘিরে ফেলল তার পাখায়। আমরা হেঁটে যাইনি, আমাদের সে নিয়ে গেল, আমরা উড়ে চললাম সুমুখে; পৃথিবীর মুক্তি আমাদের চাই। এ যেন আলিঙ্গনের আগেই প্রেমের বিহ্বলতা। কি সে আলিঙ্গন! কি সে ভয়ংকর আত্ম-বিক্রয়! সব কিছু বিক্রি হচ্ছে, এমন কি ভালোবাসাও; যারা আসছে, তাদের কাছেই আমাদের সে উৎসর্গ করছে, ভবিষ্যতের কাছেই উৎসর্গ করছে। কিন্তু যুদ্ধে বিশ্বাসের এই উন্মত্ততা—এর উদ্দেশ্য কি? কার কাছে সে আমাদের উৎসর্গ করছে? যখন আমরা শান্ত হয়ে একথা ভাবতে শুরু করলাম, তখন তো উৎসর্গ হয়ে গেছে। দেহটাই তখন ঢেঁকিতে পিষে গেল, আত্মা ছাড়া আর কিছু রইল না, সে-আত্মাও টুকরো-টুকরো। আর

দেহই যখন নেই, আত্মা নিয়ে তুমি তখন কি করতে পার? আত্মাহীন দেহ, আত্মার বিরোধী দেহ। নিজে শহীদ হবে? হাঁ, ঘাতক তো আরো ছিল। তখন দেখা, জানা আর স্বীকার করা ছাড়া তো উপায় নেই। লাফ তুমি দিয়েছ, বোকা বনেছ! এক, দুই···ঝাঁপিয়ে পড়! হাঁ, শেষে এসে পৌঁছতেই হবে। জীবন কখনো ফিরতি টিকিট দেয় না। একবার গেলে আর ফেরা যায় না। আর ফিরতে পারলেও আমি একা ফিরতাম না। আমরা দু'জনে একাত্মা, আমরা এক সঙ্গেই মরব। আমি জানি এ শুধু-শুধু মৃত্যু। কিন্তু একা রক্ষা পেয়ে কি হবে? না, তা তো হয় না। আমি তো পালের জন্তু, আমি তো গোটা পালের প্রতীক!'

'হাঁ, তুমি পালের প্রতীক আবার নেতাও, পাল তোমার পিছনে পিছনে চলেছে।'

'হাঁ, ভেড়ার পাল!'

'লাফাতে চায় না, এমন কেউ কি তোমাদের ভিতরে নেই?'

'না, আমাদের মাঠে তেমন জন্তু একটিও নেই।'

'কে বলতে পারে যে খুঁজলে মিলবে না?'

'তোমার মতো মানুষের কাছ থেকে তাকে কি আমরা পাব? তোমারই কোনো ছেলে?'

'আমার ছেলে! হা ঈশ্বর! তার কথা আমাকে মনে করিয়ে দিও না!'

'এই তো দেখ! তুমি তাকে লাফিয়ে পড়বার হদিসটুকু দিতেও সাহস করছ না!'

'না-না, যুদ্ধ থেকে ও বাঁচুক—বাঁচুক!'

'স্বস্তি, স্বস্তি! কিন্তু আমরা তো আর প্রার্থনায় যোগ দিইনি। আমাদের শুধু তারই প্রতিধ্বনি করতে বলা হয়েছে। রক্তাক্ত অনুষ্ঠান শেশ হয়ে গেছে, আমরা এখন তো বলি।'

'না, না, আমি বলি হতে পারি, ও কিন্তু নয়!'

'ফ্রান্স, জার্মানী, এই চিরন্তন মানবসমাজের মায়েদের কাছ থেকে তোমাকে শিখতে হবে। তারা একজনের পায়ের কাছে নিজেকে লুটিয়ে দেয়, আত্মবিক্রয় করে। সে বিষাদ।'

'কখ্খনো না! আমার ছেলে আমারই। আমি তাকে কাছেই রাখব।'

'সবাই যদি বিরুদ্ধে যায়, তবুও?'

'হাঁ, তবুও।'

'সে নিজেই যদি বিরুদ্ধে যায়?'

আনেৎ মাথা নিচু করল; তার নিশ্বাস ফুরিয়ে গেছে। তার কোমল জায়গাটায় সে আঘাত করেছে। তার ভয়, ভাবনা, সন্দেহকে সে নিজে কখনো আমল দিতে চায়নি, কারো কাছে কখনো কিছু বলেনি। তার ছেলের কথাও কাউকে জানায়নি; জোরম্যাঁ শুধু জানে তার একটি ছেলে আছে। কিন্তু এবার তার নীরবতাই সব কিছু বলে দিল। জোরম্যাঁ শুনেও শুনছে না— এমনি ভান করল।

'আমি তো আমার খুদে ভাইদের চিনি। ওরা তো আঠারো সালের··· ভাবছি, বিশ সালের ওরা কেমন হবে। বড়দের মতো ওদের মোহ নেই। ওদের টেনে নিয়ে যাবে সে বিপদও নেই। ওরা যেন ব্যবসা হিসেবেই যুদ্ধকে গ্রহণ করেছে। এখন আর ক্ষমতা, ন্যায় আর স্বাধীনতার বাজে জিগীর তুলবার প্রশ্নই আসে না। একমাত্র লক্ষ্য এখন জয়লাভ। প্রতিজনের নিজের জয়লাভ। সম্পূর্ণভাবে নিজের। নিজেই তো নিজের রক্ত মাংস খাচ্ছি। জীবনের জন্য সংগ্রাম! সংগ্রামের জন্য জীবন! নারীদেহের গন্ধ, মহিমা, আর রক্ত, সব কিছুর জন্য ঘৃণা। জাগ্রত ব্যাঘ্রের সেই তো স্বপ্ন!'

'তুমি তো শয়তান!' আনেৎ বলে উঠল।

'কিন্তু একেবারে গোবেচারী নিরীহ শয়তান। না খেয়েই টেবিল থেকে উঠে এলাম।'

'দুঃখ হচ্ছে বুঝি?'

'না, আমি তাদেরই একজন, যারা সুদিনের মুখ দেখেছিল। আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমাদের সব কিছুকে বুঝতে হবে, জানতে হবে।'

'যথেষ্ট! সব কিছু জানতে পারলে কাজের ইচ্ছে তো আর থাকবে না। না, ওপথ আমার নয়, আমার হৃদয় প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আমি মেয়েমানুষ। আমার জন্য তাহলে কি রইল?'

'কেন, অলসতা!'

'না, তাই তো যথেষ্ট নয়। আমি সাহায্য করতে চাই, বাঁচাতে চাই।'

'কাকে বাঁচাতে চাও? ওরা যে বাঁচতে চায় না।'

'বাঁচতে তাদের ইচ্ছে থাক বা না থাক, আমি তো তাই-ই চাই। আমি জানি, কিছুই করতে পারব না, তবু সব কিছুই করতে চাই। আমি

করবই। যদি সব ক'জন দেবতা আর শয়তান মিলেও আমাকে বাধা দেয়, 'না', 'না' বলে চেঁচিয়ে ওঠে, তবু আমি 'হাঁ'ই বলব!'

'তুমি তো একজন শহীদ। তুমি পরাজিত হতে চাইছ!'

'না, তা মনে কোরো না। আঘাত ফিরিয়ে দিতেও আমি জানি!'

'তোমার প্রচেষ্টায় ভাগ্যের জাঁতা থেকে এক কণা ধুলোও ঝরে পড়বে না।'

'হয় তো না···কিন্তু এ এক স্বস্তি, আরামের নিশ্বাস।'

'আমি তো বলেছি, তুমি যুদ্ধদেবী। তোমার আনেৎ নামটা তো মিথ্যে।'

'যিনি মৃত্যুকে জয় করেছিলেন, তার ঠাকুরমার ছিল এই নাম।'

'কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ীও মরলেন।'

'কিন্তু তিনদিন পরে আবার উঠে এলেন তিনি।'

'তুমি একথা বিশ্বাস কর?'

আনেৎ অবাক হয়ে গেল: 'আমি আগে তো একথা বিশ্বাস করিনি···'

'কিন্তু এখন?'

'জানি না···আমার মনের পরতে পরতে দাগ কেটে দিয়ে গেছে···'

জোরমঁ্যা কল্পনায় দেখতে পেল, এই অদ্ভুত মেয়েটি বসে আছে, আর তারই কাছে হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে রহস্যময় একদল অতিথি। তার বিছানার পাশে, নিচু চোয়ারটায় সে বসে আছে, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে, মনে হয় বিছানায়ই বুঝি সে শুয়ে পড়েছে। সে আলতো ভাবে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিল। আনেৎ-এর চোখে বিস্ময়। কিন্তু কি শান্ত তার চোখ! জোরমঁ্যা মৃদু স্বরে বলল: 'তাহলে তুমি বিশ্বাস কর?'

'কি?' সে জিজ্ঞেস করল। সে বুঝতে পারল না। বলে গেল: 'আমার শুধু এই বিশ্বাস আছে, আমি কাজ করব, সেবা করব, ভালোবাসব।'

'বেশ তো।' জোরমঁ্যা বলল: 'সেইজন্যই তো তোমাকে এখানে ডেকেছি। প্রথমে সেকথা বলিনি। আমি তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম, বুঝতে চেয়েছিলাম। এখন তো চিনেছি, বুঝেছি। আমার মিথ্যে স্বরূপটা নিয়েই এতক্ষণ তাই কথা বলেছি। আমার এই শ্লেষকে তুমি ক্ষমা কর! আমার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দাও। দরজা খুলে দিলাম। ভগিনী আনি, এস, ভিতরে এস!'

॥ পাঁচ ॥

'কোথাও আগুন লেগেছে, তুমি বুঝতে পারছ, সে-আগুন থেকে সব কিছু তুমি বাঁচতে পারবে না, আর কি করবে, পুড়তে দিতেই হবে। তুমি তখন সব চাইতে মূল্যবান জিনিস বাঁচাবার জন্যই ব্যস্ত। তখন তোমার জীবন নিয়ে টানাটানি। হয় জীবন বাঁচাও, নয় তো বাড়িশুদ্ধ আগুনের ভিতর ধসে পড়বে। আমি জীবন বাঁচিয়েছি। কিন্তু আগুন আসছে; আরো কাছে আসছে। আনি এবার উদ্ধার কর!'

এখনো বিদ্রূপের আমেজ তার স্বরে। কিন্তু তারই নিচে অধীর উদ্বিগ্নতা। আনেৎ তার হাত ধরল: 'কি বাঁচাতে হবে বল? এই তো আমার দুই হাত। আগুনের ভিতর খুঁজে দেখব।'

'আমার আনন্দ, আমার বিশ্বাস, আমার আনিকে বাঁচতে হবে। যাকে আমি ভালোবাসি তাকেও বাঁচাতে হবে বৈকি।'

'সে কি কোনো মেয়ে?'

'সে পুরুষ। আমার বন্ধু।'

'কোথায় সে? সে তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে এল না?'

'সে এখন বন্দী।'

'কোথায়—জার্মানীতে?'

'না, ফ্রান্সে।'

'শত্রু নাকি?'

'ঠিক বলেছ। সে আমার ভাই, আমার বন্ধু, ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। ওরা আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, বলে গেছে: ভুলে যাও ওর কথা, হত্যা কর। সে তো শত্রু।'

'তুমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ তো?'

'না, না, তার বিরুদ্ধে কখনো নয়। যখন সীমান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম, আমি জানতাম সে ওপক্ষে নেই। যাবার আগে, ওর কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়েই গেলাম। সে রইল ফ্রান্সে পড়ে।'

'তারা বুঝি তাকে বন্দী করল?'

'হাঁ, পশ্চিমে সে এক বন্দীশালায় এখন আবদ্ধ। তিন চার বছর ধরে

সেখানেই আছে—আমার এত কাছে, অথচ এত দূরে! ওর কোনো খবরও পাইনি, ওর সম্বন্ধে কিছু জানিও না। সে কি এখনো বেঁচে আছে?···আমি তো এখানে মরছি···'

'কি, কোনো খবরই পাওনি?'

'খবর পাওয়ার তো উপায় নেই।'

'তোমার জাতি না তোমাকে ভালোবাসে! কি করে তারা তোমাকে বঞ্চিত করছে?'

'কিন্তু ওর সম্বন্ধে তো কোনো কথা ওদের বলতে পারিনি।'

'কেন পারনি, আমি বুঝতে পারছি না।'

'পারবে, বুঝতে পারবে। তোমাকে তো খুঁজে পেয়েছি। ওর কথা তোমার কাছে বলতে পেরে আমি কি যে খুশি হয়েছি, কি বলব! যে ভালোবাসতে পারে, তার কাছে ওর কথা বলতে পারা তো ওরই সঙ্গে কথা বলার সমান। তুমি কি ওকে ভালোবাসতে পারবে?'

'আমি তো তোমার ভিতর দিয়েই ওকে চিনেছি, ভালোবেসেছি। তোমার ভিতরেই ওকে আমি খুঁজে পেয়েছি। বল, ওর কথা আমাকে বল।'

'ওর নাম ফ্রানৎস, আর আমার নাম জোরম্যাঁ। জোরম্যাঁ ফরাসী আর ফ্রানৎস জার্মান! যুদ্ধের দু'বছর আগে থেকেই ওকে চিনতাম। কয়েক বছর ধরে ও পারীতেই ছিল। ও ছবি আঁকত, আমরা একই জায়গায় থাকতাম। পাশাপাশি ছিল দু'জনের ঘর, সামনে বাগান। বছরের পর বছর কাটিয়ে দিলাম একই সঙ্গে অথচ কেউ কারো সঙ্গে কথা বলিনি। তারপর একদিন রাস্তার এক মোড়ে অন্যমনস্কভাবে ওর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। তখনো ঠিক চিনতে পারিনি, পরে মনে হয়েছিল বটে। পারীর এই ঘূর্ণিতে নারী আর পুরুষরা পাতার মতো ভেসে চলেছে, দেখা হবার আগে নিশ্চয়ই তোমরা পরস্পরকে স্পর্শ তো করবেই। ক্ষণিকের জন্যে কারো সঙ্গে দেখা হোলো, সঙ্গে সঙ্গে মনে হোলো, আগে তো একে দেখেছি। একদিন আমাদেরই এক বন্ধু ওর কাছে আমাকে নিয়ে গেল। দেখেই চিনলাম···

'তেইশ বছর ওর বয়েস, কিন্তু দেখতে আরো কমই দেখায়। এখনো ছেলেবেলায় হারানো মা-র মুখের সৌসাদৃশ্য সে হারিয়ে ফেলেনি। অভিমানী তরুণ, একটুতেই চঞ্চল হয়ে ওঠে, অস্থির, উদ্দাম সে। আশা আর সন্দেহের আবহাওয়ায় সে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। এই আলো, এই ছায়া তার মুখে—

অথচ পরিবর্তন নেই। এক বিশ্বাসময় নির্ভরতা, আর বিষণ্ণ নিরাশা। কখনো সে নিজেকে উৎসর্গ করছে, কখনো বা পিছিয়ে আসছে। তখন সে বিরূপ, দুর্বোধ্য। আমিই শুধু একা তার এই মানস উপলব্ধি করলাম, কারণ খুঁজলাম। যাদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, তারা কিন্তু সন্দেহও করেনি। হয় তুমি ভালোবাস, না হয় বেসো না। যাদের ভালোবাসে তাদের ক'জনকে মানুষ জানতে চায়? আমিও তো এ নিয়ে তার আগে মাথা ঘামাইনি। কিন্তু জীবন তার শোধ তুলেছে কড়ায় গণ্ডায়। (সেকথা তো তোমাকে আগেই বলেছি)। আমি এই শিখেছি যে, তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসতে তুমি পারবে না, কিন্তু অপরের মতো তো তাকে ভালোবাসা যায় —সে যেমনটি চায় তেমনি। তাকে আবিষ্কার তোমাকে করতে হবে বইকি।...

'না, সে আমার মতো মোটেই ছিল না। সেই অপরিচিত তরুণের সঙ্গে আমার কোনো মিলই ছিল না। তবু আমাকে তার তখন প্রয়োজন। তাকেও আমার প্রয়োজন...

'তার পরিবেশ তাকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করে রেখেছিল। ছেলে বেলায় তার শিক্ষা হয়েছিল সামরিক বিদ্যালয়ে। সেখানকার সমাজবিরোধী আবহাওয়ার অস্বাভাবিকতা তার মেয়েলি প্রকৃতিকে তুলেছিল নিষ্ঠুর করে। বড় দুর্বল, বড় একা সে, বিদ্রোহ করতে পারল না। প্রথা আর চিন্তাধারার কাছে সে নুয়ে পড়ল। তারই ক্ষত রইল সারা জীবন ধরে, যেমন ধর্ষিতা মেয়ে বহন করে তার লাঞ্ছনার স্মৃতি। সে ভীরু, তার আত্মবিশ্বাস ছিল না, ছিল না তার ইচ্ছা-শক্তি...জীবনে সে জোড়াতালি দিয়েই চলছিল...দুঃখবাদী সে, ভালোবাসা আর ভালোবাসা পাওয়ার জন্যও বুভুক্ষু হয়েছিল। সে চেয়েছিল নিজেকে ছেড়ে দিতে, কিন্তু পারেনি—প্রতারিতই হয়েছে। তার মতো লোকেরা কষ্ট সইতেই জন্মায়। তারা নিজেদের অস্ত্রসজ্জার অভাব সরলভাবেই প্রকাশ করে। আর লোকেরা তাদের অস্ত্রের ফলা দিয়ে খোঁচাতেও ছাড়ে না, তারা কঁকিয়ে ওঠে। এমনি অস্ত্রসজ্জার থেকে একেবারে অস্ত্র না থাকাই তো ভালো।...

'তার বাবা মারা যাওয়ার পর, ফ্রানৎস তার জন্মভূমি থেকে পালিয়ে এল। সে এল পারীতে, ছেলেবেলার দুঃস্বপ্ন মুছে ফেলতে চেষ্টা করল। যে অতীতের স্মৃতি থেকে তুমি কষ্ট পাচ্ছ—বিকৃত তার মুখভঙ্গী। সময় তাকে শুকিয়ে ফেলেছে, কিন্তু তবু তো রক্ত মাংসে ওরই জন্য অনুভূত হচ্ছে আঘাত।...

'এবার পারী এই কবিত্ব আর সৃষ্টির সৌন্দর্যবোধহীন তরুণের উপর করল

তার প্রভাব বিস্তার। এক স্বাভাবিক আবহাওয়া পারীর, সহজে নিশ্বাস ফেলা যায় এখানে এবং নীতিবোধহীনতা দেয় সুযোগ। কিন্তু ফ্রান্স তখন তার নিজের আভ্যন্তরীণ জীবন নিয়ে এত ব্যস্ত যে সে ওসব অভাবই বোধ করল না। তার হৃদয় তখন শুকিয়ে গেছে, শ্লেষের আমেজ লেগেছে মনে। তার বিশ্বাস তখন বিচলিত, নিজেকে সে অবিশ্বাস আর আনন্দের এই আবহাওয়ার বিরুদ্ধে আর রক্ষা করতে পারল না। তার বন্ধুবান্ধবদের পক্ষে কিন্তু আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠল না, তারা চাইল এই তরুণের চোখ ফুটিয়ে দিতে। যারা সব কিছুকেই হাল্কা ভাবে নেয় তাদের কাছে বিপদ বলে কিছুই মনে হয় না, কিছুই তাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু সে ঠিক সে-ধাতের নয়; সব কিছুরই গুরুত্ব সে উপলব্ধি করল। একেবারে তলায় ডুবে গেল সে, প্রতিরোধ করবার শক্তি নেই বলেই নিজের উপর বিরক্ত হোলো।···

'ঠিক এই সময়ে আমার সঙ্গে তার দেখা। যে বন্ধুরা তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, তারা কেউই তার মতো অভিমানী নয়, কিন্তু তাকে খুবই ভালোবাসত তারা। তার সঙ্গে ভালো ব্যবহারও করত। তার কাছ থেকে গোপন কথা বার করে তারা হাসত; এই আনন্দ শুধু সীমাবদ্ধই ছিল না—সমস্ত গোষ্ঠীই সে-আনন্দ চুনিয়ে চুনিয়ে উপভোগ করত। ফ্রানৎসকে তারা করুণা আর উপহাসের পাত্র হিসেবেই মনে করত। তার এই মুরুব্বীরা (অন্তত তারা তাই মনে করত) তার সহৃদয়তার আর ভীরুতার সুযোগ নিত বইকি। ভদ্রমহিলারা হয়তো তাকে কোনো খবর আনতে পাঠাতেন, অথবা বড় দোকানে সওদা করবার সময় পরামর্শ দেওয়ার জন্য নিয়ে যেতেন, অথবা কখনো বাণ্ডিল বইয়ে নিতেন। ভদ্র-লোকেরা শোনাতেন তাদের লিখিত জল্পনা, আর তারই ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন সেগুলি সম্পাদকীয় দপ্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সে যেন সবার হুকুমের জন্য এক পায়ে খাড়া। আর তারই প্রতিদানে তারা তাকে সুসংস্কৃত করে তুলত, শুধরে দিত তার চলার ভঙ্গী, অকারণ সুপরামর্শে তাকে ভারাক্রান্ত করে তুলত, তার গোপন ভাবধারা লোকের সামনে সম্পূর্ণ নগ্নভাবেই তুলে ধরত—এ বুঝি তার ভালোর জন্যই। অভিযোগ করবারও উপায় ছিল না—অভিযোগ করলেই সে অকৃতজ্ঞ বনে যাবে।···

'না, অভিযোগ সে করেনি। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে অকৃতজ্ঞই রয়ে

গেল। আমি তাকে দেখেই বুঝতে পারলাম। তোষামোদ আর ঠাট্টা দুই-ই সে সংযত ভাবে গ্রহণ করত, মৃদু হাসত। আমি তার এই দুর্দশা আর নিরাশার খবর রাখতাম। না, এর জন্য কোনো বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়নি। আমি একবার তাকিয়েই আঁচ করে নিলাম, তার আর তার মুরুব্বীদের ভিতরে কি সম্বন্ধ। যখন মুরুব্বীদের ভিতরে একজন কথা বলছিল, আমি তার কথার উত্তর না দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম···আমার সমস্ত মন করুণা আর শ্রদ্ধায় ভরে গেল—ওরেস্টস যখন বর্বর টাউরিসদের হাতে পড়েছিল—সেই ঘটনা পড়ে বোধ হয় এমনি শ্রদ্ধা আর করুণায়ই মন ভরে গিয়েছিল। আমার কথা শুনে তার চোখে আলো জ্বলে উঠল, হাঁ, দেখবার মতো সে-আলো। সে তার নিজের দেশের ভাষা শুনলো আমার কাছে, হাঁ, যে দেশ এখনো মৈত্রীটুকু বাঁচিয়ে রেখেছে, বাঁচিয়ে রেখেছে বন্ধুর প্রতি বন্ধুর শ্রদ্ধা ; তার চোখ সজল হয়ে এল। আমি দেখেও দেখলাম না, তার মনের অস্থৈর্য দমন করবার সময় তাকে দিলাম। সে বুঝতে পারল, যখন সে আবার আত্মস্থ হোলো, চলল আমাদের কথাবার্তা। গম্ভীর তার স্বর, কোমলতাও সেখানে আছে। আমরা কত বাজে জিনিস নিয়েই না কথা বললাম। কিন্তু স্বরই সেখানে প্রধান হয়ে উঠল। দৃষ্টি আমাদের জিজ্ঞেস করল : তুমিই কি সেই ? উত্তর এল : হাঁ, আমিই সেই, তোমার সেই ভাই।···

'বাড়ি ফিরে যেতে না যেতে পেলাম তার এক চিঠি। কি উত্তেজনা চিঠিতে ! আবার পরদিনই দেখা করতে ছুটলাম। এবার কিন্তু একা। সত্যি, আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, সহানুভূতির সেই উচ্ছ্বাস তার উপবাসী আত্মাকে এমনি করে বিহ্বল করে দেবে। আমি তখনো বুঝতে পারিনি যে, এই অপরিচিত আমার জীবনে জুড়ে বসবে। অন্য সবার মতোই দু-তিনটি বন্ধু আমার ছিল। তাদের জন্য বিশেষ কিছু করিনি, তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করবার বিশেষ কিছুই ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া বা তাদের জন্য কিছু করতে পারা তো আনন্দেরই বিষয় ; কিন্তু আমরা জানতাম, সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত মোটেই নয়। তরুণদের অহমিকা এটা স্বাভাবিক বলেই মনে করে। কারো কাছ থেকে কিছু আশা কোরো না, কেউ তোমার কাছ থেকে আশা করবে না। জীবন আর মানুষ—যেমন আসছে, তেমনি তাকে ফরাসীরা গ্রহণ করে। আতিশয্য দেখাবার প্রয়োজন নেই। কি করে সন্তুষ্ট হতে হয় তারা জানে···

'কিন্তু যে তরুণ ওরেস্টসকে শৃঙ্খল থেকে আমি মুক্তি দিলাম সে তো সন্তুষ্ট হতে শিখল না। না, সে কখনো জানতেও পারল না। জীবন সম্বন্ধে অনুভূতির পরিমাপ করতে সে শিখল না। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হোলো বটে, কিন্তু সে নিশ্চিহ্ন প্রজাতির মাপসই কাটা-ছাঁটা বন্ধুত্ব। তাকে আমার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য শুরু হোলো আমার প্রচেষ্টা। হয় তো সফল হতে পারিনি, কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করিনি, কেননা—এতো তারই ইচ্ছা। সে আমাকে সব কিছু দিল, প্রতিদানে চাইলে সব কিছু। ভগবান জানেন, আমার যা কিছু সব তাকে দিলাম—হাঁ, দিলাম বইকি। অন্তত তাইতো আমার বিশ্বাস।'

॥ ছয় ॥

এক দীর্ঘ বিবৃতি। আস্তে আস্তে সে বলে গেল, আনেৎ-এর কাছে তো নয়, যেন নিজের কাছেই সে বলছে। মাঝে মাঝে ছেদ পড়ল; বুঝি সে অতীত মুহূর্তগুলির ভিতরে বাঁচছে—তারপর একেবারে থেমে গেল, এবার এল দিবাস্বপ্ন।

আনেৎ ঝুঁকে পড়ল, কিন্তু এই মোহ সে ভাঙতে চাইল না। তার চোখে প্রতিফলিত হোলো অতীতের এই চলন্ত মরুমায়া; সে শুনে গেল, তার বলা শেষ হবার পরেও যেন রইল তার ধ্বনি। জোরম্যাঁ তখনো তাকিয়ে আছে, অতীতে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। কয়েক মুহূর্ত চলল মূক সংলাপ। আনেৎ স্পষ্ট শুনতে পেল। একটু লজ্জিত হয়ে জোরম্যাঁ বলল, যেন সে আনেৎ-এর মনের চিন্তাধারার কাছেই দিল উত্তর,—যেন সে ক্ষমা চাইল:

'খুব একটা হাসির ব্যাপার, নয়? যে মুহূর্তে মানুষ জন্মাল, সেই মুহূর্তেই শুরু হোলো তার নিজের সঙ্গে নিজের মিলে মিশে থাকা। সে নিজেকে জানতে পারল, অন্তত তাইতো সে বুঝল। মানুষ এত সরল, সবাই এক রকম তারা; সবাই যেন একই রকম ছাঁটাই আর তৈরি হয়ে কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে যাও, দেখবে সবাই তারা ভিন্ন—অথচ একই ধাতুতে গড়া! কে জানত যে আমার মধ্যে এক বেকার মা আর স্নেহময়ী বোনের আত্মা লুকিয়ে আছে? হাসছ যে...'

'এমনিই হাসছি !' আনেৎ বলল : 'আমার নিজের ভিতরেও তো অনেক বেকার আত্মা লুকিয়ে আছে !'

'ঠিক, ঠিক বলেছ ! আমি কয়েকজনকে যেন চিনতে পারছি, একটা গোটা ভেড়ার পালের চালক তো তুমি !'

'ভেড়ার পাল আমাকে চালিয়ে না নিয়ে যায় তো আমার ভাগ্য।'

'প্রত্যেককেই তো বাঁচতে হবে,' জোরম্যাঁ বলল : 'তারা তাদের চারণভূমি বেছে নিক !'

'আর চালকের কি হবে ?'

দু'জনেই হাসল।

'চুলোয় যাক সমাজ !' জোরম্যাঁ চিৎকার করে উঠল, ওতো আইন ছাড়া কিছু বোঝে না। এক মুহূর্ত চিন্তা করে সে বলে গেল :

'আমাদের এই বন্ধুত্বের কথাই ভেবে দেখ না। যখন কোনো ডুবন্ত লোককে দেখে তুমি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেল, তাকে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে কাছে টেনে নিয়ে এসে তার মুখের দিকে চেয়ে থাক—তার চাইতে বড় কাজ মানুষের কি থাকতে পারে ? ছেলেবেলা থেকে ফ্রানৎস সত্যিকারের স্নেহের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তার নিজের স্নেহ দুর্দশার বাঁধের পিছনে তখন স্তূপীকৃত। আমাকে দেখেই বাঁধ ভেঙ্গে গেল, খুলে গেল দরজা—ধারা বইল। আমি বাধা দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কে মহৎ হৃদয়ের দানকে অগ্রাহ্য করবে ? যার যে বিশ্বাস নেই—তার প্রতি আছে তার অবাধ কৃতজ্ঞতা। মানুষ তারই উপযুক্ত হতে চেষ্টা করে। সত্যি বলতে কি, এই বিরাট স্নেহের বন্ধন আমাকে বুঝিয়ে দিল,—আমার হৃদয়েব দীনতা। দৈন্য থাকলেই তো মানুষ স্বল্প নিয়ে বেঁচে থাকে ; বঞ্চনার ভিতর দিয়ে জ্ঞানী হয়ে ওঠে, জীবনের কাছে কিছুই সে চায় না। কিন্তু স্নেহ যখন দুই হৃদয়ে মিলনের গ্রন্থি এঁটে দেয়—তখন দেখা যায় হৃদয় কি ব্যগ্র হয়েই না ছিল—এত দিন বঞ্চিত হয়ে যে কি করে সে বেঁচে ছিল কল্পনাও করতে পারে না।—বন্ধুত্ব···বন্ধুত্ব ! যারা আবিষ্কার করতে পেরেছে, শুধু তাদেরই সঙ্গে এই আবিষ্কারের আনন্দ উপভোগ করা যায়। কেন যে আমরা ঘনিষ্ঠ হলাম তার কারণ বোঝবারও উপায় নেই···কারণ ? না, কোনো কারণ নেই ! নিজেকে সম্পূর্ণ করবার জন্যই তো পরস্পরের প্রয়োজন। একজন আর একজনকে ছাড়া সম্পূর্ণ

হতে পারে না। এইটেই তো অন্য লোকেরা ক্ষমা করতে পারে না। কারণ আমরা পরস্পর যদি সম্পূর্ণ হয়ে উঠি, অন্যরা তো আঘাত পাবেই।'

'আমার কিন্তু সে-অনুভূতি নেই,' আনেৎ বলল: 'যে ভালোবাসা আমার ভিতরে নেই, তাকে আমি অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করি না। যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, আমি ভালোবাসি তাদের।'

'কি ক্ষুধা!' জোরমঁ্যা বলে উঠল।

আনেৎ উত্তর দিল: 'অথচ খাবার আমার নেই।'

'সেইখানেই তো প্রকৃত কারণ। যাদের কিছুই নেই, তারাই তো সুখী—সব কিছুই তারা পাবে।'

আনেৎ মাথা নাড়ল। মোহ-বিচ্যুত সে। ধনিকরাই ওকথা বলে। তারা গরীবদের জানিয়ে দিতে চায় যে তারা সম্পূর্ণ।

জোরমঁ্যা তার হাত ছুঁল: 'কিন্তু তুমি তো গরীব নও! তোমার ভাণ্ডার তো ভরে আছে।'

'কিসে ভরে আছে?'

'দেওয়ার আনন্দে।'

'তার তো কোনো দাম নেই।'

'তারই এক কণা আমাকে দাও। তার ব্যবহার তো আমি জানি।'

'নাও, তবে নাও! আমি তোমাকে কেমন করে সাহায্য করব বল?'

॥ সাত ॥

শাভান পরিবার এই অস্বাভাবিক বন্ধুত্বকে ভালো চোখে দেখল না। এখানে সামাজিক স্বার্থ, জাতি, স্থান বা পদোন্নতির কোনো হদিসই তারা পেল না। সুতরাং একে তারা স্বীকার করতেও রাজী হোলো না। এ-বন্ধুত্ব না হলেও চলত—এমনি তাদের ভাবখানা। যুদ্ধের আগেও তারা কোনো জার্মানের সঙ্গে বন্ধুত্ব সহ্য করতে রাজি ছিল না, এই প্রাদেশিক পরিবেশে তাকে বিকৃত রুচির পরিচয় বলেই মনে করত। জোরমঁ্যার অন্যান্য রুচির মতো একেও খাপছাড়া বলেই তাদের মনে হোলো। তারা বুঝতে তো

চেষ্টা করলই না, বরং তাদের বিদ্রূপাত্মক নিস্তরঙ্গতা পরিবারের প্রথা-বিগর্হিত আচরণকে খারাপ চোখেই দেখল। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত যা তারা বুঝতে পারত না, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে তারা যেত না। কিন্তু ১৯১৪ সালের পর বিদায় নিল সেই সুন্দর ঔদাসীন্য—অথচ এতদিন সামাজিক জীবনকে সেই বেঁধে রেখেছিল। পরস্পর এবার পরস্পরের কাজে হস্তক্ষেপ করল, মানুষের অনুভূতিও বাদ পড়ল না। ছাড়পত্র যার নেই তাকে ভালোবাসা তখন নিষিদ্ধ। জার্মানের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে—এ স্বীকারোক্তিতেও তখন বিপদ! জোরম্যাঁর ভগ্নিপতি আর বোনদের চোখে তখন দস্যুর সঙ্গে সঙ্গমও বুঝি ততটা হীন নয়। তারা সৎ, দৃঢ় তাদের মন, কিন্তু দিগন্ত সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

মাদাম দ্য সেঝি ভাইয়ের থেকে বছর সাত আটেকের বড়। কিন্তু জোরম্যাঁর চাইতে তাঁর দৃঢ়তা অনেক বেশি। বাছাই করতে গিয়ে বিভ্রান্ত কখনো তিনি হননি। প্রতি জিনিসটা সম্বন্ধেই তার মতামত এক এবং অভিন্ন—সুস্পষ্টতা সেখানে আছে, কিন্তু গণ্ডী তার সংকীর্ণ। তাঁর দৃঢ় দেহের কাঠামোখানার দিকে তাকালে প্রথম দৃষ্টিতেই তা বোঝা যায়। লম্বা, সরু নাক সোজা চলে গেছে, একটু বাঁকেনি, যেখানে থেমেছে সেইখানেই তার সুষ্ঠু পরিণতি, নাকের ছ্যাঁদা দুটো ছোট। কপালখানা ছোট, বলিরেখা নেই, চুল পালটানো, একটা গোছা কোথাও অবিন্যস্ত হয়ে কপালে বা কানের কাছে পড়েনি। ভ্রূ সূক্ষ্ম, বাঁকানো, চোখ তীক্ষ্ণ, ঠোঁট দু'খানি পাতলা—হাঁ করলেও দাঁত দেখা যায় না। যেন বুজে থাকবার জন্যই তাদের সৃষ্টি। চিবুক একটু ভারি, কিন্তু দৃঢ়; একটুও দুর্বলতা নেই। মুখ রেখাকলঙ্কিত নয়, সরল রেখার সমারোহ সেখানে, দৃঢ়তারই ইঙ্গিত সেখানে পাওয়া যায়। মুখখানা দেখলেই মনে হয়, ওতে এই কথাই লেখা আছে: ও নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। সে ভদ্র, গম্ভীর। তাকে বিরক্ত করার আশা নেই। নিজের উপর সে বিশ্বাস রাখে। একটা পাথুরে দেয়াল যেন। পাথুরে দেয়ালের সঙ্গে কেউ কিছু আলোচনা করতে তো যায় না, তাকে প্রদক্ষিণ করেই যায়। সে সব কিছুকে সীমাবদ্ধ করে রাখে, গণ্ডির ভিতরে পুরে ফেলে, এই তো তার স্বরূপ। গণ্ডির ভিতরে যা রইল, সে তো তোমার নয়; সে এক ব্যক্তিগত রাজত্ব, ব্যক্তিগত সম্পত্তি। প্রত্যেকেই নিজের জন্য তৈরি, তুমি তো বাইরের মানুষ।

মাদাম দ্য সেঝি প্রথমে তাঁর নিজের জন্য—তারপর আসছে তাঁর শহর, তাঁর অঞ্চল আর ফ্রান্সের কথা। যুদ্ধ এসে সব কিছুকে তাল পাকিয়ে এক্ করে দিয়েছে—তার নাম এখন পিতৃভূমি। মাদাম দ্য সেঝি তারই মধ্যমণি। স্থানীয় ফরাসী মহিলা সমিতির তিনি সভানেত্রী। তাই তিনি মনে করেন, ফরাসী মহিলাদের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর বলবার অধিকার আছে। ফ্রান্সে মহিলারা যা বলেন, সারা পরিবারের মুখেও ঐ এক কথা—মাদাম দ্য সেঝি আন্দোলনকারিণী নন, ফ্রান্সের মহিলারাই বুঝি তা নন। তার কারণ তাঁরা ক্ষমতা হাতে পেয়েছেন, অধিকারের প্রয়োজন তাদের নেই। অধিকার তো তাঁদের কাছে খোঁড়া মানুষের লাঠিরই সামিল।

মাদাম দ্য সেঝি-শাভান তাঁর পরিবারের পুরুষদের জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করলেন। তাদের জন্য তিনি খুশিই হলেন। একজন তো নিজের প্রাণ দিল (মঁসিয়ে দ্য মারেউই), আর একজন হোলো সাংঘাতিকভাবে আহত (তার ভাই); আর তার স্বামী, গোলন্দাজবাহিনীর অধ্যক্ষ, ছ'মাস ধরে ভার্দুন-এর ঝড়ের ভিতরে ছিলেন তিনি। না, তিনি কর্নেলিয়া নন। কিন্তু তাঁর হোরেসদের তিনি ভালোবাসেন বই কি। তাদের মৃত্যুতে নেই তার উদ্বিগ্নতা। কিন্তু তাদের প্রতি মমতাও তাঁর আছে। যদি তাঁর নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারতেন, তাদের ভাগ্যকে বরণ করতে তিনি চাইতেন কিন্তু তাই বলে এই পরীক্ষার মুখে ঠেলে দিতেও দ্বিধা করলেন না। ফ্রান্স, এই অঞ্চল, এই শহর, এই সেঝি পরিবার—এরা তো তাঁর অধিকারভুক্ত তিনি সেই অধিকারই জাহির করলেন। কাজ না করলে অধিকারের মূল্য কি? আমার অধিকার—ন্যায় আর অন্যায় যাই হোক না কেন—সে আমারই অধিকার। যাক না, সমস্ত সেঝি বংশ, সমস্ত ফ্রান্স, ধ্বংস হয়ে যাক না—আমি তো বশ্যতা স্বীকার করব না! পুরনো দিনের মামলাবাজদের মতোই তিনি। যুদ্ধ, জীবন আর মৃত্যু তো মামলা। আমার যা কিছু আছে, সব হয় তো যাবে, কিন্তু আপোস করব না···

এমন মহিলার কাছে অন্য পক্ষের অধিকার সম্বন্ধে বলতে যাওয়ার কল্পনা করাও বৃথা। তিনি তার ভাইয়ের জন্য গর্বিত। সে ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে, আর তাকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন তার ভগ্নী।

কিন্তু এই লজ্জাকর দুর্বলতা, এই জার্মানের সঙ্গে বন্ধুত্বের চাইতে তাকে মরতে দিতেও তিনি রাজী। তিনি বুঝতে পারলেন। কিন্তু বুঝেও সে না

দেখারই ভান করলেন, খুশিই হলেন। জোরম্যাঁও খুশি। তাঁদের দু'দলের ভিতরে বোঝা-পড়া তখন হয়ে গেছে। যারা ভালোবাসে, তারা কখনো পরস্পরকে বিন্দুমাত্র অপমান করতে চায় না—কথায় তো নয়ই (মাদাম দ্য সেঝি তার নিজেরই কর্ত্রী), এমন কি কল্পনাও বুঝি নয়।

তার মা, মাদাম দ্য শাভান, ছেলের এই আকর্ষণের কথা বুঝতে পারলেন। ছেলে তার প্রিয় বলেই তিনি চুপ করে গেলেন। কিন্তু এতে তাঁর সমর্থন ছিল না। তাঁর নিস্তব্ধতা ছেলের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনল না, সে তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে রাজি হোলো না। তিনি বুড়ো মানুষ, প্রচলিত বা সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে কখনো চাননি, একে বিধির বিধান বলেই তিনি জীবনে মেনে নিয়েছেন। হয় তো তাঁর হৃদয় মুক্তই ছিল, হয়তো বা মুক্ত হতেও পারত। কিন্তু প্রকাশ করবার সুযোগ কখনো হয়নি। তিনি কর্মময় জীবন কাটিয়েছেন, তার নীতিবোধ অলসতায় পর্যবসিত হয়ে গেছে—শান্তিবাদের রং ধরেছে—সব কিছু বিক্ষোভ থেকে পালিয়ে গেছে তাঁর মন—হৃদয়ের তাই সেখানে স্থান খুবই কম। কিন্তু তবু আত্মার গভীরের কোমলতা তিনি হারাননি। সে-কোমলতা ছিল তাঁর বিশ্রামের তাগিদের নিচে তলিয়ে। তিনি রুগ্ন ছেলের হাত জড়িয়ে ধরলেন। তিনি জানতেন তার ছেলের ভাবনার খবর, কিন্তু মনে মনে প্রার্থনা করলেন, তাকে অনুনয় করলেন, সে যেন তাঁর কাছে সেকথা প্রকাশ না করে।

জোরম্যাঁ যার কাছে প্রথম তার স্নেহ আর উদ্বিগ্নতার কথা প্রকাশ করল, সে আনেৎ। যুদ্ধের এই পরিণতির চাইতেও প্রবল হয়ে এরা দেখা দিয়েছিল, তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আনেৎ যখন অবাক হয়ে বলল : 'কিন্তু মাদাম দ্য মারেউই ?'—এই তরুণী নারী তাকে আকৃষ্ট করেছিল। আকৃষ্ট করেছিল তার বিষণ্ণ হাসি,—জোরম্যাঁ হতাশ হয়ে তার হাত নাড়ল : 'না, না, ও নয়।'

সে ভালো, সে পবিত্র। সে মাদাম দ্য মারেউইকে ভালোবাসে। পরস্পরের প্রতি আছে এক পবিত্র স্নেহের বন্ধন, কোনোদিন প্রকাশ করবার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। সে বলল : 'ওর দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখ!'

'দেখেছি।' আনেৎ বলল : 'ও তো মেরত্যুর-এর সম্ভ্রান্ত মহিলার মতোই।'

জোরম্যাঁ হাসল : 'ছোট্ট, দুর্বল পাখী, পিঠ কুঁজিয়ে গেছে ; স্নিগ্ধ চোখ দুটো মিট মিট করছে, সন্তানের দিকে তাকিয়ে আছে, সন্তানের পা চাপড়ে দিচ্ছে। তেমনি ভ্রূ, সুন্দর নাক, লম্বা চিবুক, তেমনি সুন্দর হাসি, আর পাতলা ঠোঁট। কিন্তু বিষাদ তার ওড়না বিছিয়ে দিয়েছে ওর মুখে। কোথায়, কোথায় তার সন্তান ? সে তো তাকেই খুঁজছে। তারই প্রতীক্ষায় সে উন্মুখ। সে তো স্বর্গে। তার ভালোবাসা তারই পেছনে ছুটে গেছে সেখানে। এখানে আমাদের জন্য কিইবা অবশিষ্ট রইল ? সে সহিষ্ণু, অভিযোগ সে করে না, কর্তব্য করে যাচ্ছে। সে আমাদের দুঃখ দিতে চায় না—সে স্পষ্ট করে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে, এ পৃথিবী তো তার ক্ষণিকের বিশ্রামের জায়গা। আমরাও তার কাছে ক্ষণস্থায়ী ছাড়া তো কিছুই নই।'

'আচ্ছা সে যদি এই ক্ষণস্থায়ী আত্মাদের একটু হাসি বিলোয় তাতেই বা আপত্তি কি ?'

'সে তো তাই-ই করছে। কিন্তু আমি তো তার দাম জানি। ওতে প্রতারিত হোয়ো না।'

'এই তো সত্যিকারের জ্ঞান।'

'কিন্তু সে-জ্ঞান তোমার জন্যে তো নয়।'

'আমি ক্ষণস্থায়ী আত্মাদের কেউ নই।'

'এই জ্ঞান কি বলছে জানো ?' সব কিছু স্বীকার করে নাও—অদৃষ্ট, মৃত্যু—যাদের ভালোবাস তাদের ধ্বংস—সব কিছু ! কারো প্রতি তার ঘৃণা নেই, কিন্তু সে একথা বিশ্বাস করে যে যুদ্ধ ভগবানেরই দাস, সে তাকে শ্রদ্ধা করে। তুমি তো দেখেছ, সে-নিষ্ঠুরতায় একে কলুষিত করতে দিতে চায় না, চায় না অশ্রদ্ধা দিয়ে একে কলঙ্কিত করতে, পরাজিতের প্রতি ক্ষমতা প্রয়োগ করে শক্তির অপব্যবহার করাও রীতি নয়। সত্যিই সে মহৎ। কিন্তু এ মহত্ব পুরনোদিনের। যা হয়ে গেছে, তাই তো হওয়া উচিত, আবার তাই হবে। যা হয়ে গেছে—ভালো আর মন্দ যাই হোক না কেন—আভিজাত্য তো সেইখানেই। এ তো জাতি থেকে এসেছে, এসেছে ভগবানের কাছ থেকে। সে তাকে বদলাবার চেষ্টাও করবে না। এমন সম্ভ্রান্ত বিধান সে মেনে নেবে বই কি।'

'কিন্তু আমি তা মানি না। আমার উদ্ভব তো সেই পুরনো জাতি থেকে হয়নি। আমি হয় একে বাতিল করে দেব, নয় মেনে নেব।'

'আমার পক্ষ নেবে তো ? অবিশ্যি এ হার-মানার দল। হার যারা মানে তাদেরই তো আমি ভালোবাসি।'

'তুমি দুঃখবাদী !'

'না! ওদের অদৃষ্ট মন্দ বলেই তো ওদের আমি আপন করে নিতে চাই।'

'যদি না পার ?'

'আবার নতুন করে শুরু করব।'

'কিন্তু আমার যে বড্ড তাড়া আনেৎ। আমি তো নতুন করে শুরু করতে পারব না। তোমার মতো আমার জীবন তো আর অসীম নয়।'

'সে-কথা কে বলতে পারে ?'

'না, না! শুধু ছায়া নিয়ে আমার চলবে না। আমি পৃথিবীর মানুষ, বেশি দিন এখানে থাকব না। আমার কাছে সব কিছুই এই মুহূর্তেই চাই, না পাই তো দরকার নেই তার।'

'বেশ তো, আজকের এই মুহূর্তের উপরেই আমরা আমাদের সব কিছু বাজি রাখব। আমিই তো বাজি। খেলাটা আমাকে দেখিয়ে দাও!'

॥ আট ॥

আনেৎ খেলায় মেতে উঠল ; সাবধান সে হোলো না। তার চাই কাজ, শুধু চিন্তা বা কাজ করবার ইচ্ছে নিয়েই সে সন্তুষ্ট নয়। যুদ্ধের প্রথম থেকে কাজ করবার পথ সে খুঁজে পাচ্ছিল না। এবার সে হঠাৎ পেল তার সন্ধান। দু'টি তরুণের অদ্ভুত ভালোবাসার ভিতরে সে তাকে খুঁজে পেল। তার উদ্দাম উৎসাহ সে উৎসর্গ করল তাদেরই কাজে। সে নিজে জোরম্যাঁর কাছে তখন কৃতজ্ঞ। তার বিচার-বুদ্ধি তার কানে কানে বলল :

···এর ধার তোমাকে শোধ দিতে হবে।

···আচ্ছা পরে দেব'খন। এখনতো কিনছি···

···যা তোমার নেই, তাই দিয়েই তো কিনছ।

···পরে ওকথা ভাবব।

নির্বুদ্ধিতা! কিন্তু ক্ষতি কি? তার তখন নিজেকে উৎসর্গ করবার বড় প্রয়োজন; প্রতিদানে কিছুই সে চাইল না। কাউকে সুখী করতে পারলেই তখন সে সুখী—তাছাড়া ঝক্কি বইতেও রাজি। ঝক্কি! সে যে জন্ম থেকেই জুয়া খেলায় ওস্তাদ···(জোরম্যাঁ স্পষ্ট বুঝতে পারল)···সে তার জীবন নিয়ে বহু জুয়া খেলেছে, উৎসাহ তার কখনো উবে যায়নি।

একথা স্বীকার করতে ক্ষতি নেই—যে মুহূর্তে জোরম্যাঁ তার মনের এই হদিস পেল, সে তার সুযোগ নিতে ছাড়ল না। সে ছাড়ল না তাকে। কিন্তু তাতেও বিপদ আছে বইকি। কিন্তু বিপদকে সে গ্রাহ্য করল না। রোগীর তো করুণা বলে কিছু নেই।

আনেৎ শুরু করল কাজ, তরুণ বন্দীকে খুঁজে বার করল। আঁজের-এর কাছে এক বন্দী শিবিরে সে তখন পচছে। জেনেভার আন্তর্জাতিক বন্দী প্রতিনিধি সঙ্ঘের মধ্যস্থতায় আনেৎ তাকে একখানা চিঠি পাঠাল, আবার দুই বন্ধুর ভিতরে স্থাপিত হোলো যোগসূত্র। তার নিজের নামেই আনেৎ চিঠি লিখল, উত্তর পেল।

ফ্রানৎস-এর প্রথম চিঠির প্রথম ছত্র পড়েই সে আর চিঠি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না। এ এমন এক প্রেমের হর্ষধ্বনি, সে ধরা পড়ল, বন্দী হোলো—মনে হোলো দু'খানা হাত তাকে যেন জড়িয়ে ধরেছে। মুক্তি পেতে সে চেষ্টা করল, কিন্তু শক্তি নেই; শেষ পর্যন্ত পড়ে গেল চিঠিখানা। শেষ করে হাঁটুর উপর চিঠিখানা রেখে বসে রইল, নিশ্বাস তখন তার ফুরিয়ে গেছে, সে যেন আক্রান্ত হয়েছে। তাকে ঘিরে ফেলেছে এক জ্যোতির পরিমণ্ডল। সে চেষ্টা করল শাভান-এর কাছ থেকে তাকে লুকিয়ে রাখতে। কিন্তু জোরম্যাঁর কাছে যখন সে একা রইল, তার মুখের দীপ্তি দেখে জোরম্যাঁ বুঝতে পারল। হাত বাড়িয়ে হুকুমের সুরে সে বলল, অধীরতায় তখন সে কাঁপছে: 'দাও, আমাকে দাও!'

চিঠি পড়া শুরু হোলো, আনেৎ ঝুঁকে পড়ল না, একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরে নিস্তব্ধতা। আনেৎ জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল রৌদ্রহীন আঙ্গিনার দিকে। চিঠির পাতা ওল্টানোর খস খস শব্দ, ঘন ঘন নিশ্বাস; তারপর নিস্তব্ধতা। দেয়ালের বাইরে রাস্তায় একটা গোরুর গাড়ি চলে গেল, চাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু গাড়িটা যেন চলছে না। মধ্য ফ্রান্সের প্রান্তরের গতি-হীনতারই নিদর্শন। থেমে গেছে সময়। পশুপালকের চিৎকার, পাখীর

ডাক। শব্দ এবার অস্পষ্ট হয়ে এল। ধসে-পড়া দেয়াল আবার তেমনি স্থির। আবার সময়ের প্রবাহ, দুই আত্মা আবার সজাগ। জোরম্যাঁর স্বর শোনা গেল :

'আনেৎ !'

ফিরে তাকাল, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল আনেৎ। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে শুয়ে আছে, আলোটা অনেক দূরে রয়েছে। বিছানার উপর খোলা চিঠিখানা। সে বলল : 'পড়েছ ?'

সে স্বীকার করল : 'ক্ষমা চাইছি। চিঠি আমি আগেই পড়েছি।'

ওর দিকে না তাকিয়ে জোরম্যাঁ হাত বাড়িয়ে দিল ; 'তোমার তো সে দাবি আছেই। চিঠি তো তোমারই। তোমার জন্যই পেলাম এ চিঠি।

কথা না বলে সে আনেৎ-এর পোষাকের প্রান্ত তুলে ধরে তারই ওপর চুমু খেল।

এর পর থেকে তারই অনুরোধে আনেৎ বন্ধুর চিঠি পড়তে লাগল। স্নেহের বন্যা বয়ে চলল তার ভিতর দিয়ে। তার সঙ্গে তার নিজের রং আর উন্মাদনা মিশিয়ে দিল। এরা পরস্পরকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসেনি। আর সে ভালোবেসেছে তাদের দু'জনকে আর নিজেকে। সে যেন একটা গাছ যেখানে এসে এই দুটি পাখী বাসা বেঁধেছে। ঘন পাতার ভিতর সে শুনতে পেয়েছে তাদের বন্ধুত্বের গান। গাছটার চেহারাই যেন বদলে গেছে, নতুন হাওয়া লেগেছে, আকাশের তারুণ্য স্নান করিয়ে দিচ্ছে পেলব শাখাকে। সময় আর যুদ্ধ মুছে গেছে, গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে।

এ যেন এক আশ্চর্য দ্বৈত সংগীত। আনেৎ ভালো করে শোনবার জন্য চোখ বুজল। তার মনে হোলো, একটি স্বর যেন তরুণীর আর একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিতা নারীর। নারী বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে তরুণীর দিকে। তরুণী তার বাহুতে আত্মসমর্পণ করছে।

ফ্রানৎস-এর প্রথম চিঠি···সে যেন এক উদ্দাম মুক্তির গান। হাঁ, অবশেষে মিলেছে আশ্রয়। তিন বছর ধরে আত্মা আর দেহের ভিড়ে সে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল—এবার এল মুক্তির সন্ধান। আর কারো বুঝি বন্দী শিবিরের এই পরিবেশ এতখানি অসহ্য হয়ে ওঠেনি ! না, কখুনো একা থাকা এখানে সম্ভব নয়। অথচ একা সে রয়েছে, নির্জনতা দিয়ে নিজেকে সে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু কি ভীষণ সে-নির্জনতা, কি হীনতম নিকৃষ্ট সে-

নির্জনতা! নিজেকে সেখানে হারিয়ে ফেলতে হয়। মহান হৃদয়ের সে ছাপিয়ে-ওঠা মানবতাও তার নেই যে, তা দিয়ে নিজেকে লোকের চোখের সামনে মহান করে তুলে ধরবে। বৃথা হোক আর না হোক মেষপাল তো পান করবে, হুটোপাটি খাবে···আর তা যদি না করতে চায় মিলিয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে···যারা এমনি ধারা ভাবতে পারে না, তাদের সম্বন্ধে তার ভয়, তারা তো তার জীবনের স্বপ্ন বুঝতে পারবে না। আবার তার নিজেরও প্রাণের সে-প্রাচুর্য নেই যা দিয়ে বিখ্যাত শিল্পীর মতো নিজস্ব পৃথিবী গড়ে নেবে! সাতাশ বছরের দুর্বল ছেলে, এখনো সে কিশোরই আছে। তার অবদমিত কামনার স্রোত কোনো শক্তিশালী হৃদয়ের কাছে উৎসারিত করে দিয়ে সে শান্তি পেতে চায়। সে-স্রোত আপনা-আপনি বুঝি শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছতে পারবে না। সে-স্রোতের জন্য চাই ভালোবাসার নদী, সেই নদীই তাকে বয়ে নিয়ে যাবে। অহংজ্ঞানই তো করাবে এই উৎসর্গ। নেওয়া মানে তো দেওয়া। যে আত্মা উপত্যকাকে শুকিয়ে দিয়ে গেল, তাকে আবার ছাপিয়ে তুলতে হবে স্রোতে। হাঁ, এই তার আবিষ্কার আর আনন্দ।

কিন্তু এ ক্ষণিকের জন্যই বটে। ক'দিনেই প্রথম আনন্দ নিঃশেষ হয়ে গেল, অস্থির দুই আত্মা অনুভব করল তাদের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান। কামনা আর বঞ্চনার চিৎকার। চিঠিতে কিছুই পাওয়া গেল না, বরং আবছা বলেই মনে হোলো। আর সেন্সরও বন্দীশিবিরের যথাযথ বর্ণনা চিঠিতে লিখতে নিশ্চয়ই বাধা দিল। কিন্তু এ বাধার কথা তরুণ বন্দী কখনো ভাবেনি। তার নিজের অহমিকা অন্যের সত্তা সম্বন্ধে ভাববার কখনো সময়ই পায়নি। সে চিঠিতে নিজের কথা বলে গেল—সরল মর্মস্পর্শী সে-কাহিনী, আত্মবিশ্বাসের সেখানে প্রাবল্য। তার ভাবপ্রবণতায় যে অলস বিষণ্ণতার আমেজ, অষ্ট্রীয়াবাসীর বিশেষত্ব সেখানে পরিস্ফুট। বড় কোমল, একটু কলহপরায়ণও বটে, কিন্তু সেখানে তারুণ্য তাকে সুন্দর করে তুলেছে। তার হৃদয়ের গান যেন শোকগাথার কোমলতায় মেদুর। নাইটিঙ্গেলের হৃদয়ের সবগুলো সুর সেখানে ঝরে পড়েছে। সে শুনল তার নিজের গান, রক্ত ঝরল তার বুক থেকে, সে কাঁদল। যাকে সে নিজের চাইতেও ভালোবাসে, তাকে সে নিজের মনের কন্দরেই ভালোবেসেছে—তারই জীবন্ত প্রতিধ্বনি আর প্রত্যুত্তর তার এই দুর্বল গাথাকে জানাল অভিনন্দন, তাকে দীর্ঘস্থায়ী করে তুলল।

জোরমঁ্যার হৃদয়ের গান কিন্তু তার চাইতে ঢের সবল। তার সুর এক নিশ্বাসে ঝরে পড়ল, কোথাও ব্যাহত হোলো না। কোথাও সুরের বিস্তারে এই অবস্থার কথা সে তাকে একরকম জানালই না। সে তখন তার বন্ধুর চিন্তাই করছে, নিজের কথা বলে তাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইল না। তার চিঠিতে রইল বন্ধুর স্বাস্থ্য, বন্দীশিবিরের সঙ্গী আর কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে প্রশ্ন। সে তাকে সান্ত্বনা দিল, দিল পরামর্শ, ক্লান্তি এল না এই পুনরাবৃত্তিতে। একটি শিশুকে যেন সে উপদেশ দিচ্ছে, স্নেহের ভৎর্সনা করছে, এমনি তার মনোভাব। কিন্তু শিশু তার কথার অনেকটাই শুনল না। এ উপদেশ একটু কেমন বেখাপ্পাই ঠেকল। কিন্তু বিদ্রূপপ্রবণ হৃদয় উপহাসে টলল না, আনেৎ চিঠি পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মুচকি হাসল। এই মানুষটির ভিতরে সে তার মাতৃত্বের সেই বিরাট আকুতি দেখতে পেল—রক্ষা করবার জন্য তার সে কি উদ্বিগ্নতা—তার সীমারেখা টেনে দেওয়া যায় না। সে এই দু'টি তরুণের মাঝে সেই শাশ্বত নারীকে আবিষ্কার করল—সকলের ভিতরেই সে রয়েছে, তাই তাকে স্বীকার করতে মানুষ লজ্জা পায়। সে এদের এই সম্পর্কের ভিতর খুঁজে পেল পবিত্রতা। তার হৃদয় স্পর্শ করল তারা।

না, এর ভিতরে দ্ব্যর্থবোধক কিছু নেই। এক স্ফটিক স্বচ্ছতা। স্বাভাবিক এই ভাবাবেগ, মধ্যাকর্ষণ শক্তির মতোই স্বাভাবিক। দু'টি আত্মা, দুই পৃথিবী, সূর্যের চারপাশে তার কক্ষদু'টি একসঙ্গেই ঘুরছে, যেন একই সঙ্গে তারা গাঁথা. মালিকের হাতে রয়েছে সে দড়ি। দুই শান্তি একই সঙ্গে মিলে এক ছন্দের সৃষ্টি করছে, এনে দিয়েছে বিরাম। মানুষের এই পালটাকে চিনতে না পেরে বানর আর বাঘভরা জঙ্গলে পথ হারিয়ে সাহায্যের জন্য যে মানুষ আর্তনাদ করছে, এই তো তারই শান্তি। হাঁ, আর এক শান্তিও আছে, এ শান্তি যার—সব কিছু সে জানে, বোঝে, বেশি করেই বোঝে; কিছু তাকে আঁকড়ে ধরতে চায় না, অথচ একজন মানুষের তাকে প্রয়োজন, নিজের জীবনের মুক্তির জন্যই সে তাকে চায়। হাঁ, মুক্তিদাতাই তাকে দেবে মুক্তি, সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের মুক্তিও নিয়ে আসবে সেই মুক্তির বিনিময়ে।

প্রকৃতির দান সেই দু'খানি বাহুর আশ্রয় নিতে কেন তারা ছুটে গেল না? হাঁ, সেইখানেই তো আমরা আমাদের কামনা আর উদ্বেগের জ্বলন্ত প্রবাহ উৎসারিত করে দিই—তার দুঃখ আর কামনার সঙ্গে মিশিয়ে দিই। হাঁ, প্রকৃতির সে-দান—নারী···সে তাদের গোপন ব্যাপার। আনেৎ কিন্তু বুঝতে

পারল। ফ্রানৎস-এর কাছে নারী ব্যবধান—এক ভয়। আর জোরম্যাঁর কাছে তিক্ততা, কেন না হতাশ হবার জন্যই সে প্রস্তুত। (ট্রেঞ্চে সাথীদের মধ্যে একা তারই এ অনুভূতি নয়।) দু'জনেরই প্রবৃত্তিগত অনুভূতি এক। মিথ্যা হোক বা সত্য হোক, তারা জানে নারী তাদের পৃথিবীর নয়, এক আলাদা পৃথিবীর। জোরম্যাঁ আনেৎকে শ্রদ্ধা করে, প্রীতির সম্পর্কও সেখানে আছে। আনেৎ-এর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু আনেৎ তাতে প্রতারিত হয় না। সে জানে, এ বিশ্বাসের মানে একমাত্র তারই সাহচর্য সে পাচ্ছে; সে তার একনিষ্ঠতায় বিশ্বাসী; তাছাড়া জোরম্যাঁ জানে না, আনেৎ তাকে আবিষ্কার করেছে। আনেৎ বহুবার লক্ষ্য করেছে যে, জোরম্যাঁ তাকে উদ্দেশ্য করে কথা বললেও তার লক্ষ্য সেই অদৃশ্য বন্ধু। ওদের চিঠি পড়তে পড়তে সে তুলনা করে দেখেছে। না, তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুর এ নয়। এ সুর সম্পূর্ণ আলাদা, এতে ঝঙ্কার আলাদা, ওদের বন্ধুত্বের দ্বৈত সংগীতে প্রতিটি গৎ যেন ছন্দে মূর্ত হয়ে ওঠে, এক সুসঙ্গত মিলন নিয়ে আসে। আনেৎ-এর ঈর্ষা হয়নি। বরং সে খুশি। ঐক্যতান বাদনে যোগ দেওয়ার চাইতে শোনাই তো ভালো!

কিন্তু যোগ সে দিয়েছে—নিজে বুঝতে পারেনি। তারই মনের অভ্যন্তরে দুই তার এসে মিলেছে। বেহালার সে-ই তো আত্মা!

॥ নয় ॥

আনেৎ দূতী হিসাবে আসা যাওয়া শুরু করল, তার ওড়নার আড়ালে ভাবধারার যে রহস্যময় আদান-প্রদান শুরু হোলো, সে-সম্বন্ধে শাভান পরিবার কিছু জানতে চাইল না।

শুধু সাত বছরের সেই ছেলেটির দৃষ্টি রইল সজাগ। সে মনে মনে আলোচনা আর গোয়েন্দাগিরি করে দু'জনের আদান-প্রদানের হদিস পেল। কিন্তু কাউকে বলল না। তার গোপন জীবন নিয়েই সে ব্যস্ত, বড়দের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। কি ঘটছে সে বুঝতে পারল না, কিন্তু যা কিছু দেখল তারই উপরে গড়ে তুলল এক অদ্ভুত রমন্যাস। তার মনে হোলো,

আনেৎ আর জোরম্যাঁর ভিতরে চলছে এক চটুল প্রেম। এই সুকেশীকে দেখে সে তো প্রথম দিন থেকেই আকৃষ্ট হয়েছিল, তাই বুঝি বিভ্রান্তও হোলো। সে তাকে ঘৃণা করল, আবার পাগলের মতোই ভালোবাসল।

মাদাম দ্য সেঝি-শাভান গর্বভরে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি কিছু জানতে চাইলেন না, চেষ্টা করলেন না।

মাদাম দ্য মারেউই এ ব্যাপারের কিছুই জানতে পারলেন না। তাঁর কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা হয়তো একে নিন্দাই করত, কিন্তু টের পেল না। জোরম্যাঁর প্রতি তাঁর এত শ্রদ্ধা ছিল যে তিনি জানতেন, তাঁর মতোই জোরম্যাঁ নিজেকে দেশের একমাত্র দাবির কাছে উৎসর্গ করেছে। তবু একমাত্র তিনিই বন্ধুত্বের বন্ধনের এই মাধুর্য বুঝতে পারলেন। কিন্তু জোরম্যাঁ কি করে সাহস করল দাবি জানাতে? তিনিও তো জোরম্যাঁর মতোই প্রেমে বঞ্চিত, তবু অভিযোগ তাঁর নেই, তার দুঃখ তিনি ভগবানের হাতে সঁপে দিয়েছেন—আত্মাহুতি দিয়েছেন তিনি। হাঁ, জোরম্যাঁ কি করে সাহস করল?

জোরম্যাঁর মা মাদাম দ্য শাভানই একমাত্র জোরম্যাঁর এই রহস্যের সন্ধান পেলেন। তাঁর কাছ থেকে গোপন রাখাও কঠিন। তিনি তাকে বারবার চিঠি পড়তে আর লিখতে দেখলেন। তাঁর সম্মতি ছিল না, কিন্তু কিছু বললেন না। আহা, ছেলেটি তার রোগে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে! তার কাজের সমালোচনা করা তো উচিত নয়। ওইটুকুই তো একমাত্র আনন্দ! পাছে এই রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে এই ভয়েই তিনি শিউরে উঠলেন। তারপর শুরু হবে এই অক্ষম আর সমস্ত পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ—দু'দলই তাঁর হৃদয় দলে পিষে দিয়ে যাবে। একদিকে তাঁর পরিবারের আচরণই যুক্তিসঙ্গত মনে হবে; আর একদিকে তাঁর ছেলে, তাঁর নিজের ছেলে। আইন তো আছেই, কিন্তু আইনের উপরেও তো আরো কিছু আছে।

মাদাম দ্য সেঝি-শাভানও বুঝতে পারলেন, কিন্তু স্বীকার করলেন না। বোন তিনি, জোরম্যাঁর মুখে মৃত্যুর ছায়া তিনি দেখতে পেলেন। চুপ করে প্রতীক্ষায় রইলেন সেই আসন্ন মৃত্যুর। তিনি বুঝতে পারলেন, কিছু যেন তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। মনে মনে স্থির করলেন, গোপনই থাক না, ক্ষতি কি! রোগীর ঘরে ঢোকবার আগে এখুন তিনি জোরে জোরে কথা বলে জানিয়ে দেন, তিনি আসছেন। ভাই তাঁর কাছ থেকে যা লুকোতে চাইছে, লুকিয়ে ফেলুক—এই তাঁর ইচ্ছে।

এবার আনেৎ-এর উপর তাঁর রাগ হোলো। প্রায়ই আসছে আনেৎ, অনেকক্ষণ বসে থাকে রোগীর কাছে। কিন্তু উদাসীনতা ছাড়া মাদাম গু সেঝি কিছুই প্রকাশ করলেন না, ভদ্র ব্যবহার দিয়ে মুড়ে রাখলেন সেই শীতল উদাসীনতা। কিন্তু এই ঔদাসীন্যের মানে যারা জানে এমনি দু'টি নারীর কাছে এর মূল্য তো যথেষ্ট নয়। যে অভিযানে সে নিমিত্ত মাত্র হয়েই এসেছিল, তারই জন্য আনেৎকে দায়ী করা হোলো। কিন্তু একটুকুও টলল না সে, তাকে সে স্বীকার করে নিল। জ্যোরমঁ্যাকে দেখতেই সে এ বাড়িতে এসেছে, অন্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। অন্যেরা উদাসীন হলেই বা ক্ষতি কি?

দুই বন্ধুকে সাহায্য করতে সে অক্ষম নয়, উদাসীনতাও দেখাতে পারে না।

হঠাৎ বন্দীর কাছ থেকে চিঠি পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। বন্দী-শিবিরে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ আর কঠিন বিধিনিষেধ কয়েক সপ্তাহের জন্য চিঠিপত্র দিল বন্ধ করে। এই অস্বস্তিকর নীরবতা রোগীকে অস্থির করে তুলল। যে ঝর্ণা সে খুঁজে পেয়েছিল, আবার তাকে হারালো। তৃষ্ণা গেল বেড়ে। সে যেন এক শুষ্ক মরুভূমি, ধু ধু করছে তৃষ্ণায়। প্রতিদিন আনেৎ এলে সে তার দিকে ক্রোধভরে চেয়ে থাকত, জানাত খবরের দাবি। তাকে নিরাশ করেছে বলে সে রেগে উঠত। এই নৈতিক উত্তেজনা তার অসুখ বাড়িয়ে দিল, অসুখ আবার বাড়ালো উত্তেজনা। কিছুদিন নিস্তরঙ্গ জীবন বিষের ক্রিয়া কমিয়ে দিয়েছিল, আবার সে তার কাজ শুরু করে দিল দ্বিগুণ উৎসাহে, দেহ যন্ত্র আক্রান্ত হোলো। কয়েক সপ্তাহের বিরামের ভানের পরে আবার এল ব্যাধির বর্বর প্রকোপ। কে জানে কোথায় এবার সে হানা দেবে? এক দিকে আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখলে, অন্য দিকে সে ছুটে যাবে। এ যেন এক আগুন, বাড়ির ভিতরে ছড়িয়ে পড়ছে। বাইরে থেকে আগুন নেবানো চলছে, কিন্তু আগুনের যেখানে অমিত শক্তি, সেখানে তো পৌঁছনো গেল না। বাড়ি ধসে পড়ছে। সবাই বুঝতে পারছে, তারা এ আগুন নেবাতে পারবে না।

জোরমঁ্যা একথা বুঝতে পারল সব চাইতে বেশি। এই অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে তখন সংঘর্ষে সে বিধ্বস্ত, পরাজিত। এই যুদ্ধে তার চরিত্র বদলে গেল। নিজেকে সে রক্ষা করতেই তখন ব্যস্ত, অন্যের কথা ভাববার সময় কোথায়? অহং জ্ঞানের কোটরেই তখন তার আশ্রয়। নিজের

কথা ছাড়া সে আর কিছু চিন্তা করল না। তার অসুখ, তার কামনা—আর কিছু নয়। রাতে জোরমঁ্যা অসহায় ভাবে তার চিতায় শুয়ে দেখল, লকলক করে উঠছে আগুনের শিখা। পুড়ে যাবার আগে তার বন্ধুকে একবার দেখার ইচ্ছে তাকে পেয়ে বসল।

অনিচ্ছাসত্বেও তার মা আনেৎকে রোগীর ঘরে যেতে দিলেন। ইচ্ছেয়ই মত দিলেন। কিন্তু কথা বলা তখন তাদের বন্ধ হয়ে গেছে। আনেৎ যে মুহূর্তে এসে ঘরে ঢুকত, জোরমঁ্যার চোখ তাকে উলটে-পালটে দেখত, তারপর চোখের জ্যোতি হতাশায় নিষ্প্রভ হয়ে যেত। তার নিজের দুঃখকে সে সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘিরে রাখত। আনেৎ তাকে ভোলাবার চেষ্টা করত, কিন্তু কৌতূহল তখন তার ফুরিয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে আনেৎ নিজেই থেমে যেত। নিরাশ হয়ে সে এবার উঠে দাঁড়াত, কিন্তু জোরমঁ্যা হাত দিয়ে ইশারা করে বাধা দিত, কটু ভৎর্সনা করত। একে উড়িয়ে দেওয়ার সাধ্য তার ছিল না। সে নিজেকে দোষী বলেই মনে করত। আশা সে জাগিয়ে তুলেছে, কিন্তু তার পরিতৃপ্তি সে আনতে পারছে না।

একদিন তারা একাই ছিল—মা ডাক্তারের সঙ্গে ঘর থেকে চলে গেছেন। ডাক্তার তার সঙ্গে আবার প্রতারণা করে গেছে—সে হঠাৎ আনেৎ-এর হাত চেপে ধরে বলল : 'আমি তো মরছি—'। প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করল আনেৎ। আবার সে বলল : 'আমি মরছি। আমি জানি। কিন্তু একবার তার সঙ্গে দেখা আমাকে করতেই হবে।'

আনেৎ তাকে বাধা দিল।

কিন্তু তাকে কথা বলবার ফুরসৎ না দিয়ে রুক্ষস্বরে জোরমঁ্যা বলল : 'হাঁ, এই আমার ইচ্ছা।'

'আমরা ইচ্ছা করবার কে?'

'তুমি একথা বলছ? তুমি?—'

বিব্রত হয়ে আনেৎ মাথা নিচু করল।

আবার রুক্ষ স্বর ঝরে পড়ল : 'এ তোমার মেয়েলী গর্ব! তুমি তো মিথ্যেবাদী!'

নিজের পক্ষ সমর্থন আনেৎ করল না। বললে : 'বেচারী বন্ধু আমার, যদি পারতাম তোমার জন্য সব কিছুই করতাম, কিন্তু কেমন করে করব? উপায় কি?'

'উপায় খুঁজে বার কর! ওকে আর একবার আমি দেখতে চাই, তার আগে তুমি আমাকে মরতে দিয়ো না।'

'না না, তুমি মরবে না।'

'আমি তো মরছি। মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আমি করছি না। তার উপায়ও নেই! এই তো আইন। কিন্তু মানুষের এই পশুত্ব তো আমি কখনো স্বীকার করব না। সে আমার কাছে, আমার পাশে,—আমার একমাত্র বন্ধু সে। অথচ তার সঙ্গে দেখা করতে আমি পারব না! না, না, এ এক অমানুষিক বর্বরতা!'

আনেৎ চুপ করে রইল। সে ভাবছিল হাজার হাজার অশান্ত আত্মার কথা। ট্রেঞ্চ থেকে তারা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের জীবনীশক্তি হ্রাস হয়ে গেছে। তারা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সেই সুদূরের গৃহকোণের দিকে—যেখানে তাদের নিঃসঙ্গ প্রিয়জনেরা নিদ্রাহীন ব্যথায় এপাশ ওপাশ করছে, গুমরে মরছে। জোরম্যাঁ বুঝতে পারল তার মনের কথা; বলল:

'সবাই বশ্যতা স্বীকার করতে পারে, আমি করব না। এই তো আমার জীবন, এক মুহূর্ত হয়তো আর টিকবে না। আমি অপেক্ষা করতে রাজি নই। আমার দাবি আমি পেতে চাই।'

আনেৎ-এর হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, কিন্তু কিছু সে বলল না; তার হাত দু'খানা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু হাত সে রেগে ঠেলে দিল, পিছন দিকে সে মুখ ফিরিয়ে শুলো। আনেৎ চলে এল বাইরে।

সে-রাতের অন্তঃসংঘর্ষের পর সে আবার পরদিন ফিরে এল। রোগী তেমনি পড়ে আছে বিছানায়। কালকের উত্তেজনার চাইতে এই স্থৈর্য যেন বেশি তীব্র। শান্ত বিষণ্ণ স্বরে সে বলল: 'আমি ক্ষমা চাইছি। পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। ন্যায়ের দোহাই পেড়েছিলাম, নিজের দাবি জানিয়েছিলাম। ন্যায়ের দোহাই তো মিথ্যে, দাবিও আমার নেই। যারা যুদ্ধে লুটিয়ে পড়ল, তারা তো অভাগা! কি আর করবে, মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকবে, নিজেদের চিৎকার বন্ধ করে দেবে মুখে মাটি পুরে। পোকাকে তো মাড়িয়েই যেতে হয়। না, না, এ নির্বুদ্ধিতা! এই আমি চুপ করলাম। আর বাধা দেব না।'

বিন্দু বিন্দু ঘাম তার কপালে দেখা দিয়েছে, আনেৎ কপালে হাত রাখল। 'না, না, বাধা তোমাকে দিতেই হবে। কিছুই এখনো হারায়নি।

এইমাত্র তোমার ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হোলো। তিনি তোমাকে সুইজারল্যাণ্ডের কোনো স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠাতে পরামর্শ দিয়েছেন। হাওয়া এখানকার ভালো নয়, স্যাঁতসেঁতে, নৈতিক আবহাওয়াও খারাপ। যাই-ই কিছু করতে চাও না কেন, যুদ্ধ সবকিছুকেই সংক্রামিত করবে, বিষাক্ত করে দেবে। ওখানে তুমি পাহাড়ী পরিবেশে নিশ্বাস নেবে, শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘুরে বেড়াবে, নিশ্চয়ই তোমার স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। ডাক্তার তো এই কথাই বললেন।'

'মিছে কথা! হাঁ, সে আমাকেও ওকথা বলেছে। সে জানে, আমি মরছি; তাই সে আমাকে দূরে মরতে পাঠাচ্ছে। আমার হাত থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে চায়। কিন্তু আমি বলি: না, আমি এইখানেই মরব।'

আনেৎ তাকে চেষ্টা করল বোঝাতে, কিন্তু সে বার বার আউড়ে গেল: 'না, না, না!'

দাঁতে দাঁত চেপে ধরে রইল, কথা সে বলতে চায় না, এ এক একগুঁয়ে একরোখা বাধা।

আনেৎ ঝুঁকে পড়ল তার বিছানার উপর, বিষণ্ণ স্বরে বলল: 'একি শুধু ওর জন্যই?'

'হাঁ, যদি আমি ফ্রান্স ছেড়ে যাই, ওর কাছ থেকে তো আরো দূরে চলে যাব।'

আনেৎ বলল: 'কি করে জানলে?'

'তার মানে?'

আনেৎ ঝুঁকে পড়ে বলল: 'যদি অন্যরকম হয়। ধর, ওর আরো কাছে চলে গেলে তুমি?'

সে চেপে ধরল তার হাত, তাকে কাছে টেনে নিয়ে এল: 'কি, কি বলছ তুমি?'

সে হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল, কিন্তু জোরম্যাঁ ছাড়ল না। পরস্পরের মুখে পড়ছে পরস্পরের নিশ্বাস।

'তোমাকে সুইজারল্যাণ্ড যেতেই হবে। বন্ধু আমার, বল, বল যাবে!'

'আগে আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দাও, কি বললে তুমি।'

'আঃ লাগছে! আমাকে ছেড়ে দাও।'

'না, আগে বল!'

তার কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে, জোরম্যাঁর গায়ে ভর দিয়ে আনেৎ কাঁপতে কাঁপতে মৃদুস্বরে দ্রুত বলল: 'শোনো! এখনো ভেবে কিছু ঠিক

করতে পারিনি। একটা উপায় ঠাউরিয়েছি মাত্র। তোমার কাছে বলে বোধ হয় ভুলই করলাম, কিন্তু চেষ্টা করে দেখব। ঝুঁকি ঘাড়ে নিতেও আমি প্রস্তুত।'

সে তার হাত চেপে ধরল : 'বল, আমাকে বল!'

'কাল রাতেই এ কথা ভাবছিলাম। এখানে এসে শুনলাম, তোমাকে সুইজারল্যাণ্ড পাঠাবার পরামর্শ হয়েছে। ও যদি পালাতে পারত!'

জোরম্যাঁ আনেৎকে জড়িয়ে ধরল। সে পড়ে গেল বিছানায়, তার মুখ জোরম্যাঁর মুখে সংলগ্ন। সে চুমু খেল তার ঠোঁটে, নাকে, তার ঘাড়ে—কি উদ্দাম সে-চুম্বন! আনেৎ অবাক হোলো, অভিভূত হোলো; মুহূর্তের জন্য হারাল সম্বিৎ, এবার সে উঠে দাঁড়াল। জোরম্যাঁ বুঝতে পারল না সে কি করছে। সেও উঠে বসে চিৎকার করে বলল : 'হাঁ, ওকে পালাতে সাহায্য তোমাকে করতেই হবে। সুইজারল্যাণ্ডে তুমি ওকে নিয়ে আসবে আমার কাছে।'

দু'জনেই নীরব, অভিভূত, ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে পাচ্ছে।

আবার সে যখন কথা বলবার শক্তি ফিরে পেল, আনেৎ তাকে শুয়ে পড়তে বলল। হুকুম মেনে নিয়ে সে শুয়ে পড়ল। বিছানা আর বালিস সমান করে দিল আনেৎ। জোরম্যাঁ বাধা দিল না। ব্যবস্থা করে দিয়ে সে বসে পড়ল বিছানার পাশে। দু'জনেই ভুলে গেল কি হয়েছিল (তাতে আনেৎ-এর কি ক্ষতি হোলো, কি ক্ষতি হোলো জোরম্যাঁর!) এবার তারা পালাবার ফন্দি নিয়ে শুরু করল জল্পনা-কল্পনা।

॥ দশ ॥

আনেৎ পারীতে ফিরে এল। এসেই সে গেল তার পুরনো বন্ধু মার্সেল ফ্রাঁর কাছে। মার্সেল-এর পরনেও চমৎকার উর্দি। কারুকলা বিভাগের একজন হোমরা-চোমরা হিসেবে সে সবে রোম থেকে এক রহস্যময় উদ্দেশ্য সমাধা করে ফিরে এসেছে। সে-উদ্দেশ্য সাধনে বিপদ ছিল না বটে, কিন্তু মহিমা ছিল। এখন সে এমন একটা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত, যার কাজ হচ্ছে যুদ্ধের আওতা থেকে চারুকলার সংরক্ষণ। যুদ্ধের এই কাজে তার অতিরিক্ত উৎসাহ নেই, বরং যুদ্ধকে সে অজ্ঞতা বলেই মনে করে। আর অজ্ঞতাই তো

স্বাভাবিক—মানুষের ওইতো পরিমাপ। খুব উৎসাহ সে দেখাল না, তবু আনেৎকে পেয়ে সে খুশিই হোলো। তখুনি হাসতে হাসতে তাকে জানাল সম্বর্ধনা। ঠিক তেমনি পুরনো দিনের হাসি তার মুখে। মাথায় তার বিরাট টাক পড়েছে, কিন্তু তার সৌন্দর্য যেন আরো বেড়ে গেছে। মুখখানায় এখনো তারুণ্য, চোখ দু'টো জ্বল জ্বল করছে, দাঁতগুলিও তার সুন্দর। হাল্কা নীল রঙের যোদ্ধার পোশাকে তাকে মানিয়েছেও বেশ।

শুধু দু'জনে ঘরে। পরস্পরের কুশল-জিজ্ঞাসা শেষ হলে আনেৎ এবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। মার্সেল-এর দাঁতের দিকে সে চেয়ে রইল; এখনো সেখানে হাসি। অন্যমনস্কভাবে মার্সেল শুনে গেল তার কথা, তার চোখ দু'টি তখন আনেৎকে দেখতে ব্যস্ত। আনেৎ হঠাৎ থেমে গেল: 'তুমি কিন্তু শুনছ না!'

'সেইটেই তো স্বাভাবিক,' সে বলল: 'তোমাকে আবার দেখতে পেলাম, এখন কি আর কথা শোনবার ফুরসৎ আছে! তার চাইতে ঢের ভালো কাজ করছি। আমাকে ক্ষমা কর! শুনছি বইকি তোমার কথা। আমি জানি, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসনি, আমাকে দরকার বলেই এসেছ। তোমার প্রয়োজনে আসতে পারলে তো খুশিই হব। সে তো তুমি আর আমি দু'জনেই জানি। তাই তোমাকে দেখছিলাম।'

'অত কাছে এসো না। আমি তো এখন বুড়ো হয়ে গেছি।'

'এই তো মধ্যাহ্ন। গ্রীষ্মের পরিপূর্ণতা তোমার রূপে।'

'হেমন্তও তাকে বলতে পার।'

'আচ্ছা তাই না হয় বললাম। কিন্তু হেমন্তের সেই সুপক্ক পরিণতি তো ভোলা যায় না!'

'শুধু পরিণতি নিয়ে কি হবে, ফুলও তো চাই।'

'কিন্তু ফুল আর ফল দুই-ই আমি ভালোবাসি।'

'বেশ, মানলাম, সব কিছুই তুমি ভালোবাস। এখন আমার কথা শুনবে?'

'বলে যাও!'

'তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ আমি ভিখারী হয়েই তোমার কাছে এসেছি। এতদিনের দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আজ তোমার কাছে কোনো প্রার্থনা নিয়ে আসতে লজ্জিত হওয়াই আমার উচিত ছিল। কিন্তু আমার নিজের ব্যাপারে আমি আসিনি।'

'একথা বলে রেহাই পাবে না।'

'বেশ তো, না-ই পেলাম।' আনেৎ উত্তর দিল: 'অন্যের ব্যাপার বলেই লজ্জা আমি হজম করে ছুটে এসেছি। আচ্ছা, যার প্রতি তোমার কৌতূহল আছে, সে কি তোমার থেকে ভিন্ন? তোমার সত্তায় সে তা মিশে গেছে। সত্তার কোথায় শুরু আর শেষ, কে জানে?'

'সত্তার সাম্যবাদ! বেশ, বেশ, তোমার ব্যাপার না হয় আমার ব্যাপারই হোল! এখন শোনা যাক তোমার কাহিনী।'

আনেৎ তাকে বলল তরুণ বন্দীর কাহিনী। মার্সেল তার নাম জানত। একটা চিত্র প্রদর্শনীতে তার দু'একখানা ছবিও দেখেছিল, কিন্তু সেগুলো উল্লেখযোগ্য নয় বলেই মনে দাগ কেটে যায়নি। কিন্তু যত নগণ্যই হোক না কেন, সে শিল্পী—তারই বিভাগের একজন। আনেৎকে সে উদারতা দেখাতে ত্রুটি করল না, তার প্রতিপত্তি খাটিয়ে বন্দী-শিবিরে ফ্রানৎস-এর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতিপত্র জোগাড় করে দিল।

আনেৎ ঈস্টারের ছুটিতে বেরিয়ে পড়ল অভিযানে। ছেলের কাছে না গিয়ে সে রওনা হোলো আঁজের-এ। প্রথম তাকে ফ্রানৎস-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নির্ভর করছে তার উপর।

এতদিন সে তাকে বন্ধুর ভালোবাসার ভিতর দিয়েই দেখে এসেছে, তাই তার সঙ্গে দেখা করবার চিন্তা তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। জোরম্যাঁর চিন্তাধারার সে অংশীদার হয়ে তার ভালোবাসাকে সে নিজের করে নিয়েছে: তার হৃদয় ফ্রানৎস-এর চিন্তায় বিভোর, চোখ পক্ষপাতদুষ্ট—সে তো তার চোখ দিয়েই দেখছে। এ নারীমনের পেলব নমনীয়তা; নারী একে জানে, এরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আবার এরই চর্চা করতেও ছাড়ে না। এর ভিতরে বিপদ লুকিয়ে আছে সে জানে, কিন্তু মাধুর্যে বিহ্বল হয়ে যায়। তার ইচ্ছাশক্তি শিথিল হয়ে আসে, বিবশ হয়ে পড়ে। ঢালু পথে সে নিজেকে ছেড়ে দেয়···

আঁজের এগিয়ে আসছে। ট্রেনের কামরায় বসে আনেৎ তার বুকে অনুভব করল জোরম্যাঁর বুকের জ্বালা। সে চেপে ধরল তার বুক। হাঁ, স্থির তাকে হতে হবে।

॥ এগারো ॥

ফ্রানৎসকে বন্দী-অবস্থায় খুব কষ্ট পেতে হয়নি। তাদের বন্দীশিবিরে খানিকটা স্বাধীনতাও আছে। অনেক বন্দীই শহরে কাজ করে, স্বাধীনতাও তাদের আছে বইকি। তবে ভোর আর সন্ধ্যেয় নাম ডাকার সময় নিয়মিত হাজরে দিতে হয়। পাহারাও শিথিল; কর্তৃপক্ষ তাদের নিরীহ বলেই জানেন। সীমান্ত থেকে তো তারা অনেক দূরে, পালাবার ইচ্ছে থাকলেও সেখানে পৌঁছনো সোজা নয়। আর সত্যিকথা বলতে কি, এরকম কোনো কল্পনাও তাদের মনে উদয় হয়নি। ১৯১৪ সালের আগে থেকে এদের অধিকাংশই পারীতে জীবন যাপন করেছে, জার্মানীর আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদ ব্যথাও সহ্য করেছে, কিন্তু তাদের সংঘর্ষ আর বিপদের ভাগীদার হতে কখনো ইচ্ছে হয়নি। আর এখানকার বাসিন্দারা—এই সমৃদ্ধ ঘুমন্ত পশ্চিমের বাসিন্দারা একথা ভালো করেই জানে! তারা গোপনও করল না সেকথা।

ফ্রানৎস একটু-আধটু ছবি আঁকছিল। বন্দীশিবিরের অধ্যক্ষের স্ত্রী তাকে দখল করে বসলেন। সে তাঁর বসবার ঘরের সাদা দেয়ালে আঁকল ছবি; বুশার এক শিষ্যের আঁকা ছবি ছিল দেয়ালে: ছবিখানির বিষয়বস্তু এক নগ্ন নারী: কিউপিড তাকে তাড়া করেছে। রং বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, ফ্রানৎস তাকে আবার উজ্জ্বল করে তুলল, আবার দেখা দিল মাংসের গোলাপী আভা। ভদ্রমহিলা যদি এই জার্মান বন্দীকে চাকর বলে না মনে করতেন, তাহলে কাজটা নেহাৎ খারাপ ছিল না। গর্বিত, লাজুক, অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ অভিজাত ফানৎস এই অপমান সহ্য করল বটে কিন্তু আহতও হোলো। কিন্তু তার সঙ্গীদের চামড়া পুরু বলেই কোনো দাগ রেখে গেল না। হয়তো এই জন্যেই অধ্যক্ষের স্ত্রী আরো মজা পেলেন। যতই ইতর হোক না কেন, তাদের শিকার চিনে নেবার মতো সূক্ষ্ম বুদ্ধিটুকু মেয়েদের আছে। তারা তাদের সহজাত প্রবৃত্তির নিষ্ঠুরতা এমনি করেই পরিতৃপ্ত করে।

ফ্রানৎস দিনের শেষে যখন কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরত, মন তার ভরে যেত তিক্ততায়। বাইরে এসে স্বস্তির নিশ্বাস সে ফেলত না, পাইপ ধরিয়ে গোধূলির মায়াময় পরিবেশে দিনের ক্লান্তি উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাও সে কখনো করেনি। আকাশ আর সন্ধ্যা—উষ্ণ মায়াময় আপেলের মতোই পরিপূর্ণ,

রসালো। কিন্তু ফ্রানৎস বিষণ্ণ মনেই পথ চলত। এমনি এক সন্ধ্যায়ই আনেৎ-এর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

তাকে এড়াবার জন্যে সে চেষ্টা করল। নারী সম্বন্ধে ছিল তার লজ্জা, আকর্ষণেরই নামান্তর। আনেৎ তাকে ডাকল নাম ধরে। ফ্রানৎস থেমে পড়ল না; হাঁটতে হাঁটতে সে একবার ট্যারচাভাবে তাকাল, চোখে তার অস্থৈর্য, ভ্রূ কুঁচকে গেল। দুশ্চিন্তা আর বিরক্তির ছাপ লেগেছে মুখে, কেউ যেন তার সতীত্ব নষ্ট করতে চেষ্টা করছে—এমনি ভাব। আনেৎ হাসল। তরুণ জোসেফ তার জোব্বাটা রক্ষা করবার চেষ্টা করছে; সে বলল: 'জোরমঁ্যা আমাকে পাঠিয়েছে···'

ফ্রানৎস অবাক, তোতলা বনে গেল : 'জোরমঁ্যা শাভান?'

তার চোখে কি খুঁজল। আনেৎ-এর চোখ দিল উত্তর: 'হাঁ।' ফ্রানৎস তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল।

হাঁ, টেনে নিয়েই চলল, একগুঁয়ে শিশুকে যেমন করে টেনে-হিচড়ে নিয়ে যায়। আনেৎ ছাড়িয়ে নিল না হাত। কেউ দেখে ফেলতে পারে, এ ভয় থাকলেও সে বাধা দিল না। রাত হয়ে এসেছে; পথে এক চাষার কিশোরী মেয়ের সঙ্গে দেখা। সে হেসে উঠলো ওদের দেখে। এবার একটা গলি পেরিয়ে ওরা পড়ল খোলা মাঠে। একটা বাগান, ধসে-পড়া দেয়াল চারদিকে। ওরা একটা ভাঙা জায়গা দেখে বসে পড়ল। আর রাস্তার লোকের নজরে পড়তে হবে না। পাশাপাশি বসলো দু'জনে, হাঁটুতে হাঁটু ঠেকছে। ফ্রানৎস ঝুঁকে পড়ল আনেৎ-এর দিকে, তার হাত তখনো সে ছেড়ে দেয়নি। ফ্রানৎস-এর স্বরে ঝরে পড়ল অনুনয়: 'বল, জোরমঁ্যার কথা বল!'

গোধুলির ম্লান আলোয় আনেৎ-এর মনে হোলো দু'টি আকুতিভরা চোখ তাকে ঘিরে ধরেছে, দাবি জানাচ্ছে তার কাছে। হাঁ, দাবি জানাচ্ছে, আবার নিষেধও বুঝি করছে।

সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। চোখদু'টি ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে। সন্দেহ এসে ছায়া ফেলছে, অস্বীকার সে করতে চায়, আবার উদ্ধত গর্বে তার গোপন কথা প্রকাশ করতেও বুঝি সে রাজি। আবার বদলে গেল রং—একার নিষ্প্রভ ঘুমেভরা দুই চোখ। পাতলা ধুসর চুল, কপাল সুগোল, নাক সরু, ঠোঁট দু'টি অপরিপূর্ণ; মুখে ছেলেমানষি ভাব; আনন্দ আর বিষাদের প্রতীক্ষায় যেন সে রয়েছে। খাঁটি ছেলেমানুষ। জোরমঁ্যা তার সম্বন্ধে যা বলেছিল,

আনেৎ মনে মনে মিলিয়ে দেখল। ভেবে অবাক হয়ে গেল, কি করে এই শিশুর প্রতি জোরম্যাঁর এই আকর্ষণ সম্ভব হোলো!

হাতের চাপে এবার আনেৎ-এর মনে পড়ল তার প্রশ্নের উত্তর সে চায়। সে বলতে শুরু করল ফ্রানৎস-এর সেই সুদূরের বন্ধুর কথা। প্রতি মুহূর্তে প্রশ্ন এসে তার কথায় বাধা জন্মাল। উদ্বিগ্নতায় এল বিরতি; আনেৎ পরখ করে দেখল তাকে। জোরম্যাঁর জন্য তার মন উদ্বিগ্ন হয়েছিল, এবার এই যুবকটির জন্যও হোলো। সাবধানেই তার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে।

শিবিরের বিউগল এবার বেজে উঠল, ওদের মনে পড়ল আর একবারও বেজে গেছে বিউগল। এখনই বিদায় নিতে হবে। আনেৎ তাকে পরদিন দীর্ঘ আলাপের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে বিদায় নিল। হাত ছেড়ে দিল তারা, ফ্রানৎস এতক্ষণ পরে টের পেল আনেৎ-এর হাত তার হাতের মুঠোয় এতক্ষণ ছিল। সে তাকাল আনেৎ-এর হাতের দিকে। তার নিজের হাতের দিকে পড়ল তার চোখ। সে বলে উঠল: 'এই হাত তাকে স্পর্শ করেছে…'

হাতের ওপর মুখ চেপে ধরে সে গন্ধ শুঁকল, আনেৎ-এর হাতের গন্ধ।

বারো

আনেৎ শীগ গিরই বুঝতে পারল ফ্রানৎস-এর পক্ষে কোনো সুষ্ঠু উপায় উদ্ভাবন বা তাকে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। তার ভিতরে উদ্দামতা নেই এমন নয়। সে বিপদের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে; বরং তার রাশ টেনে রাখাই দায়। আনেৎ তাকে পালাবার উপায় সম্বন্ধে প্রথম কথা বলতেই সে এত ক্ষেপে গেল যে, আনেৎ তাকে থামিয়ে দিতে বাধ্য হোলো। মনের কথা রইল মনে। কি জানি ফ্রানৎস-এর অপরিণামদর্শিতা আর হঠকারিতা যদি সব নষ্ট করেই দেয়। যা কিছু করবার ওকে ছাড়াই করতে হবে, কাজের মুহূর্ত আসার আগে ওকে কিছুই বলা হবে না। আর তখনো একা সে কিছু করতে পারবে কিনা সন্দেহ। হাত ধরে তাকে পদে পদে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর পালাবার আশা যদি বা আগে ছিল, এখন একেবারেই নেই। কিন্তু আনেৎ তবু আশা ছাড়ল না। সে

তো প্রতিশ্রুতি-বন্দী ; বন্ধুত্বের সেই উদ্দামতার কবলে সে ধরা পড়েছে ; দুই ধারা এসে তার উপর পড়ছে আছড়ে। সে যেন দুই নদীর মোহনায় এক ছোট্ট দ্বীপ। সে স্থির, কিন্তু স্রোতের ধাক্কায় উলটে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তে তাকে চঞ্চল করে তুলছে। দুই বন্ধুর মনের অস্থিরতার সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই বটে, কিন্তু ঘূর্ণিতে সে আত্ম-সমর্পণ করেছে বইকি।

বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধ-ছিন্ন এই দুই বন্ধুর এ যেন এক আত্মিক আনন্দ—এক শৌর্যের বন্ধন—যে পৃথিবী সে-বন্ধনকে অস্বীকার করে, তারই বিরুদ্ধে এক উদ্দাম আত্মা একে গড়ে তুলছে—গড়ে তুলছে এক দুঃসহ পীড়নের বিরুদ্ধে। এই শৌর্য এক অদ্ভুত রূপ নিয়েছে জোরম্যাঁর ভিতরে। দু'জনের মধ্যে তার শক্তি বেশি, দুর্বলকে সে রক্ষা করছে এই সংগ্রামে, আহত হয়েছে, নুয়ে পড়েছে ; তরুণ বন্ধুকে ঘিরে রেখেছে তার সমস্তখানি ভালোবাসা দিয়ে। আর তরুণ ফ্রানৎস, শত্রুর শিবিরে বন্দী ফ্রানৎস ! তার কাছে এক অতিন্দ্রীয় ভক্তির রূপ নিয়ে এল এই বন্ধুত্ব। তার রক্ষক-বন্ধুর দূরত্ব তাকে লোকাতীতের পর্যায়ে উন্নীত করল—সে যেন বেদীর উপরের সন্তদেরই অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধ তাদের অনুভূতিকে দিল বিকৃত রূপ—তারা পরস্পরের চোখে মহিমা বা করুণার স্ফীত রূপ নিয়ে দেখা দিল। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তারা হয়তো এতটা উপরে উঠতে পারত না, আর সবার মতো দৈনন্দিন পরিবেশেই তাঁবু ফেলত, কিন্তু বিপদ আর অস্থৈর্য তাদের এমন এক পরিবেশে নিয়ে হাজির করল, যেখানে শুধু প্রার্থনাই পৌঁছে দিতে পারে। যারা জীবন থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়েই পড়েছে, তাদের বন্ধুত্ব তো অধ্যাত্মমার্গে গিয়ে পৌঁছবেই। কিন্তু যে তিনজন এই পথে চলল—জোরম্যাঁ, ফ্রানৎস আর আনেৎ—কেউই ভগবানকে মানে না। কিন্তু একথা তাদের বুঝতে দেরি হোলো না যে ভগবান তাদের কাছে বন্ধুত্বের রূপ নিয়েই দেখা দিয়েছেন—এ যেন জুপিটারের রূপ পরিবর্তন আর কি। তারা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তাঁরই সত্তায়। তারা তাঁরই কাছে নিজেদের উৎসর্গ করছে।

তিন জনের ভিতরে আনেৎ-এর অবস্থাটাই সবচেয়ে অদ্ভুত। এর আগে সে এদের দু'জনের জন্য এমন কিছু অনুভব করেনি যাকে ভালোবাসা বলা যায়। তার ব্যক্তিগত অনুভূতি করুণার সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়নি—আর কোনো নারীর পক্ষে দুঃখী আত্মার জন্য সেইটুকুই তো স্বাভাবিক। দুঃখী আত্মা তাকে চাইছে—তাছাড়া সে পুরুষ—তার শক্তিহীনতাও তো আর এক আকর্ষণ।

কিন্তু জোরম্যাঁ আর ফ্রানৎস-এর অক্ষমতা সীমারেখার বাইরে টেনে নিয়ে গেল তাকে। তারই মধ্যস্থতায় তাদের ভাবের আদান-প্রদান চলল, আর তাদের মনের রং ধরল তার মনে। তারা পরস্পরকে ভালোবাসল তাকে কেন্দ্র করে। সে হোলো তাদের প্রতিনিধি, তাদের দূতী।

শক্ত কাজ বইকি। এ কাজে কাঁধ দিয়ে সে পাগলামি করল না তো? সে যখন একা থাকে, এই কথাই ভাবে, থেমে যেতেই ইচ্ছে করে। কিন্তু মেশিন যে চলতে শুরু করেছে, চাকার ঘূর্ণায় সে আরো জড়িয়েই পড়ছে।

পারী ফেরবার সময় ট্রেনে একথা ভেবে ভয়ই পেল। বিপদ বুঝি কাটিয়ে উঠতে পারবে না। দুই বন্ধুর প্রতি তার কর্তব্য বুঝি সে পূর্ণ করতে পারবে না। একটা পাথরের নিচে রয়েছে এক গাছা খড়। সে যেন একটা পিঁপড়ে, খড়গাছা টেনে বার করবার চেষ্টা করছে। বার করতে যদি বা পারে, কিন্তু ঝুঁকিও কম নয়। কি জানি, পাথরখানা হয়তো তাকে পিষে মেরে ফেলবে। কিন্তু একটা পিঁপড়েকে এ বিপদ তো দাবিয়ে দিতে পারে না। আনেৎ-এর বরং এতে উৎসাহ বেড়েই গেল। তার মনের একটা দিক বিপদকে বরণ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল, আর একদিকে তার মনের দুর্বলতা পেল ভয়।

হা ঈশ্বর! কি কাজ হাতে নিলাম? এখন কি ছেড়ে দিতে পারি না, পালিয়ে যেতে পারি না? কে আমাকে রুখবে? আমি, আমি রুখব! হাঁ, ঠিক রুখব!

সে একা। রাষ্ট্রের পর্বতের মুখোমুখি সে দাঁড়িয়ে। জাতির বিকৃত ভয়ংকর মূর্তি তার সুমুখে। কুপিতা দেবীদের পায়ের তলায় সে পড়ে আছে। তারা তাকে ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু নুইয়ে দিতে পারবে না। তাদের সে আর বিশ্বাস করে না। যে মুহূর্তে সে মানুষের আদিম আর পবিত্র স্নেহ, বন্ধুত্ব আর ভালোবাসাকে এই বর্বরতার পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যেতে দেখেছে,—বাকি সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার কাছে। বাকি আর কি? পশুশক্তি তো? সেই পশুশক্তির বিরুদ্ধে আছে আত্মা।

পাগলামি? বেশ তো তাইই হোক না। তাহলে তো আত্মাও পাগলামি। এই পাগলামি আছে বলেই তো আমি বেঁচে আছি। অতল গহ্বরের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি—সন্তরা বুঝি এমনি করেই জলের উপর হেঁটে বেড়াতেন!

॥ তের ॥

ঈস্টারের আগের মঙ্গলবারে সে এসে পৌঁছল ; পারীতে মাত্র ছুটির পাঁচ-দিন কাটাতে পারবে। উদাসীন মার্ক খুবই নিরাশ হোলো। ছ'মাস আগে হলে বলা যেত, শিকার হারাবার জন্যেই তার এই নিরাশা।

কিন্তু সে-মার্ক নেই। সে-আনেৎও আর নেই। আবহাওয়া বদলে গেছে। গত ছ'মাসে মার্ক-এর ভালোবাসা আর বন্ধুত্বের ধারায় এসেছে পরিবর্তন। এখন যা আছে সে তো তুষ, শস্যের কণাও হয়তো মিলবে না। কঠোর তার দৃষ্টি, করুণার লেশমাত্র নেই—এমনকি নিজের প্রতিও বুঝি নেই। মার ঐ মায়োপিয়াগ্রস্ত, উজ্জ্বল, উষ্ণ চোখের জন্য তো নয়ই। তার মাসীর ঈর্ষিত চোখের জন্যও নয়। খাপ খাইয়ে নিতে সে পারে না—যা কিছু পায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলাই তার স্বভাব। তারপর আর ক্ষণিকের বন্ধুত্বের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। মার্ক খোসাটা ভেঙ্গে ফেলে ভিতরে পোকা বা ময়লা খুঁজে বেড়ায়, কখনো আসে শূন্যতা। কিন্তু এক জায়গায় সে শূন্যতা পায়নি—সে তার মার হৃদয়। সে তার ঠোঁট দিয়ে এরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু আঁচর কাটতে পারেনি সেখানে। কি ধাতুতে সে তৈরি কে জানে! কিন্তু এখনো ঠিকই আছে, একটু বিকৃত হয়নি। মার্ক সম্ভ্রমে নুয়ে পড়ল। তার ইচ্ছা, সেখানে সে ঢুকবে—তবে স্বীকার সে করল না। সিলভী তার খুবই প্রিয়, কিন্তু তাকে সে ঘৃণাই করে, সে-ঘৃণায় আছে ভালোবাসার মিশেল। সে জানত সিলভীর গোপন ব্যাপারের উপর সে ভরসা করতে পারে—এর জন্য সে তার কাছে কৃতজ্ঞই—কেননা, এতে তারই সুবিধে। (কিন্তু একটা শর্ত আছে: ধরা পড়লে চলবে না, নির্বোধের জন্য তার একটুও অনুকম্পা নেই)। কিন্তু আনেৎ-এর সঙ্গে সিলভীর তফাৎ আছে বইকি। আনেৎ-এর আত্মার দুর্গে পৌঁছনো দুর্গম বলেই সে-দুর্গ জয়ে আনন্দ আছে। এই ছ'মাসে সে এইটুকু বুঝতে পেরেছে যে, তার মা তাকে ভালোবাসে, কিন্তু সে-ই তাকে আঁকড়ে ধরতে পারছে না। মাতৃস্নেহ এক সহজাত প্রবৃত্তি, কিন্তু মার্ক আরো কিছু চায়। সে বুঝতে চায়, নিজেকে বোঝাতে চায়, চায় অধিকার জানাতে—অন্তরের রাজত্বে যত অধিকারের বিস্তার হয় ততো ভালো। মাকে সে চায়,

তার সত্তাকেও সে বাদ দিতে চায় না। মা তো সকলেরই মা, এক অজ্ঞাতনামা স্ফুটনযন্ত্র। কিন্তু প্রতিজনের সত্তার আড়ালে যে নির্যাস আছে, তার কোনো মিল নেই—সেই নির্যাসেই তো তৈরি হয় সুগন্ধি। সে সেই সুগন্ধির সন্ধান পেয়েছে। ঢাকনার নিচে পৌঁছুতে হবে, তারপর তো পাবে এক কণা সুগন্ধি। তুমি, তুমিই···একবারই তো তোমার অস্তিত্ব জাহির করতে পার···হাঁ, আমি তোমার গোপন মনের সন্ধান চাই!···

কি করবে সে সুগন্ধি নিয়ে? যখন পরিতৃপ্তি আসবে, ছুঁড়ে ফেলে দেবে না তো? এই খুদে জন্তুরা, এই কিশোররা, অধিকার বিস্তারের জন্য উন্মুখ, কিন্তু অধিকার বজায় রাখতে তো জানে না। তাই তাদের দাঁতের নাগাল থেকে এই কাম্য অমূল্য সম্পদ সরিয়ে রাখাই তো দরকার।

আনেৎ-এর কাছে সেই অমূল্য সম্পদ আছে। সে নিজেকে বিলিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে, তার হাসি মাখা ঠোঁট দুটি উৎসর্গের কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে; কিন্তু যে কৌটোয় তার সত্তা লুকিয়ে আছে, তার চাবি তো তার কাছে নেই। তাই সে উপহার দিতে পারেনি। অবশ্য এক দিক দিয়ে ভালোই। চাবিকাঠি হাতে থাকলে সে বহুবার এই সম্পদের অপচয় করত। মার্কের কাছে এই দুর্ভেদ্য দুর্গ এমন আকর্ষণ জাগাতেও পারত না।

সে এই ঈস্টারের ছুটির অপেক্ষায়ই ছিল। এবার সে হবে প্রভু এই ছিল তার আশা, কিন্তু আনেৎ ঠিক সময়ে এসে পৌঁছল না। মার্ক নখ কামড়াতে লাগল। যখন সে এল, ছুটির এক সপ্তাহ শেষ হয়ে গেছে। সম্পর্ক আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, তাড়াতাড়িই গড়ে তুলতে হবে। সময় তো নেই। অথচ বহুবার তো মার কাছ থেকে এসেছে আহ্বান, মার্ক রাজি হয়নি। আর একবার সুযোগের জন্য সে উন্মুখ হয়ে রইল, গত ছুটিতে সে তো সুযোগ পেয়েছিল। এবার যদি সুযোগ পায়, যদি অনুরোধ আসে, সে ছাড়বে না···

কিন্তু আনেৎ-এর মনে এবার জুড়ে বসেছে অন্য চিন্তা। সে এগিয়ে এল না, দিল না সুযোগ। মার্কের গোপন কথা? বেশ তো! তারই থাক না। আনেৎএর নিজেরও তো আছে গোপন কথা, সে তো নিজের মনেই তাকে লুকিয়ে রেখেছে।

মার্ক কি আর করবে—এই অদ্ভুত নারীকে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করল। তার সব চাইতে কাছে—অথচ বহু-দূরে তার এই মা। তার মনের কন্দরে সে তো উঁকি দিতেও পারছে না, শুধু

বাইরে থেকে দেখছে, সার্শির ভিতর দিয়ে দেখছে। এই সেদিন আনেৎও অমনি দেখতে চেয়েছিল মার্ককে। পারেনি। মার্ক অবরোধ দিয়ে ঘিরে রেখেছিল নিজেকে। আজ বদলে গেছে পরিস্থিতি।

কিন্তু আনেৎ অবরোধ খাড়া করল না : ইচ্ছে হয় দেখ না! কিন্তু তার কথা নিয়ে ভাববার সময় কোথায়? এইটেই তো মার্কের পক্ষে অপমানজনক। কিন্তু অপমান সে হজম করল। কৌতূহলের আকর্ষণ তো গর্বের চাইতে বেশিই হবে।

তার মার দৃঢ়তা আর স্থৈর্য দেখে অবাক হয়ে গেল সে। আত্মারা তো এখন হাওয়ার ঘূর্ণির ধুলোর মতোই উড়ছে, এরই ভিতরে সে কোথা থেকে পেল এই স্থৈর্য আর দৃঢ়তা? ডুবন্ত জাহাজের মতোই বাড়িখানা। যন্ত্র ভেঙেচুরে গেছে, মানুষের বুকে ঝড় বইছে। দোরে দোরে কালো আর লাল কালিতে মৃত্যুর নিশানা। গতবার আনেৎ যখন এসেছিল, তার কিছু পরেই আপলিন করেছে আত্মহত্যা; আনেৎ অবশ্য এবার এসে একথা শোনেনি। সিলভী তাকে ইচ্ছে করেই বলেনি। নভেম্বরের শেষে ওরা এই পাগলীর মৃতদেহ সীন থেকে তুলেছিল। আলেক্সিস-এর কোনো পাত্তা নেই; বিস্মৃতির সাগরে সে ডুবে গেছে, তলিয়ে গেছে। বার্নাঁদের দুটি ছেলেও মিলিয়ে গেছে—কিন্তু সে অন্য সাগরে—তার নাম মহিমা। আন্দালুসিয়ার সেই বিরাট জলায় ঘোড়া আর মানুষের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে আছে। দুই গোলন্দাজ বাহিনীর বুড়ো আঙুল দিয়ে সে সব চটকানো চলছিল, আজ সোম-এর কাদায় তার আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ঘূর্ণিবায়ুর মতো বার্নাঁ পরিবারের উপর এল শোকের ঝড়। এক মুহূর্তেই লোপ পেল বংশ। এক পক্ষ আগে তারা খবর পেয়েছে। মঁসিয়ে বার্নাঁ, এখন পরাজিত ষাঁড়ের মতো, তাঁর চোখ দিয়ে যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। তাঁর ক্রোধ আর বিশ্বাসের মধ্যে শুরু হয়েছে ভীষণ সংগ্রাম। কখনো কখনো তিনি ঈশ্বরের সঙ্গেও লড়াই করছেন। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমতা বেশি—মানুষ দলিত-পিষ্ট হচ্ছে, মাথা নুয়ে পড়ছে—বশ্যতা স্বীকার করছে।

তার পৌঁছবার পরের দিন হামলার সঙ্কেতধ্বনি তাদের জড়ো করল সেলারে। আনেৎ সেখানে বাড়ির অধিবাসীদের ভগ্নাংশ দেখতে পেল। প্রথম দিকের সে-উত্তেজনা নেই, নেই সেই সাদর সম্ভাষণ, আশা আর বিশ্বাস। তবুও ভদ্রতা বজায় রাখতে হোলো, বজায় রাখতে হোলো পারস্পরিক স্বার্থের মুখ-পাত। কিন্তু প্রতি পরিবারের প্রতি মানুষটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে; নিজের প্রকোষ্ঠে এখন তারা বন্দী। ক্লান্তির ভারে নুয়ে পড়েছে। অতি সাধারণ

ভদ্রতার আদান-প্রদানের উচ্চারণের নিচে তাদের দুর্দশা রণিত হয়ে উঠছে। দুঃখ হতাশা শোক আর অগ্নি-পরীক্ষার হিসেব তারা দিতে পারে ; কিন্তু কার কাছে তারা সে হিসেব দাখিল করবে ? সে কোথায় লুকিয়ে আছে ? তাকে না পেয়ে তারা নিজেদের দেনা নিজেরাই শোধ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

১৯১৭ সালের এপ্রিল মাস। সমস্ত ফ্রান্স জুড়ে অসন্তোষের প্রধূমিত বহ্নি। রুশ বিপ্লব শুরু হয়েছে। আকাশ থেকে দিগন্তে ঝরছে রক্ত। ধ্রুব-তারা উদিত। পারীতে বিপ্লবের খবর এসেছে তিন সপ্তাহ আগে। এক সভায় তারা তাকে সাদর অভ্যর্থনাও জানিয়েছে। কিন্তু নেতা নেই, বিপ্লব চালাবে কে ? নেই সমষ্টিগত প্রচেষ্টা—প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিক্রিয়া আর অহমিকা জনগণকে মিলতে দিচ্ছে না। তাই তারা খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। বিপ্লবের আত্মা বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহে পর্যবসিত হচ্ছে, ধসে পড়ছে। এপ্রিলের এই কয়েক সপ্তাহে সৈন্যবাহিনীর ভিতরেও অসন্তোষ দেখা দিল। এই দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের চাইতে তারা বেশি কিছু জানত না, সুতরাং জহ্লাদরাই তাদের সেই অসন্তোষের সুযোগ নিল। কিন্তু সবাই একথা জানত, তারা দুঃখ ভোগ করছে; তারা এমন কাউকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করল, যার উপর তারা প্রতিশোধ নিতে পারে।

এই অসন্তোষের প্রকাশ ভাবভঙ্গী আর স্বরে দেখা দিল বটে, কিন্তু কথা হয়ে ঝরে পড়ল না। তাদের দুঃখের বোঝা তাদের এক জায়গায় এনে জড়ো করতে পারল না। পরস্পরকে তুলনা করে প্রতিবেশীকে তাদের দুঃখের জন্য দায়ী করল। বার্নাষ্ঁা আর ঝিরের একে অপরকে দুষলো। শুষ্ক নমস্কার, নিরুত্তাপ ভদ্রতা—এই তো তখন নিয়ম। দুঃখের সীমান্ত আগলে তারা বসে রইল। অতিক্রমে এল বাধা।

আনেৎ-এর উষ্ণ সহানুভূতির প্রকাশ হোলো জ্যুস্তিন আর উরস্যুল বার্না-ষ্ঁার কাছে। তারা চাপা মেয়ে, কখনো একটা কথাও তার সঙ্গে বলেনি, কিন্তু সহানুভূতির এই বিস্ফোরণে তারা অভিভূত হয়ে পড়ল, লজ্জারুণ হয়ে উঠল। তারপর এল ভীরুতা আর অবিশ্বাস, আবার শোকের ওড়নার আড়ালে তারা চলে গেল, নিজেদের খোলার ভিতরে ঢুকে পড়ল। আনেৎ পেছু পেছু ছুটল না। কারো যদি তাকে প্রয়োজন থাকে, সে প্রস্তুত ; কিন্তু কাউকে তার নিজের তো প্রয়োজন নেই। সে কারো উপর নিজের ব্যক্তিত্ব বা ভাবধারা অরোপ করতে চায় না।

সেলারের ভিতরে তার চারপাশে চলল নানা কটূক্তি। ক্লাপিয়ে ছায়াচিত্র দেবু লে মর-এর বর্ণনা করল, জার্মানদের বর্বরতার কাহিনী মূর্ত হয়ে উঠল।

ভাই হোক, আত্মীয় বা বন্ধু হোক, সে তো শত্রু—তাকে হত্যা কর! একজন মৃত জার্মান মানে মানবতার একটি শত্রু ধ্বংস হোলো।

মাদাম বার্নাঁর্দ্য প্রতিবেশীর কাছে এমন এক পবিত্র সংজ্ঞের কথা বললেন—যে শত্রুর প্রতি ঘৃণা জীইয়ে রাখবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। আনেৎ চুপ করে শুনল। মার্ক চেয়ে রইল তার মুখের দিকে কিন্তু মুখের চেহারা বদলাল না। এমন কি সিলভী যখন হাল্কাভাবে পাড়ার কুৎসা গাইতে শুরু করল তখনো তার ভাবান্তর এল না। আনেৎ তাকে বাধা দিল না, উত্তর না দিয়ে শুধু হাসল, অন্য কথা পাড়ল, তার মনের ভিতরে কি হচ্ছে বাইরে প্রকাশ করল না। এমন কি আপলিনের শোচনীয় মৃত্যুর খবর শুনে তার চোখে করুণার একটু ঝিলিক দেখা দিল মাত্র। অন্য সময়ে এ কথা শুনলে সে অভিভূত হয়েই পড়ত। এই শোচনীয় মৃত্যু মার্ককে নাড়া দিয়েছিল সব চাইতে বেশি, সেও মার এই গাম্ভীর্য দেখে বিরক্ত হোলো। সে চাইল তার গাম্ভীর্য ভাঙতে। সে যা শুনেছে বা দেখেছে, তারই ভয়াবহ বিবরণ সে শোনাতে লাগল। আনেৎ তাকে চুপ করিয়ে দিল। যে আলোচনা ভালো লাগে না, তাতে যোগ দিতে সে রাজি নয়। তাকে টেনে আনার চেষ্টাও বৃথা। তার এ সম্বন্ধে আছে নিজস্ব ধারণা; মার্ক তা খুব ভালো করেই জানে। কয়েকটা কথা বলেই সে বুঝতে পারল, যুদ্ধ আর দেশ অন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে, কিন্তু তার মা সেসম্বন্ধে উদাসীন। সে মার এই উদাসীনতার কারণ জানতে চাইল। মা কথা বলেছে না কেন?

রুশ বিপ্লব তাকে চঞ্চল করে তুলেছে। পহেলা এপ্রিলের সভায় সে গিয়েছিল। কৌতূহল বশেই গিয়েছিল, কিন্তু জনতার ছোঁয়াচ বাঁচাতে পারল না, সংক্রামিত হোলো। সেভরিনকে সে উল্লসিত হয়ে অভ্যর্থনা জানাল, জুও-কে করল ঘৃণা। সে দেখল রুশরা কাঁদছে আর বিপ্লবের স্তোত্র শুনছে। সে এমনি কান্না পছন্দ করে না, এর ভিতরে সে আবিষ্কার করল এক বলিষ্ঠতা, এক মহিমা। কিন্তু তখনো ভাবধারার হদিস পায়নি। কয়েকজন মস্কোবাসীর সঙ্গে সে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে হতাশ হোলো, হোলো বিভ্রান্ত; তাদের অসহনীয়তা, আর জাতীয়তার গর্বে স্বাধীনতার টুপিটার নিচে গাধার কান

দু'খানা বেরিয়ে পড়েছে। ফ্রান্স আর ফরাসীজাতির বিরুদ্ধে তাদের কি বিদ্রূপ! হাঁ, হাঁ, যথেষ্ট হয়েছে! মার্ক তার নিজের জাতিকে ঠাট্টা করতে ছাড়েনি, কিন্তু অন্যে তার জাতিকে ঠাট্টা করবে—তা সে বরদাস্ত করতে পারল না। মার্ক সহজাত প্রবৃত্তির দিক থেকে খাঁটি অভিজাত। এই 'এশিয়াবাসী'দের ভাবধারা তাকে প্রলুব্ধ করতে পারল না (হাঁ, খুদে জন্তুটি ওই বলেই ওদের সম্বোধন করে)। ব্যগ্র হয়েই সে ঢুকেছিল, আবার তাড়াতাড়ি পিছু হটেও এল। নানা প্রতিক্রিয়া তখন শুরু হয়েছে। তার ভিতরে কতগুলি হয়তো খারাপ, কতগুলিকে আবার বাতিল করাও যায় না। কিন্তু আলোচনা করতে সে চাইল না; হোক না খারাপ, ক্ষতি কি? সে যা তাই-ই। দেশাত্মবোধ আর সর্ব-হারার অধিনায়কত্ব—তার কাছে দুই-ই সমান উৎপীড়ন। ন্যায়ের ফাঁকি, পাগলামি। তার হৃদয়ে অতখানি মানবতা বা উদারতা নেই যে, জনগণের সঙ্গে সে সায় দেবে—নিজের ক্ষতি স্বীকার করতেও সে রাজি নয়। পিতাঁ আর তার সাথীরা তাকে তো কোনো সাহায্যই করতে পারবে না! পিতাঁ অবশ্য এরই ভিতরে এই নতুন ভেলায় ভেসে পড়েছে, কিন্তু তরুণ রিভিয়ের আকৃষ্ট হয়নি। সে এই আকস্মিক দুর্ঘটনা আর ধ্বংসের ভিতরে অধ্যাত্মবাদের সন্ধান পায়নি, এই দুঃখ, এই উৎসর্গের ভিতরে উদ্দীপনা অনুভব করেনি।

···তোমাদের সঙ্গে যাব! যার কিছুই হারাবার ভয় নেই, যে কিছু না-জেনে জীবন উৎসর্গ করতে চায়, সে যাক না! আমার আছে বহু মূল্যবান জিনিস—আমার সত্তা, আমার বুদ্ধিমত্তা, ভবিষ্যৎ, জীবনের কাছ থেকে যা আমি ছিনিয়ে নিয়েছি—সবই তো রয়েছে। আমার যা কিছু পাওনা আমি নিয়ে নিয়েছি, সব কিছু আমি দেখেছি, অভিজ্ঞতা লাভ করেছি—এখন! এখন তাকে উৎসর্গ করব? হাঁ, বোধ হয় তাই। অন্ধকারের পলেস্তারার আড়ালে সব কিছু উৎসর্গ করতে হবে। ধন্যবাদ বন্ধু! ওরকম উৎসর্গ আমার ধাতে নেই। সর্বহারার অধিনায়কত্ব আমি চাই না, অন্য আলো দাও আমাকে।

আনেৎ-এর অন্য আলো আছে নাকি? মার্ক আবিষ্কার করবার বৃথাই চেষ্টা করল। তাকে উত্তেজিত করবার জন্য নিজের পাপের কাহিনী তাকে বলে গেল। আনেৎ শুনেও শুনল না। ঢিল পড়ল শূন্যতায়। মার্ক লজ্জা পেল। তাহলে ও কিছু চিন্তাই করছে না? মার্কের কাছে চিন্তা তো চামড়ার উপরের জ্বালা। চুলকোনো ছাড়া উপশমের উপায় নেই। চিন্তা যেন

তার কাছে এক উত্তেজনা, সে অপরের উপর তাকে আরোপ করবে, তাদের ভিতরে সঞ্চালিত করবে—তা সম্মতি বা জোর—যে উপায়েই হোক! কিন্তু অন্যে তার মতো ভাবল কি না ভাবল, আনেৎ এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

তবে কি সে উদাসীন? না, তা নয়। তবে তার মতে চিন্তা হচ্ছে অঙ্কুরের মতোই। তাকে আস্তে আস্তে বাড়তে দাও। সে যদি ফনফনিয়ে বাড়তে শুরু করে, অঙ্কুরেই ঝরে পরবে—প্রথম তুষারের ঝাপটাও সইবে না। তার চার পাশের আত্মাদের এখনো শীত চলেছে। অলসতা ভাঙবার এখনো সময় আসেনি। সন্দেহ আর দুর্দশাকে এখনো ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। অকালে যদি ঘুম ভাঙে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

তার ঘর থেকে সে শুনতে পেল উপরের তলায় পেরে বকবক শুরু করেছে। একজন কমরেডের সঙ্গে চলেছে তুমুল তর্ক। কয়েক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে সে ফিরেছে। সীমান্তে আর পিছনে সে যা কিছু দেখেছে, তাতে বিরক্তি ধরে গেছে। শুধু জীবনের অপচয়, ধন-সম্পদের অপচয় আর মোহবিচ্যুতি। তার নিজের পরিবার ভেঙে গেছে, নীতিবোধহীনতা দেখা দিয়েছে। তার মেয়ে এখন গণিকা—হত্যার কারখানা থেকে যে মজুরী সে পাচ্ছে, তাইই ফুঁকে দিয়ে বোকা বনছে। সব দেখে শুনে পেরের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। এ বিদ্রোহ তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে, উর্ধ্বতন সামরিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে—পৃথিবীর বিরুদ্ধে। কিন্তু তবু তিক্ত অন্তিম পরিণতির দিকেই সে ছুটল। তার বিদ্রোহী বন্ধুরা তাকে ঠাট্টা করল, তার সংকল্প থেকে টলাতে চেষ্টা করল, সে চিৎকার করে বলল :

'চুপ কর, নয় তো নিচের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দেব! তোমরা কি করতে বল? এরই মধ্যে কি যথেষ্ট হয়নি? ওরে হাঁদার দল, দেশাত্মবোধ তো ফাঁকা কথা। ওরা আমাদের শুধু শুধু খুন করেছে—এই কথা আমার কাছে প্রমাণ করতে পারলেই তোদের সুবিধে হবে? উঁহু, মোটেই নয়। আমি তোদের বিশ্বাস করি না, বিপ্লবকেও বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না ধর্ম আর মানবতাকে। আর ওতো সবচাইতে ফাঁকা বুলি, অসম্ভব ব্যাপার। আজ যদি দেশই চলে গেল কি রইল আমার—কাকে আঁকড়ে ধরব? তখন তো নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকবে না।'

আনেৎ পেরেকে চিনল, মার্ক কিন্তু ঠিক চিনতে পারল না···উড়িয়ে দিক না নিজের খুলি!···দুর্বলের দুর্দশায় তরুণ তো কখনো অনুকম্পা দেখায় না—

দুর্বলরা তো বাঁচবার জন্য জীবনের সঙ্গে জোড়াতালি দিয়েই থাকে! মার্ক জোড়াতালি দিয়ে থাকতে রাজি নয়। সে তরুণ, সে বাঁচতে চাইল। সে আর তার এ্যানর্কিস্ট বন্ধুরা সব কিছুকেই বিদ্রূপ করে নিল প্রতিশোধ। তাদের বিদ্রূপ গেল সংযমের বাঁধ পেরিয়ে, সীমা ছাড়িয়ে। অযৌক্তিকতা তখন উত্তুঙ্গে উঠেছে, এসেছে যুক্তির বিপর্যয়।

একজনকে সে তো কিছুতেই বুঝতে পারল না। সে তার মা। পরিবেশ থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে—একথা সে হলফ করেই বলতে পারে। নিজেকে রক্ষা করবার জন্য আক্রমণেরও তার দরকার নেই, কোনো সমালোচনাও সে করে না। কারো খুঁত ধরতেও সে যায় না। তার নিজের মন আর যুক্তিতে সে আচ্ছন্ন—নিজের আত্মার প্রকোষ্ঠে সে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে। নিজের ভিত্তির উপর সে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে ভিত্তি কি?

আনেৎ নারী। একমাত্র চিন্তায় তার মন আচ্ছন্ন। বিশ্বে সে তার চিন্তা-ধারা ছড়িয়ে দিতে চায়নি। তার দিগন্ত একমাত্র কর্মপ্রেরণায় আবদ্ধ। যে বিয়োগান্ত রহস্য নিয়ে পৃথিবী তর্কের ঝড় তুলেছে, সে তো তার ব্যাপার নয়। তার ওপরে বিশেষ কর্তব্যের ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—তারই জন্য এই বিয়োগান্ত রহস্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধ। সে বাঁচাবে—এই বন্ধুত্বকে বাঁচাবে। বাঁচাবে দুই বন্ধুকে—তাদের সঙ্গে তার অদৃষ্ট তো জড়িয়ে গেছে। আর সবার অদৃষ্ট নিয়ে সে ভাবে না। অদৃষ্টের সেও ভাগীদার—এই ভূমিকাটুকুই তো যথেষ্ট—প্রাণ সে উৎসর্গ করেছে। এরই জন্য সে আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে পারে, মানুষের গড়া যে-কোনো আইন ভাঙতেও প্রস্তুত। এক মহান আইন, এক বিধির স্বর সে শুনেছে। সবাই যদি এমনি করে সেই বিধির স্বর নিজের নিজের সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতরে শুনতে পেত, তাহলে তো মানবতার মহত্তম বিপ্লব আসতো পৃথিবীতে।

॥ চৌদ্দ ॥

আনেৎ পারী থেকে চলে গেল। কাউকে সে তার গোপন রহস্য বলল না—তার ছেলে মার্ককে তো নয়ই। মার্কের ঘনিষ্ঠ হবার খুবই ইচ্ছে ছিল,

কিন্তু আত্মরক্ষার উগ্রতা তার সে-ইচ্ছাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে তার মার শান্তিবাদ নিয়ে ঠাট্টাই করল।

এ নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছে আনেৎ-এর ছিল না। শান্তি বা যুদ্ধ তার ব্যাপার নয়। তারা সুদূরেরই বস্তু। তার হাতের মুঠোয় দুই বন্ধুর দু'খানি হাত—তারই উপর তারা ন্যস্ত। তার এখন কর্তব্য তাদের মিলন, আদর্শের প্রশ্ন এখানে নেই। তাদের আর তার নিজের জীবনের প্রশ্নই এখানে বড়। তার নিজের জীবন তো সে বাজি ফেলেছে। এক অসম্ভব বাজি! হাঁ, যুক্তির দিক থেকে তো বটেই! কিন্তু হৃদয়ের তো যুক্তি আছে। হৃদয় কথা কইছে।

পারী থেকে চলে আসার মধ্যে একটা কথা সে শুনতে পেল, হয়তো তার পরিকল্পনায় সাহায্যই করল সে-কথা। মার্ক তার কাছে একদিন কথায় কথায় ফ্রান্সে যে সব রুশ বিপ্লবী রয়েছেন, তাদের কথা বলল। তাঁরা ফিরে যেতে চান রাশিয়ায়, সেখানে গিয়ে বিপ্লব-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান, কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে মিত্রপক্ষ পাসপোর্ট দিতে নারাজ। তবু তাঁরা পাসপোর্ট ছাড়াই পালাচ্ছেন। যুদ্ধ-বিরোধী ফরাসী প্রবাসী আর তাদের ফ্রান্সের সহকর্মীদের ভিতরে চলেছে গোপন আলোচনা। কাঁটাতারের জালে ফরাসী মনকে ঢেকে দিয়েছে, নিশ্বাস বন্ধ ক'রে ফেলেছে, তবু সূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। আর পাওয়াও যাচ্ছে, আর তারই ভিতর দিয়ে বিশুষ্ক জীবন আবার মুঞ্জরিত হয়ে উঠছে, সীমান্তের ইঁদুরের গর্তের ভিতর দিয়ে আসাযাওয়া করছে খবরের কাগজ আর চিঠি। পিতাঁর হাতে এই ভয়ংকর খেলার সুতো—যারা ক্ষমতার রাশ হাতে নিয়ে বসে আছেন, তাদের কাছে ছাড়া এ অতি নিরীহ ব্যাপার। কয়েকটা কথা কি আর এই যুদ্ধমান বিরাট সরীসৃপের পামুরে কানের ভিতর দিয়ে তার খোলার ভিতরে ঢুকবে? যারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে নিজেদের স্বাধীনতার স্বপ্ন দিয়ে ভুলাতে চাইছে, তাদের কাছে এর মোহ আছে বইকি। আনেৎ পিতাঁর নাম টুকে নিল। তার সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু পিতাঁকে খুঁজে বার করবার জন্য মার্কের সাহায্য চাইল না।

সে ফিরে এল কাজে। জোরম্যাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হোলো, ফন্দি নিয়ে তর্কবিতর্ক করল। কিন্তু আনেৎ তাকে সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহের কথা জানাল না। সে মনে মনে অবশ্য সফলতার কোনো হদিসই পেল না। কিন্তু জোরম্যাঁকে জানতে দেওয়া হবে না। এখন ওর ভিতরে বাঁচবার ইচ্ছে জাগিয়ে তুলতে হবে, ওকে সুইজারল্যাণ্ডে পাঠাতে হবে। হাওয়া বদলে অবশ্য

কোনো ফলই হবে না, তবু এই তো শেষ সুযোগ। চেষ্টা করতে হবে। জোরমঁ্যার কিন্তু মন স্থির করতে সময় লাগল। ঘটনার একেবারে আগে ছাড়া তার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। পরিকল্পনা কিন্তু অতি অস্পষ্ট। সে তখন অহমিকায় আচ্ছন্ন, দেখতে পেল না কি বিপদের মুখেই সে ঠেলে দিচ্ছে আনেৎকে, এমনকি তার বন্ধুকেও। দেখতে পেলেও, মৃতের চোখ দিয়েই সে দেখত। জীবিতের চোখ দিয়ে দেখবার তার সাধ্য কি? মৃত্যু তখন তার কাঁধে চেপে বসেছে। তাকে শান্ত করবার জন্যই আশার ছলনা দরকার। ঘটনাতো এগিয়ে আসছে। মার্সেল ফ্রাঁ-র সাহায্যে সে তরুণ অষ্ট্রীয়ানের জন্য ভালো ব্যবহারের সুবিধেটুকু আদায় করল। স্বাস্থ্যের জন্য বন্দীশিবির থেকে তাকে স্থানান্তরিত করা হোলো। শহরে থাকতে দেওয়া হোলো তাকে, কড়াক্কড়িও রইল না। ফরাসী শিল্প সম্বন্ধে গবেষণায় সে তখন নিযুক্ত, অন্তত সেই অজুহাতেই তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হোলো। যুদ্ধের সময় এমনি উদারতার দৃষ্টান্ত বিরল। অন্তত লোকের তাই ধারণা। অথচ মধ্য ফ্রান্সের কোনো শহরে বার্লিনের এক নগণ্য মানুষের উপরে নজর রাখতেও ফরাসী সরকার চাননি। ষাটজন অভিজাত জার্মানকে কারনাক-এ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, এমন কি তাদের পত্নী বা উপপত্নী নিয়ে থাকবার অনুমতিও মঞ্জুর হয়েছিল। আড়াইশো একর হদ্দার ভিতরে তারা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতেও পারত। প্রথম বছরের উন্মাদনা যেন মদের বোতলের বুদ্বুদ—দু'দিনেই থিতিয়ে গেল, তখন কোনো কোনো অঞ্চলে বন্দীদের সম্বন্ধে এই আইন প্রথা হয়ে দেখা দিল। তারা প্রদেশের স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে গেল মিশে। শৃঙ্খলা তখন প্রতিষ্ঠিত, কড়া পাহারার প্রয়োজনও আর নেই। ফ্রানৎস পেল তারই সুযোগ। জোরমঁ্যার চোখে এই সুযোগ দেখা দিল মুক্তির পথে প্রথম মশাল হিসেবে।

তার পরিবার, আনেৎ আর ডাক্তারের অনুরোধে, সে ফ্রান্স ছেড়ে যেতে রাজি হোলো। আনেৎ তাকে বোঝাল, দেরি না করে সুইজারল্যাণ্ডে যাওয়া এখন বিশেষ প্রয়োজন। বন্দী পালাবার পর তার উপরেই তো অভ্যর্থনার ভার। কিন্তু জোরমঁ্যার সন্দেহ তখনো যায়নি।

'আনেৎ আমাকে ভোলাবার চেষ্টা কোরো না! আমার তো এখানে মরাই ভালো। মরণাপন্নের বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সে তো নীচতা! তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারিত করবার চেষ্টা করছ, অথচ একথা ভালো করেই জানো, সে-প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে তুমি পারবে না।'

'পূর্ণ করতে পারব কিনা কে বলতে পারে,' আনেৎ উত্তর দিল : 'কিন্তু আমি তোমার জন্য যে-কোনো বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে রাজী—হাঁ, তোমাদের দু'জনের জন্য। বিশ্বাস হচ্ছে না আমাকে ?'

জোরম্যাঁ তাকে বিশ্বাস করল।

বিদায়ের আগে শেষ কটা দিনে সে বুঝতে পারল আনেৎ এই প্রতিশ্রুতির জন্য কতখানি মূল্য দিয়েছে।

'আনেৎ, তোমাকে প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি দিচ্ছি। আমি···'

কিন্তু কামনা তখন উদগ্র। না, সে তো মুক্তি দিতে পারবে না! যতক্ষণ পর্যন্ত একটু ক্ষীণ আশা আছে ততক্ষণ পর্যন্ত না।

বিদায়ের সময় সে শুধু বলল : 'আমাকে ক্ষমা কর!' কেন সে ক্ষমা চাইছে, বুঝিয়ে বলল না। আনেৎ তার জন্য জীবন বিপন্ন করুক না! তার নিজের জীবন তো ফুরিয়ে এসেছে।

আগস্টের মাঝামাঝি রওনা হোলো জোরম্যাঁ। সঙ্গী হলেন তার মা আর মাদাম দ্য মারেউই।

আনেৎ রইল একা, আর রইল এক অসম্ভব পরিকল্পনা।

সময়টাও অনুকূল নয়। বিপদের মাত্রা তখন বেড়ে গেছে। ১৯১৭ সালের প্রথম দিকের শৈথিল্য শেষ হয়ে গেছে, এবার এসেছে কঠোরতা আর অভিযোগ। বিপ্লবী ধর্মঘট আর বসন্তকালের বিদ্রোহের সময়ে যে শাসনতন্ত্র নিজের অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল, সেই এখন আগের কাপুরুষতার শোধ তুলছে। এই অপস্মারগ্রস্ত শাসনপদ্ধতি চারদিকে ফ্রান্সকে পরাজিত করবার ষড়যন্ত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটা কারখানা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, আর তারই ধোঁয়ায় ইওরোপ আর আমেরিকার আকাশ আচ্ছন্ন। এও এক যুদ্ধজাত শিল্প—এর মূল্য এখন যথেষ্ট! শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র—এই ধুয়া, এই মিথ্যার সাহায্যে সমস্ত নিচ অপবাদকে শুদ্ধি করা হচ্ছে। এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধেই তো পবিত্র সংঘ গড়তে হবে, মিলিত হতে হবে! সেপ্টেম্বর মাসে এক নতুন সংঘ প্রতিষ্ঠিত হোলো, তার কাজ হোলো পারস্পারিক সন্দেহ আর ঘৃণার বীজ বপন। প্রতিজন প্রতিজনের বিরুদ্ধে তখন দাঁড়িয়েছে। এমনকি নিজের ছায়াকেও বুঝি সন্দেহ করতে শুরু করেছে।

সারা গ্রীষ্ম আনেৎ যেন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াল, কিন্তু একটুও এগোতে

পারল না। সব পথ বন্ধ। ফ্রানৎস-এর কাছে যাওয়ারও উপায় নেই, সন্দেহ জাগতে পারে। চিঠিপত্র তো খুলেই পড়ছে। কি করে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যায়, ফন্দি আঁটা যায়? আর ফন্দিটিই বা কি? ফরাসী সীমান্ত পায়ে হেঁটে তো আর অতিক্রম করা যাবে না; রওনা হবার পরদিনই তাহলে সে গ্রেফ্তার হবে। তাড়াতাড়ি তাকে এদেশ ছেড়ে যেতে হবে, গোপনে হাসিল করতে হবে কাজ, প্রথমে কোনো রেলপথে সে রওনা হবে, আনেৎ মিলবে এসে তার সঙ্গে, তারপর সীমান্ত পেরিয়ে যাবে দু'জনে। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের ট্রেনের আসা-যাওয়ার সময় বদলে গেছে। তাছাড়া যে শহরে সে অন্তরীণে আছে, সেখান থেকেই বা কে তাকে ট্রেনে তুলে দেবে, মুক্তির পথ সুগম করে দেবে? একজন লোকের সাধ্যই বা কি? আনেৎ-এর তো এমন কেউ নেই যাকে সে বিশ্বাস করে একথা বলতে পারে।

কিন্তু সুযোগ এল বইকি। ছুটির মাসে সে পারীতে ফিরে এল। তার নিজের ফ্লাটেই এসে উঠল। একদিন চীনেমাটির একটা ভাঙা জিনিস সে হাতে নিয়ে দেখছিল—এ সেই বুঁর্বো-বাড়ির স্মৃতির উপহার—সামান্য কটা জিনিস অবশিষ্ট আছে, আর সব ভেঙে গেছে। সেইখানে দু'বোনের পরম আনন্দে দিন কেটেছিল। সিলভীও তখন সেখানে উপস্থিত। ভাঙা চীনেমাটির বাসনে দিগন্তের আবছা নীলের আভাস দেখে তার চোখের সামনে ভেসে এল অতীতের দিনগুলি। সিলভী তার বোনকে একজন ওস্তাদ কারিগরের ঠিকানা দিল। সেই একমাত্র জোড়া লাগাতে পারবে এই বাসনটিকে। আনেৎ পিতাঁর নাম শুনলো এবার।

তারই খোঁজে সে বেরিয়ে পড়ল। খুঁজে পাবার আশা বড় ছিল না। সিলভী আগেই তাকে বলেছিল, পিতাঁ সব সময়েই বাইরে বাইরে ঘোরে, দোকান থাকে প্রায়ই বন্ধ। আনেৎ তবু শহরতলীতে তার দোকানে গিয়ে হাজির হোলো। পিতাঁ তখন সেখানেই ছিল।

পিতাঁ তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল, কিন্তু প্রতারিত সে হোলো না। সামান্য একটা চীনেমাটির বাসন মেরামত করতে এতদূরে কেউ নিশ্চয়ই আসে না। কিন্তু পিতাঁ তাকে স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গেই ডেকে এনে বসাল, বিস্ময়ের কিছুমাত্র ভাব দেখাল না। আনেৎকে এগিয়ে দিল চেয়ার। তারপর দাঁড়িয়ে শুনল তার কথা। তার মখমল-চোখে ঝরে পড়ল সহানুভূতি। আনেৎ বসে পড়ল—পিতাঁকে সেও দেখল—সে বসে আছে বটে, কিন্তু পিতাঁ এখনো লম্বায়

তার চেয়ে বেশি বড় হবে না। এই মানুষটির জীবনে নারীর কোনো স্থান নেই বলে সে তার সঙ্গে কথা বলতে বিব্রত বোধ করল না, সহজভাবেই সে বলল কথা। তার সহজাত ছেলেমানষি তাকে মেয়েদের অন্তরঙ্গ করে তোলে, তাদের মন যেন খোলা পুঁথির মতোই তার কাছে, তাদের কামনা আর ছলনার উপর কৌশলে যতোই রং বুলানো হোক না কেন, সে ঠিক ধরে ফেলবে। তাদের দেখে সে কখনো অবাক হয়নি, সমালোচনাও কখনো করেনি। তারা মিথ্যে কথা বললেও, সে কখনো বাধা দেয়নি। যখন 'না' বলতে হবে, তখন তারা 'হাঁ'ই বলেছে, আর সে সহানুভূতি জানিয়ে মাথা নেড়ে দিয়েছে সায়। কিন্তু তার গম্ভীর দু'টি চোখ শুধু জানিয়েছে, ওই 'না'র মানে সে বোঝে। তার হাসি দেখে তারা কিছু দোষ ধরেনি। সে তাদের সাথী, প্রতারক তো নয়; বরং সহকর্মী। কিন্তু তারা যেমন তেমনিভাবেই তাদের গ্রহণ করেছে, তাদের শ্রদ্ধাও দেখিয়েছে।

এই স্পানিয়েল-চোখের সঙ্গে অন্য দু'টি চোখের মিতালি হয়ে গেল, এল বিশ্বাসের বিনিময়।—হবে না কেন? আনেৎ-এর দু'টি চোখ তো পর্দাহীন দু'টি জানালা। তাছাড়া মার্কের নামও নিস্তব্ধতার বরফ গলিয়ে গলিয়ে দিল। পিতাঁর মেটে দাড়িওলা মুখখানা খুশির আলোয় ঝলসে উঠল। সে বলল: 'তাহলে আপনিই মাদাম রিভিয়ের?'

মার্ক-এর মাকে সে শ্রদ্ধা করত। তার সম্বন্ধে সে অনেক কথাই মার্ক-এর কাছ থেকে শুনেছিল, তারই উপর গড়ে উঠেছিল তার উপলব্ধি আর বিশ্বাস। সে প্রকাশ করল তার সে বিশ্বাস।

'তুমি কি আমাকে চেন?' আনেৎ জিজ্ঞেস করল।

'আপনার ছেলেকে চিনি।'

'কিন্তু সে তো মোটেও আমার মতো নয়।'

'তাই তো স্বাভাবিক। আর সব ছেলেমেয়েদের মতোই সে। সে আপনার মতো না হবারই তো চেষ্টা করছে। তাই তো আপনাকে আমি চিনতে পারলাম।'

'আমি তো ওকে অস্থির করে তুলেছিলাম। তাই ও পালিয়ে গেল।'

'ওর পিছনে ছুটবেন না যেন! জীবনটাই তো ঘোড়দৌড়ের মাঠ—এক গোলক ধাঁধা। আপনি শুধু অপেক্ষা করতে পারেন ওর জন্য, তার বেশি কিছু নয়। ও আপনার কাছ থেকে যত দূরে সরে যাবে, ততোই তো আরো কাছে আসবে!'

মুখখানা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনেৎ হাসল। ওরা মার্ককে চিনতে চাইছে, ওদের মধ্যে মিতালি হয়েছে। পিতাঁ এবার আনেৎকে বলল : 'আপনার জন্য কি করতে পারি মাদাম রিভিয়ের? মার্কের কোনো ব্যাপার নাকি?'

আনেৎ লজ্জিত হোলো, তার ছলনার মুখোশ সে খুলে ফেলেছে। 'না, না, ওর জন্য আসিনি। তবে তোমার কাছে পরামর্শ চাইতেই আসা। সোজা কথা না বলে এতক্ষণ যে প্যাঁচ খেলছিলাম, এজন্য আমাকে ক্ষমা কর!'

'আমি তখুনি বুঝতে পেরেছি। আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে না। ওদের পবিত্র সংঘ আজ পরস্পরকে সন্দেহ করতেই তো শিখিয়েছে।...কথা বোলো না! চেপে রাখ কথা! কে তোমার কথা শুনছে কে জানে...এই তো আজকের দিনের বুলি। আমরা যখন পরস্পরের কাছে মনের কথা খুলে বলছি—তখন চুপ করে থাকব বইকি।'

'কিন্তু আমি যে আর চুপ করে থাকতে পারছি না। আমাকে নিয়ে যা খুশি তুমি করতে পার।'

পিতাঁ বলল : 'আমাকে দিয়ে বিপদের ভয় নেই, মাদাম রিভিয়ের। আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। আমরা দু'জনে খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই।'

কোনো কথা গোপন না করে আনেৎ তার ফন্দির কথা তাকে বলল। শুনে পিতাঁ একটু চমকে উঠল, কিন্তু বাধা দিল না। আনেৎ-এর কথা শেষ হতেই একটু কেসে বলল : 'কিন্তু মাদাম রিভিয়ের, কি ঝুঁকি আপনি ঘাড়ে নিতে চাইছেন তা জানেন কি?'

'না, না, সেকথা হচ্ছে না!' আনেৎ শান্তভাবে উত্তর দিল।

পিতাঁ আবার কাসল। সে মনে মনে ভাবল, এমন কি কৌশল, যার জন্য এই স্ত্রীলোকটি তার জীবন আর মর্যাদা নষ্ট করতে চলেছে। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারল না। আনেৎ বুঝতে পারল তার মনের কথা।

'মঁসিয়ে পিতাঁ, তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও?'

পিতাঁ ঘুরিয়ে না বলে সোজা জিজ্ঞেস করল : 'আপনি কি সেই লোকটিকে ভালোবাসেন?'

আনেৎ লাল হয়ে উঠল আবার (এখনো রক্তে তার তারুণ্য!) 'না, না, ভালোবাসার এ ব্যাপারই নয়। পিতাঁ সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আর আমি তো বুড়ি, আমার এ বয়সে কি ওসব মানায়! এমন কি, ও নিয়ে স্বপ্ন দেখাও শেষ হয়ে গেছে। আমি শুধু ভাবছি তাদের বন্ধুত্বের কথা—আমার

প্রতি তাদের বন্ধুত্বের কথা নয়—তাদের চোখে আমার তো কোনো দামই নেই—তাদের পরস্পরের বন্ধুত্বের কথাই ভাবছি।'

'সত্যিই কি তাই?'

পিতাঁর চিন্তা তখনো শেষ হয়নি। আনেৎ বলল: 'আচ্ছা, এর জন্য আত্মোৎসর্গ কি তোমার কাছে বৃথা বলে মনে হচ্ছে?'

পিতাঁ আনেৎকে চিনতে চেষ্টা করছিল। আনেৎ যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যই বলল: 'দু'জনের একজন মরছে। আলোচনা করে কোনো লাভ নেই পিতাঁ।'

পিতাঁ আলোচনা করল না। সে বুঝতে পারল। কৌশলের উন্মাদনা তখন তাকে ছেয়ে ফেলেছে। আনেৎ তখন তার শ্রদ্ধার পাত্রী। 'কিন্তু একা তো আপনি একাজ পারবেন না,' কয়েক মুহূর্ত ভেবে সে বলল।

'তাও যদি করতে হয় করব।' আনেৎ উত্তর দিল।

পিতাঁ আবার চিন্তায় মগ্ন; খানিকক্ষণ পরে আনেৎ-এর সামনে নুয়ে পড়ে মেঝে থেকে খানিকটা ধুলো তুলে নিয়ে নিজের কপালে ছোঁয়ালো।

'কি করছ?' আনেৎ জিজ্ঞেস করল।

'আপনার বাহিনীতে যোগ দিলাম এবার। দেখুন মাদাম রিভিয়ের—' একটা টুল টেনে তার পাশে বসে পড়ে ফিস ফিস করে বলল: 'সব কিছু আপনি একা করতে পারবেন না—কেননা, কাজের ক্ষেত্রটা মস্ত বড়। একজন সঙ্গীও এখানে কিছু নয়। তাছাড়া আপনার কর্তব্যগুলি তো করতে হবে। আপনার ছেলে আছে, আপনার বিপদের সামনে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। ধরা পড়লে আপনি তো গেলেনই, সঙ্গে সঙ্গে আপনার ছেলের ভবিষ্যৎও নষ্ট হয়ে যাবে। সে তার জন্য নিশ্চয়ই আপনাকে ধন্যবাদ দেবে না। কিন্তু আমার কথা যদি ধরেন, কোনো ভয়ই আমার নেই। আজকের দিনে একা লোক ভারি সস্তা, মাগনা বিকোচ্ছে। এসব কাজ কি করে হাসিল করতে হয় আমি জানি। আমার উপরে আপনি ভার দিন। আমার বিপদ ঘটলে কারো কোনো ক্ষতি নেই। আর যা করতে পারা যায়, করতে তো হবেই।'

'কিন্তু পিতাঁ,' আনেৎ বলল: 'যাদের জন্য বিপদ বরণ করে নিতে যাচ্ছ, তাদের তো তুমি চেনও না।'

'কিন্তু বন্ধুত্ব আমি চিনি,' পিতাঁ বলল: 'ওরা দু'জনে বন্ধু, আপনি তাদের বন্ধু। আর আমি আপনার বন্ধু—এই চার বন্ধু আমরা। বন্ধুত্ব তো চুম্বক-পাথর—লোহার চাইতে শক্ত হলে তবে তো তাকে রোখা যায়!'

'কিন্তু আজকের পৃথিবী তো তাকে রুখছে।'

'সবাই জানে,' পিতাঁ বলল : 'আজকের পৃথিবী দৈত্যের পৃথিবী। কিন্তু মাদাম রিভিয়ের, আমরা এখনো অত উঁচুতে উঠতে পারিনি। আমরা তো সাধারণ মানুষ।'

উপায় সম্বন্ধে শুরু হোলো আলোচনা। পিতাঁ কোনো কথা শুনলো না, বিপদের বেশির ভাগই সে তুলে নিল নিজের কাঁধে। সে তরুণ বন্দীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে—এই ব্যবস্থা হোলো। তারপর যখন সময় আসবে, তখন সে তার পথ প্রদর্শক হিসেবে তাকে এনে আনেৎ-এর হাতে সঁপে দেবে। জেনেভার ট্রেনে কোনো গোলমালই হবে না। সীমান্ত অতিক্রমের ব্যবস্থা সে বন্ধুদের সাহায্যেই করবে। কিন্তু তার আগে হালচালটা একবার ভালো করে বোঝা দরকার। বেশি তাড়াহুড়ো করলে সব পণ্ড হতে পারে। সামনের সপ্তাহে পিতাঁ কোনো একটা ছুতোয় শহরে গিয়ে বন্দীশিবিরের চারপাশে ঘুরে দেখে আসবে। ফ্রান্‌ৎস-এর সঙ্গেও সে দেখা করে ভিত গেঁড়ে আসবে। পিতাঁ বার বার সতর্কতার উপর জোর দিল বটে, কিন্তু উদ্দামতায় তখন সে পরিপূর্ণ। ধরা পড়লে অভিযুক্ত হতে পারে, গুপ্তচর হিসেবে যে কোনো শাস্তি তার হতে পারে, একথা সে আমলই দিল না। সে বুঝতে পারল বইকি। কিন্তু এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি হোলো না। (কে জানে? তার অন্তরের অন্তরে বিপদের আকর্ষণ হয়তো তখন খুবই বেশি। পিতাঁকে আমরা যেমনটি দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে সে 'খাম্বই' হতে চায়) ব্যাপারটা এই বিষাদের দিকটাই তাকে টানলে। সে অভিভূত হোলো, মাথা নুয়ে পড়ল তার, চোখে জ্যোতি, নাক তখন শুঁকছে, পথের সন্ধান করছে। হঠাৎ সে থেমে পড়ল ; দাড়ির জঙ্গলে দেখা দিল হাসি, সে বলল :

'মাদাম রিভিয়ের, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমরা দু'জনেই সমান পাগল। সব কিছু ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, শহর আর মানুষ কারো পাত্তাই মিলছে না, তখন আমি বসে বসে চীনেমাটির বাসন মেরামত করছি। আর আপনি বন্ধুত্বের ভাঙা টুকরোগুলো নিয়ে জোড়াতালি দেবার চেষ্টা করছেন। ভারি হাসির ব্যাপার কিন্তু! আসুন, দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠি। সেই পুরনো গল্পে আছে : পাগলরা যতো এক সঙ্গে জড়ো হয়, ততো তারা জ্ঞানী হয়ে ওঠে!'

'কে বলতে পারে, আমরাও হয়তো একদিন জ্ঞানী হব।'

॥ পনের ॥

পরদিন থেকেই পিতাঁ কাজ শুরু করল। কিন্তু ব্যবসায়ে যে সহিষ্ণুতার শিক্ষা তার হয়েছিল, সেই তার গতিবিধিকে সংযত করে দিল। ধাপে ধাপে সে চলল। গ্রীষ্ম চলে গেল। আনেৎ যখন পারীতে আবার ফিরে এল, তখনো তারা দিন স্থির করতে পারেনি। কিন্তু স্থতো তখন আনেৎ, ফ্রানৎস আর পিতাঁকে শক্ত করে গেঁথে ফেলেছে। আনেৎ-এর ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে এল, পিতাঁ রওনা হোলো সুইস সীমান্তে—সেখানকার ব্যবস্থা তাকে করতে হবে।

শাতো দা'য়েক্স-এর স্বাস্থ্য নিবাসে বসে জোরমঁ্যা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। চিঠিতে সে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারল না। যন্ত্রণায় সে মাঝে মাঝে গোঙিয়ে উঠল বইকি, কিছুটা সে ব্যক্তও করল।

আনেৎ বলল : 'সব কিছু ভেস্তে দিতে চাও?'

তারপর আবার জোরমঁ্যার সেই আদেশ। আনেৎকে সে অন্তত বিশবার এমনিধারা শপথ করতে বাধ্য করলো। 'শপথ কর! তুমি শপথ করেছ।'

'শপথ করেছি, হাঁ সে-শপথ থেকে বিচ্যুত আমি হব না। হায় মুমূর্ষু, আমাদের চালিয়ে নিয়ে চলেছ তোমরা, আমাদের জীবন তো তোমাদের কাছে তুচ্ছ। বেচারী, বেচারী! আমি তোমাকে জানি। না, না, এর থেকে নিজেকে মুক্ত করতে আমি চাই না!'

দু'বছর পেরিয়ে তিন বছরে পড়েছে, সে কলেজে পড়াচ্ছে। কিন্তু আবহাওয়া এবার একেবারে বদলে গেছে। শাভানদের বাড়ির দরজা তার কাছে বন্ধ। সে শুধু বন্ধুই হারায়নি, তাঁরা রক্ষকও ছিলেন, আর তা সে ভালো করেই বুঝতে পারল। সে যে এই পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তাতে সারা শহরে ঈর্ষার উদ্রেক হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্ত হয়নি সে-ঈর্ষা। যে ঢাল তাকে আড়াল করে রেখেছিল, এবার সেখানা সরে যেতেই আর বাধা মানল না। সারা শহর জানতে পারল, জোরমঁ্যার বোন মাদাম দ্য সেঝি-শাভান এখনো এখানে আছেন বটে, কিন্তু আনেৎ-এর সঙ্গে তাঁর সে-বন্ধুত্ব আর নেই। তাঁর ভাই চলে যাওয়ার পর তিনি তার সঙ্গে আর দেখাও করেননি। এতদিন যে নিন্দা আর কুৎসা দমিত হয়েছিল, এবার তা বেরিয়ে এল। দু'বছর ধরে সেখানকার মেয়েরা পিঁপড়ের

মতো কণা কণা করে আনেৎ-এর সম্বন্ধে নানা কুৎসা সংগ্রহ করে স্তূপীকৃত করে রেখেছিল। এই সর্বসাধারণের খামারে সবাই নিজের নিজের ভাগ জোগালো—এক যৌথ প্রতিষ্ঠানের হোলো সৃষ্টি। আনেৎ-এর ব্যক্তিগত জীবন, তার সন্দেহজনক মাতৃত্ব, দেশপ্রেম সম্বন্ধে তার উদাসীনতা, শত্রুর প্রতি সহানুভূতি—সব কিছু সেখানে এনে তারা জড়ো করল। কি সে করেছে, তারা জানত না, কিন্তু তার সন্দেহজনক গতিবিধি করল নানা গুজবের সৃষ্টি। তার গতিবিধির উপর বসল কড়া পাহারা। সুতরাং এই সময়ে পিতাঁর হাতে কাজের ভার দিয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় সে দিল। সে লক্ষ্য করল, তাদের ব্যবহার এসেছে আরো ঠাণ্ডা হয়ে, তাদের মধুর ভদ্রতার আড়ালে দেখা দিচ্ছে বিষাক্ত হাসি—মুখ একটু কুঁচকে যাচ্ছে।

কুৎসা রটেছে এ সম্বন্ধে খবর দেওয়ার বন্ধুর আমাদের অভাব হয় না। খারাপ খবর শোনাবার মতো আনন্দও বুঝি আর নেই। যাকে শোনানো হোলো তার পক্ষে তো ভালোই। তাছাড়া এতো শুধু সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যাপার নয়, এযে কর্তব্য।

লা ব্রতে সানন্দে এই কর্তব্য নিজের কাঁধে তুলে নিল। লা ব্রতে —বিধবা ব্রতা—নির্ভুল উচ্চারণ বুঝি তর্‌তা—এই স্ত্রীলোকটিই সেই জার্মান সামরিক কর্মচারীটির কানে ঘুষি মেরেছিল, তারপর আনেৎ-এর কাছে অনুতাপও সে করেছে। প্রায় চল্লিশ বছর তার বয়স, ভালো মানুষ, নিজের বোতলটি নিয়েই সে খুশি। সেই স্মরণীয় দিন থেকে তার উৎকট শান্তিবাদের পর্ব শুরু হয়েছে। পুলিসগুলো ভালো মানুষ বলেই তাকে কিছু বলেনি। আনেৎ-এর জন্য তার দরদও খুব, কিন্তু এ দরদ ছাড়াও আনেৎ-এর চলত। পাশাপাশি দু'জনে থাকে। তাছাড়া স্ত্রীলোকটির ধোলাইর ব্যবসা। তার কাছে থেকে কি রেহাই পাবার জো আছে।

আনেৎও তাকে তার বুড়ী শাশুড়ীর মুখ চেয়ে সাহায্য করতে রাজি ছিল। এই বুড়ী শাশুড়ীর সঙ্গেই সে থাকত। কিন্তু দু'জন স্ত্রীলোকের ভিতরে এত তফাৎ আর কখনো দেখা যায়নি। লা ব্রতের বিরাট চেহারা, উঁচু নাক আর ক্ষুরধার জিভ; আর তার শাশুড়ী গীইয়্‌মেতে, ছোটখাটো মানুষটি, রোগা চেহারা, ভারি শান্তও সে। তার বয়েস সত্তর পার হয়ে গেছে। অরাস অঞ্চলের এক কৃষকের সঙ্গে দ্বিতীয়বার তার বিয়ে হয়েছিল, সুতরাং যুদ্ধের অগ্নি-শুদ্ধিও তার বাকি নেই। তার যা কিছু ছিল, সব গেছে: বাড়ি-সুদ্ধ ধ্বংস হয়ে

গেছে; বুড়ো স্বামী তারই শোকে মারা গেছে। কিন্তু সে মেনে নিয়েছে এই দুঃখ আর দুর্দশা। কয়েক সপ্তাহ তাকে জার্মান সৈনিকদের সঙ্গে কাটাতে হয়েছে, তার নিজের দেশবাসীর অশ্রান্ত বোমাবর্ষণও তাকে সহ্য করতে হয়েছে। যারা তার সব কিছু ধ্বংস করেছে, আর যারা তার এই দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করেছে তাদের উপর তার কোনো ক্ষোভ নেই। বরং বোমাবর্ষণের সময় সে শত্রুদের জন্যই দুঃখিত হয়েছিল। তারা তখন তার প্রতিবেশী, তারই বিপদের সাথী। সে আত্মসম্মানবোধের পরিচয় দিয়ে তাদের আশ্চর্য করে দিয়েছিল। যখন সে বুঝতে পারল, অদৃষ্টকে এড়াবার চেষ্টা বৃথা, সারা জীবনের শ্রম বৃথা হয়ে গেছে, সে তার অতিথিদের তার যথাসামান্য পুঁজির ভাণ্ডার দেখিয়ে বলল: 'আহা বেচারীরা, নাও, নিয়ে নাও। যতক্ষণ বেঁচে আছ, যদি দরকার থাকে নিয়ে নাও না। আমার কথা কেন ভাবছ? আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি। আমার আর কিছুই দরকার নেই।'

আনেৎ হাসপাতালের একজন আহত জার্মান বন্দীর কাছ থেকে একথা শুনেছিল। সে তখন খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। অরাস অঞ্চলে কয়েকদিনের জন্য মাদাম গীইয়্মেতের অতিথি হয়েছিল; আবার তাকে দেখতে পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে উঠল।

'তোমাদের খবরের কাগজ,' সে বলল: 'বারেস আর পোয়ঁ্যাকারে ফ্রান্সের নামে যা-ই বলুক না কেন, ওদের চাইতে ফ্রান্সকে আমি ভালো করে চিনি।'

আনেৎ-এর ইচ্ছে হোলো মাদাম গীইয়্মেতের সঙ্গে আলাপ করে—অবশ্য ওর ছেলের বৌ যতটা সুযোগ দেয়। বুড়ী কথাবার্তায় খুবই সংযত। আনেৎ-এর মতোই সে ছেলের বৌকে পছন্দ করে না। কিন্তু কখনো সে-ভাব দেখায়নি, মাঝে মাঝে শুধু দুষ্টুমিভরা হাসি হাসে, মুখখানায় তখন দেখা দেয় তারুণ্যের দীপ্তি। অভিযোগ সে কখনো করেনি, প্রতি পাখীরই তো নিজের গান আছে।

আনেৎ প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা করতে যায়—এ খবরটা জানাজানি হয়ে গেল। সমালোচনাও চলল বইকি। দু'টি স্ত্রীলোকের একটিকে তো কেউ দেখতেই পারে না, আর একটি সম্বন্ধে তাদের আছে সন্দেহ। কারণ সে তিন বছর শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে কাটিয়ে এসেছে, জার্মানদের বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই। একজন জার্মান বন্দী তার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে, আর আনেৎও তখন সেখানে থাকে—এ ব্যাপারটা কারো নজরে

এড়াল না—আনেৎ-এর বিরুদ্ধে আর একটা প্রমাণ খাড়া হোলো। কিন্তু লা ত্রতে যখন তার কাছে কুৎসার ঝুলি খালি করে দিল, সে ভ্রূক্ষেপও করল না।

সে পবিত্র দিন এগিয়ে আসছিল। ফরাসী জাতির সত্যিকার ধর্মোৎসবের দিন—'অল সোলস্ ডে'। আরগুলো তো বাহুল্য মাত্র, কোনো রকমে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, কোন দিন খসে পড়বে কে জানে। কিন্তু এই একদিন—যেদিন যে কোনো ধর্মাবলম্বী, এমন কি যাদের ধর্ম নেই তারাও, যোগ দেবে। কেন না যে-মাটিতে তারা জন্মেছে, যে-মাটিতে তারা মিশে যাবে—এ যে তারই উৎসব। তাই আনেৎ, মাদাম ত্ব সেঝি-শাভান্, এমন কি লা ত্রতের কাছেও উৎসবের আহ্বান এল। দিন এসে পড়ল। আনেৎ একরকম অজান্তেই পথচারী জনতার ঢেউয়ে মিশে গেল। তারা এগিয়ে চলল কবরখানার দিকে।

ফটক দিয়ে ঢুকবে এমন সময় মাদাম্ গীইয়্মেতের সঙ্গে দেখা। সেও খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসেছে। সে তার হাত ধরে নিয়ে চলল। কবরগুলি ফুলে ফুলে ঢাকা, মাঝখানের পথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু এক কোণে, ধসে-পড়া দেয়ালের পাশে ফাঁকা জমি পড়ে আছে, সেখানে ফুলের সমারোহ নেই। কতগুলো কাঠের ক্রুশ মাথা উঁচিয়ে আছে। অস্পৃশ্যদের কবরখানা। মৃত শত্রু তারা, হাসপাতাল থেকে এনে এখানে গোর দেওয়া হয়েছে। শত্রু হলেও তারা খৃস্টান—তাই যীশুর এই উপত্যকায় তারা পেয়েছে স্থান। কিন্তু তবু পৃথক হয়েই পড়ে আছে। শেষ-বিচারের দিনে ভেড়াগুলোকে ছাগল থেকে পৃথক করে নেওয়ার জন্যেই বুঝি এই ব্যবস্থা!

মাদাম গীইয়্মেতে স্বর্গরাজ্যে আগে থেকেই জায়গা বেছে রাখবার সুযোগ পায়নি। সে আনেৎকে ডেকে বলল: 'ওখানে আমার একটি ছেলে রয়েছে। সুন্দর চুল তার, চোখে চশমা। ভারি ভদ্র ছিল। আমি যখন রাঁধতাম ও কুয়ো থেকে জল এনে দিত। ওর বাবা আর প্রিয়ার কথা বলত, ওর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি, কি বল?'

আনেৎ তার সঙ্গে সঙ্গে গেল। বুড়ী ক্রুশের উপর লেখা নাম পড়তে পারল না, আনেৎ তাকে সাহায্য করল। অনেক খুঁজে ওরা বার করল তাকে। মাদাম গীইয়্মেতে বলল: 'আহা বেচারী আমার, তুমি এখানে রয়েছ! তোমার অদৃষ্ট তো ভারি খারাপ! কিন্তু ওখানেও এই অবস্থাই হোতো। যাক্ তোমার বুড়ীমা তোমাকে ভোলেনি। সে তোমার জন্য ফুল আনতে পারেনি বটে, কিন্তু প্রার্থনা সে করবে।'

আনেৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। কবরগুলির নগ্নতা তাকে স্পর্শ করল, সে শিউরে উঠল। অসহায় তারা, শত্রু তারা, তাই আত্মার উৎসবের দিনে মৃতের আত্মীয়রা তাদের ইচ্ছে করেই ভুলে গেছে। সে উঠে পড়ে কবরখানার ফটকের কাছে এসে রক্ষকের কাছ থেকে কতকগুলো ফুল কিনল, একবারও মনে হোলো না, তার আশেপাশের লোকগুলো তাকে লক্ষ্য করছে। ফুল নিয়ে সে সেই অবহেলিত মৃতের কাছে ফিরে এল। নগ্ন মাটির নিচে তারা পড়ে আছে, তাদের সেই নগ্নতাকে সে ফুল দিয়ে ঢেকে দিল। বুড়ী তখন প্রার্থনা করছে তাদের আত্মার মুক্তি-কামনায়। এবার সে উঠে দাঁড়াল, আনেৎ তার হাত ধরে বেরিয়ে এল।

তারা এবার এই অছুৎ এলাকার সীমান্তে একদল লোককে দেখতে পেল। তারা তাদের লক্ষ্য করছে। কয়েকজন স্ত্রীলোক আঙুল দিয়ে তাদের দিকে দেখালো, শোনা গেল উত্তেজিত স্বর। কিছুদূরে দু'একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা কোনো মন্তব্য করলেন না। মাদাম গীইয়মেতে আর তার সঙ্গীকে এই ঝোঁপের ভিতর দিয়েই চলে আসতে হোলো, ঝোঁপে কাঁটা ছিল বইকি। একটা স্বর শোনা গেল : 'একবার ভাব তো, ঐ পচা মড়াটার কবরে ওরা ফুল দিয়ে এল!'

আনেৎ-এর রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল, সে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করল। গর্বভরে সে তাদের অতিক্রম করে গেল। তাকে অপমান করতে কেউ সাহস করল না কিন্তু মাদাম দ্য গীইয়্মেতে রেহাই পেল না। চিৎকার উঠল : 'বুড়ী বেশ্যা কোথাকার! নিজেকে বিকিয়ে এলি!'

'আরে তাও কি বলতে হবে নাকি, মাগী তো হুনদের কাছে দেহ বেচেছে।'

বুড়ী মুচকি হাসল : 'হাঁ, বেচেছে বইকি। চমৎকার ব্যবসা! তার যথাসর্বস্ব গেছে!' আনেৎ কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দিল না। সে এগিয়ে এল বুড়ীকে বাঁচাতে, তার স্বভাব অনুযায়ী তাদের আক্রমণ করে বসল। মৃতের সুমুখে এমনি ঘৃণিত উক্তির জন্য সে তাদের ভৎর্সনা করল। কবরের নিচে সবাই তো সমান, সেখানে শত্রু আর মিত্র কোনো প্রভেদ নেই। তারা জানাল তীব্র প্রতিবাদ। সহ্যের সীমা তখন সে অতিক্রম করে গেছে, সে ঘোষণা করল জার্মান আর ফরাসী মৃত শহীদদের সে সমান শ্রদ্ধাই করে। তারা সবাই-ই তো বলি, তারা তো শিকার!...

সে যা বলল, স্থানীয় তিনটি খবরের কাগজের পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট।

তাদের রাজনীতিক রং বিভিন্ন হলেও তারা পরদিনের কাগজে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাকে জানাল তীব্র অভিনন্দন। দৃশ্যের যথাযথ বর্ণনা দিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপিকার মন্তব্য উদ্ধৃত করে দিল। অথচ তিনি রাষ্ট্রেরই অন্তর্ভুক্ত। তারা সমস্বরে চিৎকার করে দাবি জানাল, সরকারকে এর বিহিত করতে হবে।

ফল ফলতেও দেরি হোলো না। আনেৎকে অধ্যক্ষ ডেকে পাঠালেন, তদন্ত শুরু হোলো, একদিন বরখাস্ত করার রায়ও বেরুল। আনেৎ অভিযোগ করল না। রওনা হবার জন্য সে প্রস্তুত। তার তখন বিরক্তি ধরে গেছে।

তাছাড়া এসেছে কাজের ডাক। লগ্ন এসে গেছে। নিজেকে থাকতে হবে প্রস্তুত হয়ে।

পিতাঁও প্রস্তুত। ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। সবকিছু সে খতিয়ে দেখেছে বিস্তারিত ভাবে। ফ্রানৎসকে বন্দীশিবির থেকে নিয়ে আসা, তাকে ট্রেনে চাপিয়ে দেওয়ার ভার তার উপর। তারপর আনেৎ তাকে পৌঁছে দেবে সর্বশেষ স্টেশনে। এখানে ফরাসী শুল্ক-বিভাগের অফিস। পিতাঁর এক বন্ধু সেখানে থেকে তাকে ঘোরাপথে সীমান্তে নিয়ে যাবে। সেখানে দুই দেশের সীমার উপর এক হোটেল আছে, তার একটা দরজা ফ্রান্সে, আর একটা সুইজারল্যাণ্ডে। কোনো রকমে সেই দরজা দিয়ে সরে পড়বে তারা। কিন্তু পিতাঁর উপরই বেশি দায়িত্ব, আনেৎও সাবধানী, তারও বিপদের আশঙ্কা কম নয়। সে পারীতে সুইজারল্যাণ্ডের দু'খানি টিকিট জোগাড় করল। টিকিট জোগাড় করবার জন্য স্টেশনে তাকে দু'খানা পাসপোর্ট দেখাতে হোলো। পাসপোর্টে তারিখ আর গন্তব্যস্থানের ছাপমারা। পিতাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল, সে ফ্রানৎস-এর পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু আনেৎ ঠিক সময়ে তার কাছ থেকে পাসপোর্ট পেল না। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। দিন এসে পড়ছে। আনেৎ দু'খানা পাসপোর্ট জোগাড় করল —একখানা তার নিজের, আর একখানা ছেলের নামে। এ নিছক পাগলামি। মার্ক ফ্রানৎস-এর বয়েসী তো নয়ই, তাছাড়া চেহারায়ও মিল নেই। কিন্তু দেরি করা তো চলে না। সে বিপদ বরণ করতে প্রস্তুত। সব কিছু উৎসর্গ করতে হবে। উপায় কি! তাছাড়া পাসপোর্টের দরকার তো শুধু টিকিট কেনবার সময়।

মার্সেল ফ্রাঁর সাহায্যে টিকিট পেতে অসুবিধে হোলো না। অথচ তার

চাইতে যাদের টিকিট পাবার দরকার ঢের বেশি তারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে শত চেষ্টা বা অনুনয়-বিনয় করেও কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেল না। কি চমৎকার আইন-কানুন! নিরীহ লোকদের উৎপীড়ন করবার সুন্দর ব্যবস্থা! আনেৎ কিন্তু তার এই সৌভাগ্যের কথা টেরও পেল না। সে যখন যা চেয়েছে, পেতে হবে বলেই চেয়েছে। যাদের উপর এই পাওয়ার ব্যাপারটা নির্ভর করছে তারা তার ইচ্ছাশক্তির কাছে মাথা নুইয়েছে। আনেৎ-এর কাছে ব্যাপারটা তাই অতি স্বাভাবিক বলেই মনে হোলো। সে শুধু জানাল, তার অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে সে সুইজারল্যাণ্ডে যেতে চায়। মার্সেলও অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন মনে করলে না, যথাযথ ব্যবস্থা করে দিল।

পিতাঁর সঙ্গে যেদিন স্থির করা হয়েছিল, তার আগের দিন সন্ধ্যায় আনেৎ রওনা হোলো। সে এমনি বন্দোবস্ত করে রেখেছিল যাতে তার রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে পিতাঁও তার কাজ শুরু করে দেয়। এখন গাছের ডালের পাখীর মতো তার দশা, কোথায় উড়ে গিয়ে বসবে কে জানে। এই অঞ্চল আর পারীর লোকদের এড়িয়ে তাকে চলতে হবে। সেই ব্যবস্থাই সে করল। সে পারী হয়ে যাবে, এ খবর কাউকে জানাল না। সিলভী শুধু জানত তার বোন বরখাস্ত হয়েছে, তার কারণও তার অজানা ছিল না। কিন্তু কবে সে ফিরবে সে জানত না। আনেৎ কয়েক ঘণ্টা মাত্র পারীতে রইল। সে তখন তার অভিযানের তোড়জোড় নিয়ে ব্যস্ত। চৌঠা নভেম্বর রাতে এসে পৌঁছল পারীতে। কেউ জানল না পৌঁছনোর খবর। স্টেশনের কাছে এক হোটেল গিয়ে উঠলো। এবারও তার ভাগ্য ভালো,—অক্টোবর মাসের শেষ থেকে ফ্রাঙ্কো-সুঈস সীমান্ত একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইতালীর বিপর্যয় তার কারণ। নভেম্বরের ন' তারিখ পর্যন্ত বন্ধই থাকবে। দশ তারিখে আবার একদিনের জন্য সীমান্ত খোলা হবে—এই মর্মে ঘোষণা তখন হয়ে গেছে। আনেৎ ভোরবেলা অস্থির হয়ে কাটাল, পুলিস দপ্তর পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে কেটে গেল সারা বিকেলটা। এবার পাসপোর্ট তৈরি, টিকিটও পাওয়া গেল। সব শেষ হতে বেলা শেষ হয়ে এল। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আনেৎ হোটেলে ফিরে এল বিশ্রাম করতে—সুমুখে তার দুঃসাহিক অভিযানের রাত। কিন্তু ঘরটা যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা। হাতে কাজও নেই, এবার এল দুশ্চিন্তা। সে ক্লান্তিতে গা এলিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগল এই অভিযানের নিষ্ফলতার কথা। ফ্রানৎস-এর

এই পালাবার খবর কি ওরা তাড়াতাড়ি ধরতে পারবে না? সে কি ঠিক সময়ে ট্রেন ধরতে পারবে? তার কাছে দু'খানা টিকিট—তাকে কি ওরা ছেড়ে দেবে? না, না, এখন ও-ভাবনা নয়। শীগগিরই তো সে বুঝতে পারবে। আজ আগামীকালের বিপদ ধার করে এনে লাভ কি? এখন চিন্তা থাক। হঠাৎ তার মনে পড়ল খাবার তো সঙ্গে নেওয়া হয়নি। ফ্রানৎস হয়তো ক্ষুধার্ত হয়েই আসবে। সে আবার বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

চারটে বেজেছে, দিনের আলো নিবে গেছে। ঠাণ্ডা, অলস নিশ্বাস যেন চেপে বসেছে শহরের উপর। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, শহর ভিজে উঠেছে। না, এ বৃষ্টি থামবে না। মনে হয় যেন মাটি ফুঁড়ে ঝরছে বৃষ্টি, বাড়ির দেয়াল চুইয়ে পড়ছে। অদৃশ্য আকাশ থেকে ঝরছে বৃষ্টি। পারী কুয়াশায় ডুবে গেছে, যেমন কম্বলের নিচে ডুবে যায় ঘুমন্ত মানুষ। আনেৎ পথে বেরিয়ে চোখে কিছুই দেখতে পেল না। বর্ষার ওড়নার আড়াল থেকে হঠাৎ পথিকেরা বেরিয়ে আসছে, আবার কুয়াশার আড়ালে মিলিয়ে যাচ্ছে। যারা লোকের চোখ এড়িয়ে যেতে চায়, তাদের পক্ষে এ এক আড়াল। আবার ফাঁদও বটে।

হঠাৎ কুয়াশার সার্সি ভেঙে খানখান হয়ে গেল, একটা মাথা ভেসে উঠল, উঠল চিৎকার। এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটে গেল, আনেৎ কিছু ভেবে পেল না। একখানা হাত এসে চেপে ধরল তার হাত। সে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে মার্ক।

'মা! তুমি!'

আনেৎ হতবাক। একে সে দেখবে আশাও করেনি। মার্ক তার দিকে তাকাল। সুখী, কৌতূহলী মার্ক। আনেৎ-এর ছাতার নিচে ঢুকে সে তাকে জড়িয়ে ধরল। তাদের ঠোঁট আর গাল চুইয়ে পড়ছে বৃষ্টি। আনেৎ আত্মস্থ হতে চেষ্টা করল।

'তুমি তাহলে এসে গেছ? বাড়িতে আসবে না?' মার্ক জিজ্ঞাসা করল।

'না, আমি পারীতে কয়েক ঘণ্টা আছি, তারপর চলে যাব।'

মার্ক অবাক হোলো: 'কি বললে? আজ রাতটা তো থাকবে?'

'না, আজ সন্ধ্যেয় চলে যাচ্ছিরে।'

ছেলে বুঝতে পারল না। 'কি বললে? আজ সন্ধ্যেয়ই চলে যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ, কদিনের জন্য যাচ্ছ? কবে ফিরছ? এসেই চলে যাচ্ছ, কই আমাকে তো কিছুই বলনি মা?'

আনেৎ এখন আত্মস্থ। 'আমাকে ক্ষমা কর! এখনও জানি না, কবে ফিরব।'

মার্ক আবার তাকে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যস্ত করে তুলল।

'পরে বলব'খন। রাস্তায় বৃষ্টির ভিতর দাঁড়িয়ে তো সব কথা বলা যায় না।'

'বেশ তো, বাড়ি চল! সন্ধ্যের এখনো ঢের বাকি।'

'না, আমি সোজা স্টেশনেই যাব।'

মার্ক গম্ভীরস্বরে বলল: 'বেশ তো, আমি তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসছি।'

হোটেলে তাকে ফিরে যেতে হবে। আর সে তার ছেলেকে জানতে দিতেও চায় না কোথায় সে উঠেছে। তাকে ব্যাপারটা বলাও মুশকিল। হাজারটা কারণ আছে। তাকে এর সঙ্গে জড়াতে সে রাজি নয়। কি মনে করে বসবে কে জানে! আনেৎ-এর তার উপর বিশ্বাস নেই, তার চরিত্রের উপরও নেই। সে বুঝতে তো পারবেই না, বরং বিরুদ্ধবাদীতাই করবে। না, তাকে বলা হবে না। আর একটা জীবনের কথাও তো ভাবতে হবে। কিন্তু না-বললে যে সন্দেহ করবে? সন্দেহ তো করেছেই। ওর এই গোপনে পারী আগমন নিয়ে মার্ক কি ভাবছে? আনেৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

'এখন বাড়ি যাও,' সে বললে: 'বৃষ্টি জোরে পড়ছে। ভিজে চুপচুপে হয়ে যাবে।'

মার্ক ঘাড় নাড়ল। 'তুমি নিশ্চয়ই সঙ্গে জিনিসপত্র এনেছ। কোথায় রেখে এসেছ বল তো? যাই গিয়ে নিয়ে আসি।'

'কোন দরকার নেইরে।'

আঘাত পেল মার্ক, কিন্তু শুনেও যেন শুনল না তার কথা, সে জানতে চায়, আনেৎ কোথায় চলেছে।

'টিকিট করেছ?'

আনেৎ উত্তর দিল না। মার্ক এবার তার পাশে পাশে চলতে শুরু করল। আনেৎ-এর মনে হোলো সে তাকে পাহারা দিচ্ছে। আনেৎ একটা কারণ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করল, কিন্তু ভেবে পেল না। একটা পথের বাঁকে এসে সে থেমে পড়ল, হঠাৎ আদেশের স্বরে সে বলল: 'এখানে আমরা বিদায় নেব।'

মার্ক বার বার বলল: 'না, এখন নয়। স্টেশনের প্লাটফর্মে।'

'না, এখুনি।' আনেৎ-এর স্বর রুক্ষ।

সে তবু সঙ্গে সঙ্গে চলল। আনেৎ বিরক্ত হোলো। তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল : 'যথেষ্ট হয়েছে! এবার ফিরে যাও!'

থেমে গেল মার্ক, কে যেন তার মুখে থাবড়া কষিয়ে দিয়েছে। আনেৎ বুঝতে পারল, এ-অপরাধ সে কখনো ক্ষমা করবে না। কিন্তু শুরু সে করেছে, শেষে তাকে পৌঁছতেই হবে। আর এছাড়া অন্য উপায়ও নেই।

আঘাত পেয়ে মার্ক সে-আঘাত ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করল : 'কি করতে যাচ্ছ তুমি? আমাকে তুমি অবিশ্বাস কর?'

'হাঁ, করি।'

মার্ক মুখ ফিরিয়ে চলতে শুরু করল।

আনেৎ চিৎকার করে উঠল। 'মার্ক, মার্ক, আমাকে চুমু খেলে না!'

মার্ক ফিরেও তাকাল না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে চলে যাচ্ছে। কুয়াশা তাকে ঘিরে ফেলছে।

আনেৎ তখন ভাবাবেগে হত-চেতন, সে ছুটে গেল : 'মার্ক! মার্ক··· হা ঈশ্বর।'

মার্ক তখন মিলিয়ে গেছে।

আনেৎ ছুটল, পথচারীদের ধাক্কা দিয়ে কুয়াশার ভিতরে সে ছুটল। চিৎকার করে বলতে চাইল : 'ক্ষমা কর! আমাকে ক্ষমা কর! আমি পরে তোমাকে বলব। একটু অপেক্ষা কর মার্ক!'

কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। সে চলে গেছে। রাত আর কুয়াশা তাকে গ্রাস করেছে। কয়েক মুহূর্ত পরে সে ফিরে এল। আর একজনের কথা ভাবতে হবে। সে তো আর অপেক্ষা করবে না।

॥ ষোল ॥

মার্কের কথা আর মনে পড়ল না। যাত্রার তোড়জোড় করতেই সে তখন ব্যস্ত। আর বিপদও আছে। প্লাটফর্মের ফটকে দু'খানা টিকিটেই ছাপ মেরে নিতে হবে। ওরা তো একখানা করে টিকিটে ছাপ মারে। আর

একখানা টিকিটে কি করে সে ছাপ মেরে নেওয়াবে? কিন্তু এবারও ভাগ্য তার উপর সদয় হোলো। একটি পরিবার যাচ্ছিল। বাবা মা আর তিনটি ছেলেমেয়ে। বাবা একজনের হাত ধরে আছে, মার হাতে আর একজনের হাত—বারো বছরের ছোট্ট মেয়েটি তাদের পিছনে। আনেৎ গিয়ে তার হাত ধরল, গার্ডকে টিকিট দু'খানা সে হাসিমুখেই দেখাল। গার্ড তখন ব্যস্ত, ভালো করে দেখলও না, ছাপ মেরে ছেড়ে দিল। আনেৎ এবার মেয়েটিকে তার বাবা আর মার কাছে পৌঁছে দিল।

গাড়িতে ভিড়, কামরাগুলো ভরতি। আনেৎ গাড়িতে উঠে করিডোরে দাঁড়িয়ে রইল। অনেক্ষণ পরে ছাড়ল গাড়ি। রাতের অন্ধকারের ভিতরে ছুটে চলল। শত্রুর বিমানের ভয়ে আলো সব নেবানো। হঠাৎ থামল ট্রেন। অন্ধকার স্টেশন। বৃষ্টি পড়ছে, গাড়ির ছাদে, জানালায় ঝরছে বৃষ্টি। জীবনের সাড়া নেই। যেন প্রান্তরের ভিতরে তাদের ভুলে ফেলে গেছে। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ। ঠাণ্ডা। আনেৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোলো। গাড়ির কাঠের পার্টিশনে সে হেলান দিয়ে রয়েছে, চারপাশে তার ভিড়। হাঁটুতে আর গাঁটে ব্যথা। ক্লান্তিতে সে মরে যাচ্ছে—স্বপ্ন দেখল সে; ট্রেনের ধাক্কায় তার ভেঙে গেল স্বপ্ন, আবার চলতে শুরু করেছে গাড়ি। আবার স্বপ্ন।

মার্ক আর ফ্রানৎস-এর স্বপ্ন। একটা শোয়ার ঘর, শহরে নয়, কোনো এক নির্জন পরিবেশে। ফ্রানৎস তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দু'জনে এবার যাত্রা শুরু করবে। ব্যাগ গুছনো শেষ, তারা প্রস্তুত। হঠাৎ খুলে গেল দরজা। মার্ক! ফ্রানৎস অদৃশ্য হোলো পাশের ঘরে। কিন্তু মার্ক তাকে দেখতে পেয়েছে। তার মুখে হাসি, কিন্তু সে-হাসিতে আগুন, কঠিন তার মুখভঙ্গি। সে চাইল তারই সঙ্গে যেতে। কিন্তু আনেৎ জানে সে বন্দীকে ধরিয়ে দেবে। ফ্রানৎস যে ঘরে লুকিয়েছিল, মার্ক সেই দিকেই চলল। আনেৎ বাধা দিল, এসে দাঁড়াল দরজার সুমুখে।

মার্ক বলল: 'মা আমাকে ঢুকতে দাও! আমি তোমার প্রিয় ফ্রাৎসকে একবার দেখতে চাই। অনেক কথা তাকে বলবার আছে।'

আনেৎ চিৎকার করে উঠল। 'তুমি কি চাও আমি জানি। না, ঢুকতে তুমি পাবে না!'

দু'জনের মুখে এসে লাগল দু'জনের নিশ্বাস; তারা দাঁড়িয়ে রইল। পরস্পরকে তুচ্ছ করল তারা। মার্ক তাকে ভয় পাইয়ে দিল। তার

চোখে দেখা দিল বিদ্রূপের নিষ্ঠুর ঝিলিক। সে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল: 'এবার তোমার প্রেমিককে আমি ধরে ফেলেছি!'

ক্রোধে আর ভয়ে আনেৎ অভিভূত হয়ে গেল, এক অজানা আবেগ তার মগজে তুলল আলোড়ন। রান্নাঘরে ব্যবহার-করা একখানা ছুরি সে তুলে নিল হাতে। আর এক মুহূর্ত—তারপরেই ছুরি হানবে আঘাত।

এই পাপ থেকে নিজেকে বিরত করতে সে চেষ্টা করল, শুরু হোলো তারই সংগ্রাম; ঘুম ভেঙে গেল। চারিদিকে অন্ধকার, সে ট্রেনের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে। ভয় আর লজ্জায় সে তখন অভিভূত···দম বন্ধ হয়ে আসছে তার···ছেলের অপমান, তার উপর নিজের আক্রমণ—এই ঘৃণিত সন্দেহ—এ-তো অবচেতন মনের সৃষ্টি—তার সত্তার বিভিন্ন রূপ। মনে মনে বলল: একি হতে পারে? আমি কি কখনো এমনি ধারা ভাবতে পারি! আমার ভিতরেই কি এই ভাবনা এতদিন লুকিয়ে ছিল? হত্যার কথা ভেবে সে শিউরে উঠল।

নিজেকে দু'বার দোষী মনে হোলো। ছেলে তাকে সন্দেহ করতে পারে একথা সে কল্পনা করেছে, তাছাড়া আছে ছেলেকে হত্যা করবার প্রচেষ্টা। মনে মনে সে না ভেবে পারল না: আচ্ছা, এমনি একটা ব্যাপার যদি ঘটত, আমি কি ওকে খুন করতাম?

মনে হোলো, হয়তো সে জোরেই বলে ফেলেছে, আর চারপাশের লোকজন শুনতে পেয়েছে তার কথা। প্রলাপ তার থেমে গেল। নিজেকে সংযত করল, গলায় কান্না জমে উঠছিল, তাকে সে করল শাসন। এবার সে ফিরে পেল সম্বিৎ, বুঝতে পারল গাড়ি রাতের গভীরে ছুটে চলেছে। না, কেউ তার এ প্রলাপ শুনতে পায়নি। সবাই নিজের ভাবে বিভোর। অন্ধকারে সে তার চোখের জল মুছে ফেলল, এই চোখের জলই বুঝি তাকে তিলে তিলে পুড়িয়ে মারছিল। কান পেতে শুনল, তার পাশের দু'জন লোক কি বলছে। আবার বর্তমানে সে এসে পড়ল।

তারা বলছিল, গাড়ি নাকি অন্য পথে চলেছে, বুরবনের লাইনে না গিয়ে বাঁ-দিকে চলেছে। আনেৎ কেঁপে উঠল। সে তো খেয়ালই করেনি! জানলায় এসে সে দাঁড়াল। জমাট ছায়া ছুটে চলেছে, পথের হদিস মিলছে না। এবার থামল গাড়ি। আনেৎ তাকিয়ে দেখল। হাঁ, সেই স্টেশন!

মুখ বার করে সে তাকাল। দু'জন চাষা, কয়েকজন সৈনিক। সে যার

প্রতীক্ষা করছে, সে তো এল না। তার মনে হোলো, সব হয়ত পণ্ড হয়ে গেছে। উদ্বিগ্ন হয়ে সে করিডোর খুঁজতে চাইল। কিন্তু যা ভিড়! গাড়ি আবার চলতে শুরু করল, আবার মাঝপথে থেমে পড়ল, কি প্রয়োজনেই যেন থামল। আলো নেবানো। সে হাতড়ে হাতড়ে এই জমাট-বাঁধা স্রোত পেরিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু পারল না। গাড়ি আবার ছুটতে শুরু করেছে; আলো জ্বলে উঠেছে। আনেৎ আবছা আলোয় দেখতে পেল, যার প্রতীক্ষা সে করছে, সেই তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। আনন্দের উদ্ভাস, তাদের ঠোঁটে মিলল ঠোঁট। বহু কথা ছিল! কিন্তু আত্মা তখন মূক, দেহ কইল কথা। হারানো ভাই আবার ফিরে পেলে তার বোনকে।

ফ্রানৎস-এর হৃদয়ে হতাশা, সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কোথায় সে যাবে, কি করে সে মুক্তি পাবে—এই ছিল তার ভাবনা। ঠিক এই সময়ে আনেৎ এসে দেখা দিল দেবদূতের মতো। সে তাকে ছোট্ট শিশুর মতোই জড়িয়ে ধরল। আনেৎও সুখী, মুরগী যেমন করে তার ছানাগুলিকে আড়াল করে রাখে তেমনি করেই সে তাকে আড়াল করে বলল পরস্পরকে মুক্তির কথা। পিতাঁ কি ধূর্ত! স্টেশনে তাকে সোজা নিয়ে আসেনি, মাঠের ভিতর দিয়ে তাকে নিয়ে গেল। এক জায়গায় আগে থেকেই লাইনটা খারাপ করে রেখেছিল, ট্রেন সেখানে থামতেই, ফ্রানৎস অন্ধকারে গাড়িতে উঠে পড়ল।

এক ঘণ্টা পরে তারা গাড়ি বদলাল। টিকিট পরীক্ষা শেষ, বিপদের সম্ভবনা তখন চলে গেছে। কিন্তু তখনো আছে সীমান্ত। আর একবার ঝাঁপ দিতে হবে বিপদের মুখে। কিন্তু আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। ফ্রানৎস-এর মনে আর আশঙ্কা নেই। আনেৎ-এর মনের আশঙ্কাও ধুয়ে-মুছে গেছে। সে ভুলে গেল তার ক্লান্তি আর দুঃস্বপ্ন। তার ছেলে, তার নিজের আসন্ন বার্ধক্যের কথা সে ভুলে গেল। স্কুলের দু'টি শিশুর মতোই তারা হাসি-গল্পে মেতে উঠল। একটা যেন প্রহসন দেখছে—এমনি ভাবখানা। তারা দুই ভাই আর বোন। ফ্রানৎস এবার ঘড়ির ব্যবসার কথা পাড়ল। ছোট্ট সুঈস শহর জুরায় তাদের দোকান। সেখানকার প্রতিবেশীদের বিদ্‌ঘুটে নাম বলে সে আনেৎকে হাসাল। যারা তাদের পালাবার কথা জানত, এমনি হাসতে দেখলে পাগল না ভেবে পারত না। কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রের উপর ধকল তো কম যায়নি। দুশ্চিন্তার সময় তো ঢের আছে!

কিছুক্ষণ গল্প করার পর ঝিমুনি এল ওদের। হঠাৎ ফ্রানৎস-এর মাথা

ঢলে পড়ল আনেৎ-এর কাঁধের ওপর; আনেৎও ঘুমিয়ে পড়ল, তার গালে ফ্রানৎস-এর চুলের স্পর্শ। স্বপ্ন থেকে তার কর্তব্য এবার তাকে জাগাল—তার উপাধানের মতোই কোমল বুঝি সে-স্বপ্ন।

'ওঠ!'

(সে উঠতে রাজি হোলো না)

'ওঠ। ওরা দরজায় ঘা দিচ্ছে।'

'কারা?'

'যাদের তুমি ভালোবাস।'

(সে মার্ককে দেখতে পেল; নাঁমের ভিড়ের আড়ালে মার্কের মুখ ভেসে উঠেছে।)

'ওর পেছনে তারা তাড়া করছে। ওঠ! খোল দরজা!'

সে চেষ্টা করল, কিন্তু যেন বিছানার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। নিশ্বাস নিল এবার, লাফিয়ে উঠে পড়ল। চোখ তার খোলা। দিনের আলো, গাড়ি সবে থেমেছে। এইখানেই ফ্রানৎস নামবে।

তাড়াতাড়ি সে তাকে জাগিয়ে দিল। তারপর দু'জনে নেমে পড়ল। ভোজনাগারে গিয়ে ঢুকল তারা। একজন চাষা এসে বসলো তাদের টেবিলে, তার মাথার চুল প্রায় সাদা হয়ে গেছে। সে জিজ্ঞেস করল পিতাঁর খবর। আস্তে আস্তে কথা বলল সে। সবাই মিলে কফি খেল। এবার সে বিদায় নিয়ে 'বার'-এর দিকে চলে গেল। চাষাটি এ অঞ্চলের সব খবরই জানে। বার-এর লোকটির সঙ্গে কি কথা বলল, তারপর পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ফ্রানৎস কয়েকটা বিয়ারের বোতল কিনল। এবার তারা আবার চেপে বসল গাড়িতে। গাড়ি চলতে শুরু করল।

নিবস্ত আকাশ, মাঠে বরফের ঝলসানি—পাহাড়ের সার বৃত্ত রচনা করেছে। আনেৎ তার কামরা থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। বরফঢাকা সাদা পথ, তারই উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে গাড়ি। জাতির ফাটল পেরিয়ে সে চলেছে—বন্ধুকে নিয়ে চলেছে মুমূর্ষু বন্ধুর কাছে।

চতুর্থ খণ্ড

॥ এক ॥

বিরাট শহর রোদে গা এলিয়ে দিয়েছে। জেনিভা হ্রদের স্বচ্ছ-শীতল ঠোঁটে সে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাইছে। কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়ায় হ্রদের বুক চঞ্চল।

প্রথমে যে হোটেলটা চোখে পড়ল আনেৎ স্টেশন থেকে বেরিয়ে সেখানেই দু'খানা ঘর ভাড়া নিল। বড় ক্লান্ত সে, কিন্তু বিশ্রামের আশা নেই। তার বুকে চলেছে তোলপাড়, ফ্রানৎস নিরাপদে আছে জানতে না পারলে বিশ্রাম সম্ভব নয়। সন্ধ্যের আগে তার পৌঁছুবার তো সম্ভাবনা নেই। তাই আনেৎ বিকেলটা কাটাল স্টেশনের কাছে একটা পার্কে বসে। ফ্রানৎসকে এই পার্কটার কথাই সে বলেছিল। একটা বেঞ্চে সে বসে পড়ল, কিন্তু চুপ করে বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারল না। উঠে পড়ে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল, ঠাণ্ডা হাওয়ায় পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে, মনে হয় এই বুঝি ভেঙে পড়ে। কিন্তু তবু উপায় নেই। কারো নজরে না পড়ে এই ভয়ে সে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। দিন শেষ হয়ে গেল, এল রাত। সে ফিরে এল হোটেলে। ঘরের জানালা দিয়ে পার্ক আর গেটটা দেখা যায়। সে বার বার সেদিকে তাকাল। বিজলী বাতির নিচে প্রতি-পথিকের ছায়াই ভালো করে দেখল। রাত দশটায় আবার বেরিয়ে পড়ল। কন্‌কনে হাওয়া পথের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে—যেন কোন যুদ্ধের রথ। আকাশের আলো তারই নিশ্বাসে নিবুনিবু। আনেৎ-এর মনে হোলো সত্যিই বুঝি তারা এবার নিবে যাবে।

ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা। এবার সে এল। কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তার ভাব তার মুখেচোখে। হতবুদ্ধি এক শিশুর মতো সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। মনে হয়, এবার বুঝি সে ককিয়ে কেঁদে উঠবে। কিন্তু কাঁদছে না তো। শুধু ঠোঁট কামড়ে আছে।

ওকে দেখতে পেল না, এগিয়ে গেল। আনেৎ ডাকল, সে চিৎকার করে উঠল আনন্দে। আনেৎ ইঙ্গিতে তাকে চুপ করতে বলল। আনেৎ-এর মুখ

উজ্জ্বল। রাস্তার কাদায় ভরে গেছে তার দেহ। পথের এক কোণে দাঁড়িয়ে সে হাত দিয়ে তার কাদা ঝেড়ে দিল; ও কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই হয়েছে আর কি। কোনো আপত্তি না করে ফ্রানৎস তার হাতে নিজেকে সঁপে দিল। সে একা নয়, এতেই সে সুখী, নিজের কাহিনী সে তাকে শোনাতে পারবে। আনেৎ তাকে চুপ করতে অনুরোধ করল; ঘরের ভিতরে গিয়ে সে বলবে, এখানে নয়। রাতের ঠাণ্ডা আর সারা দিনের ভ্রমণে তার সর্দি হয়েছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একদল ভ্রমণকারী স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রানৎসকে হোটেলে ঢুকতে কেউ দেখল না। আনেৎ নিজের ভাই বলে হোটেলে তার নাম লেখাল।

দু'জনের ঘর পাশাপাশি, যাওয়া-আসার বন্দোবস্ত আছে। আনেৎ ফ্রানৎসকে খাওয়াতে বসাল। ফ্রানৎস খাবারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল; শুরু হোলো তার কথা, পলায়নের কাহিনী বর্ণনা করতে তার শ্রান্তি নেই। সে যাতে আস্তে কথা বলে তাই আনেৎ ঝুঁকে পড়ে তার মুখে পুরে দিল কেক। চোখ দিয়ে তার জল ঝরছে ঠাণ্ডায়, মাথা ভারী, নাক ঝাড়ছে ঘন ঘন, হাঁচছে, ঘুম পাচ্ছে তার। তবু ফ্রানৎস-এর সেদিকে লক্ষ্য নেই। খাওয়া আর কথা চলেছে, বিরাম নেই। আনেৎ ক্লান্ত হলেও তাকে থামিয়ে দিতে চাইল না। দেয়ালের কয়েকটা টোকার শব্দ তাকে জানিয়ে দিল অন্য লোকের অস্তিত্ব, ফ্রানৎস চুপ করল এবার। হঠাৎ যেন শ্রান্তি তাকে অভিভূত করে ফেলেছে; সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। পরাজিত সে, এবার এল ঘুম। আনেৎ বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটাল, জ্বরের ঘোরে শুনলো ঘুমন্তের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিটি শব্দ। দরজা খোলা ছিল। তার এই অল্পবয়েসী বন্ধুটির নিয়মিত নিশ্বাস-প্রশ্বাসে তার আনন্দ হোলো—সেই তো তাকে বাঁচিয়েছে। গলা তার শুকিয়ে গেছে, বুক ভারী, সে যাতে তার কাসির শব্দ শুনতে না পায় তাই সে বিছানার চাদরে মুখ ঢাকল।

ভোরে উঠে সে নিজেদের পোশাক ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে রাখল, তারপর বেরুল জোরম্যার মাকে তার করতে।

'আমরা আসছি।'

যখন সে ফিরে এল, ফ্রানৎস তখনো ঘুমে, তাকে জাগাতে সে ইতস্ততই করল। সে তার দিকে তাকাল, তাকাল আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে। মুখ চোখ ঠাণ্ডায় লাল হয়ে গেছে : চোখ আর নাক তো বেশ ফোলা।

বিরক্ত হোলো। কিন্তু এ তো শুধু ছায়া। ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে উঠল।

শাতো দা'য়েক্স-এর ট্রেন সকালেই ছাড়ে। সে ঘুমন্ত মানুষটিকে জাগাল। ফ্রানৎস বিছানার পাশে তাকে দেখে আশ্চর্য হোলো না। মেয়ে সম্বন্ধে এত লাজুক ছেলে! আনেৎ আর তার কাছে মেয়ে নয়, সে এখন তাকে পোষ্যপুত্রী গ্রহণ করেছে! তাই মনে হোলো, তার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া তার পক্ষে অস্বাভাবিক। সে তো তাকে বিশ্বাসের যোগ্য বলেই মনে করেছে (আবার তাড়াতাড়ি সেটুকু কেড়ে নিতেও তার বাধবে না)। আনেৎ তাকে জানাল, সন্ধ্যেয় তারা বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাবে। ফ্রানৎস-এর মুখখানা আঁধার হয়ে গেল। তার বাঞ্ছিতের এত কাছে সে এসে পড়েছে, অথচ ভয় করছে তার। সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল এবার। এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আনেৎ-এর সুমুখে বদলাল পোশাক; সে তাকে গ্রাহ্যই করল না।

হোটেল থেকে বেরোল তারা। সব কিছু তার হাতেই সে ছেড়ে দিল, বিল চোকানো, টিকিট কেনা, ট্রেন খুঁজে বার করা, জায়গা বেছে নেওয়া—সব কিছু। আনেৎ-এর ব্যাগটা পর্যন্ত সে বইল না শুধু একবার থেমে সে একগোছা ভায়োলেট কিনে নিল। সাধারণ জ্ঞান তার নেই, প্রতিরোধশক্তিও তার নেই। প্লাটফর্মে যাত্রীর ভিড়ে সে ঠেলা খেল। আনেৎ যদি ঠিক সময়ে তাকে হাতছানি না দিত, তার জন্য অপেক্ষা না করত, সে হয়ত তাকে হারিয়েই ফেলত। সে এমন মানুষ, কি করছে নিজেই জানে না। তার মন তখন ভবিষ্যতের ভাবাবেশেই বিভোর।

আনেৎ তাকে সচেতন করতে বৃথা চেষ্টা করল। দীর্ঘপথ সে কিছু দেখল না, আনেৎ-এর কথা শুনল অন্যমনস্কভাবে। আনেৎ সবই লক্ষ্য করল। এক ভাবনার ভিতরেই যেন সে বেঁচে আছে। প্রতীক্ষায় উন্মুখ, অধীর সে; সে সুখী, আবার ভীতিও সেখানে দেখা দিচ্ছে। না, আনেৎ-এর চিন্তা নয়, জোরমঁ্যার চিন্তায় তার মন আচ্ছন্ন। চাকার প্রতি আবর্তনে সে এগিয়ে আসছে তার কাছে, আরো কাছে। আনেৎ দেখল, তার ঠোঁট নড়ছে, সে যেন বন্ধুর সঙ্গে কথা কইছে।

শাতো দা'য়েক্স-এ পৌঁছে আনেৎ তাকে আস্তে চলতে অনুরোধ করল, সে নিজে গেল এগিয়ে। জোরমঁ্যাকে তৈরি রাখতে হবে।

জানালার কাছে জোরমঁ্যা গা এলিয়ে দিয়ে শুয়েছিল, পরনে তার বাইরে বেরুবার পোশাক। পাশে মা। সে খবর শুনে উঠে দাঁড়াবার জন্য আবদার

জুড়ে দিল, কিন্তু উঠতে পারল না। চার মাস আনেৎ-এর সঙ্গে দেখা হয়নি, এরই ভিতরে ভয়ংকর পরিবর্তন হয়েছে তার চেহারার। আনেৎ চমকে উঠল—কিন্তু তাকে দেখে, তাড়াতাড়ি সে সামলে নিল।

আনেৎকে আসতে দেখে, সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু অসম্ভব বুঝতে পেরে আবার ভেঙে পড়ল।

আনেৎ কথা বলল। তাকাল তার দিকে, কিন্তু সে যেন এক পর্দা, তারই আড়ালে লুকিয়ে আছে তার সব কিছু। সে ভ্রূ কোঁচকাল, আড়ালটুকু দূর করতেই যেন সে চাইছে। আনেৎ এবার একপাশে সরে দাঁড়াল, মুখ তার আধখোলা দরজার দিকে। সে যা খুঁজছিল, দেখবার অনুমতি মিলেছে। ফ্রানৎস টলতে টলতে ঢুকছে ঘরে; একবার সে থামল, দেখল তাকে, তারপর ছুটে এল তার কাছে।

আবার তাদের হোলো মিলন।

দিনের পর দিন রাতের পর রাত, এই মুহূর্তটির ছবি এঁকেছে, কল্পনায় করেছে অভিনয়—যখন আবার দু'জনের মিলন হবে কি করবে তারা? কিন্তু তারা যা ভেবেছিল, কিছুই তো হোলো না।

করমর্দন তারা করল না, আলিঙ্গনে বদ্ধ হোলো না। এমন কি মুহূর্ত আগেও যে কথা তাদের জিভের ডগায় ঘোরাফেরা করছিল, তাও অনুচ্চারিত রয়ে গেল। প্রথম দৃষ্টিতেই ফ্রানৎস-এর উত্তেজনা হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে গেল, সে ভেঙে পড়ল কাউচের উপর। তার হাত দু'খানা জোরম্যাঁর দেহ ছুঁয়ে গেল। তার মুখ ঢাকা পড়ল কম্বলে। সে ভয় পেল: এই তার বন্ধু—যাকে সেদিন সে বিদায় দিয়েছিল—তখন ছিল সে প্রাণের প্রাচুর্যে পূর্ণ—আর আজ তাকে চেনা যায় না! ভীতির এই ক্ষণিক বিদ্যুৎ জোরম্যাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, তারই আলোয় সে দেখল নিজেকে। ওদের ভিতরে মৃত্যু এসে দেখা দিয়েছে, ওদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

ম্লান মুখ, অসাড় তার দেহ, তবু সে অনুভব করল বন্ধুর মাথা তার পায়ের উপর পড়ে আছে। সে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে মাথা চাপড়ে দিল, যেন অজানা ভয়ের বিরুদ্ধে সে তাকে রক্ষা করতে চাইছে। কিন্তু ভয়ে তখন ফ্রানৎস্ আচ্ছন্ন। তারা বুঝতে পারল, একই তীরে আর তারা নেই—এক যুগে থাকার অধিকারও তাদের লুপ্ত হয়ে গেছে। যুগের সামান্য তারতম্যে তাদের পথ এখন বিভিন্ন, আর অসীম সেই বিভেদ। একজন মৃতের গোষ্ঠীভুক্ত আর

একজন জীবিতের। জোরম্যাঁ স্বীকার করে নিয়েছে এই বিভেদ, তার হিমশীতল দেহ একে প্রশ্নের পরিধির বাইরে বলেই মেনে নিয়েছে। এখন তার কাজ জ্যেষ্ঠের মতো অন্য পারে যে রয়েছে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া। হা ঈশ্বর, কতদূরে তারা চলে গেছে!

ফ্রানৎস্ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। দু'জন স্ত্রীলোককে জোরম্যাঁ অসহিষ্ণু ইঙ্গিতে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তারা এতক্ষণ দরজার কাছে ছায়াঘন আঁধারে ছিল দাঁড়িয়ে—তাদের ডেকে সে বলল : 'দেখ, দেখ, ও কত কষ্ট পাচ্ছে, ওকে নিয়ে যাও!'

আনেৎ ফ্রানৎসকে তাড়াতাড়ি ঘরে নিয়ে গেল। তাকে বসিয়ে তার কানে কানে ভর্ৎসনা আর সান্ত্বনার কত কথাই বলল। লজ্জিত ফ্রানৎস চোখের জল মুছে ফেলল, তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হোলো।

আবার বালিসে মাথা দিয়ে পিছন ফিরে শুয়ে পড়ল জোরম্যাঁ। মৃত্যুর ছায়া তার চোখে, জীবন বুঝি ফুরিয়ে এসেছে। পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইল, মা কি বলল, শুনতে পেল না।

॥ দুই ॥

প্রথম আঘাতের পর তাদের ইচ্ছাশক্তি আবার নতুন করে কাজ শুরু করে দিল। আত্মা আবার নতুন ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনে ব্যস্ত হোলো। মন আবার বেঁধে দিল ক্ষতস্থান, প্রলেপ লাগাল—মোহ ছাড়া তারা তো বাঁচতে বা মরতে পারবে না।

দু'জনের ভিতরে ফ্রানৎস বেশী চতুর, প্রবৃত্তির করায়ত্ত সে, তাই সে খুব সহজেই নিজেকে ভোলাতে পারল—যা সে মনে রাখতে চায় না সহজেই তা ভুলে গেল।—তারা পাশের এক বাড়িতেই উঠেছিল। সন্ধ্যায় তার ঘরে বসে বন্ধুকে সে একখানা চিঠি লিখল···নিজেকে দিল উজাড় করে সে চিঠিতে। সে নিজেকে তো প্রতারণা করলই, জোরম্যাঁকেও প্রতারিত করতে চাইল। সে লিখল তার প্রথম দর্শনের সেই উদ্বেলিত ভাবাবেগের কথা। পরে যখন দেখা হোলো, জোরম্যাঁকে তার সেই মিথ্যা প্রতারণার আরশিতেই দেখল।

ফিরে এল পুরনো বন্ধুত্ব; এমনকি ফ্রানৎস-এর তারুণ্যের আতিশয্য আবার যেন পূর্ণমাত্রায় দেখা দিল। কিন্তু সে হয়ত ভুলতে পারে, জোরমঁ্যা ভোলেনি। ভবিষ্যৎ আর তার নেই, তাই সে অতীতকে দূরে সরিয়ে দিতে পারল না। যা সে দেখেছে, তার মুল্য সে কমিয়ে দিতে চাইল না। প্রথম দর্শনে বন্ধুর মুখে ভীতির ছায়া পড়েছিল, সেই ছায়াই রইল তার মনে জেগে। সেই ছায়াই যেন ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো আবার দেখতে পেল। ফ্রানৎস যখন কথা বলছিল, তার দীপ্ত মুখে বুঝি সে-ছায়া দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল, নাকটাও বুঝি কুঁচকে গেল একবার। সেই তো যথেষ্ট। মাংসের আবরণের আড়ালে জোরমঁ্যার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে এড়াতে পারেনি। ফ্রানৎস মৃত্যুর গন্ধ শুঁকল, মুখ ফিরিয়ে নিল। পরক্ষণেই আবার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে। কবরের সুমুখে দাঁড়িয়ে তার ঘৃণা তো সে লুকোতে পারেনি।

জোরমঁ্যা তিক্ত স্বরে আনেৎকে বলল: 'ও অসুস্থ। ও ঠিকই করেছে।'

ক্রমে ক্রমে মোহের মাকড়সার জালের ফুটোগুলো তারা মেরামত করে দিতে সক্ষম হোলো। ফ্রানৎস আর রোগীর মুখে দেখতে পেল না মৃত্যুর আঙুলের খেলা, শুধু বুঝতে চাইল সেমুখ কি ছাঁচে গড়া চলছে। অবশেষে সেই আসন্ন মুহূর্তের কথাও ভুলে গেল, সে শুধু দেখতে পেল তার বন্ধুকে, তার পুরনো দিনের প্রিয়তম বন্ধুকে। জোরমঁ্যা যেন নতুন জবাব পেল তার উপস্থিতিতে। তার অধর আবার রক্তিম হয়ে উঠল, মনে হোলো সে বুঝি গোপনে রুজ্ মেখেছে। আনেৎ তাই নিয়ে ঠাট্টা করতে সে বলল: 'তুমি ঠাট্টা বলে মনে করছ, কিন্তু এ তো সত্যি। আমি যে একজন পুরনো নাগর তা জানো না! আহা বেচারী! ও পাছে ভয় পায় সেই তো আমার ভাবনা!'

যখন তার অসহ্য ব্যথা উঠত, দমন করবার আর যখন সাধ্য থাকত না, ফ্রানৎসকে বেড়াতে নিয়ে যেতে আনেৎকে সে অনুরোধ করত। না, ওকে সে দেখতে দেবে না যন্ত্রণার এই বিকৃতি।

দু'এক দিনের বেশি শাতো দা'য়েক্স-এ তারা থাকবে না আনেৎ প্রথমে তাই ভেবেছিল। দু'বন্ধুর মিলন ঘটিয়ে দিয়ে পরের দিনই সে পারীতে ফিরে আসবে এই ছিল তার ইচ্ছে। কিন্তু জোরমঁ্যার অবস্থা দেখে যাওয়া সে স্থগিত রাখল। আঁধার ফটকের সামনে তাকে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া চলে না। জোরমঁ্যাও তাকে বুঝিয়ে দিল সে তাই চায়, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলল না। সে কারো

বোঝা হয়ে আছে এ ধারণা তার অসহ্য। আর ফ্রানৎস-এর সঙ্গে একা থাকতে তার ভয়। আনেৎ তার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে থেকে গেল। পারীতে তার বহু কাজ থাকলেও তার সব চাইতে বড় কাজ এখন এই আশ্রিতকে দেখা। সে যে আমাদের পুরনো পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চলেছে।

সে এই গুরুভার গ্রহণ করল, দু'জনেরই বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠল। একমাত্র তার কাছেই তারা তাদের গোপনতম কথা বলতে পারে, কেননা তখন পরস্পরের কাছে বলবার সাহস তারা হারিয়ে ফেলেছে, আর তারা তা চায়ও না। ফ্রানৎসই দু'জনের ভিতর একটু মুখ খোলা, জোরম্যাঁ চাপা। কোনো কথাই সে গোপন করল না। যে সব কথা লোকে গোপন রাখে তা বলতেও সে দ্বিধা করল না।

আনেৎ সবই শুনল, কিন্তু নিজেকে সে প্রতারণা করল না। বুঝতে পারল, জোরম্যাঁ আর ফ্রানৎস সে আনেৎ বলেই তার কাছে সব কথা খুলে বলেনি, সে সেখানে আছে, কাছে আছে বলেই বলেছে। তাদের কাছে সে তো এক অজানা স্ত্রীলোক, তারা শুধু নিজেদের কথা শোনাবার জন্য একজন বিশ্বাসী কাউকে চায়। তার প্রতি ভালোবাসাও তাদের নেই। তারা শুধু নিজেদের নিয়েই বিভোর, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসাও হয়ত আছে—কিন্তু আনেৎ সেখানে কোথায়!

আনেৎ একথা বুঝল, তবু এই অদ্ভুত বন্ধুত্বের নিশ্বাসে সে আক্রান্ত হোলো, অভিভূত হোলো। তাদের ভালোবাসার অদৃশ্য রশ্মি একজন থেকে আর একজনে সংক্রমিত হোলো। আনেৎ তার যোগসূত্র—তার ভিতর দিয়েই তারা পথ পেল দু'জনের হৃদয়ে।

চলতে চলতে ফ্রানৎস আনেৎকে বলল : 'আমি শুধু ওকেই ভালোবাসি, আর কাউকে না। কিন্তু ওকথা ওকে বলতে পারছি না। কেমন যেন রাগে ভরা ওর মুখখানা। ও হয়ত আমাকে বলতেই দেবে না। ও বলে উচ্ছ্বাস ওর সহ্য হয় না। কিন্তু এতো উচ্ছ্বাস নয়—ও তা জানে—আমার মনের কথা জানে—কিন্তু শুনতে চায় না—বিরক্তি লাগে। ও বলে, মনের কথা বলা নাকি মোটেই ভালো নয়। ভালো কি মন্দ জানি না, শুধু জানি ওকে আমি ভালোবাসি—ওকে ভালোবেসেই আমার আনন্দ—এতে তো মন্দ কিছু থাকতে পারে না। হাঁ, ওকেই শুধু আমি ভালোবাসি, আর কাউকে নয়। মেয়েদের আমার ভালো লাগে না। কোনোদিন লাগে নি। হাঁ, ওদের দিকে তাকিয়েছি

বইকি—সুন্দর বলেই তাকিয়েছি। কিন্তু ওদের মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমাকে বাধা দিয়েছে—আকর্ষণ আছে ওদের, কিন্তু তাতে বিরক্তির মিশেলও আছে বইকি। ওদের আলাদা প্রজাতি। একরকম পোকা আছে যারা তাদের পুরুষদের রস চুষে শুষে তাদের মেরে ফেলে, ওরা সেই জাতের হলেও আমি আশ্চর্য হব না। ওদের কখনো ছুঁতে আমার ইচ্ছে হয়নি। তুমি হাসছ? কি বললাম আমি? ওঃ, আমাকে ক্ষমা কর, আমি ভুলে গিয়েছিলাম··· কিন্তু (সে আনেৎ-এর হাত চেপে ধরল) তুমি তো মেয়ে নও।'

'তবে আমি কি?'

'তুমি তুমিই।'

(তার মানে, আনেৎ ভাবল: আমি—আমি তোমার গ্রাহ্যের মধ্যেই নই। খুদে আত্মসর্বস্ব জীব!)

ফ্রানৎস বলল: 'ভারি মজার ব্যাপার তো! কিন্তু তোমাকে কখনো মেয়ে বলে ভাবিনি।'

'একে ঠিক প্রশংসা বলব কিনা ভেবে পাচ্ছি না। যা হোক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'তুমি রাগ করনি তো?'

আনেৎ হেসে উঠল: 'তোমাকে দেখলে রাগ যে থাকে না।'

'কি বললে বুঝতে পারলাম না।'

'সেই তো ভালো! তোমার শোনা উচিত ছিল কিন্তু।'

'আবার বল?'

'না।'

'কি অদ্ভুত তুমি! আমি তোমাকে বুঝতে পারি না। তোমার কাছে অপ্রতিভ হওয়াই আমার উচিত, অথচ কখনো তা হইনি। মনে হয়, তোমার কাছে যা খুশি তাই-ই বলতে পারি।'

'তার কারণ কি জানো? আমি সব কিছু শুনতে পারি।'

'তুমি যেন একজন পুরুষ।'

'তাহলে তো তোমারই জাতের—কি বল? বন্ধু তো?'

'হাঁ। সেই তো সব চাইতে বড়, সব চাইতে ভালো জিনিস। জীবনে ভালো তো বড় মেলে না। আমার বন্ধু তো মাত্র একজন, কিন্তু যখন আমি বন্ধুকে ভালোবাসি, সম্পূর্ণভাবেই বাসি। তাকে একান্ত নিজের করে পেতে

চাই। তাই কি স্বাভাবিক নয়? কিন্তু এ নিয়ে কথার জাল বোনা চলে না। সে তো শুনতেই চায় না। আমার মনে হয়, পৃথিবীতে বুঝি কাউকে পুরোপুরি ভালোবাসা যায় না।'

আনেৎ তার হাতে একটু চাপ না দিয়ে পারল না।

'তুমি আমাকে বুঝেছ?' ফ্রানৎস জিজ্ঞেস করল।

'যত পাগল আছে, সবাইকে আমি বুঝতে পারি। আমিও যে তাদেরই একজন।'

কাউচে গা এলিয়ে দিয়ে নীল আকাশের দিকে চেয়ে জোরম্যাঁও তাকে খুলে বলল তার মনের গোপন কথা।

'আমাকে ছাড়া ও কি করবে? আমাকে এত ভালোবাসে। একেবারে মেয়েদের মতো। তোমার মতো নয় কিন্তু। জীবনের কঠোর শিক্ষা তোমাকে পুরুষ করে তুলেছে। কিন্তু ও তো হৃদয়ের অসংযত ভাবাবেগের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। এই স্বাপ্নিক দুর্বল হৃদয়, এই প্রচণ্ড ভাবাবেগ কোথায় ওকে নিয়ে যাবে? ওকে কত বিপদ থেকে যে বাঁচিয়েছি সে-কথা তোমাকে বলতে পারব না। ও কিন্তু তা টের পায়নি, ওর সে-শক্তি নেই, নেই বিচার-বুদ্ধি। ও চরিত্রহীন, আবার নিষ্পাপ। নৈতিক মূল্যের মানে ওর কাছে আলাদা। মাঝে মাঝে ও আমাকে উদভ্রান্ত করে তুলেছে, তখন কঠোর হওয়াই আমার উচিত ছিল, কিন্তু ওর নিষ্পাপ চোখে দুঃখ আর চমকের ঘোর দেখে আমার নিজেরই মনে হয়েছে, হয়ত আমারই ভুল। ও কি প্রকৃতির এক বৈষম্য, এক বিচ্যুতি? অথবা আমাদের সংকীর্ণ নৈতিক নিয়ম সম্বন্ধেও অচেতন? যাই হোক না কেন, এই নিয়মই তো আমাদের পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত করছে, আমাদের বিচার-বুদ্ধি জন্ম দিয়েছে। আর যখন এই পৃথিবীতে আমাদের থাকতে হবে, তখন ওকে এগুলো মানতে আমরা বাধ্য করব—ও অস্বীকার করলেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু সত্যিই ও স্বীকার করতে চায় না। আমি কখনো ওকে বোঝাতে পারিনি—শেষে আশা ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ও বোঝাবার ভান করেছে, কিন্তু এতে ওর সরল মন শুধু আহতই হয়েছে। আমি তাই ওকে বরং অস্বাভাবিক মানুষ হিসেবেই কামনা করেছি, কিন্তু ভণ্ড হিসেবে নয়। ও নিষ্পাপ। ওকে যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস করানো যায় না বটে কিন্তু ভালোবাসা দিয়ে ওকে যে-কোনো নিয়মের কঠোরতায় বাঁধা যায়। কিন্তু ভালোবাসা বড় নড়বড়ে অবলম্বন, একবার ধসে

পড়লে আর উপায় নেই—সব কিছু শেষ হয়ে যাবে, ওর আত্মা তখন ভেসে ভেসে চলবে, পথ পাবে না। তাই ত ভাবি, আমি যখন থাকব না, কি হবে ওর? আমাকে ছাড়াও ও যাতে টিকতে পারে, সেই পথই ওকে বাতলে দিতে হবে।'

জোরমঁ্যা থামল, চোখ তখনো তার আকাশের দিকে। ঘন নীল আকাশ··· কেমন একটা কাঠিন্যে যেন দানা বেঁধে আছে···কোনো ধাতু বলেই মনে হয়। আকাশে ঘন আলোর নির্যাস আর তার মনে নেমেছে ঘন চিন্তার ছায়া। কিছুক্ষণ পরে সে আবার তিক্ত হাসি হেসে শুরু করল। স্বর দৃঢ়, তেমনি মাপা কথা ঝরে পড়ল। মনে হোলো সে যেন আপন মনেই বলে চলেছে। (আনেৎ-এর দিকে একবারও সে তাকাল না; আনেৎ তার পাশে আছে একথাও বুঝি সে ভুলে গেল।)

'হাঁ আমি জানি, সে একদিন বুঝতে পারবে, শিখে নেবে। আমাকে ছাড়াও তার চলবে। আমরা নিজেদের খুব প্রয়োজনীয় ভেবে গর্ব অনুভব করি, কিন্তু পৃথিবীতে কেউই প্রয়োজনীয় নয়। আমাকে হারিয়ে ও হয়তো ভাববে, সব কিছুই ও হারালো। কিন্তু যা আমরা হারালাম তাতো হারিয়েই গেল, তবু তো চলল আমাদের জীবনযাত্রা—আমরা বেঁচে রইলাম। একই সময়ে আছি আর নেই—এ তো হতে পারে না।'

'তাই তাড়াতাড়ি আমরা যে-কোনো একটা পথ বেছে নিই। জীবিতরা মৃতের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দেয়—সে-বন্ধন তো শুধু বাধাই দেয়। বন্ধন যদি তখনো তাদের ঘিরে থাকে, তারা কেটে ফেলতে দ্বিধা করে না। তারা নিজেরাই বুঝতে পারে না কখন কেটে ফেলে, কিন্তু মৃত মানুষ খসে পড়ে—এমনি করেই আমরা বেঁচে থাকি। আমি জানি, ফ্রানৎস এমনি করেই বেঁচে থাকবে। সে তো আর ব্যতিক্রম নয়।'

আনেৎ এই মোহ-বিচ্যুত আত্মার হাতে হাত রাখল: 'ফ্রানৎস বেঁচে থাকবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে থাকবে তোমার স্মৃতি।'

সে হাত ছাড়িয়ে নিল: 'সে ভুলে যাবে। বিস্মৃতি যখন ধীরে ধীরে আসে তখন নিজেরাই তো তার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে এগিয়ে যাই। ফ্রানৎস বড় সরল। তাকে এ-নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

আনেৎ প্রতিবাদ করতে যাবে, এমন সময় জোরমঁ্যা আবার বলল: 'আমি নিশ্চিত জানি তাই হবে।'

কিন্তু আনেৎ বুঝতে পারল না। সে নিশ্চিত নয়, এ-কথা সে বিশ্বাস করে না। তাই তার ভুল বুঝিয়ে দিতে দেরি হোলো না। সে যদিও স্ত্রীলোকটির যুক্তি শুনে ব্যঙ্গের হাসি হাসল, তবু মনে হোলো উপেক্ষা সে করেনি। তার দিব্যদৃষ্টির সঙ্গে প্রতি মানুষের মোহের প্রয়োজনীয়তার সংঘাত শুরু হোলো। এই প্রয়োজনীয়তার কাছে বশ্যতা স্বীকার পরাজয় ছাড়া কিছুই নয় এ-কথা সে বুঝল, কিন্তু এ-পরাজয়ও বুঝি আনন্দ। আর যে-সত্য দলে পিষে দিয়ে চলে যায়, কেনই বা সে আশার চাইতে বড় হবে?

আনেৎ-এর কাছে সে বশ্যতা স্বীকার করল: 'হ্যাঁ, তার মন হয়ত ভুলবে না। না, এখুনি ভুলবে না। তার জন্যে চাই সময়। কিন্তু এ-মনকে চালাবে কে—এতদিন তো সে চালিত হয়েই এসেছে? ওর দুঃখ নিয়ে আসবে বিশৃঙ্খলা, সব গোলমাল করে দিয়ে যাবে। দুঃখ কাউকে শেখায়, কাউকে বা হতবুদ্ধি করে ফেলে। যারা শেষের দলে, তারা তো প্রতিরোধ করে না, তারা নিঃশেষে দলিত হয়। তারপর নিজেদের বাঁচাবার জন্য যে-কোনো আনন্দকে আঁকড়ে ধরে। ওর জন্য আমার ভয় হয়। কে ওকে ভালোবাসবে, কে ওকে পরামর্শ দেবে? আনেৎ, ওকে তুমি ত্যাগ কোরো না। ও তোমাকে বিশ্বাস করে। ওকে চালিয়ে নিয়ে যেও। ওর আবদার সইতে হবে বইকি। হয়তো মাঝে মাঝে তুমি অবাক হয়ে যাবে। হয় তো এমন অনেক জিনিস পাবে, যাতে শিউরে উঠবে। প্রতি মানুষের ভিতরেই তো ওসব আছে।'

'সে তো আমার ভিতরেও আছে বন্ধু।' আনেৎ বলল: 'আমার মতো স্বাধীন স্ত্রীলোককে অবাক করে দিতে হলে অনেক দূর যেতে হবে। আমি জীবনকে দেখেছি, জেনেছি।'

জোরম্যাঁ অবিশ্বাসভরে তাকাল: 'একজন স্ত্রীলোক নানাভাবে জীবন কাটিয়েও হয়তো জীবন থেকে কিছুই শেখে না।'

'আমাদের তুমি এমন অপদার্থই মনে কর?'

'পৃথিবীর আদি থেকে মেয়েরা এমনিই।'

'তোমরাও তো গুহার বাসিন্দেদের থেকে কিছুমাত্র এগোওনি।'

জোরম্যাঁ হাসল। 'ঠিক, তুমি ঠিক বলেছ! তোমাদের থেকে আমরা সরেশ নই। একই রকম আমরা। আমরা ভাবি, জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি বুঝি সোজা হয়ে আমরা দাঁড়াতে পারি, কিন্তু তা তো নয়। কখন যে তারা এসে আমাদের ধরে ফেলে জানতেও পারি না। কিছুই আমরা শিখিনি। অবশ্য,

আমার নিজের অসুবিধে আর নেই, আমার শিক্ষা তো শেষ। কিন্তু তোমরা যারা রইলে এখনো হাতে বেতের আঘাত পড়বার সময় আছে; সজাগ হোয়ো, বাতাস শুঁকে আগে থেকে তৈরি থেকো! তোমার বহু অভিজ্ঞতার গর্ব হয়তো তোমার সঙ্গে চাতুরী খেলবে, জানোতো, অন্ধের দেশে একচক্ষুরাই রাজা। তোমার হাতে ওকে সঁপে দিলাম—হোক না তোমার একটি মাত্র চোখ—তবু তুমিই ওর ভার নেবে।'

'কিন্তু আমার তো দু'টি চমৎকার চোখ রয়েছে—' আনেৎ হাসতে হাসতে বলল।

'ও-চোখ দেখবার জন্য নয়, ওরা শুধু দেখাবার জন্য। কিন্তু নিজের জন্য দেখতে না পাও, ওর জন্য দেখতে চেষ্টা কোরো। অন্যের ব্যাপারে বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া অনেকটা সহজ ব্যাপার। ওকে চালিয়ো, ভালোবেসো…'

'কিন্তু খবরদার, বেশী ভালোবেসো না—' সে আবার বলল।

আনেৎ ঘাড় নাড়ল।

॥ তিন ॥

ফ্রানৎস-এর থেকে জোরম্যাঁর সঙ্গেই আনেৎ-এর বেশি ঘনিষ্ঠতা, সে তার স্বজাতি, তাকে সে বুঝতেও পারে। একই ছাঁচে ঢালাই তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা, একই আকাশের নিচে তাদের ভাবনা পূর্ণতা লাভ করেছে। জোরম্যাঁর ভাবাবেগের হদিস সে জানে, তার অনুভূতিও জোরম্যাঁর কাছে অজানা নয়। তার বন্ধুত্ব, ভয়, নৈর্ব্যক্তিকতা, জীবন সম্বন্ধে যুক্তি—মৃত্যু আর যন্ত্রণা সম্বন্ধে তার ধারণা, চলে যাবার দুঃখ আর তার নিরাসক্তি—সব কিছুই স্পষ্ট আর স্বচ্ছ। আনেৎ যদি এই ভাগ্য নিয়ে পুরুষ হয়ে জন্মাত বোধ হয় ওর মতোই সে ভাবত, ওর মতোই হোতো সে। এই-ই তার মনে হোলো, জোরম্যাঁর কিছুই যেন তার কাছে অস্বাভাবিক নয়। (সে নিজের সম্বন্ধেও কি এতটা বলতে পারত?) ঘটনাচক্রে তারা আদর্শ স্বামী-স্ত্রী হতে পারত… পরস্পরের প্রতি থাকত শ্রদ্ধা আর স্নেহ—নিশ্চিন্ত হতে পারত তারা—নিজেদের দরজার চাবিকাঠি পরস্পরকে দিয়ে দিত—শুধু হাতে থাকত একটি ছোট্ট চাবি —সে-চাবির কথা কেউ তারা ভাবত না। কিন্তু সেই চাবি দিয়ে তালা খুললে

দেখা যেত তারা পরস্পরের কাছে অপরিচিতই রয়ে গেছে। কিন্তু সুখের বিষয়, এই তালা খোলার সময় বড় আসে না—আর বন্ধুত্ব কখনো এই ছোট্ট চাবিটার দাবি করে বসে না। জোরমঁ্যা আর আনেৎ-এর বন্ধুত্ব প্রতিদান চায়নি, প্রশ্ন করেনি। পরস্পর যা আশা করেছিল তাই-ই তারা পরস্পরকে দান করেছে।

কিন্তু ফ্রানৎস-এর কাছ থেকে কি আশা করা যায় তারা বুঝতে পারল না। এই অজানা রহস্যই তাকে দূরে সরিয়ে দিল, আবার আকর্ষণের বস্তুও করে তুলল। তাকে জানবার চেষ্টা বৃথা। কেউ তাকে জানতে পারবে না; সে নিজেই নিজেকে জানে না। এত ছেলেমানুষ, এত সরল সে! কিন্তু একবার তার অন্তরের অন্তস্তলে ঢুকেছ, দশ পা যেতে না যেতে পথ হারিয়ে ফেলবে। মনে হবে, এক অজানা রাজ্যের আঁধারে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আনেৎ সবগুলো চাবি দিয়ে ওর মনের দরজা খোলার বৃথা চেষ্টা করল, কিন্তু চাবি ঘুরলো না। শুধু সেই খুদে চাবিটা ছাড়া—জোরমঁ্যা এই চাবিটা দিয়ে কখনো চেষ্টা করে দেখেনি। এই সেই চাবি সে যেন বলে: আমি কি জানি না! (লোকে সেই বিখ্যাত রাজার সময়ে ঐ কথাই তো বলতো, তখন ভালো করে কিছু দেখতে হলে সাবধান হওয়াই ছিল নিয়ম।) আনেৎ কিন্তু আত্মার এই কোণ আবিষ্কার করে খুব খুশি হতে পারল না। দোকান-ঘরের পেছনে পথিকের দৃষ্টির বাইরে ঘর থেকে উঠে এল এক রহস্যময় গন্ধ, কানে বাজল মৌমাছির গুনগুনানি। আনেৎ আত্মার এই ঘর-গোছানোর সময় তা শুনলো বইকি। পাখার এই ভনভনানি—এই মিষ্টি অথচ ভয়ংকর শব্দ শুনলো, সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হোলো। তার জটিলতায় জড়িয়ে পড়ল তারা, দুই অপরিচিতের মধ্যে দেখা দিল সুদূর আত্মীয়তার এক বন্ধন (জাতির ক্ষেত্রে এই সুদূর বন্ধন অন্য বন্ধনের চাইতেও নিবিড় হয়ে ওঠে)।

এমনি করে তারা পরস্পরের সংস্পর্শে এল, কথার আদান-প্রদান চলল তাদের, চলল ইঙ্গিত—এমনি করে বুঝি পোকারা আধো-অন্ধকারে তাদের শুঁড় তুলে ইঙ্গিত জানায়। সমস্ত মানুষেরই এক গুপ্তজীবন আছে, কিন্তু প্রখর দিনের আলোয় এই গুপ্তজীবনের হদিস হারিয়ে ফেলে। তাই যখন ইঙ্গিত ব্যবহারের সুযোগ আসে, তারা এক অজানা আনন্দ পায়, যাদের জন্য সম্ভব হোলো তাদের প্রতি জানায় কৃতজ্ঞতা।

দিনের আলোয় তারা হাজারো বিষয় নিয়ে আলোচনা করল, কিন্তু আনেৎ

আর ফ্রানৎস সে-ইঙ্গিত তো ভুলল না। উপত্যকায় ঢেউয়ের কুল-কুল ধ্বনি তারা শুনতে পেল। হৃদয়ের গভীরে তারা পেল পরস্পরের স্পর্শ।

॥ চার ॥

ধ্বংসলীলা ক্রমাগত বেড়ে চলল, যেন তোরণদ্বার ধসে-খসে পড়ছে। অন্ধ না হলে দেখতে পাবে বইকি। মুখের সে ম্লানিমা বুঝি কোনো রুজেই ঘোচেনা। জোরম্যাঁ আর ব্যবহারও করে না, ফ্রানৎসও দেখতে চায় না, এড়িয়ে চলে।

সে ঘরে নিয়ে আসে জীবনের উষ্ণ নিশ্বাস, প্রান্তরের প্রাণপ্রাচুর্য। কখনো বা তুষার ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু তার চুল থেকে, হাতে তার কয়লা আর খড়িতে আঁকা নতুন কখানা রেখাচিত্র। পোশাকে তার তুষার। মুমূর্ষুর অস্থির আঙুলগুলি আর্দ্র স্পর্শ থেকে তার নিজের সবল হাতখানা তাড়াতাড়ি মুক্ত করে নেয়। উত্তেজিত হয়ে সে কথা বলে, জোরম্যাঁ তার প্রাণের উৎসারিত ধারায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আলাপে তারা রোগের কথা এড়িয়েই চলে। ফ্রানৎস তাড়াতাড়ি কয়েকটা প্রশ্ন করে, জোরম্যাঁ কঠোর ঔদাসীন্যের সঙ্গে উত্তর দেয়, পাশ ফিরে শোয়। তারপর শুরু হয় শিল্প-আলোচনা, ভাবজগতের কথা, চিরন্তন প্রশ্ন—যার কোনো অস্তিত্ব নেই। (আনেৎ ভাবধারার মুঠোয় বন্দী এই মানুষ দু'টির উন্মত্ততা দেখে অবাক হোলো।) এক এক সময় ফ্রানৎস একাই কথা বলে যায়। তার বন্দীজীবন, বছরের পর বছর কেটে গেছে তার বন্দী শিবিরে; কত দুঃখই না সে সয়েছে—দূর থেকে সে-দুঃখ কেমন মধুর বলে মনে হয়। কত লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে তখন, যুদ্ধের পর কি করবে তারই জল্পনা করে কাটিয়েছে দিন। তার বিস্তৃত দৃষ্টি সব কিছুকে এমনি করে ছুঁয়ে যায়, মনে হয় সে যেন জোরম্যাঁর ঐ তোবড়ানো বিকৃত চেহারাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে। ভয় পেয়ে আর এক প্রসঙ্গে চলে আসে। জোরম্যাঁ নিঃশব্দে হাসে, জীবিতের পৃথিবীতে তাকে এনে সে হঠাৎ আছড়ে ফেলে দেয়। বলে :

'যথেষ্ট গল্প করেছ। আনেৎ, এবার ওকে বেড়াতে নিয়ে যাও। এমন চমৎকার দিনটা ঘরে বসে নষ্ট করবে?'

তারপর আনেৎ বিদায় নেওয়ার সময় বলে : 'আজ সন্ধ্যেয় একবার একা এসো, দরকার আছে।'

আনেৎ ফ্রানৎসকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। ফ্রানৎস তাড়াতাড়ি বলে : 'আজ বোধহয় বেশ ভালো আছে—তাই না ?'

উত্তরের অপেক্ষা না করে, লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল, প্রশস্ত বুক-খানা তার এগিয়ে যাচ্ছে। চলার তালে তালে হাওয়ায় উড়ছে চুল, বিশুদ্ধ হাওয়া সে গ্রহণ করছে প্রতি নিশ্বাসে। আনেৎ-এর পাও পড়ছে সমান তালে, চলার আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জীবিতের এ এক প্রতিশোধ। রোগের আবহাওয়ায় বসে বসে দেহ মন যখন উৎপীড়িত হয়ে ওঠে, বেদনার মাদকে যখন আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তার পরেই আসে এই প্রতিশোধের পালা। ফ্রানৎস এগিয়ে চলল, ওকে ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গেল, এক অদ্ভুত ছেলেমানুষি ওকে যেন পেয়ে বসেছে ; ওরা দৌড়চ্ছে, খাড়া উঁচু জমির উপর লাফিয়ে উঠছে, পাইনের বরফ-ঢাকা ডাল আঁকড়ে ধরছে। ওরা স্কী পরে শাদা মাঠের উপর দিয়ে ভেসে চলল ; উড়ে গেল ! এবার এসেছে পরিপূর্ণ নিবৃত্তি, বিশুদ্ধ হওয়ায় মাদকতা এনে দিয়েছে দেহে, রক্তের ঢেউয়ে ভাবনার শেষ ছায়াটুকু গেছে মিলিয়ে ! একটা পাথরের উপর ওরা বসে পড়ল। রোদ পোহাচ্ছে, তাকিয়ে আছে উপত্যকার সীমারেখার দিকে। ফ্রানৎস হাসতে হাসতে তাকে বুঝিয়ে দিল প্রকৃতির সৌন্দর্যের এই মূলতত্ত্ব ! স্বরগ্রাম আর তন্ত্রীতে মিলে এ এক চমৎকার সুর ! পশ্চিম আকাশে ময়ূরের পুচ্ছের মতো ছড়িয়ে পড়েছে রাঙা মেঘ। কথা বলতে বলতে বলিষ্ঠ রেখায় সে আঁকল পাতার পর পাতা : প্রান্তর, গাছপালা, শুকনো ঠোঁট, তীক্ষ্ণ নাকওলা ঝুঁকে-পড়া মানুষের মতো টীলার চূড়া। নিজেই বুঝতে পারলনা কি সে আঁকছে—কথা, অনর্গল বেরিয়ে এল কথা—কথার পর কথা। আনেৎ ওর আঙুলগুলির দিকে তাকিয়ে রইল, কানে বাজছে ওর অলস কথার ধ্বনি। অন্যমনস্কভাবে উত্তরও সে দিয়ে গেল। যাকে সে পিছনে রেখে এসেছে, তার কথাই সে ভাবছিল, কিন্তু একবারও তার নাম করল না। হঠাৎ সে মোহাবিষ্ট হোলো : একি ! ফ্রানৎস-এর আঙুল যন্ত্রচালিতের মতো একখানা মুখ এঁকেছে—সে-মুখ তার চেনা—মৃতের সে-মুখ। কোনো কথা সে বলল না। ফ্রানৎস তখনো বকে চলেছে। একখানা মেঘ সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে, চারিদিকে আঁধার গুহার নিস্তব্ধতা। ফ্রানৎস এবার

আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো, পিছিয়ে গেল : হঠাৎ যেন একটা সাপ তার পাশে মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। হাত তার কাঁপছে, সে পাতাটা উলটে দিল, তারপর ছুঁড়ে ফেলল রেখাচিত্রের খাতাটা—ঢালু জমিতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলল খাতাটা। ফ্রানৎস এক লাফে উঠে বরফ-ঢাকা প্রান্তরে নেমে এল। ভেসে চলেছে সে—চারিদিকে শাদা, শাদা বরফ। আর আনেৎ তার পিছনে।

রাতে খাওয়ার পর আনেৎ জোরমঁ্যার কাছে এল। রোগীর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, মনে হয় যেন বরফে মোড়া মুখ। সারাদিন সে যুদ্ধ করে কাটিয়েছে। নিষ্ঠুর এক যুদ্ধ।• দিনটা যাদের ভালো কেটেছে তাদের উপর তার ভীষণ রাগ। এত দেরী হোলো বলে আনেৎকে সে ভৎর্সনা করল, এমনকি নিষ্ঠুরভাবেই সে জিজ্ঞেস করে বসল, দিনটা তারা কেমন কাটিয়েছে। তার মুখের দীপ্তি, তার চামড়ার নিচে রক্তধারার চঞ্চলতাও তার দৃষ্টি এড়াল না ; সে অভিনন্দন জানাল কিন্তু ব্যাঙ্গের হুল তাতে ফুটে রইল।

আনেৎ উত্তর দিল না। বুঝতে সে পেরেছে, ক্ষমা চাইল : 'ক্ষমা কর বন্ধু !'

লজ্জিত হোলো জোরমঁ্যা, শান্তস্বরে এবার সে জিজ্ঞেস করল দিনের খবর। আনেৎ জানাল, খবর ভালো নয়। দীর্ঘ চার বছরেও যুদ্ধে ক্লান্তি আসেনি, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে শক্তিগুলি আরো মেতে উঠেছে। ভয়ংকর বসন্ত অভিযানের ভীতি পারীর উপর দুলছে। সেই বিয়োগান্ত আগামীর কথাই তারা বলাবলি করল, জোরমঁ্যাও তার নিজের বেদনা আরোপ করল পৃথিবীর উপর, ছড়িয়ে দিল। তার মনে হোলো, মানুষের ক্রমিক উন্নতি ক্ষণিকের সাফল্য নিয়ে এসেছিল—সে সাফল্যের মূলে ছিল অক্লান্ত প্রচেষ্টা আর অসাধারণ ভাগ্য—প্রতিভার পরিশ্রমের ফলে আর এক অঘটন ঘটেছিল (দু'টোরই বুঝি এক মানে), কিন্তু তাকে টিকিয়ে রাখা তো চলল না। প্রতিভার বিজয় ও মানুষের প্রাগগ্রসরতা—সে তো বিজয়ের নামে পরাজয়ের জয়মাল্য। আজ এসেছে যুগান্তর ; উঠতি বক্ররেখা চূড়ায় এসে পৌঁছেচে, টাইটান নিজেকে অতিক্রম করবার প্রচেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গহ্বরের অন্ধকারে—ম্যানহাইমের কুকুর রলফ্-এর মতোই তার অবস্থা। কুকুরটা মানুষের মতো চিন্তা করতে পারত কিন্তু দু'বছর পরে আবার ফিরে আসত তার পূর্বাবস্থা। তখন সে বিষণ্ণ-রাতের বুক ভরিয়ে দিত চিৎকারে, রক্তধারায় স্নান করিয়ে দিত। মানুষই শুধু এই বিরাট দুঃসাহসিক অভিযানের প্রচেষ্টা

করেনি, সমস্ত প্রকৃতিই করেছে। প্রতিদিকে চলেছে জীবিতের এই অবিরোহনের প্রচেষ্টা, তারা এইভাবেই রহস্যময় শক্তির সমাধি থেকে পালিয়ে যেতে চাইছে। তারা মরিয়া হয়ে উঠছে, দেয়ালে পড়ছে রক্ত ছিটকে, তারপর আসছে সেই মুহূর্ত, যখন হাত পা ছেড়ে দিয়ে তারা গড়িয়ে পড়ছে দুঃখের আঁধারে। তখন তাদের চোখের আলো যাচ্ছে নিষ্প্রভ হয়ে—যেন কাচের জোড়া জোড়া চোখ চেয়ে আছে। দুঃস্বপ্ন প্রতীক্ষা করছে তাদের জন্য···দুদিকেই সে দাঁড়িয়ে আছে···ঘুমের আগে আর পরে।

'কে বলতে পারে,' আনেৎ বলল : 'জীবনের এই কলকোলাহলময় ঘুম হয়ত গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে।'

'এখনো কি এ-ঘুম যথেষ্ট হয়নি ?'

'রাত যে দীর্ঘ, আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ব, তারপর আসবে দিন।'

'যদি দিন না আসে ?'

'আমি শুধু স্বপ্ন দেখব।'

জোরম্যাঁর বিশ্বাস বলে কিছু নেই, তাই সে আলোচনা করতে চাইল না। নিয়তির হাতেই সে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে, নিজের ধ্বংসের চিন্তায়ই সে বিভোর। অস্বীকার করবার শক্তিও তার নেই। উন্মত্ততা এই বিরাট মানব জাতিকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে—ধর্মের নামে, দেশের নামে তারা পাগল। নিয়তির জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। নিজের ধ্বংস সাধন করতে জীব পূর্ণতা পাচ্ছে। মানুষের প্রচেষ্টার শেষও বুঝি এই নেতি—এই শূন্যতা।

আনেৎ তাকে বলল : 'বন্ধু তুমি এই প্লাবনের দিকে শুধু তাকিয়ে থেক না। এতো এক ঘূর্ণাবর্ত, মানুষ সেখানে উঠছে পড়ছে। নিজের দিকে ফিরে তাকাও। সেই আমি, আমিই তো পৃথিবী। আমার পৃথিবীতে নেতির স্থান নেই, এখানে শোনা যাচ্ছে সেই চিরন্তন অস্তিত্বের স্বর।'

'কিন্তু আমার পৃথিবী তো কফিন,' জোরম্যাঁ বলল : 'এখানে পোকারা কিলবিল করছে।'

'তোমার জীবনকে তুমি বিশ্বে পালিয়ে যেতে দিয়েছ। তাকে বিশ্ব থেকে আবার নিজের ভিতরে নিয়ে এস। তোমার বুকে আবার তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধর।'

'হাঁ, যেমন করে আমি আমার শবাচ্ছাদন বস্ত্রখানা জড়িয়ে ধরব।'

'তুমি তো শুধু এই বিছানায়ই শুয়ে নেই ; তুমি আছ সর্বত্র, সব জীবনের

মধ্যেই তো তোমার বিকাশ। এই স্নিগ্ধ শান্ত রাত,—এতো তোমারই··· তোমারই ভিতরে সে আছে, তার বিরাট কালো পাখার নিচে ঘুমিয়ে আছে হাজার হাজার মানুষ, তারা স্বপ্ন দেখছে। তোমার দুঃখ দিয়ে পেয়েছ তোমার প্রিয়জনের সমৃদ্ধি। ফ্রানৎস-এর তারুণ্য, তার ভবিষ্যৎ তো তোমারই। আমার তো কিছুই নেই, তবু আমার সব আছে।'

'তোমার আছে উষ্ণ রক্তধারা—আবার কি চাই ?'

'হায়, সে-রক্তধারা যদি তোমাকে ঢেলে দিতে পারতাম !'

ব্যগ্রস্বরেই সে বলল। রক্তের ঢেউ তার দেহের পাত্র ভরে দিল কানায় কানায়। মুমূর্ষু এরই জন্য তাকে হিংসা করছে। হা ঈশ্বর, সে তো চায় সে-রক্ত তারই দেহে ঢেলে দিতে !

জোরম্যাঁ অভিভূত হোলো। কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু স্বর রুদ্ধ হয়ে গেছে। সে ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে। সারারাত আনেৎ তার শিয়রে বসে রইল, মাথাটা চেপে রাখল বালিসে। তার উপস্থিতি তাকে বেঁচে থাকবার সাহস জোগাল। জোরম্যাঁর তাকে লুকোবার বা প্রকাশ করবার কিছুই ছিল না। তার যন্ত্রণার কথা বলা তো অপ্রয়োজনীয়। আনেৎ তো আঙুল দিয়েই তা অনুভব করছে। মুহূর্তের জন্য তার পাণ্ডুর মুখে বেদনার হাসি ফুটে উঠল : 'মরা খুব কষ্ট—তাই না ?'

আনেৎ তার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিল।

'হাঁ। আমিও তো মরে যাব। অন্যে মরবে আর আমি বেঁচে থাকব এমনি হলে তো নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম না।'

ভোর হতেই সে তাকে বিদায় দিল। এই কয়েক ঘণ্টা সে কথা বলতে পারেনি, আনেৎ-এর কথাই ভেবেছে, ভেবেছে তার সহৃদয়তার কথা। সে তো নিজেকে জোরম্যাঁর জন্য বিলিয়ে দিয়েছে, আর সেও কতো নিয়েছে অন্যায় সুযোগ। জোরম্যাঁ নিজের এই অপরাধের ক্ষমা চাইল।

'তুমি তো জানো না,' আনেৎ বলল : 'বন্ধুরা যখন সুযোগ নেয় কত ভালো লাগে। যারা ভালোবাসে তারা যখন জুলুম করতে চায় না তখনই তো লাগে আমাদের বুকে আঘাত।'

সে তার ছেলের কথাই ভাবছিল। এখন পর্যন্ত জোরম্যাঁকে তার কথা বলে নি, জোরম্যাঁও জানতে চায়নি। কিন্তু শেষের এই কদিনে জীবনীশক্তির সঙ্গে সঙ্গে যখন তার দুঃখের কাহিনী ঝরিয়ে দিচ্ছিল, তখন সে জানতে

চাইল তার বন্ধুর দুঃখের কথা। আনেৎ তো এতদিন তা লুকিয়েই রেখেছে।

প্রায় প্রতি রাতেই আনেৎ এল সেবা করতে। যদিও তার বোনকে তার করে আনা হোলো, কিন্তু আনেৎকে সে ছাড়ল না। সে তখনো সুযোগ নিল বন্ধুত্বের, মাঝে মাঝে বিবেককে এই বলে শান্ত করল, আর কদিনই বা আছে। আনেৎও বুঝি এই সুযোগ নেওয়ায় সুখী। কিন্তু জোরমঁ্যা জানত সহৃদয়তার এই সুযোগ নেওয়ার ফল কি হবে। আনেৎ হয়ত ভবিষ্যতে এর জন্য অনেক দুঃখই পাবে।

নিজের কথা বলা সে এবার কমিয়ে দিল। কথা কওয়ায়ই তখন কষ্টকর, আই আনেৎকে এবার কথা কইতে বাধ্য করল। সে জানতে চাইল তার গোপন রহস্য। এখন তো সে মরতে বসেছে, তার কাছে কোনো কথাই তো আর লুকোনো চলে না। আনেৎ তাকে বলে গেল তার নিজের কাহিনী, সরল ভাবেই বলল—ভাবাবেগ রইল চাপা—এ যেন অপরের কাহিনী। সে কথা বলল না, শুনে গেল। আনেৎও একবার তার দিকে তাকাল না। জোরমঁ্যা শুধু লক্ষ্য করছিল তার ঠোঁট দু'টি। যে কথা অব্যক্ত রয়ে গেল, তাও পড়ে ফেলল। বোধ হয় আনেৎও এত ভালো করে নিজের মনের কথা পড়তে পারত না। তার নিজের জীবন তখন নিবু নিবু, আনেৎ-এর জীবনের প্লাবন এল সেখানে; তাকে পূর্ণ করে দিল। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে এই প্রথম পড়ল প্রেমে। সে তাকে একান্তভাবে ভালোবাসল, হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে সে তাকে করল বিবাহ। আনেৎ জানতেও পারল না। আনেৎ-এর অনুভূতি তখনো ভগিনীর পর্যায়ে—প্রেমের পাখা তাকে ছুঁয়ে গেল না। মুমূর্ষুর মুখ তার করুণা জাগিয়ে তুলল—এ এক উদগ্র করুণা; কিন্তু ভালোবাসা তার সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় চোখ ফিরিয়ে নিল। জোরমঁ্যা বুঝতে পারল, তাই কিছুই সে চাইল না। সে তখন নিজের বৃন্ত ছাড়িয়ে উর্ধ্বে চলে গেছে।

কিন্তু সে সম্পর্কের এই পরিবর্তন তাকে জানাল না। জানাবার উপক্রম করতেই থেমে গেল। আনেৎ জানতে পারল না কি ঘটেছে, কিন্তু সে হোলো তার স্ত্রী—অন্তরে অন্তরে জোরমঁ্যা তাকে পত্নী বলে গ্রহণ করল। শুধু বাইরে সে তার পতিত্ব জাহির করতে চেষ্টা করল আনেৎ-এর জীবন আর তার ছেলের সম্বন্ধে তাকে উপদেশ দিয়ে। মার্ককে সে না

দেখলেও পুরুষের সহজাত বোধশক্তি চিনিয়ে দিল মার্ককে। সে চিনল—আনেৎও বুঝি তার ছেলেকে এত করে চিনতে পারেনি। মা আর ছেলের মধ্যে যে ভুল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তা বুঝতেও তার দেরি হোলো না। অবশ্য সমাধানের সময় নেই, তবু শেষ শক্তিটুকু দিয়ে সে তাদের পথ দিতে চেষ্টা করল।

…আনেৎ, আমি তো চলে যাচ্ছি। আর তাই তো ভালো। আমি এখন তাদের দলে ভিড়ে গেছি যাদের আগামীতে স্থান নেই। আমার পরে যারা আসছে ভবিষ্যৎ বা অতীত সম্বন্ধে তাদের মোহ থাকবে না। বেশি বুঝেছি বলেই কাজের স্পৃহা আমার নষ্ট হয়ে গেছে। তোমার প্রবৃত্তির ডাক তাই আমার চাইতে ঢের অভ্রান্ত। কিন্তু প্রবৃত্তির ডাকই কি যথেষ্ট আনেৎ? তারও সীমা আছে। তুমি স্ত্রীলোক, কিন্তু একটি পুরুষকে তুমি সৃষ্টি করেছ। তোমার একটি ছেলে আছে। সে তোমার এই সীমার উপর আছড়ে পড়ছে, সংঘাত শুরু হয়েছে তোমাদের—একদিন তোমার গর্ভের দেয়ালে আছড়ে পড়ে বেরিয়ে আসার জন্য এমনি সংগ্রামই সে চালিয়েছিল। আমার তো মনে হয়, সে তোমাকে বারবার আঘাত করবে। আনেৎ, আনেৎ, তুমি তাকে মুক্তির গান শোনাও। সেই বিচ্ছেদের গান, যে দিন সে তোমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাকে আমার নাম করে বোলো, আমার মতো সব কিছু জেনে যেন সে সন্তুষ্ট হয়ে না থাকে আর তোমার মতো যেন সবাইকে ভালো না বাসে। সে নিজে বেছে নিক তার পথ। ন্যায়পরায়ণ হওয়া তো ভালো, কিন্তু প্রকৃত ন্যায়বিচার কি শুধু দাঁড়িপাল্লার কাছে বসে থেকে দেখেই সন্তুষ্ট হয়! তাকে বিচার করতে দাও, সে হানুক আঘাত! স্বপ্ন তো যথেষ্টই দেখেছি আমরা। এবার আসুক জাগার পালা। বিদায়, মোহ বিদায়!…

কে জানে—আনেৎকে, না, আপনমনে সে কথাগুলো বলে গেল। শেষবারের মতো সে তাকাল আনেৎ-এর দিকে—বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর পাশ ফিরে শুল—যেন জীবিতের কাছ থেকে চিরবিদায় নিচ্ছে। চুপ করে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। শুধু শেষ গোঙানি ছাড়া কোনো কথাই বেরুল না। মনে হোলো, গোঙানি যেন দেহকে তার দলিত মথিত করে দিয়ে উঠে এল।

॥ পাঁচ ॥

নিজের দুঃখের কথা ভাববার আনেৎ-এর সময় ছিল না। ফ্রানৎস-এর দুঃখ তখন সব কিছু গ্রাস করে ফেলেছে। সে এক উন্মত্ততা। উপায় নেই। হয় তাকে সেই উন্মত্ততার কাছে ধরা দিতে হবে, নয়ত পালিয়ে যেতে হবে। আনেৎ ধরা দিল। দুঃখ তাকে গ্রাস করল।

প্রথমে তার এই অসীম দুঃখ সবাইকে অভিভূত করে ফেলল, সেও দুঃখ চেপে রাখবার কোনো চেষ্টাই করল না। এ যেন শিশু বা প্রেমিকের হতাশা। সে জোরমঁ্যার মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদল, জোরমঁ্যার পরিবারের সবাই অবাক হয়ে গেল। লোকে কি বলবে সে-ভয়ও তাদের ছিল, তাই তারা ফ্রানৎস-এর এই দুঃখের আতিশয্য সহ্য করল না। ঠিক করল, ফ্রানৎসকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। তারা আনেৎ-এর হেফাজতে ওকে রেখে গ্রামের গির্জায় প্রেতকৃত্য শেষ করল। তাদের নিজের গ্রামে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানের পর লাগেজ ভ্যানে তোলা হলো মৃতদেহ।

শাভানরা রওনা হোলো···জীবিত আর মৃতের যাত্রা শুরু হোলো একসঙ্গে। (মৃতই বুঝি তাদের পরিবারের মধ্যে সব চাইতে জীবন্ত।) আনেৎ-এর কাছেও বিদায় তারা নিল বইকি। জোরমঁ্যার বোন মাদাম দ্য সেঝি-শাভান যেন নিতান্ত বাধ্য হয়েই তার সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন, এমনকি গোপন বিতৃষ্ণা চেপে রেখে তাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টাও যে না করলেন তা নয়। এই চেষ্টার পরে আর কি বাকি থাকে—ঋণ তো শোধ হয়েছে!

মাদাম দ্য শাভান—জোরমঁ্যার মা—শুধু আনেৎ-এর গাল ভিজিয়ে দিলেন চোখের জলে, তাকে 'আমার মেয়ে' বলে ডাকলেন। কিন্তু সেও গোপনে। তিনি কেমন যেন ভালোবেসে ফেলছিলেন আনেৎকে। আনেৎ-এর চিন্তাধারার সঙ্গে তার কখনো খাপ খায়নি, তবু তিনি তাকে আপনার করেই নিয়েছিলেন। ধর্মের গণ্ডির বাইরে অন্যের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর তো কোনো সম্বন্ধ নেই, তিনি আর সব কিছু সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু ভারি দুর্বল। তাঁর নিজের শান্তি ছাড়া আর কিছু তো ভাবেননি। পরিবারে আন্দোলন শুরু হয় এমন কিছু তিনি করতে পারেন না। কি আর করবেন তিনি। পরস্পরের

কাছে 'আপাতত বিদায়' নিলেন। কিন্তু একথা তাঁরা খুব ভালো করেই জানতেন, ভবিষ্যতে তাদের আর দেখা হবে না।

আনেৎ আর ফ্রানৎস ঘরে বন্দী হয়ে রইল। এদিকে গির্জার অনুষ্ঠান আর যাত্রার আয়োজন শেষ হোলো। সে কল্পনায় সবই দেখতে পেল। আনেৎ দেখল, সে শবযাত্রার মিছিলে চলেছে। পথ বরফে ঢাকা, উপরে ফেব্রুয়ারীর শেষের বিক্ষুব্ধ আকাশ: এদিকে প্রিমরোজ ফুটতে শুরু করেছে পথের ধারে। আর বাস্তবে? চারিদিকে নিস্তব্ধতা। শুধু দূর থেকে ভেসে আসা আনুষ্ঠানিক ঘণ্টার শব্দ এল কানে। ফ্রানৎস তাও শুনতে পেল না। আনেৎ ওকে কথার পর কথার মালা গেঁথে যখন ঘুম পাড়াচ্ছিল তখন শুনতে পেল গমনোন্মুখ ট্রেনের বাঁশী—বাঁশী তো নয়, তার বুকে ছুঁচ হয়ে যেন ফুটল। সে চলে গেল···মৃত বন্ধু আবার মরল···তার মৃত বন্ধু জোরমঁ্যা।

যে বেঁচে আছে তার কথাই তাকে ভাবতে হবে। যে গেল তার তো আর তাকে দিয়ে প্রয়োজন নেই। এতদিন সে আনেৎ-এর করুণার সবটুকু কেড়ে নিয়েছিল—আজ আর তার প্রতি করুণার প্রয়োজন নেই। এখন অন্য খাতে বইছে—করুণার ঢেউ আবার জীবিতের দিকে বইতে শুরু করেছে। আর মৃত বন্ধু তো তারই হাতে তাকে সঁপে দিয়ে গেল।

···'আমি তোমার হাতেই ওকে দিলাম। আমার স্থান নেবে তুমি। ও তো এখন তোমার।'···

করুণার ঢেউ এবার যেন সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে বইছে ফ্রানৎসকে ঘিরে। ওতো জোরমঁ্যার মতো নয়। জোরমঁ্যা, কঠোর জোরমঁ্যা, করুণা সে চায়নি। কিন্তু ফ্রানৎস চাইল। নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করতে তার লজ্জা নেই। করুণা ভিক্ষা তার কাছে সহজ, তেমনি বুঝি আনেৎ-এর কাছে দেওয়াও খুব সহজ। এই আনন্দ থেকেই আনেৎ এতদিন বঞ্চিত ছিল। জোরমঁ্যার মতোই তার ছেলেও করুণার দান অগ্রাহ্য করে এসেছে। গর্বান্ধ মানুষ তাদের ভাবাবেগের উৎসমুখ দাঁত দিয়ে সবলে যেন চেপে রেখেছে, নিজেদের হৃদয় তারা উন্মুক্ত করে দিতে পারেনি। এ যেন তাদের কাছে এক অপমান, এক বিতৃষ্ণা—মার বুক থেকে যে স্বচ্ছ স্নেহ একদিন তারা পান করেছিল, আজ তাকেই তারা অপমান করছে। কিন্তু ফ্রাৎনস তাদের মতো নয়। সে কিছুই লুকোয়নি। সে মুখভরে চুষে নিতে চায় তার পাওনা। জন্মান্ধ শিশুর মত সে হাঁতড়ে বেড়ায়, তার ঠোঁট খোঁজে সেই স্নেহের উৎসমুখ।

…'খাও বাছা আমার, ছোট্ট খোকা আমার খাও! আমার বুক থেকে চুষে চুষে খাও! আমার স্তনের ডগা তো তোমার মুখে পুরে দিয়েছি।'…

এই নারী-বিদ্বেষী যার স্তন্য পান করল তার কথা একবারও ভাবল না। ভাববে কি—ওযে মাতৃস্তন্য বঞ্চিত—ছোট বেলায় ও মাকে হারিয়েছে। ও তো আনেৎকে ভালো বাসতে পারল না, ভালোবাসল তার স্তন দু'টি। তার অদম্য তৃষ্ণা তো মেটাতে হবে। আনেৎ সবই বুঝতে পারল। সে তো তার কাছে সেবিকা ছাড়া কিছুই নয়। তার এই ব্যাধির জ্বালা উপশম করতেই তার প্রয়োজন। দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়ানোই তার কাজ। কিন্তু তবু তার মাতৃস্নেহ উথলে উঠল। ফ্রানৎস-এর প্রয়োজন অনুসারে দিন দিন তা বেড়ে চলল। মাতৃস্নেহের ভিতরেই তো সব ভালোবাসার বীজ লুকিয়ে থাকে। তাদের বিভিন্ন নামে সে স্বীকার না করুক, কিন্তু গোপনে তাদের লালন-পালন করে।

ফ্রানৎস তাকে সব কথাই বলল, খুলে দিল তার মনের অর্গল—আড়াল রাখল না। এমনকি শোভনতার সীমা সে লঙ্ঘন করে গেল। তার মনে হোলো, আনেৎ তার সব কথা শুনতে বাধ্য—সে তা তারই জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে। তার হৃদয়ের তিক্ততা, দুঃখ, বিস্ময় সব কিছুই তাকে জানতে হবে, এমন কি তার স্বাস্থ্য, খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান কোনো কিছুই বাদ যাবে না। সে তো একাধারে মা আর সেবিকা, বিশ্বাসভাজনা আর দাসী। ফ্রানৎস তো তার কাছে আর কিছু চায় না—তার কাছে এইই তার মূল্য। সান্ত্বনা আর যত্নই সে আশা করে। তার কাছে তো বটেই, আনেৎ-এর কাছেও যেন এই দাবি সহজ বলেই মনে হয়।

সে তাকে ধন্যবাদ জানায় বটে, কিন্তু সে মামুলি ভদ্রতা। বরং আনেৎই তার প্রয়োজনে আসতে পেরেছে বলে নিজেকে ধন্য মনে করে।

তার এই আত্মসর্বস্বতায় আনেৎ খুশিই হয়েছে। আত্মসর্বস্ব পুরুষদের উপর মেয়েদের কেমন একটা মোহ আছে, এদের তারা পছন্দও করে। যখন মানুষ কাউকে ভালোবাসে, সে কৃতজ্ঞ হয়; কিন্তু যখন সে নিজের জন্যই তাকে ভালোবাসে তখন তাকে মনে রেখে কি ফল!…নিজের কথাই ভাবে, নিজেকে সে উৎসর্গ করতে জানে না। সে তোমাকে গ্রহণ করে, গ্রাস ক'রে তোমার প্রতি তার ভালোবাসার পরিচয় দেয়।

'কিন্তু ও কি চমৎকার!' নির্বোধ জীব ভাবলে। ফ্রানৎস আনেৎকে চমৎকার ভাবে গ্রাস করে ফেলল। সে কোমল, পেড়াপীড়ি করতে জানে,

তার প্রলোভনও সরলতাভরা। সে অনুকম্পা চায়, চায় আদর, শুধু মাত্র নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করে আনেৎকে কৃতার্থ করে। আর আনেৎ ছোটে সে-ইচ্ছা পূর্ণ করতে—সিঁড়ি দিয়ে দিনে দশবার সে কমলালেবু, খবরের কাগজ কি অন্য কিছু কিনতে ওঠানামা করে। তার জরুরী চিঠি ডাকঘরে নিয়ে যায়। ঋণ ভালো করেই শোধ দেয় ফ্রানৎস। যখন সে বাড়ি ফেরে, এত দেরি কেন হোলো বলে সে তাকে ভর্ৎসনা করে। সন্ধ্যেয় বারান্দায় সে এসে বসে আনেৎ-এর পাশে। করুণ, বিষণ্ণ তার মুখ, সে যেন আনেৎ-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে ঘসে ঘসে নিজেকে গরম করতে চায়। হঠাৎ সে কেঁদে ওঠে···আনেৎ তার কাজ ফেলে রেখে এই শিশুর মতো অসহায় তরুণের মাথা টেনে নেয়, কাঁধের উপর রাখে মাথা। কিছুক্ষণ বেশ জোরে কাঁদবার পর কি সুখ! চোখের জল মুছিয়ে দেয় আনেৎ, ফ্রানৎস একটুও লজ্জিত হয় না!—সেকথা বলতে শুরু করে। তার গোপন দুঃখের অশ্রুধারা সে উজার করে দেয়। এই অশ্রু সে তো ছোট বেলা থেকে অবদমিত করে রেখেছিল, কখনো প্রকাশ করতে সাহস করেনি, এমন কি জোরম্যাঁকেও না। সেই দুঃখ তো আছেই, তার উপর জোরম্যাঁর শেষ সময়ে সে তাকে এড়িয়ে চলেছে সে-দুঃখও তাকে রাত দিন যন্ত্রণা দেয়। সে তো তাকে তেমনি করে ভালো বাসতে পারে নি, আর বন্ধুকে সেকথা জানবার সুযোগও দিয়েছে। চমৎকার শ্রোত্রী আনেৎ। সে তার মাথায় এই স্ত্রীলোকটির গালের স্পর্শে কেমন উৎসাহিত হয়ে ওঠে, তার সান্ত্বনায় আসে শান্তি। আনেৎ তো তাকে বাধা দেয় না, তার কান্নার সঙ্গে মিশে থাকে আনেৎ-এর করুণ কণ্ঠস্বর। সে আগে যা কখনো বলতে পারেনি, তাই স্বীকার করলে। আনেৎ অবাক হোলো না, উঠল না শিউরে, তাকে গ্রহণ করল; এ অভিজ্ঞতাও যেন তার আছে। অথচ গোপন মনের এই নির্লজ্জ প্রকাশ, এই কুশ্রী স্বীকারোক্তি, এই নৈতিক বিচ্যুতি বইয়ে পড়লেও বোধ হয় তার মনে ঘৃণাই জাগিয়ে তুলত। কিন্তু সে শুনে গেল তার কথা, যেন স্বীকারোক্তির অনুষ্ঠান চলেছে। তার গোপনতা কতো পবিত্র, শ্রোতা সেখানে ভগবৎ প্রেমে শুদ্ধিলাভ করেছে, দয়া তাকে খাঁটি করে তুলেছে। এমন শ্রোতা স্বীকারোক্তি দ্বারা কলুষিত হয় না, ঘৃণায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে না; মানুষের দুর্বলতার অংশ গ্রহণ করতে সে এগিয়ে আসে—এ দুর্বলতা যেন তার নিজেরই। সে তাদের করুণা করে সে-দুর্বলতা তুলে নেয় নিজের কাঁধে, দুর্বলকে সে আরো বেশী ভালোবেসে নিজের হাতে তার পা ধুইয়ে দেয়।

॥ ছয় ॥

এক পক্ষ কেটে গেল। দুঃখের কাছে আত্মার পরিপূর্ণ বিসর্জন আর অসীম হতাশার ভিতর দিয়ে কেটে গেল পক্ষকাল। এ এক আকস্মিকতা—মানুষের গলা টিপে ধরে তাকে পিষে মারতে চায়। আর তাই চাইলও। রাতে আনেৎ বারবার পাশের ঘর থেকে উঠে এল তাকে সান্ত্বনা দিতে। তার কান্নার ফোঁপানি থামিয়ে দিতে। সে কি কান্না বালিশে মুখ গুঁজে, মনে হয় এখুনি বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে! এমনি করে কেটে চলল দিন—এবার এল অবসাদ। ক্ষতবিক্ষত হবার পর এখন এক ক্লান্তি আর নিঃশব্দ কান্নার প্রহর। শীত আর বসন্তের মাঝামাঝি পরিবর্তনশীল আকাশ। থমথমে নিস্তব্ধতা আর ক্লান্তিভরা—সূর্য লুক্কায়িত আর নিঃশব্দ ধারা ঝরছে। তারপর এল রোগোপশমের পর সলজ্জ জাগরণ, নিরাময় হয়ে উঠতে যেন সে লজ্জিত, স্বাস্থ্যোদ্দীপ্ত জীবনে ফিরে যেতে সে চায় না, তাকে নিজের ঔদ্ধত্য দিয়ে গোপন রাখতে চায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ফ্রানৎস আনেৎ-এর সঙ্গে ক্ষীণ স্বরে কথা বলে গেল। জীবনের যে বান ডেকেছে হৃদয় তখন তাকে উৎসারিত করে দিতে চাইছে, কিন্তু সহানুভূতিশীল কোনো হৃদয়ের কাছে গোপনে ছাড়া জানাতে তো সে রাজি নয়।

এবার ওরা বেড়াতে বেরুল। ফ্রানৎস আনেৎ-এর বাহুতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে চলল। চারিদিকে কুয়াশাময় বিকেলের ম্লান আলো। ঝোপঝাড়ের শুকনো মরা পাতার ভিতর উঁকিঝুঁকি মারছে সদ্য ফোটা ভায়োলেট। ভীরু বসন্ত তার আগমন জানিয়েছে পাহাড়ের চুড়ায় চুড়ায়, কিন্তু উপত্যকা এখনো ঘুমন্ত, এখনও বিষাদিত নীলে আর ছায়ায় হতচেতন হয়ে পড়ে আছে। তাদের মনে পড়ল বন্ধুর কথা। বন্ধু হোলো তাদের সঙ্গী। সে যেন ওদেরই প্রতীক্ষা করছিল। তারা দু'জনেই অনুভব করল তার উপস্থিতি। পরস্পরের উপস্থিতি তার উপস্থিতিকে জীবন্ত করে তুলল। কিন্তু একা যখন তারা রইল, মনে হোলো বন্ধু তখন বহুদূরে চলে গেছে। তার অদৃশ্য উপস্থিতি তখন রূপান্তরিত হোলো সুদূর ছায়ায়। চলতে চলতে ফ্রানৎস আনেৎ-এর কাছে ঘেঁষে এল, দেহের স্পর্শ পেল দেহে, এমনি করেই বুঝি সে জোরম্যাকে পেতে চাইল তার সান্নিধ্যে। জীবিতের বাহুর উপর ভর করে সে রইল, তার ভয়

পাছে সে অদৃশ্য বন্ধুর হাতখানা হারিয়ে ফেলে। সে তাকে অভিভূত করে দিল তার ভালোবাসায়—তার অভিজাত প্রকৃতির ভদ্রতাই বুঝি তাকে জাগিয়ে তুলল। আনেৎ-এর প্রতি তার আসক্তি প্রবল হয়ে উঠল, আর সে তার প্রমাণ দেবার জন্য শুরু করল সাধ্যসাধনা। তাকে ছাড়া তার চলবে না—বারবার সে এ-কথাই বলল, প্রমাণ করল। আনেৎ-এর মর্ম স্পর্শ করল তার আবেদন, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। এসম্বন্ধে মোহ তার ছিল না। সে ফরাসী নারী, যাদের সে ভালোবাসে তাদের মন যে তার স্পষ্ট পড়া আছে, তাদের চরিত্র সে বোঝে। কিন্তু ফরাসী নারীও তো নারী। সে প্রেমাস্পদের মন বোঝে; কিন্তু নিজেকে সে তো পুরোপুরি বুঝতে পারে না বা বুঝতে চায় না।

তার ডাক পড়ল পারীতে। সেখানে আছে তার ছেলে। তাকে এতদিন সে একা ফেলে রেখেছে। তার মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল জোরমঁ্যার মৃত্যুযন্ত্রণা আর ফ্রানৎস-এর দুঃখ। তিনমাস সে নিজেকে তাদেরই হাতে ছেড়ে দিয়েছিল—তখন বুঝি ছেড়ে চলে যাওয়াও হোতো অমানুষিক (—অন্তত বিবেক তার এই অজুহাতই দিয়েছে)। কিন্তু এখন তো আর থাকা চলে না, কর্তব্যের ভান করেও না। তার কর্তব্য এখন অন্যত্র। সে তার ছেলের ভৎর্সনার দৃষ্টি অনুভব করল সর্ব অঙ্গে; কোনদিন ছেলে তো তার মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। দিনে সে তাকে ভুলে থাকত, কিন্তু রাতে তো তাকে প্রতিদিনই দেখেছে, অনুশোচনায় ভরে গেছে মন। তার বিপদের সম্ভবনায় মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, ব্যথায় ভরে গেছে। তিরিশে জানুয়ারীর বিমান আক্রমণের পর সে আর স্থির থাকতে পারল না, রওনা হবার জন্য তৈরি হোলো। নিজেকে ভৎর্সনা করবার তখন বহু কারণই ঘটে গেছে। এতদিন পত্র বিনিময় হয়েছে তাদের কম, চিঠি চললেও দীর্ঘ বিরতি থেকে গেছে। প্রিয় সম্বোধনগুলি পর্যন্ত প্রায় যেন নিঃশেষিত। সে তো খুব কমই লিখেছে চিঠি, সময়ই পায়নি, তাছাড়া নিজের কাছে নিজে দোষী বলে তার মাতৃস্নেহের উত্তাপও যেন শীতল হয়ে গেছে। দোষী বইকি! তার কাছ থেকে দূরে সরে থেকে সে তো তার কাছে দোষীই হয়েছে, কিন্তু সে কথা তো স্বীকার করতে চায়নি। বরং তার স্নেহের এই শীতলতা, এই প্রতিরোধের জন্য সে তার সন্তানকেই দায়ী করেছে। হাঁ, মার্কই দোষী! মার্কও তো তাদের সেই শেষ দেখার কথা ভুলতে

পারেনি, ক্ষমা করতে পারেনি তার মার আচরণ—তার মার অবিশ্বাস যেন তার উপরে হেনেছে প্রচণ্ড আঘাত। তারপর প্রতিরাতেই সে-দৃশ্য যেন তার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠেছে; রাগে সে বালিশ কামড়েছে। কিন্তু কাউকে জানতে দেয়নি। অন্যে জানবে, তার চাইতে তার মৃত্যুও ভালো। তার চিঠি তাই অমনি উত্তাপহীন আর উদ্ধত। যেন আত্মীয়তার লেশমাত্র নেই। সে তার মাকে দেখাতে চেয়েছে, সে তার কেউ নয়, তার উপর সে বিন্দুমাত্র নির্ভর করে না। সবচাইতে খারাপ, আনেৎও তার নিজের উদ্বিগ্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে কিছুই লক্ষ্য করেনি। সে চিঠির জবাব দিয়েছে মামুলি ঢঙে, কোনোরকমে দু'ছত্র লিখে। তার উপরে ডাক বিভাগের দেরি। তার পয়লা জানুয়ারীর চিঠি এক পক্ষের ঢের পরে এসে মার্কের কাছে পৌঁছেছিল। জোরম্যাঁর মৃত্যুযুদ্ধে সমস্ত আবেগ ঢেলে দিয়ে সে ভুলে গিয়েছিল মার্কের জন্মদিনে উপহার পাঠাবার কথা। মার্ক যদিও উচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধেই, তবু মার এই বিস্মৃতিতে সে কেঁদে ফেলল। তারপর শুকিয়ে গেল চোখের জল, কিন্তু রইল জ্বালা। সে নিজেই বুঝতে পারল না, এর কারণ তার হতাশা না আর এক ভাবাবেগ! এই ভাবাবেগকে স্বীকার করা তো তার পক্ষে পরম লজ্জা। আনেৎ কিন্তু কিছুই টের পেল না। সে যখন বুঝতে পারল তার বিস্মৃতির কথা, দুঃখ পেল; কিন্তু ওর কাছে স্বীকার করা তো বৃথা—ও তো চেতনাহীন—ভ্রূক্ষেপই করবে না। হায় ও যদি ফ্রানৎস-এর মতো অমনি উদার, অমনি স্নেহার্ত হোতো! ফ্রানৎস আর মার্কের বয়সের তফাৎ থাকলেও সে প্রায়ই তাদের তুলনা করতে বসে। ফ্রানৎসও তো তারই সন্তান। যে সর্বগ্রাসী স্নেহের বাঁধনে সে ফ্রানৎস-এর সঙ্গে বাঁধা পড়েছে তারই কৈফিয়ৎ দেয় সে এই বলে। কিন্তু এ কৈফিয়ৎ তো প্রতারণা, আনেৎ এমনি করেই নিজেকে প্রতারণা করল। তাই বিদায়ের কথা মনে হতেই তার প্রবৃত্তি যেন তাকে উৎপীড়ন শুরু করল। কিন্তু নারীমনের রাক্ষুসীটা প্রতিশোধের একটা পথও পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সে তাকে কানে কানে জানাল: সে যদি থাকে, তাহলে গেল না বলে আসবে তার অনুতাপ; আর সে যদি চলে যায় তাহলে বিদায়ের অনুশোচনায় ভুগতে হবে। সে ঠিক করল চলেই যাবে। যুক্তির কাছে সে তার গোপন ইচ্ছাকে বলি দিতে চাইল, পরে না হয় সে তার ক্ষতিপূরণ করবে।

ফ্রানৎস-এর কাছে প্রশ্নটা অনেক সোজা। আনেৎ যখন বলল সে চলে

যাবে, ফ্রানৎস জানাল তীব্র প্রতিবাদ। তার অন্য কর্তব্য আছে, একথা সে স্বীকার করতে চাইল না। সে পেল আঘাত। আনেৎ যেন তার কাছে প্রয়োজনীয় এক অভ্যাস, তাই তাকে বিদায় দিতে চাইল না। আনেৎ এই যুক্তিহীন দাবী শুনে শিউরে উঠল না, বরং ফ্রানৎস-এর এই আধিপত্যে সে গোপনে খুশিই হোলো; তাই সে বিশেষ বাধা দিল না তার ইচ্ছায়। দিনের পর দিন যাত্রা রইল স্থগিত। ফ্রানৎস কৌশলে পারীর সংবাদপত্রগুলো তার কাছ থেকে গোপন করে রাখল, আনেৎও ভুলে গেল সংবাদপত্রের কথা। আটুই আর এগারোই মার্চ আরো তু'টো হামলা হয়ে গেল পারীর উপর। ফ্রানৎস সবই জানত, কিন্তু আনেৎকে বলল না। মার্চের প্রথম পক্ষের মধ্যে ফরাসী-সুইস সীমান্তের অবরোধে তার সুবিধে হোলো। সে জানাল, এরই জন্য সংবাদ আসছে না। এর শাস্তিও পেল আনেৎ। বাইশে মার্চ এক জোড়া বাজ যেন পড়ল তার মাথায়। সংবাদপত্রের "শেষ সংবাদ" স্তম্ভে সে পড়ল লা কুরতিই-এর বিস্ফোরণের কথা, পারীর উপর জার্মানরা হানা দিয়েছে। দশ দিন আগের তারিখ দেওয়া সিলভীর একখানা চিঠিও এল তার কাছে। তাতে সে জানাল, পিতাঁর গ্রেফতারের সংবাদ।

আনেৎ অভিভূত, হতবুদ্ধি। পিতাঁ যে বন্দীর পালানোর ব্যাপারে তারই বদলে শাস্তি ভোগ করছে, সে সম্বন্ধে তার কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না। এ সময়ে এর চাইতে বড় দোষ আর নেই। চিঠি পাঠানোর পর দশদিন কি ঘটেছে কে জানে! আজকের এই লৌহকঠিন একনায়কত্বের দিনে—যখন শত্রু এগিয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে অস্থৈর্য—কালক্ষেপ না করেই শাস্তিবিধান চলেছে, বিচারের ধার কেউ ধারছে না। বিচার—বিচার তো শুধু প্রতিশোধের দালাল মাত্র। মাসের পর মাস আনেৎ রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তু'জনের জন্য সে ভুলে ছিল জগৎকে। সে এবার নিজেকে দুষল···

রওনা হবার তোরজোড় শুরু হোলো। সে বুঝতে পারল, ফিরে গিয়ে তাকে পিতাঁর অদৃষ্টই বরণ করে নিতে হবে। ভয় পেল না, কিন্তু নিজের দায়িত্ব দূরে সরিয়ে সে পালিয়ে আছে, পিতাঁর প্রতি সে অন্যায় করেছে—এই ব্যথাই তার বুকে বাজল। না, আর মুহূর্ত দেরি নয়! জার্মানরা এগিয়ে আসছে, যে কোনোদিন পারীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তার নিজের ছেলে, তার নিজের জাতি বিপন্ন। তার স্থান তো এখন তাদের পাশে।

বৃথাই ফ্রানৎস প্রতিবাদ করল। তার জন্য উদ্বিগ্নতা এখন কমে গেছে,

তার স্থান এখন আনেৎ-এর মনে প্রথম নয়, দ্বিতীয়। নিজের দুঃখ নিয়ে একাই সে বেঁচে থাকুক। তার দুঃখ তো এখন শান্ত হয়ে এসেছে; এখন সে এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে, যখন জীবনের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়; আর সে তো তাল রেখেই চলেছে জীবনের সঙ্গে। তার দুঃখ এখন জীবনেরই এক উপাদান, জীবনকে ধ্বংস করবার শক্তি তার ফুরিয়ে গেছে। দুঃখ তাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে, তাকে শক্তি জোগাচ্ছে, এমন কি তার নিঃসঙ্গতার সাথী হয়েছে।

আর আনেৎ তার বন্ধুকে ত্যাগ তো করছে না। সে জানে মাসের পর মাস এই ঘনিষ্ঠতার পর এই নিঃসঙ্গতার গুরুভার তার আত্মাকে পিষে দেবে। তাই সে খুঁজল তার এক উপযুক্ত সঙ্গী, যে বাধা হবে না, খোঁজ-খবর নেবে আর আনেৎকে দেবে ফ্রানৎস-এর খবর।

পাশের বাড়িতে থাকে মা আর মেয়ে। জাতিতে তারা রুশ, বাল্টিক প্রদেশ থেকে এসেছে। কারো সঙ্গে মেশে না। মার এখনো শোকের পর্ব চলছে। খুব লম্বাচওড়া, আভিজাত্য তার চেহারায়। মেয়ের বয়স ছাব্বিশ। সে পঙ্গু, প্রায় সময়ই শুয়ে কাটায়। একরাশ সোনালী চুল তার মাথায়, বেণী করে রাখে। সুশ্রী সে মোটেই নয়। বেশ লম্বা, মুখখানা বিশীর্ণ, কিন্তু দেহ-সৌষ্ঠব চমৎকার। যক্ষ্মায় ভুগেছে—হাড়ে রোগ ধরেছিল, দু'তিন বছরের চিকিৎসার পর এখন প্রায় সেরে উঠেছে। একটু খুঁড়িয়ে চলে। বিকেলে মা আর মেয়ে খানিকটা ঘুরে আসে। বেশীদূর যায় না। আনেৎ আর ফ্রানৎস যখন বেড়িয়ে ফেরে তখন প্রায়ই তাদের দেখা হয়, তারা এক সঙ্গেই ফেরে। মেয়েটি লাঠি ভর দিয়ে চলে, নিজের পঙ্গুতা ঢেকে রাখতে চায় না। কে জানে, এ তার গর্ব না ঔদাসীন্য! কথা খুব সামান্যই হয়—মামুলী দু'চারটে কথা। দু'দলই নিঃশব্দে চলে—কেউ কাউকে বুঝি নিজেদের গোপন কথা জানাতে রাজি নয়। কৌতূহলীও হয় না। কিন্তু তবু কেমন একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে, একদল আর একদলকে বই পড়তে দেয়।

আনেৎ মাদাম দ্য ভিন্দেরগ্রুন-এর শরণাপন্ন হোলো। তিনি যদি তরুণ বন্ধুটির একটু খোঁজ-খবর নেন, তার দুঃখে সান্ত্বনা দেন—। ফ্রানৎসকে একথা জানাল না। ফ্রানৎস ওদের সহ্য করতে পারে না। তাদের সঙ্গে পরিচয়ের কথা জানালে ফ্রানৎস মোটেই রাজি হবে না। সে চলে যাবে একথা

ফ্রানৎস ভাবতেও পারে না, তার উপর আর কাউকে তার বদলে রেখে যাবে,—সে তো রীতিমত অসহনীয়। এ যেন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়।

রওনা হবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সে আশা করেছিল, আনেৎ থেকে যাবে। শেষের দিনগুলো মুখ গোমরা করে কাটাল, কখনো বা উদগ্র অনুনয়ে লুটিয়ে পড়ল। 'আনেচেন, না, তুমি যাবে না। বল, তুমি যাবে না? আমি শুধু এই ভিক্ষা চাই, তোমাকে চাই…'

'কিন্তু বাছা, আমার নিজের জাতি যে প্রতীক্ষা করছে—' আনেৎ জানায়।

'করুক তারা প্রতীক্ষা! অধিকারই তো আইনের শেষ কথা। আমি তোমাকে আমার অধিকারে পেয়েছি।'

তাকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। সে যেন এক শিশু, বার বার বলছে: 'আমার তেষ্টা পেয়েছে।' কোন কথা শুনতে চাইছে না।

যখন সে দেখল, আনেৎকে ফেরানো যাবে না, সে দৃঢ়সংকল্প—ফ্রানৎস নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল, আর কথা বলতে চাইল না। উত্তর দিতে রাজি হোলো না। আনেৎ জিনিষপত্র গোছাতে গোছাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু ফ্রানৎস সাহায্য করতে ছুটে এল না। সব তৈরি। হয়ত বিদায়-সম্ভাষণও সে জানাবে না, কিন্তু শেষ মুহূর্তে যখন ভ্রমণের পোশাক পরে আনেৎ তার ঘরে এল, দেখল সে এককোণে বিষণ্ণ মুখে বসে আছে। সে ঝুঁকে পড়ে তার কপালে চুমু খেতে যাবে, এমনি সময় হঠাৎ সে মাথা তুলল। আনেৎ-এর মুখে লাগল আঘাত, ঠোঁট কেটে গেল। তখন সে বুঝতে পারেনি, অনেক পরে সে অনুভব করল ব্যথা। ফ্রানৎস কিছুই দেখল না, তার হাতে চুমু খেয়ে কেঁদে কেঁদে বার বার বলল: 'আনেচেন, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো আনেচেন!'

আনেৎ তার মাথা চাপড়ে দিয়ে বলল: 'হাঁ, হাঁ, তাড়াতাড়িই ফিরব।'

এবার ফ্রানৎস তার ব্যাগ তুলে নিয়ে চলল তার সঙ্গে। সারা পথ আনেৎই শুধু কথা বলে গেল। স্টেশনের পথে যেতে যেতে তাকে নানা উপদেশ দিল, নিজের শরীরের উপর নজর রাখতে বলল। সে কিছুই শুনতে পেল না, শুধু তার স্বর বাজতে লাগল কানে। ট্রেনের কামরায় আনেৎকে তুলে দিয়ে তার পাশে সে বসল। তখনো মুখে কথা নেই। অন্যদিকে চেয়ে বসে রইল। আনেৎ-এর ভয় হোলো,

হয়ত ফ্রানৎস তার সঙ্গেই যাবে। কিন্তু গাড়ি ছাড়বার পাঁচ মিনিট আগে হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, তারপর বিদায়-সম্ভাষণ না জানিয়ে লাফিয়ে পড়ল। বোধহয় ভাবাবেগ রোধ করতে পারবে না বলেই সে এমনি করল। গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আনেৎ দেখল, সে চলে যাচ্ছে। একবার সে নিশ্চয়ই ফিরে তাকাবে। কিন্তু সে তাকাল না, মিলিয়ে গেল। আনেৎ তাকাল শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিকে। গতিহীন, শব্দহীন, শূন্য ট্রেন। ঠোঁট তার জ্বলছে, ঝরছে রক্ত। সে রক্ত চুষে চুষে নিল···

॥ সাত ॥

সীমান্তে পৌঁছে আনেৎ ফিরে এল বর্তমানে। চারিদিকে যুদ্ধের রক্তাক্ত ছায়া আর বিপদ তাকে জাগিয়ে দিল। বুঝতে পারল, কর্তব্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার সময় এসেছে। ভয় হোলো, হয়ত তার চেহারার বিবরণ তারা পেয়ে গেছে, ফরাসী দেশের মাটিতে পা দিলেই হয়ত গ্রেফ্‌তার হবে। সিলভীর চিঠিতে সতর্কতা আছে, কিন্তু বিস্তারিত কিছুই সে লেখেনি। প্রতি ছত্র সে পড়ে দেখেছে, ভয়ের কারণ আছে আবার নেইও। যাক্‌ পাসপোর্ট পরীক্ষা হয়ে গেল, কিছুই ঘটল না। আনেৎ সীমান্ত অতিক্রম করে চলে এল।

পারীতে এসে পৌঁছল। কেউ দেখা করতে এল না। তার চিঠি পৌঁছবার ঢের আগেই সে এসে পৌঁছেচে। আর মন তার সারারাত ধরে ছুটে এসেছে ট্রেনের আগে আগে।

দিনটা ছিল রবিবার। পথেই সে খবর পেয়েছিল, অদৃশ্য কামানের গোলা পড়েছে পারীতে, এ যেন জুলে ভার্নের কল্পনা পেয়েছে রূপ। সে তার ছেলের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হোলো। যে অঞ্চলে সে থাকে, সেই অঞ্চলেই হয়ত পড়েছে গোলা। পারীতে এসে সে খানিকটা আশ্বস্ত হোলো কিন্তু পুরোপুরি নয়। বাড়িটা ঠিক আছে দেখতে না পেলে শান্ত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। বাড়ি পৌঁছে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। দোরে ঘা দিতেই, শুনল (কি আনন্দ!) তার ছেলের পায়ের শব্দ। সে দোর খুলতে এগিয়ে আসছে।

মার্ক অবাক। এক মুহূর্তের জন্য তার সংযম ভেসে গেল। যে কৃত্রিম দেয়াল তারা নিজেদের ভিতরে খাড়া করেছিল, এক নিমেষে তা গেল গুঁড়িয়ে। দু'জনে দু'জনকে ধরল জড়িয়ে; তারা আশ্চর্য হোলো কামনার আতিশয্যে ভরা আলিঙ্গনে। কোথা থেকে এল এই অতি-কামনা—কোথা থেকে এল?

কিন্তু সে তো ক্ষণিকের। এমনি আতিশয্যে ওরা অভ্যস্ত নয় বলেই পরমুহূর্তে অপ্রতিভ হোলো, আলিঙ্গন পড়ল খসে—আবার সেই পুরনো বাধা এল ফিরে।

কি এক গোপনতা যেন ওদের বিচ্ছিন্ন করে দিল। আনেৎ ঘরে ঢুকে বিস্তারিত বলল, কেন সে ফিরে এসেছে। মার্ক শুনল, কথা বলল না। কিন্তু চোখ রইল তার দিকে। এবার মার্কের পালা। মার্ক তার প্রতি-অঙ্গ সঞ্চালন লক্ষ্য করছে। আনেৎ অপ্রতিভ হয়ে বলতে বাধ্য হোলো। কেমন এক অশ্বস্তি ভোগ করছে। ছেলে বিচার করবে এই ভয় তাকে পেয়ে বসেছে। ভয় তো হবেই। সে তো তার কাছে বহু দোষে দোষী। তাই তো সে কোমল হতে পারল না। সেও তাকিয়ে তাকিয়ে মার্ককে দেখল, কিন্তু মনের শঙ্কা তাকে ভালো করে দেখতে দিল না। তিনমাস আগে যে বালককে সে রেখে গিয়েছিল, মার্ক আর সে-বালক নেই—একথা সে বুঝতে পারল না। যাকে আমরা জানতাম সে-ই ক'দিন পরে কত ভিন্নরূপেই না দেখা দেয়! আমরা শুধু অতীতের রূপকেই আঁকড়ে ধরে থাকি, তাকে জানি বলে গর্ব করি। নতুন রূপ তো আমাদের কাছে অচেনা, তার চাবিকাঠির সন্ধান রাখি না।

গ্রেফ্তার হবার আগে পিতাঁ বুঝতে পেরেছিল, কর্তৃপক্ষ তার পিছনে লেগেছে। তাই সে সিলভীকে চিঠি লিখেছিল, সে যেন আনেৎকে জানায়, তার কোনো ভয় নেই, সে নিজের ঘাড়েই সব ঝুঁকি নিয়েছে। শুধু এইটুকু সে লিখেছিল, কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট। সিলভী এসম্বন্ধে সঠিক জানত না, কিন্তু গ্রীষ্মকাল থেকেই ব্যাপারটা সে সন্দেহ করে আসছিল, এবার সে রীতিমত ভয় পেল। তার পাগলী দিদি কি ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে? কিন্তু আবিষ্কার করা তার পক্ষে সম্ভব হোলো না, পিতাঁ তখন জেলে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে কথাটা মার্ককে জানাল। মার্ক বুঝল, মায়ের বিপদ উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ডিসেম্বরের গার দ্যু লিয়ঁ রেল স্টেশনে মার সঙ্গে সেই রহস্যময় সাক্ষাৎ (সে কাউকে ঘুণাক্ষরে একথা জানায়নি)।

এরই উপর কিশোর গড়ে তুলল এক অদ্ভুত রমন্যাস। মাসীকে সে জানায়নি, নিজের কল্পনাই তো যথেষ্ট। সিলভী তাকে জানাল, কি ঘটেছে—কবরখানার দৃশ্য, বন্দীর প্রতি করুণা—কিছুই বাদ গেল না। এই তথ্যগুলি নিয়ে মার্ক আবার কাজ শুরু করল, এবার তার মা দেখা দিল অন্য রূপে। তার ধারণা গেল বদলে।

যে শান্তিবাদকে সে নারী আর দুর্বলেরই সাজে বলে ঘৃণা করত, সেই-ই তার কাছে এক উন্মাদনা নিয়ে দেখা দিল! তার বিপদে সে পেল এক নতুন রহস্যের আমেজ। সে কল্পনায় আঁকল দুঃসাহসিক অভিযানের ছবি—বীরত্ব আর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ—এ যেন রমন্যাস। কেমন ঈর্ষা হোলো তার, এক অস্থৈর্যময় আকর্ষণ অনুভব করল। কিন্তু এবার বুঝতে পারল, সে অন্যায় সন্দেহই করেছে। আঘাত পেল মার্ক। নিজের উপর রাগ হোলো। কিন্তু নিজের কথা চিন্তা করলেই তো চলবে না। মা বিপদে পড়েছে। মাকে পারীতে দেখে তার আর সন্দেহ রইল না, মা বিপদ জেনেও এখানে এসেছে। এই ভাবনাই তাকে পেয়ে বসল, সে কত ভাবল। মনে মনে ঠিক করল, মাকে বিপদের কথা জানাবে, কিন্তু মা তো শুনতে চাইবে না তার কথা, এ কথাও সে জানে। সে অস্থির হয়ে উঠল দুশ্চিন্তায়, মাকে প্রশংসা না করে পারল না। তার গর্ব, তার প্রশান্তি, তার গাম্ভীর্য—সবকিছুই তো প্রশংসার ব্যাপার। অবশেষে সে আবিষ্কার করেছে মাকে! আজ মার বিপদ বলেই তাকে হারাবার ভাবনায় সে শিউরে উঠেছে।

আনেৎ কিছুই দেখতে পেল না। একমাত্র কর্তব্য তখন তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে; সে উদ্বিগ্ন, অস্থির। এসেই পোশাক বদলাবার বা খাবার জন্য সে দেরি করতে চাইল না—এমন কি সিলভীর সঙ্গে দেখা না করেই সে আবার বেরিয়ে পড়ল। মার্ক আমতা আমতা করে তার সঙ্গে যাবার অনুরোধ জানাল, আনেৎ উপেক্ষা করল সে-অনুরোধ—মার্কও আর পেড়াপীড়ি করল না। আহত হোলো, কিন্তু আর একবার ভর্ৎসনা শুনতেও সে রাজি হোলো না।

মার্সেল ফ্রাঁর কাছে গিয়ে হাজির হোলো আনেৎ। সরকারের স্টীম রোলারের এখন সে একটা দরকারী চাকা। মন্ত্রীসভার সে সম্পাদক। আনেৎ ভণিতা না করে বলে গেল তার কাহিনী। মার্সেল তো হতবাক।

প্রথমেই তার বন্ধুত্বের অনুভূতি উবে গেল। আনেৎ দেখল,

মার্সেল তার স্বভাবসুলভ হাসিটুকু হারিয়ে ফেলেছে—অথচ এইটেই তার অভ্যেস, তার মুখের প্রসাধন। প্রথম কয়েক মুহূর্ত সামান্য ভদ্রতাও বুঝি বজায় রাখা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। সে শুধু এ কাহিনীর ভিতরে একটা জিনিসই লক্ষ্য করল: এই মোহমুগ্ধ জীবটি তাকে ফাঁসিয়ে বসে আছে। নিজেও সে জড়িয়ে পড়েছে এইকথা ভেবে সে একটুও স্বস্তি পেল না—হাসি ফুটল না তার মুখে। কথার কসরতে সন্তুষ্ট হবারও তার সময় ছিল না। সে বিরক্ত হোলো, আনেৎ তাকে জড়িয়ে ফেলেছে। কিন্তু আনেৎ-এর বিদ্রূপদৃষ্টি তার মুখ চোখের ভাব লক্ষ্য করছে দেখে তার স্মরণ হোলো, নিজের ভূমিকা' ভুলে গেলে তার চলবে না। সে যে পৃথিবীর হালচালের বুঝদার! মার্সেল নিজেকে সংযত করে নিল। আবার ফিরে এল সেই নিস্পৃহতা। এই স্ত্রীলোকটি সাহসের বলে সমস্ত বিপদ মাথা পেতে নিয়েছে, আর সে এত ভীরু! লজ্জা হোলো, আবার সেই পুরনো মার্সেল ফিরে এল। সে বলল:

'কিন্তু আনেৎ, দোহাই তোমার, কোন্ শয়তান তোমার উপর ভর করেছে বল? সুইজারল্যাণ্ডে তো বেশ নিরাপদে ছিলে। এখানে কেউ তোমার কথা নিয়ে মাথাও ঘামায় না—কিন্তু এখানে এই নেকড়ে বাঘের মুখে এসে পড়লে কোন বুদ্ধিতে বলতো?'

আনেৎ শান্ত স্বরে জানাল: সে পিতাঁর বদলে শাস্তি নেবে, না পারে তারই পাশে গিয়ে দাঁড়াবে।

মার্সেল হাত তুলে বাধা দিল: 'না, না, তুমি তা করতে পারবে না!'

'যে হাকিমের ওপর বিচারের ভার দেওয়া হয়েছে, তাঁর নাম জানতে তোমার কাছে এসেছি। আমি তাঁর কাছে সব স্বীকার করব।'

'আমি তা হতে দেব না।'

'তুমি কি মনে কর একজন নিরপরাধ আমার জন্য শাস্তি পাবে, আর আমি তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব?'

'সে নিরাপরাধ নয়। চিঠিপত্র আর লোক গোপনে চালান দেওয়া তার ব্যবসা। এ ব্যাপারে সে দাগী। তুমি তো তাকে বাঁচাতেই পারবে না, শুধু শুধু নিজের উপর অপবাদ টেনে আনবে। তাছাড়া, সে তোমার নামও বলেনি।'

'উদার বলেই বলেনি। আমিই বা উদার হব না কেন?'

'তোমার যে ছেলে আছে আনেৎ।'

'ঠিকই তো ! আমি তাকে ভীরু হতে দিতে চাই না।'

'আনেৎ, তুমি পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছ !'

'হাঁ, পুরোপুরি পাগলই বটে ! এখন বন্ধু যে জন্য এসেছি সেই কথা বল, তারপর শান্ত হয়ে থাক ! ভয় নেই, তোমাকে জড়াব না।'

(সে ভাবল : 'আমাকে ঠকাবার চেষ্টা কোরো না আনেৎ ! একবার যদি হদিস পায় তাহ'লে ধাপে ধাপে উঠে এসে আইন আমাকেও ধরে ফেলবে !')

কিন্তু গর্বে আঘাত লাগল। সে বাধা দিল : 'আমার কথা হচ্ছে না, তোমার জন্যই ভাবছি। তুমি তো "মুরুব্বী"কে জান না (জাতিকে যিনি যুদ্ধে নামিয়েছেন তাঁর কথাই সে বলল), দুটো একটা হঠাৎ রায় দেওয়া তাঁর পক্ষে কিছুই নয়। তাঁকে কোন স্ত্রীলোক ঠেকিয়ে রাখবে ! তিনি তো পুরনো সংস্কার ভেঙেই খুশি। শ্রদ্ধা বা নারীজাতির প্রতি করুণার তিনি ধার ধারেন না।'

'বেশ তো না-ই ধারুন, আমাকে তাঁর সমান বলে মনে করলেও আমি অখুশি হব না। এমন কি ফাঁসিকাঠের সুমুখেও না।'

মার্সেল আর অনুরোধ করল না। আনেৎকে সে চেনে।

'বেশ ! তবে আগে আমার হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দাও—দেখি কি হয়।'

'কিন্তু সময় যে নেই।'

'ভয় নেই, বেশি সময় নেব না।'

'কিন্তু আমার বুকে যে গুরুভার চেপে রইল বন্ধু। আমি কি করে বইব !'

'আর দু'একদিন বইবার মতো শক্তি তোমার আছে বইকি। মামলাটা যদি এমনি-এমনি নিষ্পত্তি হয়ে যায় সেটা কি দু'জনের জীবন উৎসর্গ করার চাইতে ভালো নয় ?'

'তারই বা নিশ্চয়তা কি ? হয়তো কাল কি পরশু সব শেষ হয়ে যাবার পর খবর পাব, পিতাঁ সংক্ষিপ্ত বিচারের বলি হয়েছে,—তখন ?'

'আমি হাকিমকে চিনি। তোমাকে জানাব। তোমাকে ভোলাতে আমি চাই না, না—সে-ঝুঁকি আমি নেব না। যদি আমার অজান্তে হঠাৎ শাস্তির হুকুম হয়, নিজেকে উৎসর্গ করবার পথ তো খোলাই থাকবে। কোনো স্ত্রীলোক যখন ধ্বংসের মুখে ছুটে যেতে চায়—কে তাকে বাধা দিতে পারে বল !'

'মার্সেল, সে-ভয় আমার নেই। কিন্তু জান তো উৎসর্গের জন্য আমি খুব ব্যগ্র নই। নিরর্থক বীরত্বের প্রতি আমার লোভ নেই।'

'যাক, ভগবানকে ধন্যবাদ—তবু একটা বুদ্ধির কথা শুনলাম! এখন সত্যিকারের বীরত্বের কথায়, আনেৎ, এস খোলাখুলি আলোচনা করা যাক। আমার যতদূর সাধ্য তোমার জন্য করতে চাই। কিন্তু সে তোমার প্রেমিক একথা কেন লুকোচ্ছ বল তো?'

'কে—?'

'যে সুশ্রী তরুণকে তুমি বাঁচিয়েছ, সে—।'

'কি বাজে বকছ!'

'আরে, এখনো লুকোতে চাইছ! যাক্ তোমাকে দুষছি না। তোমার যখন ইচ্ছে—'

'কিন্তু হলফ করে বলছি, তা নয় মার্সেল, তা নয়।'

'বল, বল!'

আনেৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল: 'না, না, না, না!'

মার্সেল হাসল: 'বেশ বেশ! রাগ কোরো না! আমি আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করব না। কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করি, ওকে ভালো না বাসলে বাঁচালে কেন? কই, সে-কথা বললে না তো? না, বলতে লজ্জা করছে?'

'কেন বাঁচালাম—' আনেৎ আবেগ ভরে শুরু করল, কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল সে। যতই সে প্রকৃত কারণ বলুক না, মার্সেল তো বিশ্বাস করবে না, বুঝবে না। বেশ, তবে ও যা ভাবে ভাবুক!

মার্সেল হাসল বিজয়ীর হাসি। মার্সেলের কাছ থেকে কেউ কি কিছু লুকোতে পারে!

কিন্তু লোকটা সে ভালো। তার উপর প্রেম ব্যাপারটাকে রসিয়ে তুলেছে। ঠিক তেমনি আছে আনেৎ···ভয়ানক গোলমাল পাকিয়ে তুলেছে! ···কিন্তু মনে মনে তার জন্য সে গর্বিত বইকি!

॥ আট ॥

তক্ষুনি সে কাজ শুরু করে দিল। দেখা করল সামরিক আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। লোকটি অমায়িক, খ্যাতিও তাঁর যথেষ্ট। তাঁর এই ভূমিকার জন্য যতটুকু অমানুষিকতা দরকার তা তিনি বিনা আয়াসেই আয়ত্ত করেছেন। জাতীয়তাবোধের উন্মত্ততা, ক্ষমতার মত্ততা আর তার সঙ্গে জুটেছে বিলাসীর কৌতূহল—এই তিনে মিশে তাঁর মধ্যে এক চমৎকার ঔদাসীন্যের সৃষ্টি করেছে। তিনি এমনি খুব ভয়ংকর নন, কিন্তু আসামীর প্রতি যখন আকৃষ্ট হন তখন তাঁর ভীষণতা দেখা দেয়।

পিতাঁর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হলেন। পিতাঁরও তাকে খুব সহানুভূতিশীল বলেই মনে হোলো। তাদের চলল দীর্ঘ আলাপ, সৌজন্যের দৈন্য দেখা দিল না সেখানে। কিন্তু এই আলাপের ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলোবার দড়ি তৈরি করবার চেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু দড়ি সরুই রয়ে গেল: তিনি নিজেই দুঃখ করে বললেন সে-কথা—সহৃদয়তাও ফুটে বেরুল তাঁর স্বরে। আর এই খুদে চীনেমাটির বাসন মেরামতকারী তো অতি ভদ্র, আর নিরীহ। সে তাঁর এই অভিসন্ধি টেরও পেল না। সে ঢেকে কিছু রাখল না, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করল, তার কল্পনাকে দিল রূপ। বরং সে এই ভেবে কৃতজ্ঞ হোলো, সে এমন একজনকে পেয়েছে যিনি তার কথা মন দিয়ে শুনছেন। ফাঁসিকাঠের দিকে সে সলজ্জ আনন্দে তাকিয়ে রইল—মনে হোলো যেন একটা কুকুর মাংসের তালের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। কিন্তু তার সহকর্মীদের নাম তার কাছ থেকে বার করা গেল না, পাওয়া গেল না তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো সূত্র। তার রুচি অনুসারে বা সহজাত চাতুর্যে সে কাহিনীকে দিল এক সুদীর্ঘ বক্তৃতার রূপ। ঘটনার উপর সে বেশী জোর দিল না, ভাবধারাকেই বড় করে দেখাল।

হাকিম ফ্রাঁকে কতগুলো চিঠি দেখালেন। এই চিঠিগুলো পিতাঁ তার এক তরুণ বন্ধুকে জেল থেকে লিখেছিল, সঙ্গে তরুণ বন্ধুটির উত্তরে লেখা চিঠিও ছিল। এই বন্ধুটির নাম মার্ক রিভিয়ের। ফ্রাঁ মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল: তবে কি সেই খুদে অপদার্থটা নিজের থেকেই সব ফাঁস করে দিয়েছে! রিভিয়েররা কখন কি করে বসে কে জানে! কিন্তু হাকিম যখন মধুর

স্বরে চিঠির দু'একটা জায়গা পড়ে শোনালেন, সে আশ্বস্ত হোলো। গীতিময় ছন্দে লেখা চিঠি, পড়লে সেই তরুণ শিলার, ফ্লবেয়ার, রুসো আর রাবোঁর কথা মনে করিয়ে দেয়। পিতাঁ নিজেও বার্নাদ্যাঁ দ্য স্যাঁ-পিয়ের আর এদগার কিনেৎ-এর অনুসরণে লিখেছে। তরুণ জানিয়েছে তার গভীর আকর্ষণের কথা। সে বিচারের এই অপব্যবহারে ফুঁসে উঠেছে, চাইছে তার অদৃষ্টের ভাগী হতে। এই ন্যায়-নিষ্ঠের অদৃষ্টে যাই আসুক, সেও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, এই তার প্রার্থনা। আর পিতার মতো তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে এই বৃদ্ধ, বলেছে তার আনন্দময় জীবনের কথা, তার মনের শান্তির কথা। এই চিঠি থেকে মনে হয় বন্দীশালা যেন জ্ঞানীর বাঞ্ছিত আশ্রয়, এ যেন এক আশ্রম—রাষ্ট্রের সুনজরে পড়েই চিন্তানায়করা এখানে আসে। হাঁ, তাই তার উঁচু আগল-দেওয়া জানলা দিয়ে হাওয়া নিয়ে আসে সীনের পাড়ের বাদাম ফুলের সুগন্ধি, সমস্ত বসন্ত যেন সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আবির্ভূত হয়। পিতাঁ যেন সেই গাথার যুগে ফিরে গেছে—সেই অনাড়ম্বর গীতিময় জীবন যাত্রায়। একটা ফুল সযত্নে সে চিঠির ভাঁজে রেখেছিল, হাকিম সেটা তুলে দেখালেন। পারীর নাগরিক দু'জন হাসলেন, বলে উঠলেন তাঁরা :

'বুড়ো তো এক অদ্ভুত জীব দেখছি!'

কিন্তু কি বৃদ্ধ কি তরুণ, মনের গহনের কথা কেউই তো প্রকাশ করেনি। তরুণের যার জন্য অস্থৈর্য আর অনুশোচনা আর বৃদ্ধের তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা মনের গহনেই রয়ে গেছে। তারা পরস্পরকে জেনেছে দীর্ঘ কথার জালের ভিতর দিয়ে। তাই তো পারীর এই নাগরিকরা তাদের চিঠি থেকে কিছুই উদ্ধার করতে পারেননি। তাঁদের মনে হয়েছে এ শুধু এমিল-এর কথোপকথনের মতোই কথার জাল বোনা ছাড়া কিছুই নয়।

হাকিম তার নথিপত্র বুজিয়ে রাখলেন।

'এর থেকে কি মনে হয় আপনার?' জিজ্ঞেস করল ফ্রাঁ।

'কি আর মনে হবে। এখন পালানোর ব্যাপারটাই বড় হয়ে উঠেছে। আমি বুঝতে পারি না, এতে বুড়োর স্বার্থটা কি? সে ব্যক্তিগতভাবে বন্দীকে চেনেও না। আমরা সুইজারল্যাণ্ডে এই খুদে পাখীটির সন্ধান পেয়েছি। ওখানকার এক ফরাসী পরিবারে সে আশ্রয় পেয়েছে।'...

ফ্রাঁ কান খাড়া করল।

'তারা খুবই ভালো লোক, এক কথায় সজ্জন, অভিজাতও বটে।

পরিবারের একমাত্র পুরুষ এই আহত ছেলে, আর সবাই সীমান্তের যুদ্ধে বেঁচে আছে বা মরে গেছে। এখন বাড়ির অধিবাসী তিনটি স্ত্রীলোক : মা, বিবাহিতা এক মেয়ে, একজন নার্স। কতগুলো কারণে মনে হয়েছে বিবাহিতা মেয়েটির সঙ্গে সুশ্রী তরুণটির কোনো একটা ব্যাপার চলছে। একেবারে মামুলী গল্প আর কি! স্বামী সীমান্তে, পেছনে নীতিবোধ কোনো রকমে টিঁকে আছে কি নেই। কিন্তু একটা ব্যাপারে আশ্চর্য হতে হয়, এমন দেশভক্ত পরিবারের মেয়ে কিনা শেষে একটা জার্মান ছোঁড়াকে জোটাল! তা মোটে না'র থেকে তো ভালো! বোধ হয় যুদ্ধের আগে থেকেই জানাশুনো ছিল।'

ফ্রাঁ নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে পড়ল। 'তা রাতে সব বেড়ালকেই তো ধূসর দেখায়। দোষ কি!'

'তবে কলঙ্ক প্রকাশ করে আমরা একজন যোদ্ধাকে এমনিভাবে পুরস্কার দিতে রাজী নই। তাছাড়া জননিরাপত্তার কথাই এখানে ওঠে না।'

'কিন্তু বুড়োর কি হবে?'

'ইচ্ছে করলে ওকে ফাঁসি দিতে পারি, ছেড়েও দেওয়া যায়। ওর স্বপক্ষে আর বিপক্ষে সমানই যুক্তি আছে। একেবারে সমান ওজন, কোন পাল্লাটা ঝুলে পড়বে সেটা খুব বড় কথা নয়। রাষ্ট্র যা হুকুম দেবে তাই-ই হবে।'

'রাষ্ট্র' ফ্রাঁর নাগালে ছিল। সে গেল "মুরুব্বী"র সঙ্গে দেখা করতে।

বহুদিন থেকেই চেনা ছিল, কিন্তু তাঁকে চেনবার গর্ব কে করতে পারে? লোকে যা আশা করে এই মানুষরূপী দৈত্য ঠিক তার উল্টোটাই করে বসেন। জঙ্গলে পদে পদে ফাঁদ পাতা। ফ্রাঁ সতর্ক হয়েই এগিয়ে গেল।

অদৃষ্ট তার ভালো। এই বুড়ো শুয়োরটির রুক্ষ উত্তরের পরিবর্তে সে তাঁকে বেশ ভালো মেজাজেই পেল। অথচ ছোকরা-শুয়োর দেখলেই তেড়ে আসা তাঁর স্বভাব। আজ তিনি ভালো ঘুমিয়েছেন, তাই মেজাজটাও ভালো। এই মঙ্গোলীয় মুখোশপরা লোকটি সীমান্ত ঘুরে সবে ফিরেছেন। সেখানকার খবর ভালো; মানুষগুলো আইনমাফিক মরছে, নিজের জায়গা থেকে নড়েনি। রক্ষা-প্রাকার সুদৃঢ়—জার্মান সৈন্যবাহিনীর ঢেউ বুঝি আবার রোখা গেল! বুড়ো খুশি হয়েই ফিরেছেন সব দেখেশুনে। ক্লান্তি তাঁর নেই, যেমন নেই তার উচ্ছ্বাস—তাঁর চামড়ায় তারা কোনো ছাপ রাখতে পারে না। সেক্রেটারীরা যেসব জরুরী ব্যাপার এই কদিন তাঁর জন্য স্থগিত রেখেছিল,

সেগুলো সম্বন্ধে যথা কর্তব্য সমাধা করেছেন। এখন আর কাজ নেই—অধিবেশনের আগে আধঘণ্টা বিশ্রাম। পরনিন্দা তিনি ভালোবাসেন। তাঁর স্তাবকদের সব সময়েই তাই হালের নিন্দা রটনার খবর রাখতে হয়। তিনি ফ্রাঁকে দেখেই যেন একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারীর গন্ধ পেলেন, ফ্রাঁ যেন পকেটে করে সেটা নিয়ে এসেছে। তাঁর হাসি দেখেই তিনি বুঝলেন।

'এই যে ফ্রাঙ্গিপেনের লাট সাহেব—(তিনি উচ্চারণ করলেন ফ্রাঙ্কটিপজিপেন,) তাঁর সওদা নিয়ে এসেছেন! এসো, এসো ছোকরা, বাক্সে কি এনেছ খুলে দেখাও!'

ফ্রাঁ এই ঘনিষ্ঠতার সুরে একটু গর্বিত হোলো। কিন্তু বিশ্রী ডাকনামটা তাকে বিরক্ত করেই তুলল। "মুরুব্বী"র সুরে মনে হয় নামটা যেন তার সঙ্গে খুবই খাপ খেয়ে গেছে। তাঁর কাছে সে পিতাঁর কথা বলল। সহানুভূতি প্রবণ পিতাঁ, তার ভিতরে তাই বলে হাসির খোরাকও যথেষ্ট আছে, সে পিতাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গই করল। কিন্তু বেশীদূর এগোনো চলল না, কেন না অসহিষ্ণু শ্রোতা তাকে বাধা দিয়ে বিদ্রূপভরে বললেন: 'সেই মহান আত্মার কথা তো ঢের শুনলাম! আর কিছু আছে?'

এবার কাহিনীকার উপাদানের উপর চড়া রঙ চড়াল, অনেক কল্পনার জাল বুনে দিল—শ্রোতার মন তো জোগাতে হবে। পিতাঁ এবার হয়ে উঠল একজন লাজুক প্রেমিক—প্রেমিকা তার এক 'অপাপবিদ্ধা' মহিলা। অথচ সে-মহিলা তাকে তো ভালোবাসেন না, তাঁর প্রেমিক এক অষ্ট্রীয় যুবক। পিতাঁ তাকেই পালাতে সাহায্য করেছে। এক জটিল ত্রিভুজের সৃষ্টি হোলো।

"মুরুব্বী" এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'কে—, কার কথা বললে? স্ত্রীলোকটি কে?' তিনি ফ্রাঁর হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'বাজি রাখতে পারি, তাকে আমি চিনি। তুমি অমুকের স্ত্রীর কথা বলছ কি?...' (অমুক তাঁরই একজন মন্ত্রী) কেমন যেন এক ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠল তার চোখে। 'না?...ঠিক বলছ, সে নয়?...ইস কি দুঃখ বল তো? ওর স্ত্রী যে ঐ ধরনেরই—আমি তো ঐ দলেই ওকে ফেলেছি।'

তিনি আরো দু'চারজন স্ত্রীলোকের নাম করলেন। ফ্রাঁ নাম না বললে তিনি থামতেন না। ভয় তার যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তখন তো আর ফেরা যায় না।

আনেৎ রিভিয়ের-এর নাম শুনে বুড়ো চিৎকার করে উঠলেন:

'রিভিয়ের!'

রিভিয়েরকে তিনি চিনতেন। তরুণ স্থপতি, প্রত্যুৎপন্নমতি, স্বাধীন চিন্তাশীল রিভিয়ের,—ড্রেফুস দলেরই একজন। তিনি আর সে একই যুগের লোক, একই প্রবাহে ভেসে চলেছিলেন। তাঁরা কতো আনন্দই না উপভোগ করেছেন, ব্যঙ্গে বিদ্রূপে ধুম হয়ে উঠেছেন! আর মেয়েটিও তাঁর চেনা··· ছোটবেলায় তার গাল টিপে কত আদর করেছেন! বহু দিন দেখা হয়নি, কিন্তু মেয়েটি বড় ভালো। সেই রজের ব্রিসোকে কি বোকাই না বানিয়েছিল! (তিনি ভণ্ডামি পছন্দ করেন না, সর্বত্রই তার গন্ধ পান—এমন কি সত্যও বাদ পড়ে না।) আনেৎ-এর আঘাতে কেমন জব্দ হয়েছিল ওরা, রজের তো কেকের মতোই লুটিয়ে পড়েছিল মুখ থুবড়ে! তিনি কেলেঙ্কারী সম্বন্ধে সজাগ বলেই ব্যাপারটা বাইরে বেশ ভালো করেই ছড়াতে পেরেছিলেন। ব্রিসোরা কি রাগেই না গুম মেরে গিয়েছিল, তারা যেন কিছু জানে না এমনি ভানও করেছিল! এ তাঁর এক সুখস্মৃতি বইকি! আজ বহুদিন পরে মনে হোলো, তিনি আর আনেৎ যেন সে-প্রহসনে এক সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। হাঁ, এই সাহসিকার প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ (হাঁ, সেই রূপেই তিনি তাকে দেখেছিলেন)। তার এই নতুন দুঃসাহসিকতার পরিচয়ে তিনি খুশিই হলেন—সেই রিভিয়ের মেয়েটি তো!

'কিন্তু ফ্রাঙ্গিপেন, সে তো এখন আর তরুণী নেই, তার বয়েস এখন···দাঁড়াও ···যাকগে! ভালোই করেছ। আমি ওকে পছন্দ করি। ভিতরে আগুন আছে হে। তাহলে ব্যাপারটা এইখানে এসে পৌঁছেচে? তা রাজনীতির সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি? তুমি ভদ্রমহিলাকে নিশ্চই ফুত্রিকিয়ে-ত্যাঁভিল এর কাছে হাজির করতে চাও না (তিনি তার এটর্নি-জেনারেলকে এই সম্বোধন করেন)। সে আবার এর ভেতরে নাক ঢোকাবে কেন? না, না! মেয়েটি ওর ভিয়েনার প্রেমিককে নিয়ে সুখে থাকুক! আমাদের অলাভ কি! পরের বারের যুদ্ধের জন্য আর একজন সৈনিক সৃষ্টি হোলো! আর বুড়ো পিতাঁর কথা বলছ তো? (সৈন্যবিভাগে আর একজন বাড়ল!) ওতো তিনজনের মধ্যে সব চাইতে সুখী, ওর মঙ্গল কামনা করি! তুমি খবর চেপে রাখ, শান্তি-টান্তির কথা আর উঠবে না। ওসব কথা যাক, এবার জরুরী ব্যাপারে এস। হাঁ, মন্ত্রীসভা তো আধঘণ্টা বাদেই বসছে। ঐ জানোয়ারগুলোকে কি বলবো বল তো?'

ঘটনাটা চাপা পড়ল।

ওঁরা তার নামে কলঙ্ক রটিয়ে, তার গায়ে কাদা ছিটিয়ে তাকে রেহাই দিলেন।

এই অরণ্যে কারো গায়ে কাদা ছিটানো বুঝি সহানুভূতিরই এক রূপ !

॥ নয় ॥

এও সুখের বিষয়, আনেৎ এসব জানতে পারেনি। ফ্রাঁর কাছ থেকে সে শুনল, ব্যাপারটা ভালোর দিকে। কিন্তু এতেও খুশি হতে পারল না, তখনো সন্দেহে তার মন আচ্ছন্ন। সে হাকিমকে চিঠি লিখে বসল। হাকিম পিতাঁকে মুক্তি দেওয়ার সময় সে চিঠিও দেখালেন।

আনেৎ বাড়ি ফিরে সিলভীকে সব বলল। সিলভী তো যা খুশি তাই বলল। তার নির্বুদ্ধিতা দেখে সে রেগে গেল। আনেৎ বাধা দিল না। এবার সিলভী থেমে গেল। ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে, এখন তার কোনো উপায় নেই। হঠাৎ সে তার বোনের গলা জড়িয়ে ধরল। সত্যি কথা বলতে কি, আনেৎ-এর কাছ থেকে এই সে আশা করেছিল। একটা গোটা রাজ্য পেলেও আনেৎরা কখনো এর বিপরীত কিছু করে না। সিলভী জানে এমন ব্যাপার সে নিজে কখনই করতে পারত না, তাই দিদির এই কীর্তিতে তার গর্বই হোলো, এই ইচ্ছাশক্তি, এই প্রশান্তি তাকে অভিভূত করে ফেলল।

পার্টিশনের আড়াল থেকে মার্ক দুই বোনের অস্ফুট স্বর শুনতে পেল। কি ঘটেছে বুঝতে পারল না। মাঝে মাঝে শুধু স্পষ্ট কানে এল সিলভীর উত্তপ্ত স্বর, আবার পরক্ষণেই আনেৎ-এর ইঙ্গিতে সে-স্বর মৃদু হয়ে এল। তারপর আলিঙ্গন আর নিস্তব্ধতা। সিলভী নাক ঝাড়ল। যার চোখ দিয়ে কখনো জল পড়েনি সে কাঁদল অঝোরে···

হাতে হাত দিয়ে দু'টি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে রইল, দু'জনের চোখে রইল চোখ। আনেৎ চুমু খেল সিলভীর ঠোঁটে, তার কানে কানে বলে গেল সেই কাহিনী। জোরমঁ্যার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব, ফ্রানৎস-এর পালানো, জোরমঁ্যার মৃত্যু—সব কিছু সে বলে গেল। তার বোনের এই উন্মত্ত সহৃদয়তায় সে একবারও কটুক্তি

করল না। নিজের মাপকাঠি দিয়ে তো তার বিচার চলে না—প্রচলিত মাপকাঠি দিয়েও না। আনেৎকে দেখে তার বারবার মনে হোলো, হাঁ, এ সেই মেয়ে যাকে অন্য মানদণ্ডে বিচার করতে হবে। সে তো সাধারণের বহু উর্ধ্বে। মার্ক পার্টিশনের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল, শুনল, পেল আঘাত। ওরা তাকে বিশ্বাস করে সব কথা কেন খুলে বলল না ! না, সে শুনতে চায় না। তার গর্ব নিয়ে সে অপেক্ষা করবে। তাদের আসতে হবে, বলতে হবে সব কথা।

কিন্তু চুপ করে থাকা তার পক্ষে তখন দুষ্কর। পরদিন এল পিতাঁ। সে বেরিয়ে এল তার কোটর থেকে। আনেৎ শুনতে পেল, দোর খুলেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল মার্ক। আনেৎ-এর হাত থেকে পড়ে গেল বুনবার কাঁটা। মার্ক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল, তারপর অভ্যাগতের হাত চেপে ধরল। পিতাঁর দাড়ির জঙ্গলে স্নেহের শান্ত হাসি। আনেৎ তাকে দেখে উঠে এসে জড়িয়ে ধরল। তারপর হঠাৎ খেয়াল হোলো, তার ছেলে তো রয়েছে। সে লজ্জিত হোলো। মার্ক অপ্রতিভ আরো বেশী, সে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করবার ছুতোয় সরে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত ওরা একা থাকুক ! আনেৎ আর পিতাঁ এবার সম্ভাষণ জানাল পরস্পরকে; ফিরে এল মার্ক। তিনজনের কথাবার্তা চলল, কিন্তু সহজ খাতে নয়, তিনজনেই যেন কি রাখল মনের কোণে লুকিয়ে। পিতাঁকে ওরা দুপুরে খেয়ে যেতে বললে, কিন্তু সে রাজি হোলো না। সে তখন পারী ঘুরে দেখবার জন্য আকুল : সাক্ষীদের সঙ্গেও দেখা করতে হবে। মার্ক ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। দু'জনে চলতে চলতে মার্ক বলল : 'পিতাঁ, আমার মাসীর কাছে তুমি যে চিঠি লিখেছিলে, আমি দেখেছি।'

'ওঃ—,' বলে পিতাঁ থেমে গেল।

মার্ক আবার বলল : 'তুমি আমাদের জন্য জীবন বিপন্ন করেছিলে, তুমি উদার।'

'তোমার মার চাইতে বেশী উদার নই।'

'সে তো নিজের জীবন বিপন্ন করেনি।'

'তোমাকে কোনো কথা তিনি বলেননি ?'

'না তো।'

'তাহলে আমি বললে তো তুমি খুশি হবে না।'

'না।'

সে বিরক্ত হোলো, কিন্তু পিতাঁ ঠিকই বলেছে। ওরা আবার চলতে শুরু

করল। কিছুক্ষণ পরে মার্ক আবার বলল: 'আমি শুধু এইটুকু জানতে চাই··· ওর কি এখনো ভয় আছে?'

'বোধ হয় না। কিন্তু আজকের যুগ তো কুকুর আর নেকড়েদের। ওঁর মতো সাহসী স্ত্রীলোকের তো পদে পদে বিপদ।'

'ওকে বাধা দেওয়া যায় না?'

'কার সে ক্ষমতা আছে জানি না। বরং ওঁকে সাহায্য করা দরকার।'

'কিন্তু কেমন করে সাহায্য করা যায়?'

'ওঁরই পাশে দাঁড়িয়ে বিপদ বরণ করে।'

মার্ক বলতে পারল না: হাঁ বিপদ বরণ করব বইকি। কিন্তু কেমন করে? আমি তো কিছুই জানি না—মাতো বিপদের কথা আমাকে কিছুই বলেনি।

আনেৎ তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এ তিক্ততা তার যায়নি। সে বার বার মনে মনে বলল: শুধু আমাকেই মা বিশ্বাস করতে পারেনি—একটুও বিশ্বাস করতে পারেনি।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে পিতাঁ ভুল বুঝল। সে বলল: 'তোমার মা তো তোমার গর্ব।'

মার্ক রাগে চিৎকার করে উঠল: 'আমার মা আমার গর্ব,—একথা কি তোমার কাছ থেকে জানতে হবে পিতাঁ?'

সে মুখ ফিরিয়ে হন হন করে অন্যদিকে চলে গেল।

দশ

একটা ভারি বোঝা নেমে গেছে। আনেৎ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গৃহস্থালীর কাজ শুরু করল। শান্ত, সাধারণ জীবন। যুদ্ধ, লোকের দুশ্চিন্তা—কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারল না। ওদের বিপদ তো তারও বিপদ, কিন্তু সে ওদের উদ্বিগ্নতার ভাগ নিতে রাজি নয়। চিন্তা করবার মতো এ ছাড়াও বহু জিনিস আছে। তার অবর্তমানে সিলভী এতদিন মার্ককে দেখাশোনা করেছে, কিন্তু এমন কতকগুলো খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে যেগুলো মা ছাড়া আর সবারই চোখ এড়িয়ে যায়। যেমন তার স্বাস্থ্যের কথা। তার মুখখানা যে

দিন দিন শুকনো হয়ে যাচ্ছে—মা ছাড়া কে তা লক্ষ্য করবে? আনেৎ ছেলের জামা-কাপড়গুলো দেখল, বহু জিনিসেরই অভাব। সে এই ভেবে খুশি না হয়ে পারল না, সিলভীর অতো কড়া নজরেও অনেক কিছু এড়িয়ে গেছে। তা ছাড়া আরো অনেক কাজ রয়েছে, ফ্লাটটা গোছাতে হবে। দু'বছর ধরে ধুলো আর পোকার আস্তানা হয়ে আছে। আনেৎ উঠে পড়ে লাগল ঘর গোছাতে। সিলভী যখনই আসে, দেখে, আনেৎ হয় বুনছে, নয় তো জিনিষপত্র সাজাচ্ছে। দু'বোনে রোজ সন্ধ্যেয় বসে বসে গল্প করে। মার্ক পাশের ঘরে লেখাপড়া করে, মাঝখানের দরজা খোলা। সে দরজা দিয়ে তাকিয়ে দেখে, কান পেতে শোনে। কিন্তু কথাবার্তার মধ্যে এমন কিছু পায় না যা তার ভালো লাগে। গোপন কথা বুঝি শেষ, এখন তারা মামুলী কথারই জাল বোনে। দিনের খবর, মেয়েদের নানা ব্যাপার, বোনার কথা, খাবারের দাম—এইসব। মার্ক ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, দরজা বন্ধ করে দেয়। এই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা কি করে বক্‌বক্ করে? সিলভীর পক্ষে তা না হয় স্বাভাবিক। কিন্তু তার মা, যে এইমাত্র জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এসেছে, কালই হয়ত আবার তাই করবে, যার বুকে লুকানো রয়েছে কত রহস্য—সে কিনা এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে! রুটির দাম, চিনি আর মাখনের নিয়ন্ত্রণ—একথা যেন তার সেই গোপন পৃথিবীর মতোই উদ্দীপনাময়। কি সে গোপন পৃথিবী—যার ভিতরে তার প্রবেশ নিষেধ—এমন কি উঁকি মারাও বুঝি নিষেধ! মার্ক ঈর্ষান্ধ হয়ে উঠল, সে প্রদীপের বুকে আলোর আভাস দেখতে পেয়েছে। উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে আনেৎ। আনেৎ কিন্তু টের পেল না তার নিজের এই দীপ্তি।

প্রদীপ তো জ্বলছে নিঃশব্দে। দিনের প্রখর আলোয় দেখা যায় না, কিন্তু তার আলাবাস্টারের ঢাকনার নিচে বাজপাখীর চোখ তো নিঃশব্দ শিখার একবার আভাস পেয়েছে। কোথা থেকে এল? কার জন্য জ্বলছে সে-শিখা—কার জন্য?

আর একটি আত্মা রাতে এই জোনাকির আলো দেখতে পেল। ঘাসের উপর পড়েছে আলো, নাচছে। সে আকৃষ্ট হোলো।

সে উরস্যুল বের্নার্দাঁ। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে আনেৎ তাকে বহুবার দেখেছে, কিন্তু লক্ষ্য করেনি। সে সেদিন সিঁড়িতে তার হাত ধরল। ভীরু

তার স্পর্শ। ফিসফিসিয়ে বলল : 'ক্ষমা করবেন মাদাম। আপনার ঘরে গিয়ে এক মিনিটের জন্য ক'টা কথা বলতে চাই।'

আনেৎ খুবই আশ্চর্য হোলো। সে জানত বের্নাস্তাঁ পরিবারের মেয়ে দু'টি ভারি লাজুক। তারা এতদিন তাকে এড়িয়েই চলেছে। সিঁড়ির আধো অন্ধকারেও সে দেখতে পেল, লজ্জা-রক্তিম হয়ে উঠেছে মেয়েটি! তার দস্তানা-পরা হাত কাঁপছে। আনেৎ কোমল স্বরে বলে উঠল : 'এস!'

মেয়েটি ভয় পেয়েছে। সে চলে যেতে চাইছে। তাই সে জানাল, আর একদিন না হয় আসবে। কিন্তু আনেৎ তার হাত ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে এল : 'এস! আর কেউ আসবে না এখানে।'

উরস্যুল বের্নাস্তাঁ এসে দাঁড়াল আনেৎ-এর ঘরে। নিশ্বাস তার যেন বন্ধ হয়ে এসেছে। চুপ করে সে দাঁড়িয়ে রইল।

খুব তাড়াতাড়ি উঠে বুঝি দম ফুরিয়ে গেছে। 'এই দেখো, আমি সব সময়েই ভুলে যাই! আমি সিঁড়ি দিয়ে যখন উপরে উঠি, দৌড়ে ছাড়া উঠতে পারি না। কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে। অন্যে তা পারবে কেন? যাক্ গে, বোসো! না, না, এই কোণটিতে এস—আলো থেকে দূরে এসে বোসো। ভালো লাগবে। কি, এবার দম ফিরে এসেছে? তাড়া তো নেই, একটু ধাতস্থ হয়ে নাও। ইস্ এখনো যা হাঁপাচ্ছ!'

সে মেয়েটির দিকে হাসিমুখে তাকাল, তাকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করল। কেমন জবুথবু হয়ে বসে আছে, বুক দুলছে ভাবাবেগে, মোটা কাপড়ে তৈরি পোশাকের নিচেও বোঝা যাচ্ছে। এই প্রথম আনেৎ তাকে ভালো করে দেখল। গ্রাম্য মেয়ের মতো। অবরোধে থাকার দরুন কেমন এক অপ্রতিভতা এসে দেখা দিয়েছে। গড়নও ভালো নয়। গ্রাম্য জীবনে একেই হয়ত সুশ্রী বলা যেত। খামারে গৃহপালিত জীবজন্তুর মাঝখানে একদল সতেজ ছেলে-মেয়ে নিয়ে সে সুখে থাকত, কাজকর্ম করে দিন কাটাত। এই নিষ্পাপ, স্বাস্থ্যের প্রভায় উজ্জ্বল তরুণীকে তো গ্রাম্য পরিবেশেই মানায়। সেখানে উঠবে কর্মের গুঞ্জন, গ্রীষ্মের রোদ তাকে স্নান করিয়ে দেবে, ঘাম ঝরবে তার কপাল থেকে—হাঁ, তার আকর্ষণ, তার রূপ তো সেইখানেই ফুটে উঠবে। কিন্তু হাসি আর রোদ এখানে তালাচাবি বন্ধ। উজ্জ্বল রক্তধারা ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ। আছে বোঁচা নাক, পুরু ঠোঁট, জবুথবু এক মেয়ে, সে নড়তে চড়তে সাহস করে না, এমন কি নিশ্বাস ফেলতেও বুঝি ভয় পায়।

মেয়েটি কিছু বলতে পারছে না। আনেৎ তাকে গোটা কয়েক মামুলী প্রশ্ন করল, এবার যদি সে প্রকৃতিস্থ হয়। উরস্যুল উত্তর খুঁজে পেল না। সে বিভ্রান্ত, তার কথার খেই গেছে হারিয়ে, চিন্তা এলোমেলো। সে তার মনের কথা বলতে চায়, কিন্তু সে-কথা মনে হতেই তার ভয় হচ্ছে। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, এখন শুধু ভাবছে : হা ঈশ্বর, এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি!

সে উঠে দাঁড়াল। 'মাদাম, আমাকে ছেড়ে দিন। জানি না আমার কি হয়েছে। আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য ক্ষমা চাইছি। সত্যি, কেন যে তখন সিঁড়িতে আপনার হাত চেপে ধরেছিলাম! আমাকে ছেড়ে দিন!'

আনেৎ হেসে তার হাত ধরল। 'আরে, একটু সুস্থ হয়ে নাও না। যত সময় লাগে লাগুক। তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ?'

'না, না…আমাকে ক্ষমা করুন! আমি চলে যেতে চাই। আমি বলতে পারব না—আজকে তো নয়ই…'

'বেশ তো, না-ই বললে। আমি তোমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করব না—ক'মিনিট বসে যাও। আমার ঘরে এসেছ, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়? আমিই বা দেব কেন? এতদিন পাশাপাশি রয়েছি, অথচ দু'জনে কখনো কথা বলিনি—ভারি আশ্চর্য তো! আর আমি বেশীদিন থাকবোও না। শীগগিরই চলে যাচ্ছি। একবার তোমার দিকে তাকালেও কি দোষ হবে? এস, এস, তোমার চোখ দু'টো ভালো করে দেখি! আমার দিকে তাকাও। কী, ভয় পাবার মতো কিছু পেলে নাকি?'

বিভ্রান্ত উরস্যুল ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে আনেৎ-এর কাছে তার এই ভীরুতা আর অদ্ভুত ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইল। একথাও সে জানাল, গতবার তাদের দুঃখের দিনে আনেৎ-এর সহানুভূতির কথাও সে ভোলেনি; সে তো কেঁদেছিল, ভেবেছিল আনেৎকে চিঠি লিখবে, কিন্তু সাহস করেনি। তার পরিবার অপরিচিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব পছন্দ করে না।

আনেৎ ঘনিষ্ঠ সুরে বলল : 'তা আমি জানি, আমি বুঝি…'

উরস্যুল এবার সাহস পেল, আমতা-আমতা করে আবার শুরু করল। তারপর বলে গেল, যুদ্ধের এই চার বছরের কথা। বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। এই দীর্ঘ চার বছরের ঘৃণা আর ঈর্ষান্ধতার কথা সে বলে গেল। সে আনেৎকে জানত না, তবু তার মনে হোলো তার কাছ থেকে সমর্থন সে পাবে।

আনেৎ কথা না বলে তার হাতখানা আলতোভাবে ধরল।

তার পরিবারে এমন কেউ নেই যাকে একথা বলা যায়। এমন কি তার বাবা-মাকেও না। তাঁরা ভালোমানুষ, কিন্তু এখন তাঁরা প্রতিশোধের কথাই ভাবছেন। (সে নিজের ভ্রম সংশোধন করল।) না, না! নিষ্ঠুর অমানুষিক দণ্ড! পুত্রের মৃত্যু তাদের পাগল করে দিয়েছে। 'শান্তির' নাম শুনেও তারা ক্ষেপে ওঠেন। ওদের মধ্যে সব চাইতে ভীষণ হয়ে উঠেছে জ্যুস্তিন। তারা ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে শোয়, একাত্মা তারা। রোজ রাতে জ্যুস্তিন ঘুমোবার আগে চিৎকার করে প্রার্থনা করে; হে ভগবান, হে কুমারী মেরী, হে সন্ত মাইকেল, ওদের শেষ করে দাও, একেবারে শেষ করে দাও! কী ভীষণ! তাকেও বাধ্য হয়ে প্রার্থনায় যোগ দিতে হয়। না দিলে ওরা অভিযোগ করে, বলে, দেশের দুর্দশায় সে উদাসীন, তার ভাইয়ের মৃত্যুও তার মনে দাগ কাটতে পারেনি। এত নিষ্ঠুর এত উদাসীন!

'উদাসীন—না, আমি উদাসীন নই। যে অসুখী, সে কি চায় অন্যে অসুখী হোক? আমার শুধু মনে হয় সে তা চাইতে পারে না—পারে না!'

সে তার চিন্তাধারা এমনি এলোমেলো ভাবে প্রকাশ করল, কিন্তু মর্মস্পর্শ করল বইকি। আনেৎ-এর কাছে একথা নতুন নয়। সে সায় দিল; আরো বিস্তারিত সে বলল। উরস্যুল চুপ করে শুনল, খুশি হোলো। তারপর জিজ্ঞেস করল: 'মাদাম, আপনি কি খ্রীস্টান?'

'না।'

উরস্যুল শিউরে উঠল: 'হা ঈশ্বর!···তাহলে তো আপনি আমার কথা বুঝতে পারবেন না···'

'বাছা, ভালো যা তাকে ভালোবাসতে বা বুঝতে খ্রীস্টান হবার তো দরকার নেই। মানুষ হলেই হোলো।'

'মানুষ! না, না, সে তো যথেষ্ট নয়। মন্দ দিকও তো মানুষের আছে। এই পুরুষদের কথাই ধরুন না! ওদের আমি রীতিমত ভয় করি, ওদের নিষ্ঠুরতা আর নীচতা দেখুন! যীশুর রক্ত ছাড়া এই পাপ মুছবে না, এই রক্তস্রোত থামবে না!'

'আমাদের রক্তেই চলবে—আমাদের সবার রক্তে—যারা ভালোবাসতে জানে, যারা—'

'হাঁ, যদি যীশুর নামে সে-রক্ত উৎসর্গীত হয়।'

'নামে কি আসে যায়!'

'এমনি যায় আসে না। কিন্তু এযে ভগবানের নাম—'

'প্রতি ভক্তের আত্মায় যদি তার অধিষ্ঠান না হোলো, সে কেমন ভগবান? এমন কি একজনের, হাঁ একজনের আত্মাও যদি তিনি অবহেলা করেন, তাহলে ভগবানের এলাকা যে সংকীর্ণ হয়ে আসবে! হৃদয় তখন ভগবৎ ঐশ্বর্যের পরিধি ছাড়িয়ে উপরে উঠবে!'

'না, না, তাঁকে ছাড়িয়ে কেউ যেতে পারে না, যা কিছু ভালো সবই তাঁর মধ্যে রয়েছে।'

'তাহলে যা কিছু ভালো আমি নিতে চাই—সেই তো যথেষ্ট।'

'কেউ ভগবানকে যদি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়, কে আমাকে ভালোর সন্ধান দেবে?'

'বাছা, তোমার কাছ থেকে তাকে আমি কেড়ে নিতে তো চাই না। তাকে জীইয়ে রাখো তোমার মধ্যে! তোমার মধ্যে তার বিকাশকে আমি শ্রদ্ধা করি। তুমি কি মনে কর, তোমার জীবনের প্রধান অবলম্বন আমি কেড়ে নেব?'

'তাহলে বলুন মাদাম, আপনিও তাঁকে বিশ্বাস করেন।'

'বাছা, যাকে আমি জানি না, কি করে বলব তাকে বিশ্বাস করি। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে দিয়ে মিছে কথা বলাতে চাও না?'

'না, না, মাদাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, তাঁকে বিশ্বাস করুন—এই আমার প্রার্থনা!

আনেৎ সস্নেহে হাসল: 'আমি কাজ করি, আমার বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই।'

'কাজ করাই তো বিশ্বাস।'

'বোধহয়। অন্তত আমার বিশ্বাসের পথ তো তাই।'

'কিন্তু যীশু যদি সে-পথে আলো না দেখান, কাজে আপনার ভুল হবে, হয়ত পাপ দেখা দেবে।'

'কিন্তু যারা পাপ আর ভুল থেকে বাঁচবার জন্য তাঁকে বিশ্বাস করেছে, এই চার বছরে যীশু তাদের জন্য কি করেছেন?'

'না, না মাদাম, ওকথা বলবেন না! আমি তো জানি, ক'জন খাঁটি খ্রীস্টান আছে! সেই তো বিপদ মাদাম! যাঁদের চিনি তাদের ভিতরে দু'জনও আছেন কিনা জানি না। সত্যি মাদাম, একথা ভাবলে আমার

বুক ভেঙে যায়; মনে হয় আমি মরে যাব। চারদিকে ভয় আর দুঃখ। এ জীবন তো দুর্বিসহ। এই মানুষগুলোকে আমি ভয় করি। এদের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আর তো এদের ভিতরে থাকা যায় না। কিন্তু কি করবো—আপনার মতো কাজের পথ আমার জানা নেই; সব রকম কাজই আমি ডরাই। এ পৃথিবীর জন্য আমি নই, তাই আমার ইচ্ছে কোনো কনভেণ্টে গিয়ে থাকব। বাবা অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু মা কাঁদছেন। বোনও আপত্তি করছে। কিন্তু আর এক মুহূর্তও এ পরিবারে থাকতে ইচ্ছে হয় না। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়, ওরা আমাদের প্রভু যীশুকে দুঃখ দিচ্ছে, তাঁকে অপমান করছে। হা ভগবান, এ আমি কি বলছি! মাদাম, আমার কথা বিশ্বাস করবেন না! ওরা খুব ভালো, আমি ওদের ভালোবাসি। ওদের বিচার করবার আমি কে? না, না, আমার কথায় কান দেবেন না। মাদাম, মাদাম, আপনি যদি খ্রীস্টান হতেন!…' সে হাতে মুখ ঢাকল।

আনেৎ তাকে সান্ত্বনা দিল। মায়ের মতো তার কাঁধে হাত রেখে বলল: 'আহা বেচারী, বেচারী আমার! হাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ।'

উরস্যুল মাথা তুলল। 'আমাকে আপনি দুষছেন না মাদাম?'

'না।'

'এদের ছেড়ে গিয়ে আমি ঠিকই করছি?'

'হাঁ, এর চাইতে ভালো বোধহয় আর কিছু নেই।'

'এই যে কাজ না করে আমি চলে যাচ্ছি, আপনার তাতে মত আছে?'

'এও তো কাজ বাছা। প্রতি মানুষেরই তো নিজের নিজের পদ্ধতি আছে। যারা প্রার্থনাকে কাজ বলে না, আমি তাদের দলে নই। যারা চিন্তার পবিত্র আগুনকে পাহারা দেয়, তাদের আমি শ্রদ্ধা করি। তারাই তো অসীম আর আমাদের ভিতরের দরজা খুলে রাখে। ওগো মেয়ে, আমরা যার কাজ করছি, তাদের জন্য তুমি প্রার্থনা কর। হয়ত আমরা সেই অন্ধ আর তুমি সেই পঙ্গু। আমরা কাজ করছি, আর তুমি পারছ না, তাই প্রার্থনা করছ—অসীমের সঙ্গে স্থাপন করছ আমাদের যোগসূত্র।'

উরস্যুল ঝুঁকে পড়ে তার হাতে চুমু খেল। আনেৎ তাকে জড়িয়ে ধরে দরজার কাছে নিয়ে এল। উরস্যুলের বুক ঠেলে বেরিয়ে এল দীর্ঘনিশ্বাস।

'মাদাম, সত্যি বলুন, কেন আপনি খ্রীস্টান হলেন না?' তারপর

সিঁড়ির কাছে গিয়ে আবার বলল: 'না, না, ভুল, আমার ভুল! আপনি খ্রীস্টান—খ্রীস্টান!'

'আমার তো মনে হয় না—' আনেৎ হাসল।

উরস্যুল-এর চোখদুটি জ্বলে উঠল: 'ভগবান তাঁর ইচ্ছে মতো মানুষ বেছে নেন। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবার তাঁর দরকার হয়নি!'

॥ এগারো ॥

আনেৎ চলে আসার পর থেকে ফ্রানৎস-এর চিঠি পায়নি। সে দুঃখ পেল বটে কিন্তু আশ্চর্য হোলো না। এর মানে সে জানত। খোকা অভিমান করেছে, তাকে শাস্তি দিচ্ছে। এমনি চুপ করে থাকাই তার অস্ত্র, সেই অস্ত্র দিয়েই সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। ভাবছে, এতেই আনেৎকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে। আনেৎ তার এই কৌশলে কেমন খুশি হোলো, ওকে (জব্দ করার জন্যেই) সেও না-বোঝার ভান করল। প্রতি সপ্তাহে সে চিঠি লেখে, তেমনি স্নেহভরা চিঠি, উত্তেজনা নেই। এদিকে নিজের কর্মপদ্ধতি সে বদলাল না। তাকে দেখবার ইচ্ছে তার হয় বইকি! কিন্তু পারীর কর্তব্য ফেলে যাওয়া অবিবেচনার কাজ হবে বলেই সে পারীতে রয়ে গেল। ভাবল, গ্রীষ্ম এলে মার্ককে নিয়ে সে পাহাড়ে হাওয়া পরিবর্তনে যাওয়ার ছলে বেরিয়ে পড়বে। আহা বেচারী মার্ক এতদিন তো বন্দীই আছে! কিন্তু সে যা ভেবেছিল তার চাইতে ভারী হয়েই চেপে বসল এই বিলম্বের বোঝা।

পারীতে আসার সপ্তাহের মাঝামাঝি এল ফ্রানৎস-এর চিঠি। অবশেষে এল চিঠি! আনেৎ হেসে ঘরের দরজা বন্ধ করে চিঠি পড়তে বসল। ভীষণ ভৎর্সনা আর ক্রোধের মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হবে এবার।

কিন্তু ফ্রানৎস ভৎর্সনা তো করেনি। রাগের উত্তাপও নেই চিঠিতে। ঠাণ্ডা ভদ্রতা ছেয়ে আছে চিঠি জুড়ে। সে ভালোই আছে। লিখেছে, পারীতে আনেৎ ক'দিন থাকুক—এমন কি অনুরোধও করেছে।

ফ্রানৎস-এর চিঠি যতক্ষণ এসে পৌঁছোয়নি, আনেৎ উদ্বিগ্ন হয়নি। কিন্তু চিঠিখানা পড়ে সে বিস্মিত হোলো, বিচলিত হোলো।

কেন যে বিচলিত হোলো সে নিজেই বুঝল না। তাকে অমন ধীর শান্ত দেখে তার তো সুখী হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু তা তো হোলো না। সেইদিনই চিঠির উত্তর না দিয়েও পারল না। তবে তার মনের ভাব সে লুকিয়ে রাখল বইকি! সে নিজেও কি তার মনের ভাব জানত? সে একটু ঠাট্টা করেই লিখল: 'যখন সে তাকে দেখবার জন্য তেমন উৎসুক নয়, সে ঠিক করেছে, বছরের শেষে ছাড়া ফিরবে না।' উত্তরের সে প্রতিবাদ আশা করেছিল। কিন্তু প্রতিবাদ এল না। আর চিঠিই এল না।

আনেৎ এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। গ্রীষ্মকাল না আসা পর্যন্ত সে সপ্তাহ গুনতে শুরু করে দিল। মাদাম ত্ব ভিণ্ডেরগ্রুন-কে চিঠি লিখল, ফ্রানৎস স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঠিক লিখেছে কিনা এই ছলেই সে লিখল চিঠি। মাদাম উত্তরে লিখল যে, তাদের প্রিয় মঁসিয়ে ত্ব ফ্রানৎস বেশ ভালোই আছেন। আর সেই দুঃখ—ভগবানের দয়া বলতে হবে—সে-দুঃখ উবে গেছে···এই বয়সে তাইত স্বাভাবিক। বেশ চমৎকার লোক মঁসিয়ে, ভারি আমুদে—তিনি এখন তাঁদের সঙ্গে একই বাড়িতে আছেন। তাঁরাও তাঁকে নিজেদের পরিবারের একজন বলেই মনে করেন।

আনেৎ নিশ্চিন্ত হোলো বটে, কিন্তু এতখানি নিশ্চিন্ততা তার ভালো লাগল না। সে-রাতে তার ভালো ঘুম হোলো না। পরের কয়েকটা রাতও একই ভাবে কেটে গেল। সে ঘাড় নেড়ে কি একটা চিন্তা যেন দূর করে দিতে চাইল মন থেকে। কিন্তু সেই বোবা চিন্তা ফিরে ফিরে এল। আর এক সপ্তাহ কাটল নিজের আত্মসম্মানের দোহাই পেড়ে। তারপর সে ঠিক করল রওনা হবে। নিজেকে যুক্তি দিয়ে সে বোঝাল না। তাকে যেতে হবে।

এই কদিনে মার্ক তার মার সান্নিধ্যে আসতে চাইল। এক তীব্র ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসল। প্রথম সপ্তাহ তার বৃথা গেছে। সুযোগের আশা সে করেছিল, কিন্তু সুযোগ আসেনি, সে সুযোগ সৃষ্টি করতে উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু দু'জনেই যখন ছল করে, তখন তা সম্ভব। কিন্তু এখানে সে একা। তার মার তো খেলায় মনই নেই। তবু সে ছাড়ল না। সারাক্ষণ তার পাশে পাশে রইল, তার একটু চাহনির জন্য ব্যগ্র হোলো—আশায় আশায় রইল। আনেৎ দেখলনা তা নয়। হয়ত দেখে তাকে কোন সুদিনের

জন্য জীইয়ে রেখে দিলে মনের কোঠায়, যখন সময় হবে তখন ব্যবহার করবে—এখন থাকনা লেখা হয়ে। সময় তার নেই, মন এখন পরিপূর্ণ। মার্ক বৃথাই চেষ্টা করল, ভগ্নোৎসাহ হোলো। শুধু একজন এগিয়ে এসে কি করবে? আর একজনকেও তো আসতে হবে। না, না, সে তো আসবে না! মার্ক আশা ছেড়ে দিল। সে যখন তার জামায় বোতাম লাগিয়ে দেয়, মার্ক ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। (সে মার্কের কাজ নিয়েই ব্যস্ত, অথচ ভাবছে অন্য কথা। সে চায় মা তার কথাই ভাবুক, অন্য সব কিছু যাক না ভেসে!) সে মার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকে দেখে। কিসের জন্য তার এই দুশ্চিন্তা? কার স্মৃতি তার গাল দু'খানা চুপসে দিয়েছে? তার চামড়ার নিচে কার ছায়া নদীর মতো বয়ে চলেছে? অন্য সময়ে আনেৎ শত চোখ মেলে তার দৃষ্টি গ্রাস করত, কিন্তু এখন তো তার সে-চেতনা নেই। সে আঙুল দিয়ে কাজ করে, কিন্তু আধো ঘুমন্ত যেন। নিস্তব্ধতা যখন অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে, সে তাকে মামুলী দু'একটা প্রশ্ন করে—ছেলের কাছে মার চিরাচরিত প্রশ্ন মাত্র। মার্ক যখন উত্তর দেয়, তখন তার মন আবার দূরে চলে গেছে—উদাসীন ভাবেই মাথা নাড়ে। অথবা তাকে বেড়িয়ে আসতে বলে। 'এত চমৎকার দিন, ঘরে বসে না থেকে বেড়িয়ে আসাই উচিত।' মার্ক তখন বেড়াতে চায় না, চায় কথা বলতে, কিন্তু তাকে উঠে পড়তে হয়। অথচ তাকে ভর্ৎসনা করবারও সে কিছু খুঁজে পায় না। সে তো তার সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করে, তবে কেমন যেন উদাসীন—কেমন এক ব্যবধান তাদের ভিতরে। সে তাকে জড়িয়ে ধরে ঝাঁকুনি দিতে চায়, চায় তার গাল কামড়ে দিতে, কানের লতি ছিঁড়ে নিতে; সে কাঁদাতে চায় তার মাকে। সে বলতে চায়: 'মা, মা, এই তো আমি! আমাকে হয় জড়িয়ে ধর নয় তো আঘাত কর! ভালোবাস নয় তো ঘৃণা কর! কিন্তু এখান থেকে চলে যেও না! এস, আমার কাছে এস…'

কিন্তু মা তো আসতে চায় না।

এবার সে ঠিক করল, মাকে রবিবার সন্ধ্যেয় সে জানাবে তার এই অভিযোগ। খাওয়া-দাওয়ার পরই জানাবে।

ঠিক রবিবার সকালে আনেৎ তাকে জানাল, সে চলে যাচ্ছে। বাক্স সে এরই মধ্যে গুছিয়ে রেখেছে। একটু অপ্রতিভ হয়ে সে বলল, একটা জরুরী

খবর আসায় তাড়াতাড়ি তাকে সুইজারল্যাণ্ড চলে যেতে হচ্ছে। আর কিছু সে তাকে জানাল না, মার্কও জিজ্ঞেস করল না। সব কিছু তার গোলমাল হয়ে গেল।

এক সপ্তাহ ধরে এই দিনটারই সে আশা করেছিল। এরই জন্য ভালো করে ঘুমোতে পারেনি; সেদিন কি বলবে বারবার আউড়েছে। আর এখন···বলবার আগেই সে চলে যাচ্ছে! তাড়াতাড়ি সে কি করে বলবে তার কথা? সময় চাই, চাই সন্ধ্যের আঁধার। যখন সে তার ভাবনা সাজিয়ে গুছিয়ে নেবে আর তাকে পাবে একা—একা। এখন এই যাবার তাড়ায় কি করে সে শুনবে? তার দৃষ্টি তো এখন ঘড়ির কাঁটার দিকে। সে তো বারবার সেই দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে উঠবে।

কিন্তু নিজের অনুভূতি দমিয়ে রাখবার শিক্ষা সে পেয়েছে, তাই সে খবরটা শুনে একটুও আশ্চর্য হোলো না। অথচ অভিভূত সে হোলো বইকি। মাকে জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করল। তারপর শেষ মুহূর্তে সে উদাসীন স্বরে বলল (সে নিজেই তখন তার স্বর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, সেখানে একটুও উচ্ছ্বাস নেই): 'তুমি তো ছুটিটা এখানেই কাটাবে বলেছিলে মা। তিনমাস আগেই চলে যাচ্ছ, আমাকে এমনি করেই বঞ্চিত করলে তোমার সঙ্গ থেকে?'

এই চিন্তাই তার মনে ঘোরাফেরা করছিল—এই তিক্ত চিন্তা।

আনেৎ প্রতারিত হোলো। এ বিদায়ের সময় পারিবারিক ভদ্রতা ছাড়া কিছুই নয়। যখন জানে সে রওনা হচ্ছে, তখন থেকে-যাওয়ার কথা তোলা তো গতানুগতিক ভদ্রতা। সে নিজেও সৌজন্য বজায় রেখেই বললে: 'না, বঞ্চিত করছি না, এই তিনমাস তোমাকে উপহার দিয়ে গেলাম—নিজের ইচ্ছে মতো যা হয় কোরো।'

মার্ক আঘাত পেল, কিন্তু উত্তর দিল না। এখন আর লাভ কি? ছ'মাস আগে সে যা ভাবত, তার মা আজ তারই প্রতিধ্বনি করছে। অথচ সে তো জানে না, এই ছ'মাসে সে কতখানি বদলে গেছে!

আনেৎ পরে সেকথা ভাবল বইকি। ট্রেনের কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে মার্ক তাকেই দেখছিল, তার মুখ গম্ভীর। সিলভীও ছিল। অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল। আনেৎ উত্তর দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তাকাচ্ছিল মার্কের দিকে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মার্ক—তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। সে এই দৃষ্টি ভুলতে পারেনি। যখন ট্রেন ছেড়ে দিল—অস্পষ্ট দু'টি মূর্তি সে দেখতে পেল—একজন

শুধু হাত নাড়ছে। তারপর রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল তারা। সে-স্মৃতি সে ভুলতে পারল না, রইল তার মনে।

মার্ক মাসীর সঙ্গে বাড়ি ফিরে চলল। মাসী নিজের মনে বকতে বকতে চলল, মার্ক আছে একথা যেন ভুলেই গেছে। তাকে সে মানুষ বলে গ্রাহ্যই করে না এমনি তার স্বভাব। সে বলল: 'জানো, আজকাল আর ওর আমরা কেউ নই। এখন অন্যের ধ্যান করছে। কি নিষ্ঠুর মন!'

মার্ক সিলভীর কথা সহ্য করতে পারল না। সে তাকে থামিয়ে দিল: 'ওর যা ইচ্ছে তাই করবে!'

এবার সে সিলভীর কাছ থেকে শুনল বন্দীর কথা। সিলভী আর সবার মতোই ভেবেছে, এই দুঃসাহসিকতার মধ্যে জড়িয়ে আছে প্রেম। সে কিন্তু বিশ্বাস করতে চায় না, তার মনে হয়, এই দুঃসাহসিকতার কারণ প্রেমের অনেক উপরে। সিলভীর ব্যঙ্গে সে দুঃখ পেল। তার মা সীজারের স্ত্রীর মতোই সন্দেহের ঢের উপরে। কিন্তু সে আলোচনা করতে চায় না, তার মা যাই করুক না, সে তার পক্ষই নেবে।

'হাঁ, তার ইচ্ছে···আমরা তো তার কেউ নই। সে-দোষ তো আমারই। আমি তাকে হারিয়েছি।'

কিন্তু স্বীকারোক্তির পর মানুষ আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বলে: 'যা হারিয়েছি—আজই হোক, কালই হোক, ছলে বলে তা উদ্ধার করবই!'

॥ বারো ॥

পৌঁছানো অবধি আনেৎ শান্তই ছিল। তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে দুশ্চিন্তা দূরে সরিয়ে রাখার শক্তি দিয়েছে। সে তাদের দমিয়ে রাখে না, স্থগিত রাখতে পারে। তাই পৌঁছনোর আগে কোনো দুশ্চিন্তাই তার মনে আসেনি। সে জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল তার অতি পরিচিত ছোট্ট স্টেশনটি এগিয়ে আসছে। সব কিছু ঠিক তেমনই আছে—ঠিক তার এখান থেকে যাওয়ার দিন যেমন ছিল। কিন্তু তাই কি? স্টেশনটি তো তেমনিই আছে, কিন্তু সে তো নেই, সে আসেনি।

সীমান্তে আনেৎ পৌঁছবার খবর দিয়ে তার করেছিল। কিন্তু আজকাল যুদ্ধের দিনে দেবদূত মার্কারীর পাখাওলা জুতোর তলায় সীসে দেওয়া। তাছাড়া ওর উপর তো কিছুই ভরসা করা যায় না! আনেৎ আশ্চর্য হোলো না, কিন্তু একটু হতাশ হোলো।

বাড়ির পথে সে রওনা হোলো। মাঝ পথে সে দেখতে পেল, ফ্রানৎস আসছে। আনন্দে নেচে উঠল তার মন, কিন্তু পরক্ষণেই উবে গেল আনন্দ। ফ্রানৎস একা নয়, মাদ্‌মোয়াজেল ভিঙেরগ্রুনও সঙ্গে আছে। ফ্রানৎস এগিয়ে এসে আনেৎ-এর হাতে চুমু খেল, দেরি হয়ে গেছে বলে চাইল ক্ষমা। আনেৎ তাকে ঠাট্টা করল, তারপর কেমন অপ্রতিভ হয়ে গেল। একজোড়া চোখ তাকে দেখছে। সে এবার ফিরে তাকাল কুমারী ভিঙেরগ্রুন-এর দিকে। ঋজু দেহ, গর্বিত মেয়েটি তাকেই দেখছে—মনে হচ্ছে সে যেন তার মালিকানা স্বত্ব জাহির করছে। তার কঠিন নীল চোখে পড়ছে আনেৎ-এর এই অপ্রতিভতা। অদ্ভুত হাসি হেসে তারা পরস্পরকে সম্ভাষণ জানাল, দু-একটা কথাও হোলো। আবার তারা রওনা হোলো।

ওরা কথা বলছিল। আনেৎ বুঝতে পারল না কি নিয়ে ওরা কথা কইছে—শুধু বুঝল ঘনিষ্ঠ ওদের সম্পর্ক। বাড়ি পৌঁছে ওরা কি একটা ছুতো করে আনেৎকে একা রেখে চলে গেল—এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়—আনেৎ তো এখন বিশ্রাম করবে। ফ্রানৎসও তাই বলে বিদায় নিল। অতি বিনীত, অতি ভদ্র ফ্রানৎস! আবার বিকেলে মাদাম ছ ভিঙেরগ্রুন-এর বাড়িতে দেখা হবে। তিনি সান্ধ্য ভোজে আনেৎকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

শোবার ঘড়ে এসে আনেৎ দাঁড়াল আয়নার সুমুখে। টুপী আর ভ্রমণের পোষাক তখনও সে ছাড়েনি। সে নিজের ছায়া দেখল আয়নায়—ভালো করে বুঝি দেখতেও পেল না। ভাবনা তার মনে, না, ভাবনাও তো নয়। অপ্রতিভ হাসি হেসে তার এই সম্মোহিত ভাব সে ঝেড়ে ফেলে দিল, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য—আবার ভাবনা তাকে ছেয়ে ফেলল। আয়নার সুমুখ থেকে এবার গিয়ে সে দাঁড়াল জানালার পাশে, তাকিয়ে রইল পাহাড় আর আকাশের দিকে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। খুলল না টুপী আর দস্তানা। হঠাৎ নেমে এল এক গভীর ক্লান্তি। কেমন একটা শূন্যতা যেন—ভিতরটা যেন ফাঁক হয়ে গেছে। না, না, আজ আর ভাবনা নয়, কাল—কাল সে ভাবনার জাল বুনবে—কিন্তু আজ নয়।

কিন্তু রাতে ভোজের পর ফিরে এল ভাবনার স্রোত। অন্যের কাছ থেকে তার মনের ভাবনা লুকিয়ে রাখবার কথা সে ভাবল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল সে-স্রোত। ওদের ভদ্র কথাবার্তা কত ভারী হয়েই না চেপে বসল তার মনে! ওরা জিজ্ঞেস করল পারীর কথা, সেখানকার আবহাওয়া এখন কেমন— ফ্যাসান, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য, যুদ্ধের স্থায়ীত্ব—এমনি নানা কথা ঘুরে ফিরে এল। কথার পর কথা চলল, শুধু মনে হোলো ফ্রানৎস ছাড়া সবাই কি যেন লুকিয়ে রাখতে চাইছে। ক্ষণে ক্ষণে তার চোখ পড়ল কুমারী ভিগুেরগ্রুন-এর চোখে। মেয়েটি চেয়ে আছে তারই দিকে। তার মুখের প্রতি বলিরেখায় সে যেন কি খুঁজছে। কিন্তু যা চেয়েছিল তা বুঝি খুঁজে পেল না। যুদ্ধের উন্মাদনায় আনেৎ-এর ক্লান্তি দূর হয়ে গেল, আবার ফিরে এল তার রঙের ঔজ্জ্বল্য। মৃদু সোনালী সে-রং। সে হাসল, আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল, এল নবজীবনের জোয়ার। মনে হোলো মেয়েটিই যেন তার তুলনায় অনেক বুড়ো হয়ে গেছে, ওর দেহের সে-উজ্জ্বলতা আর নেই। ওর গর্বের স্থান নিয়েছে এক কাঠিন্য। তারই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইছে ও, কিন্তু অতিরিক্ত ব্যবহারে সব কেমন গুলিয়ে গেছে।

ফ্রানৎস-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেমন অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা দেখাচ্ছে মেয়েটা। আনেৎ একটু ভ্রূ কোঁচকাল। এরিকার (মেয়েটির নাম) চোখ এড়াল না। এবার ওর জিৎ। কিন্তু দ্বিতীয়বারও ওকে জিততে হবে। টেবিল ছেড়ে উঠবার সময় ও একটা ভুল করে বসল। আনেৎ-এর কাছ থেকে বিভ্রান্ত ফ্রানৎসকে ও ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ফ্রানৎস তখন আনেৎকে দেখছিল, যেন সে তাকে আবিষ্কার করছিল। পাশের ছোট ঘরটায় নিয়ে গিয়ে ও তাকে দখল করে বসল। আনেৎ এরিকাকে লক্ষ্য করছিল, এবার তার মা এসে হাজির হলেন। মেয়েটি ফ্রানৎস-র গায়ে পড়ে কানে কানে কি যেন গোপন কথা বলবার ভান করছে, ঘন হয়ে বসে আবার টেরচা চোখে তাকাচ্ছে আনেৎ-এর দিকে। মাদাম ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন: 'কি ছেলেমানুষ ওরা! কেউ কারুকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারে না…'

তিনি এবার আনেৎকে ফ্রানৎস-এর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তার আয়; তার পরিবারের কথায় এসে গেলেন। আনেৎ শান্তভাবেই জবাব দিল, কিন্তু ভিতরে সে ক্রোধে জ্বলছিল। অদ্ভুত মিষ্টি স্বরে সব কিছু বলে গেল, তার ভিতরের ঝড়ের গর্জনকে উপেক্ষা করেই। কথা বলতে বলতে সে পিয়ানোর

উপরে ফটোখানা দেখতে গেল। পিয়ানোর ঢাকনিটা খুলে দেখল, যেন সে পিয়ানো-নির্মাতার নাম পড়ছে; হাত দিয়ে ঘাটগুলো টিপল, আঙুল বুলিয়ে গেল। শুধু ঘাটগুলোই কি বেজে উঠল? না, না, তিনজনেই পেল আঘাত—বুকের ঘাট বেজে উঠল তাদের। হঠাৎ অনধিকার প্রবেশকারী এসে যেন তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলছে: 'আমি, আমি এসেছি!'

এক উদ্ধত দমকা হাওয়া: তিনটি চড়া সুরের সমন্বয়: তিনটি আকাঙ্ক্ষাময় তীব্র আর্তনাদ। তারপর বিরতি আর ক্রন্দন, চূড়া থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে শূন্য আকাশে একদল মেঘের মতোই যেন ছড়িয়ে পড়ল, এক যাদু-জালের ফুটোয় ফুটোয় বন্দী হয়ে রইল আত্মারা। জাল তলিয়ে গেল।

ওদের ধরতে গিয়ে ধরা পড়ল আনেৎ নিজে। গর্জমান গহ্বরের উপর ঝুঁকে পড়ে সে শুনল: তার চিন্তাহীনতা যে সুরের জন্ম দিয়েছে, সে বুঝি মান্‌ফ্রেড। এখন তারই মুখপাতের বাজনা শুরু হয়েছে।

ফ্রানৎস সে-সুর শুনে ছুটে এল। উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে সে সংগীতজ্ঞ, প্রকৃতিতেও তাই। সংগীতের আহ্বান সে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। তার মনের গভীরে সাড়া জাগল, সে তাকিয়ে রইল এই মায়াবিনী সার্সির দিকে। সার্সি আত্মাদের আহ্বান জানাচ্ছে।···

আনেৎ বহুদিন বাজায়নি। যৌবনে সে ছিল সংগীতের সমঝদার, তারপরে পুরনো পিয়ানোটা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। তারপর সেই দুর্দিন, তখন শুধু অবিশ্রান্ত খেটেছে, পিয়ানো সাধবার সময় হয়েছে খুব কম। যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে তো তার কেমন সংগীতের উপর বিতৃষ্ণা এসে গেছে। তার মনে হয়, সুরের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে সে বিশ্বের দুঃখের কাছে অপরাধী হয়েছে। এখন পিয়ানো খুলতে গেলে, সে চারিদিক দেখেশুনেই খোলে—মনে হয় এ যেন দেহের কামনার মতোই লালসাময়। কিন্তু সংগীতের মোহ আরো যেন বেড়ে গেছে, সে তাকে ঘৃণা করে বলেই বুঝি এত বেড়েছে। আজ এই মুহূর্তে সংগীত যেন তাকে অভিভূত করে ফেলল; বাঁধ-ভেঙে গেছে, সে যেন প্রেমিকের আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছে, দেহ তার নির্জীব, মুখ জ্বলছে এক অননুভূত তৃষ্ণায়। ধারা নেমেছে সংগীতের, তারই বুকে ঝরে পড়ছে ধারা, তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে; সে শুধু এইটুকু বুঝতে পারছে তীর সরে যাচ্ছে দূরে, আছে ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত, মাথা ঘুরছে। দেহ তার বন্দী, পঙ্গু; তার স্বাধীনতা এখন শুধু দুই চোখের ভাবভঙ্গীতে।

তার এই কঠোর ভাবভঙ্গী যেন স্বরগ্রামের ঢেউ থেকে উঠে এল ; চারিদিকের মুখের সারের উপর দিয়ে বয়ে গেল ঢেউ। ওরা তাকিয়ে আছে তারই দিকে। ফ্রানৎস ভাবাবেগে উদ্বেল, চমৎকৃত। মেয়েটি ভয়ে আর ক্রোধে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে, আর হতবুদ্ধি মা বুঝতে চাইছেন সংগীতের মর্ম। আনেৎ-এর চোখ ওদের পাঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখছে, আর হাতে চলেছে বাজনা। তারই ভিতর দিয়ে আত্মার কোটরের শয়তান যেন কথা কয়ে উঠল।

প্রস্তাবনার সেইখানে সে এল, যেখানে এই শোকগাথার ভিতরে আসে এক জ্বরের ঘোর, যেখানে লয় হয়ে আসে দ্রুত, কামনা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, সংগীতের বিস্তার ঘোষণা করে বন্যার খরপ্রবাহ—ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন বাঁধ ভেসে যাবে, আনেৎ থেমে গেল। তার আঙুলগুলো চাবির ভিড়ে গেল থেমে, সংগীতের আত্মারা তখনো নিস্তব্ধতায় পলায়মান। এবার শুধু প্রতিধ্বনির রেশটুকু আছে, হঠাৎ সেও পাখা গুটিয়ে লুটিয়ে পড়ল। আনেৎ উঠে পড়ল, নিজেকে হাসির বস্তু বলেই তার মনে হোলো।

ফ্রানৎস উদ্বিগ্ন ব্যগ্রস্বরে তাকে আবার শুরু করতে বলল, মাদাম নিরুত্তাপ ভদ্রতা সহকারে পেড়াপীড়ি করলেন, এরিকা রইল নীরব। আনেৎ-এর মুখে দুষ্টুমির ছোপ, ঠোঁঠ তার ঈষৎ বাঁকানো। আনেৎ তাদের দিকে তাকিয়ে বলল : 'বাড়ি যাচ্ছি। আজ বড় ক্লান্ত।' তারপর বাধ্য ফ্রানৎস-এর দিকে তাকিয়ে বললে : 'তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে চল !'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে দেখল, মেয়েটির চোখে দুশ্চিন্তা আর ঘৃণার ছায়া। নক্ষত্রের আলোয় তারা চলল পাশাপাশি। কেউ কথা বলল না। সংগীতের সাগর বুঝি তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সামনে তাদের অনন্ত বিস্তৃতি। এবার তারা এসে পৌঁছল আনেৎ-এর বাড়ির দরজায়। অন্ধকার···তারা যেন অন্ধকারেরই এক অংশ···ফ্রানৎস বিড়বিড় করে বলল : 'শুভরাত্রি !'

তারপর এক চলমান ছায়া তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, মুখে মিলল মুখ।

আনেৎ মিলিয়ে গেছে। বন্ধ দরজার সামনে সে একা। রাতের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সে বাড়ি ফিরে চলল।

সিঁড়ি বেয়ে আনেৎ উপরে উঠে এল। কিছুই সে ভাবতে পারল না। তার মন ফাঁকা—কোন চিন্তাই তার নেই।

ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। সে ক্লান্ত ; তার বুকে যেন চেপেছে জগদ্দল

পাষাণ। রাতের জমাট আঁধার যেন ধেয়ে এসে বাসা বেঁধেছে তার মনে, তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। অন্ধকার, চারিদিকে শ্বাসরোধকারী অন্ধকার। ঘরে এসে পোশাক খুলে ফেলল, হাত যেন নড়তে চায় না এত ভারী, তবু তাড়াতাড়িই সে খুলল। পোশাক পরে রইল মেঝেয়, তুলে রাখতে ইচ্ছে নেই। আলো নিবিয়ে দিয়ে বালিশে মাথা রেখে চেয়ে রইল অন্ধকার আকাশের দিকে। একটা তারা কালো আকাশের বুকে মিটমিট করছে আর তার বুকে বিজলী ঝলকের মতো পুরনো স্মৃতির দীপ্তি। অতীত—এই নিরাবয়ব রাতের অন্ধকারে অতীত ফুটে উঠছে চোখের সুমুখে। পাথর যেমনি করে ধ্বসে, খসে পড়ে… সে তেমনি করে গড়িয়ে পড়ছে…

কিন্তু মুহূর্তে (সত্যই কি মুহূর্ত?) হৃদয়ের ব্যথা চেতনাকে হঠাৎ উদ্বুদ্ধ করে তুলল। সে ফিরে পেল নিজেকে, উঠে বসল বিছানায়, বুক চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল: 'না না, এ সম্ভব নয়!…'

কি সম্ভব নয়? বুকের তোলপাড় শান্ত না হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল। এবার শান্ত, আবার ধুক্‌ধুক্ করে চলছে—স্বাভাবিক গতি। দিগন্তে মিলিয়ে গেছে তারাটি—তার ক্ষণিক দীপ্তি বুঝি এখনো পাহাড়ের শিখরে আকাশে দেখা যাচ্ছে। পেষণে তার বুক ক্ষতবিক্ষত, সে ককিয়ে উঠল ব্যথায়। 'না, না, এ সম্ভব নয়!'

কি সম্ভব নয়? সে জানে…

'কিন্তু নিজেকে আমি কি তখন প্রতারণা করলাম? আবার জড়িয়ে পড়লাম? আবার?…ওকে কি আমি ভালোবেসেছি?'

মাতৃস্নেহের ছলে সে এতদিন নিজেকে ভুলিয়ে এসেছে—এবার সে দেখতে পেল তার মুখোশের আড়ালে কি আছে। তাহলে ওরা ঠিকই বলেছে। মার্সেল, সিলভী, পারীর নাগরিক-নাগরিকারা এই উৎসর্গের আড়ালে পাপ আগেই আবিষ্কার করেছিল!

'কিন্তু ভগবান জানেন, আমি নিজের কথা ভাবিনি। আমি কিছু আশা করে নিজেকে উৎসর্গ করিনি; নিজে ছিলাম সম্পূর্ণ নিরাসক্ত—অন্তত তাই তো তখন ভেবেছিলাম! আর স্বার্থপরতা চোরের মতো এসে ঢুকল! আমি তো দোষের ভাগী! ঘুমের ভান করেছিলাম। কামনার লঘু চঞ্চল পদক্ষেপ শুনতে পেয়েছিলাম। তখন নিজেকে এই বলে বুঝিয়েছি: ওকে ওর নিজের জন্যই ভালোবাসি, আমার জন্য তো নয়। কিন্তু আমার স্বার্থেই তো ভালো

বাসলাম! ওকে চাইলাম আপন করে নিতে—হাঁ চাইলাম বইকি! হায় অদৃষ্টের কি পরিহাস! 'আমি' কে? কে 'আমি' যে চাইলাম? আমার এই পাকা চুল নিয়ে, পথের ধুলো-মাখা এই দেহ নিয়ে, আর নিষ্ফল অভিজ্ঞতা এবং দুঃখ নিয়ে যাকে চাইলাম, সে আমার চাইতে বিশ বছরের ছোট! সে নিজেও বুঝতে পেরেছে এই বৈষম্য! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা!'

লজ্জায়, অপমানে সে অভিভূত হয়ে গেল, কিন্তু তবু ক্রোধভরে তুলল তার মাথা। '...কেন? আমি কি এই-ই চেয়েছিলাম? এই কি খুঁজেছিলাম? কেন আমি আক্রান্ত হলাম? কেন জ্বলছি? কেন এই প্রেমের তৃষ্ণা, কেন এই ক্ষুধার্ত কামনা? কেন আমার মন এমন কাঁচা রইল, অথচ দেহ গেল বুড়িয়ে?' সে জোরে বুক চেপে ধরল।...মাকড়সার মতো প্রকৃতি তোমাকে জড়িয়ে ধরেছে, তাকে আঘাত করবে কি করে? সে চাইল নিজের দেহে তাকে পিষে মেরে ফেলতে। কিন্তু সাগর কি তুচ্ছ জালে ধরা পড়ে!

সে বিদ্রোহ করল। 'হাঁ, ভালোবাসি...আমি ভালোবাসি...এখনো ভালোবাসতে পারি! ঐ ঈর্ষান্ধ মেয়েটার ভয় আমাকে সেকথা মনে করিয়ে দিয়েছে। ওকে আমি গ্রাস করেছি, আমি ওকে ধরে রাখব। ও আমার হবে কি না—সে তো আমার ইচ্ছা। হাঁ, আমার ইচ্ছা বইকি! আমি ওকে ভালোবাসি। এ আমার স্বাধিকার।'

স্বাধিকার! শব্দটার নিরর্থকতা হঠাৎ তার মনে পড়ল। অধিকার তো মানুষের তৈরি রূপকথা, সমাজের বুনানো কথার এই জাল প্রমিথিউসের যুগ থেকে চলে আসছে। এ বিদ্রোহী দাসের রক্তপতাকা—চিরদিনই তার পরিণতি এনেছে ধ্বংসে। যে সবল দুর্বলকে পিষে ফেলছে, এ তো তারই এক ভণ্ডামি। দুর্বল লুটিয়ে পড়ছে তার আঘাতে, আর সবল দুর্বলের আঘাত নেবার জন্য বুক পেতে দাঁড়িয়ে আছে!...না না, প্রকৃতির রাজ্যে অধিকার বলে কিছু নেই। লাখো লাখো জীবিতের ওপর এক উদাসীন শক্তির আধিপত্য চলছে। আনেৎ তো লাখো লাখো মানুষের মতো তারই এক শিকার। সে তার এই পরাজয়কে একদিন, কি এক ঘণ্টার জন্য মাত্র দূরে সরিয়ে রাখতে পারে—অন্যের প্রাণের বিনিময়েই তা করতে হবে, কিন্তু তারপর তো আনবে পরাজয়। অন্যের প্রাণের বিনিময়ে এই দূরে সরিয়ে রাখা কি নিরর্থক নয়?

সে চিৎকার করে উঠল: 'কেন তা করব না? এক দিন, এক মুহূর্তের, এক লহমার এই অধিকার—এ কি কিছুই নয়? অসীমকে তো সেই

এক মুহূর্তেই পাব, বিশ্বকে পাব একজনের মাঝে। আর প্রতিদ্বন্দ্বীর সেই দুঃখ—সে কি কিছুই নয়—সে-প্রতিশোধে কি তৃপ্ত হব না? কিছুই নয়—যে-মুখ দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল, অপর স্ত্রীলোক যাকে চুরি করে নিয়ে গেল—সে কি কিছুই নয়? না, না, সেই তো তৃপ্তি। ওর পালা এবার, ওর কাছ থেকে চুরি করে নেব, ওকে দুঃখ দেব, ধ্বংস করব!'

এক ঝাঁক বুনো পাখী কর্কশ চিৎকার করতে করতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গর্ব, ঈর্ষা আর প্রতিশোধের এই চিৎকার। তাদের পাখার ঝাপটানি আর কর্কশ স্বরে কিছুই শোনা যায় না কোথা থেকে এল ওরা?

'ওরা কি ছিল আমারই মনে?'

ভয় আর গর্ব দুই অনুভূতি একই সঙ্গে দেখা দিয়েছে; গলানো সীসের জ্বালা দেহে; দুঃখের আনন্দে এসেছে মূর্চ্ছা—জমাট—জমাট দুঃখ। কিন্তু পাখীগুলোকে তাড়াবার চেষ্টা সে করল না। কিছুই করবার মতো শক্তি তার নেই। সে মাঠে পড়ে আছে, মৃত্যু তার আসন্ন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তাকে নিয়ে পাখীগুলো ঝগড়া করছে। সে তো তাদের শিকার। দু'ঝাঁক পাখী—পরস্পরের শত্রু তারা, সমান তাদের শক্তি—এক দলের অধিকারের ক্ষুধা আর এক দলের আত্মোৎসর্গ। উৎসর্গেরও তেমনি ধারালো নখর, তেমনি সর্বগ্রাসী হা; ভালো আর মন্দ দুই-ই মিশে আছে (কোনটা ভালো? কোনটাই বা মন্দ) দু'জনেরই তো দুর্দম নিষ্ঠুরতার চাপরাস।

হাতে হাত চেপে, উলঙ্গ হয়ে গা এলিয়ে দিয়েছে সে। এক ছিন্নভিন্ন পশু যেন। শকুনীরা অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরছে মাথায় উপরে। সে তাকিয়ে রইল, নিজের মনের অন্তস্তলে তাকিয়ে দেখল। ভয় বা কামনা বাধা দিতে পারল না, সে তার নিজের নগ্নতা অনুভব করল। এবার মনে হোলো প্রথম থেকেই সে নিজেকে ভুলিয়ে এসেছে। সে জানত প্রেমে পড়েছে। সে জানত! কখন থেকে? যখন থেকে জোরম্যাঁ বলেছিল ওকে বেশী ভালোবেসো না! তারও ঢের ঢের আগে! তার পালানোর দিন থেকে? না, তারও আগে। ঢের আগে! সে আশ্চর্য হোলো তার এই প্রেমের আবিষ্কারে। এতদিন সে তাকে গোপনে লালনপালন করে এসেছিল!

'অভিনেত্রী! মিছে কথা বলছ তুমি!…'

সে আত্মধিক্কারে হেসে উঠল। তার দুঃখের ভিতরে সহজাত ব্যঙ্গ তার ক্ষমতা আবার জাহির করল। এই কথোপকথনে ছিল দু'জন। তার উচ্ছ্বাসপ্রবণ

মন মিথ্যা ছলনার আশ্রয় নিল, আর তার কঠোর সমালোচক মন ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মুখোশ খুলে ফেলল—তাকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিল তার মনের সত্যরূপ।

॥ তেরো ॥

কামনার স্বরূপ বুঝতে পারলেই কি তখনি কামনাকে দমন করা যায়! বরং সে তো আরো বেড়ে ওঠে।

অতিক্রান্ত হোলো রাত। দিনের আলোয় ঘাতক পাখীর ঝাঁক বিদায় নিল। তখনো আশে পাশের গাছে রইল তারা, ভয় দেখাতে লাগল। কেউ কারো কাছে হার স্বীকার করল না। নিজের ক্ষমতা জাহির করে গেল। জীর্ণ, ক্লান্ত, বিভ্রান্ত আনেৎ উঠে পড়ল। কিছুই সে ঠিক করতে পারেনি। কানে বাজছে গর্জন। সে বসে রইল প্রতীক্ষায়। এবার ফ্রানৎস এল। জানলা দিয়ে সে দেখল, ফ্রানৎস আসছে। সে জানত সে আসবে।

দরজার কাছে এল সে। তাকাল দরজার দিকে। কেমন ইতস্তত করছে তারপর চলতে শুরু করল। দরজা ছাড়িয়ে গেছে। কিছুদুর গিয়ে আবার ফিরে তাকাল। পর্দার ফাঁক দিয়ে আনেৎ দেখতে পেল। অস্থির যুবক, তীব্র অনিশ্চয়তায় দুলছে, সবকিছু যেন তার গোলমাল হয়ে গেছে। দরজার কাছে এসে সে থামল এবার। ঢোকবার জন্য পা বাড়াল, কিন্তু ঢুকল না। চোখ তুলে তাকাতেই আনেৎ সরে গেল। কিছুই সে শুনতে পাচ্ছে না এখন, দু'টি হৃদয়ের উত্তাল তরঙ্গের গর্জন শুধু কানে বাজছে। তার নিজের বুক কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে, বুকের ধুকপুকানি পেয়েছে সমতা, স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আধবোজা চোখে সে তাকে দেখল; দেখল তার দুশ্চিন্তা, কামনা আর দুর্বলতা। সে তার কাছে কৃতজ্ঞ। সে তার জন্য দুঃখিত, একটু কেমন বিদ্রূপ যেন তাতে মিশানো।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে যখন ঠিক করল পথের দিকে আবার তাকাবে, তখন সে চলে গেছে। কিন্তু সে নিশ্চিত বুঝল, পথের কোনো মোড়ে হয়ত সে দাঁড়িয়ে আছে। এই দরজার দিকেই তার দৃষ্টি। কখন আনেৎ বেরিয়ে আসবে তারই প্রতীক্ষায় সে উন্মুখ।

আবার আকাশ থেকে ভেসে এল ডানা ঝাপটানির শব্দ। পাখীরা চলে যাচ্ছে। এতক্ষণ তার আত্মার উপর তারা চেপে বসেছিল, তাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাচ্ছিল, এবার তারা চলে গেল। তার আত্মা এখন অনাবৃত। দরজা খোলা, বাইরের জীবরা ঢুকছে। প্রথম এল ব্যথা, তারপর এরিকার শুকনো মুখ, আর ফ্রানৎস-এর অন্ধ কামনা। এই দুর্বল দু'টি শিশুর উপর তার কতখানি ক্ষমতা বুঝতে পারল। সে-ক্ষমতা সে ব্যবহার করল বইকি। কিন্তু তার নিজেরই বিরুদ্ধে।

নিজের বিরুদ্ধে বটে, তবে তাদের জন্য নয়। সে তাদের ধীরভাবে ন্যায়বিচার করতেই বসে গেল। বিচারে যখন ন্যায়ই বড় হয়ে দেখা দেয়, দয়া তখন থাকেনা, সে-বিচার তখন কঠোর হয়ে ওঠে। এরিকা আর ফ্রানৎসকে ওজন করে দেখল, কাউকে এতটুকু সুযোগ দিতে রাজি হোলো না। সে বৃথাই উদাসীন ভাব দেখাতে চেষ্টা করল; মনে হোলো সে যেন দু'জনের সুখ ছাড়া আর কিছু চায় না। কিন্তু শতছিদ্র দিয়ে তার ক্ষীয়মান স্বার্থপরতা আবার দাবি জানাল। কুমারী এরিকাকে সুন্দরী বলে মনে হোলো না, সে যে ভালো মেয়ে, একথা স্বীকার করতেও পারল না। তার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তো মন্তব্য হয়ে উঠল আরো কঠোর। সে যেন তাকে উলঙ্গ করেই দেখল। এমন মেয়ে ফ্রানৎস-এর স্ত্রী হবে, কে কামনা করেছে? কে কামনা করেছে? কি পরিহাস! ফ্রানৎসও বাদ পড়ল না স্বার্থপরতার এই তীব্র সমালোচনা থেকে। ফ্রানৎস-এর প্রতি সে-অনুরাগ তার আর নেই। যেন ফুঁদেল দিয়ে ঝরে গেছে। কতখানি হারাল সে! চরিত্রের দৃঢ়তা নেই বলেই তো হারাল। আর ওর অনুরাগ তো ক্ষণিকের। এ মিলন কি আর স্থায়ী হবে! না, হতে পারে না। শুধু কি যুক্তি এখানে কথা কইল?

দিনটা কেটে গেল। আনেৎ সারা সকালটা রইল ঘরে। কিছুই ঠিক করতে সে পারেনি। ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী রেখে দিয়েছে; চিন্তা করেছে যথেষ্ট। এখন সে একেবারে শূন্য।

নিস্তব্ধতা।

বিকেলের দিকে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। এরিকাদের বাড়িতে গিয়েই হাজির হোলো। বসবার ঘরে এরিকা একা। ওকে দেখে সে চমকে উঠল। তার বুকে তোলপাড় উঠছে, মুখ শুকিয়ে গেছে। চমৎকার

সেজেছে মেয়েটি, কার প্রতীক্ষায় যেন বসে আছে। সোনালী চুল তার চূড়া করে বাঁধা, একগাছি চুলও এলোমেলো হয়ে যায়নি, বাঁকানো ভ্রূর উদ্ধত দুই রেখা; ভঙ্গীতে গাম্ভীর্য আর গর্ব। ওকে দেখে এরিকা উঠে দাঁড়াল। আনেৎ-এর সম্ভাষণের উত্তরে জানাল শুভসন্ধ্যা। তারপর ঠাণ্ডা হাসি হেসে তাকে বসতে বলল। যুদ্ধের জন্য সে প্রস্তুত। কিন্তু কি করে মানুষের আত্মাকে উলঙ্গ করতে হয় আনেৎ জানে। যখন পরস্পরকে তারা মামুলী সম্ভাষণ জানাচ্ছিল, আনেৎ-এর অভিজ্ঞ চোখ তখন দেখছিল, তরুণীর গলা কেমন শুকিয়ে এসেছে, হাসি শুকিয়ে গেছে বাঁকা ঠোঁটের কোণে; শীর্ণ মুখখানা আরো শীর্ণ দেখাচ্ছে, কাঁপছে ঠোঁট দু'টি: তার দুশ্চিন্তা, ভয়, তিক্ততা, ঘৃণা কিছুতেই সে চেপে রাখতে পারছে না। আনেৎ চুনিয়ে চুনিয়ে উপভোগ করল, একটুও মায়া হোলো না। গল্পের উপসংহার কি হবে এরই ভিতর সে জেনে গেছে। উপসংহার এখন তার হাতে, তার তো তাড়া নেই। ওরা পোশাক আর নতুন নাচ নিয়ে করল আলাপ; ঘুরে ফিরে এল দিনকালের কথা। এ অঞ্চলের কথাও বাদ পড়ল না। আনেৎ জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিল ঠোঁট।

সে চুপ করে রইল; সময় নিচ্ছিল সে। এরিকা সজাগ। আনেৎ-এর নিস্তব্ধতার ভিতরে কোথায় ফাঁদ পাতা আছে সে খুঁজছে। নিস্তব্ধতা একটা ভান মাত্র। আনেৎ এবার নিস্তব্ধতার এই কটুগন্ধ ফুলটিকে জিভের ডগা দিয়ে উল্টে দিল। কি বলবে; কি তার ফল হবে সে আগেই জানত। তারই উপভোগে সে মত্ত ছিল এতক্ষণ। এবার স্থির সংযত স্বরে বলল: 'আমি কাল ভোরেই আবার চলে যাচ্ছি।'

এরিকার মুখের উপর লজ্জার রক্তিম ঢেউ। এমনকি ভ্রূযুগলও বুঝি লাল হয়ে উঠল, কানের লতি দু'টি যেন রক্তের দুটি বিন্দু। আত্মসংযম সে হারিয়ে ফেলল, চেপে রাখতে পারল না তার উন্মত্ত ভাবাবেগ।

আনেৎ এই প্রথম হাসল; পৌঁছবার পর তার মুখে আর হাসি দেখা যায়নি। এরিকা ট্যারচা চোখে তাকিয়ে দেখছে; তার মনে ভয়, হয়ত এ আবার কোনো ফাঁদ। কিন্তু কই হাসিতে তো বিষ নেই! আনেৎ ভাবছিল এরিকার কথা, এখনো বিদ্রূপের আমেজ আছে তার ভাবনায়, কিন্তু তিক্ততা নেই। আছে করুণা। সে মনে মনে ভাবল: 'ও কী ভালোই না বাসে!'

এরিকা লজ্জায় মাথা নোয়াল, হঠাৎ তার গাল দু'খানা স্পর্শ করল আনেৎ-

এর বাহু। আনেৎ তার শীর্ণ গ্রীবায় আর চুলে হাত রাখল, মৃদু চাপড় দিল। মুখে তার স্নেহের হাসি। আনেৎ-এর কাছে সে তো এখন আত্মসমর্পিত শিশু। প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে। এরিকা সলজ্জ চোখ দু'টি তুলে তাকাল—তার চোখে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে। আনেৎ তাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করল : 'সুখী হও, তুমি সুখী হও!'

দু'জনে দু'জনের মন বুঝেছে। আর তার জন্য তাদের লজ্জা নেই। দু'জনে দু'জনের কাছে ক্ষমা চাইছে।

আনেৎ এবার তুলল ফ্রানৎস-এর কথা। সস্নেহে সে ওর কথা বলল। ওকে নিয়ে বিপদে পড়তে হবে—সেকথা বলতেও ভুলল না। এরিকা সবই জানত, তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি। তারা পরস্পরের হাত ধরল। এরিকা কোনো কথা গোপন করল না। ফ্রানৎসকে সে চেনে, তার প্রতি তার সন্দেহ আছে। কিন্তু তবু সে এই পলায়নপর আত্মাকে ধরে রাখবে, এই তার দৃঢ় ইচ্ছা। তার জন্য বিপদ সে আগেই বরণ করে নিয়েছে। যুদ্ধ আর জাগরণ। আর বিপদের দিন। যে সুখ সে পেল তার জন্য সে কষ্ট সইতে রাজি। আর সুখকে তো বন্দী করে রাখা যায় না, তাকে বার বার জয় করে নিতে হয়।

যখন সে কথা বলছিল, আনেৎ আস্তে আস্তে চাপড়াচ্ছিল তার হাত। কাঁপছে হাতখানা। অথচ এই কম্পমান হাতের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে লুকিয়ে আছে এক অদ্ভুত শক্তি। এক মুহূর্ত আগে এই কামনাময়ী নারী সেই শক্তি দিয়েই তার সুখের স্বপ্ন রক্ষা করতে চেয়েছিল। এই পঙ্গু জীবন যাকে আঘাত হেনে গেছে, সে চেয়েছিল তার বাঁচার আনন্দকে জীইয়ে রাখতে।

আনেৎ ভাবল : 'হাঁ ঠিক ঠিক!' আপন মনে বলল : 'এই হাতখানিই তাকে ধরে রাখতে পারবে—ওর হাতেই তাকে সঁপে দিলাম।'

এরিকা তার প্রশান্ত নীল-সবুজ চোখ মেলে তাকে দেখছিল। এখনো লাজুক টেরচা তার চাহনি। সে তার গাল, মুখ, চিবুক, গলা আর হাতের উপর চোখ বুলিয়ে নিল।

সুন্দর—ও খুব সুন্দর!

তার সহজাত প্রবৃত্তি দীর্ঘদিন রোগে ভুগে পেয়েছে পরিণতি। তাই বুঝতে পারল, আনেৎ-এর এই আত্মোৎসর্গ কতখানি। সে বুঝি ফ্রানৎস-কে কেড়ে নিয়ে আনেৎ-এর উপর অবিচার করেছে। কিন্তু সে তো মুহূর্তের জন্য।

'ন্যায় বা অন্যায় আমি জানি না—আমার সুখ আমি চাই!'

আনেৎ উঠে পড়ে বলল : 'ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। কথা আছে।'

এরিকা এক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল। আবার সন্দেহ এসেছে তার মনে। প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে চমকে সে তাকাল, দেখল আনেৎও তাকিয়ে আছে। সে চাইছে তার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস। হয় তাকে সে বিশ্বাস করবে, না হয়ত ছিন্ন করবে তাদের সম্পর্ক। সে বিশ্বাসই করবে স্থির করল। নম্রস্বরে বলল : 'হাঁ, ওকে পাঠিয়ে দেব।'

শেষবারের মতো তারা তাকাল পরস্পরের দিকে। দুই বোন যেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তারা খেল চুমু। সন্ধির চুম্বন—শান্তির চুম্বন।

•

চোদ্দ

এক ঘণ্টা পরে এল ফ্রানৎস।

এরিকা তাকে আনেৎ-এর কাছে পাঠিয়েছে ভেবে সে আশ্চর্য হোলো না। অন্যের অনুভূতির ধার সে ধারে না। তার নিজের অনুভূতি নিয়েই সে বিভোর। আর ক্ষণে ক্ষণে তা পরিবর্তনশীলও বটে। যদি সে সময় করে এই দু'টি মেয়ের কথা ভাবত, তাহলেও বুঝি আশ্চর্য হোতো না। মনে হোতো তাকে তো দু'জনের ভালোবাসাই স্বাভাবিক। তার কারো কাছে কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই। তাই বলে তার অনুরাগে ছলনাও নেই। সে তেমনি একজন মানুষ, যে প্রতি মুহূর্তটির জন্য বেঁচে আছে। তাই তার অনুরাগ আর বিশ্বাসও মুহূর্তের। নিজে সে তার জন্য দুঃখও সহ্য করেনি।

এই মুহূর্তে সে তার সদ্য আবিষ্কারের কথাই শুধু ভাবছিল; পিয়ানোর ঘাটে ঘাটে আঙুলের সেই যাদুস্পর্শ, দরজার সম্মুখে আলিঙ্গন, আর উপরে কালো আকাশ। ভাবাবেগে উদ্বেল হয়েই সে এসেছে, অনুভূতি তার প্রখর, আর বুকে তার নিজের সৌভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস। কেমন ভীরু যেন সে, আবার গর্বিতও বটে। আনেৎ-এর উত্তাপহীন স্বরে সে কেমন অপ্রতিভ হয়ে গেল।

সে তাকে বসতেও বলল না। আয়নার সুমুখে চুল ঠিক করে নিয়ে বলল : 'চল ঘুরে আসি!'

পাহাড়ী পথ বেয়ে তারা চলল। এই পথে বহুবার তারা এসেছে।

দু'জনেই বেশ হাঁটতে পারে, লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। আনেৎ চুপচাপ। ফ্রানৎস প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল এবার সে প্রকৃতিস্থ। সে সুখী, লঘু পাখা মেলেছে তার মন, নতুন খেলনা নিয়ে সে মত্ত। দুই নারীই তাকে ভালোবাসে—সে-বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত। এই দুই ভালোবাসা কি করে মিলবে—সে ভাবনা তো তার কাছে তুচ্ছ। নিজের অহমিকা সম্বন্ধেও সে অচেতন। নিজে সে যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাই সে কুমারী এরিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ; সে আনন্দিত, এখানে এসে সে পেয়েছে সুখ। একবারও সে তাকিয়ে দেখল না আনেৎ-এর দিকে। কেনই বা তাকাবে? সে তো তার ঈর্ষার উদ্রেক করতে চায়নি।

আনেৎ কুঁকড়ে গেল, ঠোঁটের ডগায় এল: 'হাঁ, তোমার সৌভাগ্যের জন্য আর একজন দিল তার জীবন!' না, সে সেই বিষাদভরা স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে চায় না। তাই শুধু বলল: 'জোরমঁ্যা থাকলে খুশি হোতো।'

এও যেন অসহ্য। ফ্রানৎস বিরক্ত হোলো। এখন সে-কথা সে ভাবতে চায় না। কিন্তু ভাবতে সে বাধ্য, তাই সত্যিকার দুঃখের ছায়া পড়ল তার মুখে। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হোলো না। মনের শান্তি নষ্ট হয়, এমন ব্যাপার থেকে পালাবার অদ্ভুত কৌশল সে আয়ত্ত করেছে, তাই সে আনেৎ-এর কথার উত্তরে বলল: 'হাঁ, ও থাকলে আরো কত সুখেরই না হোতো!'

তার দুঃখ আর আনন্দ দুইই প্রকৃত। কিন্তু দুঃখ কথার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেল, রইল আনন্দ। বন্ধুর নামও সে উচ্চারণ করল না। আনেৎ-এর মনে পড়ল মৃতের সেই উক্তি, মোহহীন উক্তি:

'যখন বিস্মৃতি ধীরে ধীরে আসে, মানুষ তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় তাকে গ্রহণ করতে।'

ফ্রানৎস আবার কামোন্মাদ কবির মতো শুরু করল তার উচ্ছ্বাস। কার জন্যে কামোন্মাদ সে? দু'জনেই তার মনে পেতেছে আসন। কিন্তু আনেৎ-এর উপস্থিতি এখন তার সমস্ত চিন্তা ছেয়ে আছে, যার কথা সে বলছে, তার ছায়া এখন অস্পষ্ট। সে আনেৎ-এর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না। চোখের দৃষ্টিতে সোহাগ ঝরে পড়ল, প্রতি পদবিক্ষেপে যে ঘূর্ণি উঠল হাওয়ায়, তাই আকণ্ঠ পান করল সে। হঠাৎ সে থেমে পড়ল। প্রাকৃতিক দৃশ্য তার লোলুপ শিল্পী-মনকে জাগিয়ে তুলছে; তারই বর্ণনায় সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আনেৎ থামল না। গর্বিত পদক্ষেপে সে এগিয়ে গেল। কানে

এল না তার উচ্ছ্বাস, মুখে তার বিরক্তি, সে একবার ফিরেও তাকাল না পিছনে। এই সঙ্গতিহীন শিল্পবোধে সে উত্যক্ত হয়ে উঠল। এ শিল্পবোধ তো মুহূর্তে আসে আর মুছে যায়, জীবন আর মৃত্যু পলকে আসে আর চলে যায়—মনে হয় যেন ফুঁদেল দিয়ে তারা ঝরে পড়ছে।

একটা খাড়া জমির উপর আনেৎ উঠে এল···সামনে মঞ্চের মতো একখানা লম্বা পাথর···ঠিক যেন ঘোড়ার রেকাবের মতো। আনেৎ দৌড়ে চলে এল সেখানে। উপরে নির্মল আকাশ, কুমারী এরিকার চোখের মতোই নির্মম। বাসন্তী বাতাস পাহাড়ের চূড়ার ওপর দিয়ে বেগে বইছে, ঢালু উপত্যকায় নেমে আসছে, তারই চাপে নুয়ে নুয়ে যাচ্ছে ঘাসের শিষ। আনেৎ আর তার সঙ্গীর মুখে চোখে লাগছে হাওয়া। মাটি ধসে একটা গুহা সৃষ্টি হয়েছে—আশে পাশে বাঁকানো দোমড়ানো গাছের ভিড়—তারাই ছায়া ফেলছে সেখানে। এখানে এসে তারা বসে পড়ল। সবুজ প্রান্তর শেষ হয়ে গেছে ছোট্ট নদীর ধারে। তার মাথার উপরে সাদা আকাশের বৃত্ত, তারই প্রান্তে বিষণ্ণ মেঘের পাড় বসানো। ঢেউয়ের মতো যেন পাহাড়ের চূড়ায় ভেঙে পড়ছে মেঘ।

আনেৎ আগাছার জঙ্গলে বসে পড়ল। ডুবন্ত সূর্যের শেষ আভা। উত্তুরে ঠাণ্ডা হাওয়ার চাবুকে তার গাল লাল হয়ে উঠেছে। আর ক্রোধেও বুঝি। ফ্রানৎস তার পাশে, কিন্তু তার দিকে সে তাকাচ্ছে না। সামনের দিকে তার চোখ, মাথা তুলে সে তাকিয়ে আছে, মুখে তার ঘৃণার হাসি। শক্তি আর গর্বের ঝলমলানি মুখে আর দেহে। ফ্রানৎস তাকিয়ে দেখল, তার উচ্ছ্বাস থেমে গেছে। এক প্রোজ্জ্বল নিস্তব্ধতা। আনেৎ টের পেল ফ্রানৎস-এর দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে তার দেহে। সে হাসল। কামনার দমকা হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল তার উপর, এমনি করে বুঝি গাছের আগায় হাওয়া এসে আছড়ে পড়ে। সে বলল: 'তাহলে অবশেষে তুমি আমাকে আবিষ্কার করতে পারলে!'

নিঃশব্দে সে যেন তার অনুপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে সম্বোধন করে বলল: 'হাঁ এরিকা! তুমি এখন আমার পায়ের অনেক নিচে পড়ে আছ, এখানে তোমার পঙ্গু দেহ নিয়ে উঠে আসতেও পারবে না।' মনে মনে চেঁচিয়ে উঠল: 'ওকে আমি হাতের মুঠোয় পেয়েছি···ওকে এখন ইচ্ছে করলে গ্রাস করতে পারি! এস···ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও!'

কিন্তু গ্রাস সে করতে চায় না।

রক্তের ঢেউ চলে গেল তার চোখের উপর দিয়ে, ডুবন্ত সূর্যের অগ্নিকণা যেন ধেয়ে এল, স্নান করিয়ে দিল সারা দেহ। তারপর সূর্য পাহাড়ের আড়ালে লুকোতেই উন্মত্ততা শেষ হয়ে এল। একবার কেঁপে উঠল, তারপর উঠে পড়ল। হাওয়া এখনো বইছে, উত্তুরে হাওয়া। ফ্রানৎস-এর দিকে সে ফিরে তাকাল, ফ্রানৎস কুকুরের মতোই তার পিছনে পিছনে আসছে। তার চোখ দেখছে তাকে, বুঝি দৃষ্টি ভিক্ষা করছে। কিন্তু কি পেল সে দৃষ্টিতে—শুধু সুদূর উত্তাপহীনতা। আনেৎ তার এই অস্বস্তি দেখে হাসল। তারপর মাতার স্নেহ নিয়ে তাকাল তার দিকে।

'ফ্রানৎস,' সে বলল : 'তুমি মন্দ নও, কিন্তু ক্ষতি করবার শক্তি তোমার যথেষ্টই আছে। তুমি কি তা জানো ? হাঁ, এখন তোমাকে জানতে হবে বইকি ! আর তুমি একাই নও, আমিও ক্ষতি করতে জানি। আপেল গাছে যেমন থোলো থোলো আপেল ধরে, তেমনি আমরা ক্ষতির পর ক্ষতির সৃষ্টি করে যাই। কিন্তু তার ফল তো আমাদেরই খেতে হবে। অন্যকে সে ফল দিও না!'

ফ্রানৎস কথাগুলোর মানে ইচ্ছে করেই বুঝতে চায় নি, এমনকি আনেৎ-এর দৃষ্টিও এড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতো হোলো না। আনেৎ-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তার তীক্ষ্ণ কথা তাকে বারবার বিঁধল। তার চরিত্র অতি দুর্বল, সেখানে যে-কোনো শক্তহাতের ছাপ তার উপর পড়া সম্ভব। কিন্তু ছাপ কতক্ষণ থাকবে ? আনেৎ-এর তার সম্বন্ধে এমন কিছু মোহ নেই, কিন্তু এইটুকু সে জানে, এখন সে তারই করায়ত্ত, সে তার হৃদয়ের তালটা নিয়ে দলছে, তাকে রূপ দিতে চাইছে। স্নেহ সেখানে আছে বইকি, তবে তাতে তীব্রতার মিশেলই বেশী। এই জীবন্ত কাদার তালের দুর্বলতা নিয়ে খেলা করতে বেশ লাগছে, কেমন এক মধুর অনুভূতি যেন ঘনিয়ে আসছে।

'এরিকা তোমাকে ভালোবাসে, তুমিও তাকে ভালোবাস। বেশ কথা ! কিন্তু তোমাকে সাবধান হতে হবে। তোমার ভিতরে প্রেমাস্পদাকে দুঃখ দেওয়ার শক্তি আছে। যদিও ইচ্ছে করে তা করবে না, কিন্তু এই তোমার স্বভাব। তোমার এ স্বভাব শোধরাতে হবে। তুমি তো জানো, তোমাকে আমি খুবই স্নেহ করি। মিথ্যে আমি বলি না, আর কেনই বা বলব ? কি বলছি নিশ্চয় বুঝতে পারছ। তোমাকে ছেলের মতো দেখি—হয়ত তার চাইতেও বেশী। তোমাকে সুখী করতে চাই। কিন্তু এমনি করে যদি ভালোবাসা নিয়ে ছিনিমিনি

খেল, প্রেমাস্পদাকে আঘাত দাও, তাহলে অসুখী হয়েই তুমি কাটাও—এই আমার কামনা। তুমি এই ছোট্ট মেয়েটির বুকে আঘাত হানবে না—এই আমি চাই। সে তোমাকে সবকিছু দিয়েছে, তার আত্মা তোমাকে উৎসর্গ করেছে। আর তুমি? তুমি তো কৃপণ, তেমন কিছু দাওনি। পুরুষরাই এমনি। তারা হৃদয়ের বেশীটুকু তাদের কল্পনা, আদর্শ, শিল্প উচ্চাকাঙ্খার জন্য জীইয়ে রাখে। না, না, তোমাকে দুষছি না! আমিও পুরুষ হলে এইই করতাম··· কিন্তু আমাদের যেটুকুই দেবে তার মধ্যে চাই পবিত্রতা, চাই নিশ্চয়তা! দিয়ে আবার ফিরিয়ে চেয়ো না! প্রতারণা কোরো না! আমরা তো তোমাদের কাছে সামান্যই আশা করি, কিন্তু সেই সামান্যের মধ্যেই ফাঁকি থাকবে, এ আমরা চাই না। ফ্রানৎস, সত্যিই কি তুমি ওকে এইটুকুও দিতে পারবে না? তোমার মনকে সেকথা জিজ্ঞেস্ কর, হৃদয়কে পরীক্ষা কর। তুমি ওকে চাও? ওকে ভালোবাস? তা হলে গ্রহণ কর। নিজেকে দাও বিলিয়ে। দানের বিনিময়ে দান। দান গ্রহণ করতে শেখ, দানটুকু সঞ্চয় করে রাখো—সে অক্ষয় হোক! সেই তো ভেসে-যাওয়া মেঘের আত্মা! হাওয়ার অন্তরপুরুষ!'

ফ্রানৎস মাথা নিচু করে রইল। সে মুখের উপর অনুভব করল কথার তীব্র কশাঘাত, চোখের তীব্র দৃষ্টি। চোখ দু'টি হাসছে অথচ তীব্রতা আছে সেখানে। হঠাৎ আনেৎ হেসে উঠল, ফ্রানৎসকে সে এতক্ষণ বন্দী করে রেখেছিল, বাঁধন তার শিথিল হয়ে গেছে। সে বলল: 'চল এবার ফিরি।'

নিঃশব্দে তারা নেমে এল। পথ দেখিয়ে আগে আগে চলেছে আনেৎ। সোনালী চুলের খোঁপা বাঁধা মাথা দুলে দুলে চলেছে, ফ্রানৎস চোখ ফেরাতে পারছে না। তার মনে হোলো, হায়, এই নামা যদি শেষ না হোতো!

বাড়ির সারের কাছে এসে থামল আনেৎ। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। সেই বন্দী-শিবিরে প্রথম সন্ধ্যার মতোই ফ্রানৎস নুয়ে পড়ে চুমোয় চুমোয় ভরে দিল হাতখানা। আনেৎ এবার হাতখানা রাখল ফ্রানৎস-এর কাঁধে আর চোখে তার চোখ, ধীরে ধীরে বলল: 'বিদায়, বিদায়!'

একাই সে বাড়ি ফিরল। প্রতিশ্রুতি অনুসারে পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষাও করল না। সেই রাত্রেই চলে গেল।

পরদিন এরিকা আর ফ্রানৎস বিদায় নিতে এল। এসে দেখল খাঁচা শূন্য। তারা দুঃখিত হোলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফেলল স্বস্তির নিশ্বাস।

পঞ্চম খণ্ড

॥ এক ॥

আনেৎ বাড়িতে ফিরল না। পথে একটা স্টেশনে নেমে পড়ল। এক অজানা অঞ্চল, এখানে কেউ তাকে চেনে না, খোঁজও করবে না। সে তো প্রায় ভেঙেই পড়েছে। এখন নির্জনে সে তার ক্ষতিপূরণ করবে। আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। গত মাসের ক্লান্তি যেন তাকে হঠাৎ আচ্ছন্ন করে ফেলল। সারা মাস ধরে শরীরের উপর দিয়ে ধকল গেছে। তার পরে এল আঘাত আর সেই আঘাতে আবার জেগে উঠল তার প্রৌঢ়ত্বের দুঃসহ বেদনা আর ভালোবাসার নিষ্ফল আকুতি। সে তো কখনো পরিপূর্ণ ভালোবাসার আস্বাদ পেলনা। তাই তার এই বিষাদ। অথচ এর কোনো রূপ নেই, তবু অবসাদ আনে। তার এতগুণ কি কাজে এল? সে সব কিছু দিয়েছে, সব উৎসর্গ করে সে এখন মুক্ত, সম্পূর্ণ মুক্ত। বন্ধন তার খসে গেছে। যে-বন্ধন তাকে বেঁধে রাখতে পারল না, সে কি করে সে-বন্ধনে ধরা দেবে? আঁকড়ে ধরবার মতো কিছুই নেই। এখন সে যেন আর সে নেই। নিজেকে সে আর বিশ্বাস করতে পারে না, মানবতার প্রতি বিশ্বাসও যে তার বিলুপ্ত হতে বসেছে। সব চাইতে সেই তো বড় সর্বনাশ! মানবতার প্রতি বিশ্বাস ধ্বংস হওয়ার চাইতে সে কতখানি খারাপ? যখন এক বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়, সতেজ আত্মা আর একটি বিশ্বাস সৃষ্টি করে, আবার তৈরি করে বাসা। কিন্তু যখন আত্মাই তোমাকে ছেড়ে চলে যায়, কি হয় তখন? সব ধসে যায়, চারিদিকে দেখা দেয় ধ্বংসস্তূপ। আনেৎ আপস কখনো করেনি। তার উগ্রবিশ্বাসবলে মিথ্যাকে সে বরণ করে নিল, মিথ্যার সীলমোহরে ঢেকে দিল নিজেকে। মানবতার স্বাদে তখন তার মুখ ভরে গেছে, কিন্তু তারই আড়ালে মাকড়সার জাল বুনছে হৃদয়, শিকারের অপেক্ষায় ওৎ পেতে আছে। তার কাছে মানবতা তো মানুষ। হাঁ মানুষই তো! সেই নম্র নগণ্য প্রথম আগত মানুষ। কি পরিহাস! সে তার নিজের শক্তি বৃথা ব্যয় করেছিল, বৃথাই ছিল তার বিশ্বাস আর একনিষ্ঠতা। তাছাড়া নিজের এবং অপরের বিপদও ডেকে এনেছিল—জড়িয়ে পড়েছিল, টোপও গিলেছিল!

তার এই আত্মোৎসর্গ তো এক মোহেরই জন্য। সে-মোহ এক বালক, তাকে সে দেবতার পোশাক পরিয়ে দিয়েছিল, সাজিয়েছিল নিজের কামনা দিয়ে। ভেবেছিল, এমনি করে বুঝি তার আনন্দ পাবে পূর্ণতা—বিশ্বাস আর আদর্শের রাংতা মুড়ে তাকে পবিত্র নাম দিয়ে বুঝি সে চালিয়ে দিতে পারবে মানবতা ব'লে!

সে রেগে গেল। নিজেকে ভৎর্সনা করল। নুয়ে পড়ে, হাতের মুঠোয় চিবুক ধরে, কনুই দিয়ে সে নিজেকে আঘাত করল। পরাজয়ের লজ্জা তাকে ছেয়ে ফেলেছে।

ছোট্ট একটা শহরে সে পেল তার লুকোবার গর্ত। শহরটার নামও অজানা। হঠাৎ এক রাতে এসে সেখানে সে উঠল প্রথম হোটেলটায়। মস্তবড় ছাদওয়ালা বাড়ি, ছোট ছোট জানলা, সার্সি দেওয়া—আর পুষ্পিত জিরেনিয়ামের সার।

এই রক্তিম গুণ্ঠনের আড়ালে, চওড়া ছাদের ছায়ায় তার বিক্ষুব্ধ আত্মা ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে পেল, ফিরে পেল নিজের গুহা, কিন্তু বারে বারে খাঁচার উপর আছড়ে পড়ে ক্ষতবিক্ষতও হোলো বইকি। সে বৃথাই নিজেকে বোঝাল:

'যথেষ্ট, হয়েছে! আমি আত্মসমর্পণ করছি। আর নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করব না। পরাজিত আমি! বশ্যতা স্বীকার করছি কিন্তু তবু কি যথেষ্ট হয়নি?'

না, যথেষ্ট বুঝি সত্যই হয় না। প্রকৃতি অতর্কিত আক্রমণে জানিয়ে দেয়, সন্ধিপত্রে তার স্বাক্ষর না থাকলে সে তো বাতিল হয়ে গেল! দিনের পর দিন আনেৎ যুদ্ধ করে চলল এক ভয়াবহ কামনা আর চিরন্তন দাসত্বের বিরুদ্ধে। গতায়ু যৌবন আর ক্ষণিকের মোহের বিরুদ্ধেও এ সংগ্রাম, এর পরিণাম তো ভস্মীভূত জীবন। রাতের উন্মত্ততার পর প্রতিদিন ভোরেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ত, বোবা হয়ে যেত। মনে হোতো সে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু সে তো একা নয়। এমনি কতো মানুষ আছে, যারা দিনের বেলায় শান্ত, সমাহিত, অথচ রাতের যবনিকার আড়ালে চলেছ তাদের অবিরত সংগ্রাম।

অবশেষে সে এল ফুরিয়ে। একেবারে দেউলে হয়ে গেল। আয়-ব্যয়ের হিসাব সে বিছিয়ে বসল। সে একাই তার নারীহৃদয় নিয়ে ঘৃণায় স্ফীত মানবতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছিল, সে চেয়েছিল ঘৃণা

আর মৃত্যুকে রুখতে, চেয়েছিল জীবনকে পূত করতে। কে শত্রু কে মিত্র—বিচার করতে চায়নি, সবার দিকেই সে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এ সংগ্রাম তো ভয়ংকর। তার শত্রু মানবতা তো নিজেকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে, মৃত্যুর হুঙ্কার তার মুখে। তাই তো মনে হয়—আনেৎ-এর এ ঔদ্ধত্য। সে নিজেকে ভেবেছিল অনেক বড়। কিন্তু সে তো স্বাধীন নয়। একা থাকবার তার শক্তিও নেই। সে তো সন্তানের জন্য আত্ম-ভোলা মা নয়। বরং সে তার নিজের রক্তমাংস দিয়ে গড়া সন্তানকেই ভুলে গেছে। সে সেই চিরন্তন ছদ্মবেশধারী দাসী, যে কুকুরের মতো তার কামনার পিছনে পিছনে চলেছে; গোপনে চলেছে। কি সুন্দর ঔদাসীন্য! তার আদর্শবাদ তো প্রকৃতির টোপ। এই টোপ ফেলেই প্রকৃতি তাকে কুকুরের খোঁয়াড়ে নিয়ে যাচ্ছে, চাবুক রয়েছে উদ্যত। এর থেকে রেহাই পাবার মতো অত শক্তি ধরে না সে।

'বেশ, তাইই হোক! আমি এবার শিখব বিনতি, শিখব নম্রতা। আমি কামনা করেছি···কিন্তু সক্ষম হইনি···কিন্তু কামনাও তো একটা কিছু করা! সক্ষম হইনি···কিন্তু একদিন আমার চাইতে শক্তিশালী কেউ হয়ত সক্ষম হবে, পারবে···'

পরাজিত হয়ে, পরাজয়কে মেনে নিয়ে সে ঠিক করল পারীতে ফিরবে। কিন্তু ভবিষ্যতের বিদ্রোহের সম্ভাবনা যে শেষ হয়ে গেল তা নয়।

ট্রেনের কামরায় আর দু'জন ফরাসী তার সঙ্গী। একজন তরুণ লেফটেনাণ্ট, মুখে আঘাত পেয়েছে। চোখের উপর কালো ফিতে বাঁধা, মাথায় ব্যাণ্ডেজ। তার সঙ্গে একজন হাসপাতালের পরিচারক। বেশ হৃষ্টপুষ্ট লোকটি, দুঃখের অনুভবশক্তি বুঝি হারিয়ে ফেলেছে (যথেষ্টই বুঝি সে দুঃখ দেখেছে)। কোনো রকমে রোগীর জন্য একটু জায়গা করে দিয়ে সে তার দিকে ফিরেও তাকাল না। এবার সে শুয়োরের মাংস আর মদ গিলতে বসল। তারপর ক্রেপ জুতো জোড়া খুলে সামনের বেঞ্চিটায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে নাক ডাকাতে শুরু করল। আহত ছেলেটি বসেছিল আনেৎ-এর পাশে। আনেৎ দেখল ছেলেটি হাতড়ে হাতড়ে বহুকষ্টে উঠে দাঁড়াল, মাথার উপরে কি যেন খুঁজে না পেয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বসে পড়ল।

'কিছু খুঁজছিলে? আমি সাহায্য করতে পারি কি?'

সে ধন্যবাদ জানাল। কপালে তার অসহ্য ব্যথা। উপশমের জন্য একটা

গুঁড়ো ওষুধ সে চায়। আনেৎ উপর থেকে খুঁজে বার করে দিল, একটা গেলাসে ঢেলে দিল জল। দু'জনের কারো চোখেই ঘুম নেই। ঘুম অসম্ভব। আলাপ করতে চেষ্টা করল। ট্রেনের ঝক্ ঝক্ শব্দ, কথা শোনা যায় না। রোগীর পাশে বসে সে তার সেবা করল, তার হাঁটুর উপর ছড়িয়ে দিল কম্বল। তার এই সহানুভূতির স্পর্শে রোগী যেন সজীব হয়ে উঠল। যে কোনো হতভাগাই যা করে, সেও তাইই করল। করুণাময়ী নারীর স্পর্শে খুলে গেল তার অন্তরের গোপন দ্বার, সে শিশুর মতোই সব কথা বলে গেল। কোনো পুরুষকেও যেকথা বলতে পারত না, এমনি কথাও বাদ পড়ল না। হয়ত তাকে দেখতে পেলে একথা সে বলত না ৷

একটা গোলা তার কপাল ভেদ করে চলে যায়। দু'দিন সে পড়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ধ হয়ে। আবার যেন আলো ফিরে এল ধীরে ধীরে। আবার কমে গেল। হয়ত চিরতরে আলো নিবে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই সে হারাবে। সে শিল্পী, সৃষ্টি তার আনন্দ, তার জীবিকা। তাছাড়া মগজে চোট লেগেছে কিনা কে জানে। সে তো অমানুষিক যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছে।

কিন্তু এতো কিছুই নয়। তার মনে জ্বলছে আগুন, আত্মা অন্ধকারে কাঁদছে, কিন্তু সে তো চোখের জল নয়, রক্ত। কিছুই নেই তার। সবকিছু ওরা কেড়ে নিয়েছে। বুকভরা ঘৃণা নিয়ে সে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। সে গিয়েছিল তার নিজের জাতির প্রতি ভালোবাসায়, মানবতার ডাকে, পৃথিবী আর তার আদর্শের জন্য। ভেবেছিল যুদ্ধ সে থামিয়ে দেবে, মানবতাকে এই সর্বনাশা শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করবে। শত্রুদেরও মুক্তি নিয়ে আসবে, এ স্বপ্নও তার ছিল। সবকিছু তাই উৎসর্গ করে এসেছে, সবকিছু হারিয়েছে। পৃথিবী তাকে নিয়ে ক'দিন খেলিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। যারা রাজনীতির খেলায় নেমেছে তাদের অন্যায় আর নিচ কৌশল সে বুঝতে পেরেছে অনেক পরে—সে তো দাবার ছকে বসানো ঘুঁটি মাত্র, তাকে নিয়ে তারা যেমন খুশি খেলেছে। এখন সে আর কিছু বিশ্বাস করতে পারে না। সে প্রতারিত, জীর্ণ দীর্ণ, আজ আর তার বিদ্রোহ করবার সামর্থ্য নেই, ইচ্ছাও বুঝি নেই···এখন চোরাবালিতে তাড়াতাড়ি ডুবে গেলেই হোলো। অস্তিত্ব বলে কিছুই থাকবে না, আর অস্তিত্ব বলে কিছু ছিল একথা ভাববারও অবকাশ হবে না—সে তো চিরন্তন বিস্মৃতির অতল গহ্বর, সেখানে তলিয়ে গেলে আবার ভাবনা কি !

ভাবলেশহীন স্বরে সে বলে গেল কথা, অনুভূতিও তার নেই। কেমন

একঘেয়ে ক্লান্ত স্বর। আনেৎ শুনে গেল, ভাইয়ের ব্যথায় ব্যথী ভগিনীর মতো। দুঃখ ঘনিয়ে এল তার মনে। তাদের অদৃষ্ট আলাদা, তবু কেমন যেন মিল আছে। এই ছেলেটি যুদ্ধের ভিতরে শুধু দেখেছে ভালোবাসার ছায়া, আর আনেৎ দেখেছে ঘৃণা—কিন্তু দু'জনেই দিয়েছে আত্মাহুতি। কিন্তু কেন, কার জন্যে? আত্মোৎসর্গের নামে এ এক শোকাবহ উন্মত্ততা। তা সত্ত্বেও, হাঁ, তা সত্ত্বেও,—তিক্ততার পাত্র কাণায় কাণায় ভরে উঠলেও (এমনি বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে স্বীকার করতে সাহস পেল না বটে) কি এক বিষাদঘন আনন্দ আছে এতে। না, না, শুধুই তো আমরা ক্ষতবিক্ষত হই না, একগুচ্ছ আঙুরের মতো দলে পিষে যাই না আমরা। আর যদি শুধু শুধুই দলিত পিষ্ট হই, ক্ষততে ভরে যায় দেহ, তাহলেই বা অলাভ কি? যে মদিরা তৈরি হোলো আমাদের মনের দলিত আঙুরে, তার কি কোনো মূল্যই নেই? যে-শক্তি সে-মদিরা পানে উজ্জীবিত হয়ে উঠল, মদিরা না পেলে তার কি হোতো? হাঁ, এ এক আত্মার বিভূতি, কিন্তু তার ভীষণতায় তো সন্দেহ নেই।

অন্ধ ছেলেটির উপর ঝুঁকে পড়ে আনেৎ মৃদু অথচ আবেগভরা স্বরে বলল: 'ভালোবাসা আর ভক্তি প্রতারিত হয়েছে। হয়ত···হাঁ, প্রতারণা করার চাইতে তবু প্রতারিত হওয়া ভালো। আমিও প্রতারিত। কিন্তু আবার তো সেই কাজেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। না হয় প্রতারিতই হলাম! তুমি কি করবে?'

'আমিও তাই করব।'

দু'জনে দু'জনের হাত জড়িয়ে ধরল।

'অন্তত আমরা দু'জন একথা বলতে পারব, প্রতারণার আশ্রয় আমরা নিইনি। সত্যি প্রতারিত হওয়া কত মধুর!'

ট্রেন থামল। পরিচারক এবার জেগে কিছু খাবার কিনতে গেল ব্যুফেতে। আনেৎ দেখল, ছেলেটি তার ব্যাণ্ডেজ আলগা করবার চেষ্টা করছে।

'এই, কি করছ? অমনি কোরো না।'

'না, আমাকে আলগা করতে দাও!'

'কি চাও তুমি?'

'রাত ঘিরে আসার আগে তোমাকে একটিবার দেখতে চাই।'

ব্যাণ্ডেজ খসিয়ে ফেলে সে চিৎকার করে উঠল, গোঙিয়ে উঠল ব্যথায়। 'না, দেরি হয়ে গেছে! দেখতে পাচ্ছি না তোমাকে!'

হাতে মুখ ঢাকল। আনেৎ তাকে বলল: 'বেচারী, বেচারী আমার!

চোখ দিয়ে কি এর চাইতে ভালো দেখতে পেতে! তোমাকে বুঝতে তো আমার চোখের দরকার নেই। এস বন্ধু, হাতে হাত দাও। আমাদের হৃদয় তো পরস্পরকে স্পর্শ করেছে।'

সে শক্ত করে ধরল তার হাত, তাকে হারাবার ভয় যেন তাকে পেয়ে বসেছে।

'বল! আবার বল! বল!'

চোখ তার অন্ধ। শুধু সে আনেৎ-এর স্বর শুনতে পেল। কিন্তু সেই তো যথেষ্ট। স্বর তো শুধু ধ্বনি নয়, এ যেন দেয়ালের উপরে প্রতিফলিত ছায়া। আনেৎ তার সামনে বিছিয়ে দিল চল্লিশ বছরের আশা, কামনা, উৎসর্গ, পরাজয়, আর নতুন করে শুরু করার ছবি—তার চল্লিশ বছরের বাস্তব স্বপ্ন (সবই যেন স্বপ্ন)। সে-স্বপ্ন তার মুখে ছাপ ফেলে গেছে।

'হাঁ, তোমাকে তারা শক্ত করে গড়ে তুলেছে। তোমার আত্মাকে যে আমি দেখতে পাচ্ছি বন্ধু!' ভাবল আনেৎ।

সে দেখতে পেল আত্মাকে, সবচাইতে সেরা ছবি সে বুঝি এতদিনে আঁকল। সে একাই দেখতে পেল সে-ছবি।

আনেৎ এক সময়ে চুপ করে গেল। রাত পোহাবার আগে আর কেউ কোনো কথা বলল না। গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার আগে সে তার হাতখানা সরিয়ে নিল তার হাত থেকে, তারপর বলল: 'আমি তো তোমার শুধু দুঃখেরই সঙ্গী বন্ধু। কিন্তু তবু আমার আশীর্বাদ রইল তোমার অন্ধ চোখ আর সারা দেহ ছেয়ে, রইল তোমার চিন্তায়, তোমার আত্মোৎসর্গে আর তোমার সৎ প্রবৃত্তিতে। এবার বন্ধু তোমার পালা। তুমিও অমনি করে আমাকে আশীর্বাদ করে যাও। পরম পিতা তার সন্তানদের যখন ভুলে যান, তখন সন্তানরাই তো পরস্পরের পিতার আসন দখল করে বসে।'

॥ দুই ॥

মার্ক একদিন সকালবেলা তার পেল, তার মা আসছে। উত্তেজনায় দুলে উঠল তার বুক। আনেৎ চলে যাওয়ার পর একখানা পোষ্টকার্ডে একছত্রে তাকে সুইজারল্যাণ্ডে পৌঁছনোর সংবাদ শুধু দিয়েছিল। আর সে তাকে চিঠি লিখেছে প্রতিদিন। আনেৎ চিঠিগুলোর একখানাও পড়েনি। সেই ছোট্ট সুঈস শহরের ডাকঘরেই তারা পড়ে আছে। আনেৎ সেখানে ছিল মাত্র এক-দিন, এমনকি নানা গোলমালে তার ঠিকানাটা পর্যন্ত ডাকঘরে দিয়ে আসেনি। এই নিঃশব্দতা মার্ক কিন্তু ইচ্ছাকৃত বলেই ভেবে নিয়েছিল, তাই মন তার বিষিয়ে গেছে।

সে নিজে আনেৎ-এর বাড়িতেই আছে, সিলভী বহু অনুনয় করেও তাকে নিজের কাছে রাখতে পারেনি। সে জেদ্ ধরেছিল, এখন বড় হয়েছে, একাই থাকতে পারবে। একাই সে আছে, আর আছে অনুপস্থিতের স্মৃতি। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে আনেৎ। এই বাড়িতে, আসবাবপত্রে, বইয়ে, বিছানায়—সব জায়গায় আনেৎ; অথচ মার্ক তো সে অদৃশ্য আনেৎকে ছুঁতে পারেনি, জড়িয়ে ধরতে পারেনি। চেষ্টা করেছে বইকি। তার মার ঔদাসীন্য মনে লেগেছে বটে, কিন্তু তার জন্য রাগ করেনি। জীবনে এই প্রথম অবিচার মুখ বুজে সয়েছে, বরং নিজের উপরই তার রাগ। সে মনে মনে বার বার নিজেকে দুষেছে: এক সময়ে তো মা ছিল তার একার, সে নিজেই তো তাকে দিয়েছে দূরে সরিয়ে। আজ তার মা অপরের, তারা তাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তাই তার মনে এত ব্যথা। আজ তার পেয়ে দুলে উঠছে বুক উত্তেজনায়, কিন্তু আনন্দ তো নেই। মার্ক বালিশে মাথা গুজে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ভাবল মার কথা। যাদের সে ভালোবেসেছিল তাদের সঙ্গে মার প্রতি এই ভালোবাসার কত প্রভেদ!

আবার পুরনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নেবার চেষ্টা করল। পিতাঁর সঙ্গে ভাব করল, সে জানতে চাইল, কি আছে তার মনের গহনে। কি অদ্ভুত সে-মনের গহন! বিশ্বাস, বীরত্ব আর সারমেয়-সুলভ ভক্তি—তার ভিতরে নিজের বলে তো কিছুই নেই। শুধু অন্ধকার। যেটুকু আলো সেখানে আছে, সেটুকু ধার করা, চুরি করা,—প্রতিফলিত আলো। কেউ যদি ওকে নিজেকে ব্যাখ্যা করতে

বলে, ওর চিন্তাধারার খেই খুঁজে পেতে চায়, তা হলে শুধু সে দেখতে পাবে স্পানিয়েল তার কাচের মতো স্বচ্ছ ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে আছে, চকচকে কথার দীপ্তিতে উজ্জ্বল তার চোখ। কেউ ওকে মেরে ফেললেও বুঝি সে-দীপ্তি নিববে না। (বলাই বাহুল্য, মার্ক ন্যায়পরায়ণ নয়। এই তার স্বভাব। আর সবার মতোই ভালোবাসাই তার কাছে একমাত্র বস্তু, ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে সে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু যারা কথার দাস তাদের উপর তার কোনো মায়া নেই। এই খুদে ডায়োজেনেস এমন একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, যে মানুষ, যে তার নিজের সত্তায় প্রতিমুহূর্তে বিকশিত, যে প্রতিধ্বনি নয়।) মেয়েদের কথা কেই বা চিন্তা করে! তারা তো প্রভুরই চিরন্তন দাসী! অন্ধ, স্ফীতোদর প্রজাতির মোহজালে তারা নিজেরা জড়িয়ে পড়ে, অন্যকে জড়িয়ে ফেলতে পারলে সুখী হয়।

কিন্তু অন্তত একজন (হয়ত এ তার কল্পনা) এই জালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে; ছিন্নভিন্ন করেছে এই জাল, টুকরো টুকরো করে ফেলেছে, পালিয়ে গেছে। আবার ধরা পড়েও সংগ্রাম ছাড়েনি। যতদূর মনে পড়ে তার মা তো তাই করেছে,—তার মা! মার্ক তার মার এই পরিত্যক্ত ফ্ল্যাটে (বোধহয় চিরপরিত্যক্ত) বসে এমনি আত্মচিন্তায় বিভোর হয়ে রইল। সে স্মৃতির নদী মন্থন করে চেষ্টা করল গড়ে তুলতে তার মার অতীত জীবন—হাঁ, এই ফ্ল্যাটে শেষের ক'দিন সে কাটিয়েছে নিঃসঙ্গতার অন্ধকূপে; তার বেদনা আর আনন্দ সবই তো অজানা, কামনা আর সংগ্রামের খোঁজও তো মার্ক রাখেনি। হঠাৎ সে আবিষ্কার করে ফেলল, তার মার হৃদয় তো এক মুহূর্তের জন্য নিঃসঙ্গ ছিল না, মার্ক তো তার সেই কোটর থেকে তাকে টেনে বার করে আনতে পারেনি। তবে আজ সেই পৃথিবীর উপর তার কি অধিকার? আনেৎ তো একাই যুদ্ধ করেছে সেখানে, জয়ী হতে চেষ্টা করেছে, পরাজিত হয়েছে। সেখানে সে ছিল একা। এখন কোনপথে সে চলেছে? তার কাছ থেকে তো বহুদূরে সরে গেছে। সে ভাবল তার মার কথা, নিজের ভাবনা গেল তলিয়ে। যদি পারত মার চলার পথ বুঝি আরো মসৃণ করে দিত।

মনের যখন এই অবস্থা, তখন এল তার। এ যেন অবরুদ্ধ নগরীর একঘেয়ে দিনগুলির মাঝখানে বিস্ফোরণের যতিচিহ্ন। বার বার পড়ে দেখল। মা আসছে, সে সেন বিশ্বাস করতে পারল না। তার আসার আশা সে তো ছেড়েই দিয়েছিল। মন ভরে গেল ঘন আনন্দে। কিন্তু কেন আসছে? তার জন্যই আসছে, এ ভাবনা তার মনে এলেও সে সাবধানে এড়িয়ে গেল।

হতাশা তার মধ্যে নিয়ে এসেছে নম্রতা। একটা অন্ধ সংস্কার তাকে পেয়ে বসল, তার মনে হোলো বাঞ্ছিতকে পাওয়ার সবচাইতে ভালো উপায় হচ্ছে আশা না করা।

আনেৎ স্টেশনে নেমে দেখল, ছেলে আসেনি। আধঘণ্টা দেরি করে এসেছে ট্রেন, গার দ্য লিয়ঁ স্টেশনে পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে গেছে। মার্ক বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পর হতাশ হয়ে চলে গেছে। আনেৎ বাড়ি এসে শুনল, মার্ক তখুনি আবার স্টেশনে ছুটেছে। সে সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরে এসে প্রতীক্ষা করতে লাগল। ঘরে ফুল দেখে আনেৎ কেমন অভিভূত হয়ে গেল, তারই জন্য সে ফুল এনে রেখেছে! চেয়ারে বসে পড়ল। মাথাটা এলিয়ে পড়েছে। বড় ক্লান্ত। পথের শব্দ সে কান পেতে শুনল; এবার এল ঘুম। আবছা ঘুমে সে শুনতে পেল, কে যেন দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। মার্ক ঢুকল ঘরে, দরজা খুলেই সে চিৎকার করে উঠল আনন্দে। ঘুমের ঘোর তখনো কাটেনি, আনেৎ হাসল। মনে মনে বলল: 'ও আমাকে তাহলে এখনো ভালোবাসে!'

উঠে সে তার কাছে যেতে চেষ্টা করল। পা তার কাঁপছে, আবার সে বসে পড়ল চেয়ারে। মার্ক ছুটে এল কাছে, আনেৎ দু'হাত দিল বাড়িয়ে। বাহুবন্ধে ধরা দিল মার্ক।

'উঃ, কতক্ষণ তোমার জন্য যে অপেক্ষা করেছি! কখন এলে?'

আনেৎ নিরুত্তর। সে তখন ছেলের গালে আর চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মার্ক তার মার মুখে দেখতে পেল ক্লান্তির ছায়া, বেদনায় ম্লান হয়ে গেছে; তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে সতর্ক করে দিল। আর সে প্রশ্ন করল না, ঠোঁটে এসে থেমে গেল কথা। জড়িয়ে ধরে সে তাকে তুলে ফেলল (হঠাৎ কি শক্তিই সে পেল! আর তার মা কতো দুর্বল!) আনেৎ তার কাঁধে ভর দিয়ে জানালার কাছে এল। গোধূলির আলো এসে পড়েছে তার মুখে, সারা দেহে।

'বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো মা।' মার্ক বলল।

সে প্রতিবাদ করল; কিন্তু মাথা ঘুরছে। মার্ককে সে বাধা দিল না। মার্ক তাকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল, জুতো ফেলল খুলে, পোশাক ছেড়ে ফেলতে সাহায্য করল। বাধা দিল না আনেৎ। যে ভালোবাসে তার কাছে বশ্যতা স্বীকারেও আনন্দ।

ভালোবাসে? তাহলে সে তাকে ভালোবাসে? ভাবতে ভাবতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কাল না হয় ভাববে। সবকিছু খুলে বলার প্রতীক্ষায় রইল

মার্ক। একটা প্রশ্নই বড় হয়ে উঠল তার কাছে। জিভের ডগায় বার বার এল সে-কথা, উচ্চারণ করবার আগেই বিছানায় শুয়ে মা তার এই ক্লান্তির জন্য ক্ষমা চাইল।

'ভারি লজ্জা করছে তোমার এই যত্ন দেখে! আমাকে ক্ষমা কর! ইস এত শক্তি ছিল আমার! কিন্তু এখন আর যেন শরীর বইছে না। ক'রাত ঘুমোইনি। পাশে এসে বোস না! আজ কি করলে বল, স্টেশনে গিয়ে ধরতে পারলে না কেন?'

লজ্জিত মার্ক বলে গেল তার আসা-যাওয়ার কথা। সে তার কথা মন দিয়ে শুনল না, এমন কি খানিক্ষণ পরে অর্থবোধও হোলো না; শুধু তার স্বর ভেসে এল, জুড়িয়ে দিল তার কান। চোখ মুদে এল, ঘুমিয়ে পড়ল। মার্ক কথা থামিয়ে উঠে পড়ে তার দিকে তাকাল, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। তখনো প্রশ্ন তাকে বিঁধছে। আবার ঘরে ফিরে এল, একটু ইতস্তত করে ঘুমন্তের উপর ঝুঁকে পড়ল। আনেৎ চোখ খুলল। বালিশটা ঠিক করে দিয়ে সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল: 'এবার কি তুমি এখানে থাকবে মা?'

আনেৎ অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে, বুঝতে সে পারেনি। আবার সে জিজ্ঞেস করল, স্বাভাবিক হবার প্রচেষ্টা তার স্বরে: 'তুমি কি এখানে থাকবে?'

'হাঁ থাকব।' আনেৎ হাসল।

এবার সে ঘুমিয়ে পড়ল।

মার্ক ঘর থেকে বেরিয়ে এল—আশ্বস্ত মার্ক।

॥ তিন ॥

দরজাটা খুলে রেখেই সে চলে গেল। কানে তার এল মার স্বাভাবিক নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। মনে মনে বলল: 'ও ওখানে···ওকে আমি পেয়েছি···এখনো সময় আছে।'

রাতে আবার শত্রুবিমানের সংকেতধ্বনি। চিৎকার করে উঠল সাইরেন, বাড়ির ঘরে ঘরে তেমনি গোলমাল। তাড়াতাড়ি সবাই বিছানা ছেড়ে নিচে

দৌড়ে এল। মার্ক লাফিয়ে উঠে ঢুকল গিয়ে মার ঘরে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে মা। মার্ক তাকে জাগাতে চাইল না। ভাবল: 'বোমা পড়ুক না! আমাদের তো মিলন হয়েছে।'

আর আর রাতে সংকেতধ্বনির সময় সে ছিল একা, সাহসের ভান সে করেছে বটে কিন্তু ভয় ছিল তার মনে। কিন্তু এবার (কেন?) এযে এক আনন্দ!

পরদিন সকালে সিলভী এল তার কাছে। মার্ক-এর জন্য তার ভারি দুশ্চিন্তা। আনেৎ এসেছে শুনে সে মার্ককে 'খুদে শয়তান' বলে গালাগাল দিল। (প্রথম দিন মাকে একান্ত নিজের করে পাবে বলেই সে তারখানা লুকিয়ে রেখেছিল। হাঁ, ঈর্ষা তাতে ছিল বইকি!) কিন্তু আনেৎ তখনো ঘুমে, আর তার শোয়ার ঘরের দরজায় ড্রাগনের মতো মার্ক দাঁড়িয়ে। তাদের তর্ক-বিতর্ক আনেৎকে জাগিয়ে তুলল। সিলভী এসে ঢুকল ঘরে। অনেক কথাই তার বলবার ছিল। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই সে বুঝতে পারল তার প্রিয় রিভিয়ের-এর উপর দিয়ে বহু ঝড় চলে গেছে। তাই সে তাকে বিরক্ত করতে চাইল না। যখন আত্মা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তাকে একা থাকতে দেবে—তার অভিজ্ঞতা তাকে একথা শিখিয়েছে। একা থেকে থেকে বালি তলায় চলে যাবে; তারপর তো বেরুবে বিশুদ্ধ জল। আনেৎ রাতের বিস্ফোরণ শুনতে পায়নি, এমনি ঘুমেই বিভোর ছিল, এই নিয়ে সিলভী ঠাট্টা করল। তা ছাড়া আনেৎ চলে যাবার পর থেকে মার্ক তার ঘরেই ঘুমিয়েছে—এই নিয়ে সে 'খুদে জানোয়ার' বলে মার্ককে গালাগাল দিতেও ছাড়ল না। মার ঘরে শুয়ে মার্কের রাতে পালাবার সুবিধে হয়েছে। মার্ক রেগে বললে, অন্য কেউ তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে সে তা চায় না। সে যদি সিলভীর মতের বিরুদ্ধে একটু আধটু স্ফূর্তি করতে চায়, সেটা সে তার মুখের উপর বলেই করতে পারে। অমন ছল-চাতুরীর তার প্রয়োজন নেই। সে একথা মার সামনে বলে ফেলে দুঃখিত হোলো, তারপর আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। সে চলে যাবার পর সিলভী আনেৎকে গর্বভরেই বলল: 'কি একগুঁয়ে! ঠিক আমাদেরই মতো!'

আনেৎ জিজ্ঞেস করল নিজেকে: 'সত্যিই কি ও আমারই মতো?'

গৃহস্থালীর কাজে ডুবে থাকতে সে চেষ্টা করল, কিন্তু তার অনুভূতির ক্ষত তো মিলিয়ে গেল না—বহুদিন রইল। ক্লান্তি এল তাড়াতাড়ি। মার্ক গৃহস্থালীর কাজে তাকে সাহায্য করে তার শ্রম লাঘব করতে চেষ্টা করল। সে তাকে

কাজ করতে বাধা দেয় না, কিন্তু বেশী পরিশ্রম সে না করে সে দিকে তার নজর। আসবাবপত্র সরানো, মই দিয়ে উপরে উঠে পর্দা খাটানো, এমনি ছোট-খাটো কাজগুলো করে মার্ক। এসব যেন তার কাছে নতুন—তার মার কাছেও। মাঝে মাঝে তার ভয় হয়, সে একটু বেশী করে ফেলছে—এ বুঝি ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয়। অনুভূতির দিক থেকে যারা খাঁটি, তাদের মনে এ সন্দেহ তো আসবেই। তাই মার্ক যা কিছু করে, এমন ভাব দেখায় যেন সে নিস্পৃহভাবেই করে যাচ্ছে। আনেৎ অভিভূত, আর অপ্রতিভ হয়ে ধন্যবাদ জানায়। প্রথম দিকের উচ্ছ্বাস ঝরে যায়, ঝরে পড়ে ঠাণ্ডা নিরাসক্ত স্বর। তারা দু'জনেই যেন স্নেহের এমন এক স্তরে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে আছে, যেখানে কথার অবসর কম, শুধু পরস্পরকে চোখে চোখে রাখাটাই সব। চোখের দৃষ্টি সেখানে মনোযোগী, আশায় উন্মুখ···ওকি কথা বলবে নাকি এবার? কিন্তু দু'জনেরই ভয়, যে আগে কথা বলবে সে-ই নিরাশ হবে। মার্ক মার সুইজারল্যাণ্ড যাওয়া আর হঠাৎ ফিরে আসার কথা জিজ্ঞেস করল না, এড়িয়ে গেল। অসতর্ক মুহূর্তে, আনেৎ যখন বিষাদিত দিবা-স্বপ্নে ডুবে যায়, মার্ক নিঃশব্দে মার মুখ থেকে ফিরিয়ে নেয় তার চোখ। না, সে তার মনের চিন্তাধারা পড়তে চায় না। এমনকি তাকে লজ্জা দেবার ভয়ে সে পাশের ঘরে চলে যায়। কিন্তু আনেৎ ছাড়ে না। সে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, তার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি সে কি করে কাটাল। মার্ক ব্যথা পায় তার প্রশ্নে। সে তো চিঠিতেই সব লিখেছে। তাহলে চিঠির উপর শুধু চোখ বুলিয়ে গেছে তার মা! না, না, মা তো তাকে খুব ভালোবাসে না!

সিলভী তাকে না বললে আনেৎ তখনো চিঠির কথা জানতে পারত না। সিলভী এসেছিল 'খুদে শয়তান' মার্ককে দেখতে, সে এসেই তাড়াতাড়ি চলে গেল। মা আর ছেলে পরস্পরকে আবিষ্কার করছে, পরিপূর্ণ আনন্দ আর বেদনার উৎসমুখ খুলে গেছে, এখন তৃতীয় কেউ এখানে বাহুল্যমাত্র। ওরা তো এতদিন পরস্পরকে বুঝতে পারেনি, এবার শুরু হয়েছে সেই অভিজ্ঞানের পালা। সিলভী তাদের সাহায্যই করল। একদিন সে তো ওদের প্রেমিক-প্রেমিকা বলে ঠাট্টাই করল। মার্ক তখন বাইরে ছিল। আনেৎ জানাল প্রতিবাদ।

'তোমার কথা আমি বলিনি, তুমি তো পাগল!' সিলভী হাসতে হাসেতে বলল: 'মানুষকে তুমি শুধু দুঃখ দাও। তাই তো তোমার ভূমিকা।'

'হাঁ, একথা তুমি বলবে না তো বলবে কে!'

সিলভী কিন্তু ছাড়লনা, বলে গেল : 'কিন্তু তুমি যখন বাইরে ছিলে, খুদে প্রেমিক রোজ তোমাকে চিঠি লিখত !'

আনেৎ আর কোনো কথা শুনতে পেলনা, শুধু তার কানে বাজতে লাগল, রোজ চিঠি লিখেছে মার্ক ! সেই চিঠিগুলো পড়ে আছে ডাকঘরে, একবার গিয়ে নিয়ে আসবার কথাও তার মনে হয়নি ! হাঁ, সিলভী ঠিকই বলেছে, সে পাষাণ। সে তখনি চিঠিগুলি পাঠিয়ে দেবার জন্য লিখল। কিন্তু মার্ককে কিছু জানানো হবে না। চিঠিগুলো তার হাতে পড়লে চলবে না। আনেৎ নজর রাখল ডাকের উপর। বহুদিন লাগল আসতে। যেদিন ডাকে চিঠি এল মার্ক ছিল তার কয়েক হাত পিছনে। ভাগ্যক্রমে দারোয়ানের হাত থেকে মার্ক হাত বাড়াবার আগেই চিঠিগুলো ছিনিয়েই সে নিল। তারপর মার্ক বাইরে গেলে সে খুলে খুলে পড়ল চিঠিগুলি। আটখানি চিঠি, চিঠি তো নয় সম্পদ ! প্রথম কটা ছত্র পড়েই আনেৎ-এর চোখ জলে ভরে গেল। সবগুলো একসঙ্গেই সে পড়তে চাইল, কিন্তু পারল না। চোখ ঝাপসা হয়ে এল জলে। সে চিঠিগুলি পর পর সাজিয়ে আস্তে আস্তে একে একে শেষ করবে ভাবল, কিন্তু সে-সিদ্ধান্ত তো টিকল না। চিঠিগুলো সে যেন এক গ্রাসে গিলে ফেলল, এখানে ওখানে দু'একছত্র পড়ে গেল, ছত্রগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেল, কখনো বা থেমে গিয়ে আবার প্রথম থেকে পড়তে শুরু করল। লোভীর মতো মিষ্টি কথাগুলি বার বার চেখে দেখল, উপভোগ করল। এবার তার ক্ষিদের জ্বালা শান্ত, চিঠিগুলো গুছিয়ে নিয়ে আবার ধীরে ধীরে পড়তে লাগল। প্রতিছত্রে আনন্দের ধারা নেমেছে। প্রেম তার লজ্জা নিয়ে এল। লাল হয়ে উঠল সে। হায়, মার্কের কি ক্ষতি সে করেছে !

মার্ক উচ্ছ্বসিত হয়নি। সে ভাবপ্রবণতাকে ঘৃণা করে। (ভাবপ্রবণতা তাই তাকে পেয়ে বসেছে।) চিঠিতে মিষ্টি কথা সে এড়িয়েই গেছে, অথচ কলমের ডগায় তাদের আনাগোনা আছে একথা সুস্পষ্ট ধরা যায়। মা ছাড়া এই আত্মনিপীড়ন কে আর এত ভালো করে বুঝবে ! আনেৎ অভিভূত হোলো। মার্ক চিঠিতে 'প্রিয়' এ শব্দটা পর্যন্ত ব্যবহার করেনি। তার প্রথম চিঠিতে সে লিখেছে :

'মা, আমাকে তুমি ভালোবাস না···(আনেৎ শিউরে উঠল, সংকুচিত হয়ে গেল)···আমি নিজেকেও বুঝি ভালোবাসি না ! কেউ যে ভালোবাসবে এমন কিছুই তো করিনি, তাই মনে হয় আমাকে ভালো না বাসাই বুঝি সঙ্গত। কিন্তু

আমি তো তোমার ছেলে মা! আমি তোমার যতো কাছে আসতে পারি, অন্য কারো কাছে তো পারি না। একথা তোমাকে এতদিন বলতে পারিনি। আজ তোমার কাছে আমাকে লিখতে দাও। একজন বন্ধু আমার চাই। আমার তো কেউই নেই। আজ শুধু বিশ্বাস করতে দাও তুমি আমার বন্ধু, আমার প্রতি তোমার বন্ধুত্ব না থাকলেও এইই আমার প্রার্থনা। এ-নিয়ে প্রশ্ন কোরো না! আমি জানতে চাই না তুমি নিষ্ঠুর, নির্দয়। দয়া আমি ঘৃণা করি, অপমানিত হতেও চাই না, প্রতারিত হতেও ইচ্ছে নেই। তুমি ভালো বলেই তো তোমাকে ভালোবাসি না, তুমি বিশ্বাসী বন্ধু বলেই বাসি। না, না, এ নিয়ে প্রশ্ন কোরো না! আমার সম্বন্ধে যা কিছুই ভাব, তবু তুমি আমার বন্ধু। আমার মা যদি আমার বন্ধু না হন, আমি আমার বন্ধুর কাছেই লিখছি, মার কাছে লিখছি না। কারো কাছে নিজের কথা আমাকে বলতেই হবে। মনের উপর চেপে আছে ভারী বোঝা। আমি বড় নিঃসঙ্গ, বড় নির্বোধ। আমাকে সাহায্য কর! তুমি অন্যকে সাহায্য করেছ একথা আমি জানি। আমাকেও নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। আমার কথাগুলো শোন। উত্তর আমি চাই না। অনেক বলবার আছে। আমি যা ছিলাম এখন আর তা নই। এক বছর ধরে আমার ভিতরে চলেছে পরিবর্তন ; পরিবর্তনের পর পরিবর্তন। চিঠির শুরুতে আমি এই একবছর কি করেছি বলতে চেয়েছিলাম, কি করে আমার পরিবর্তন এসেছে সে-কথাও। কিন্তু এখন ভয় পাচ্ছি, অনেক লজ্জার ইতিহাস সেখানে। তোমাকে দূরে সরিয়ে দেবে সে-কথা, এমনিই তো তুমি বহুদূরে সরে আছ! কিন্তু একদিন সব কথাই বলব, সেদিন ঘৃণা করলেও থামব না। তোমাকে না বলতে পারলে নিজেকে যে আরো বেশী ঘৃণা করতে হবে। হাঁ, তোমাকে বলবই, কিন্তু আজ নয়। আর একদিন। আজ এইই যথেষ্ট, তাই তোমাকে আলিঙ্গন জানাচ্ছি বন্ধু।'

উদ্ধত ভালোবাসার এই স্বর আনেৎকে বিভ্রান্ত করে তুলল, হৃদয়ের উপরে যেন ভারী হয়ে চেপে বসে প্রভুত্ব করল সে-স্বর। অন্য চিঠিগুলোতেও এই দুর্দম, উদ্দাম আত্মারই প্রকাশ। কিন্তু মার্ক তার মনের দুঃসহ ভার মার কাছে ব'লে লাঘব করবে কিনা তখনো স্থির করতে পারেনি। প্রতি চিঠিতেই সে তাই লিখেছে :

'এবার কি পারব? না, এখনো নয়। আমি মোটেও পারব না। তুমি স্ত্রীলোক একথা ভুলে গেলে তবে বুঝি পারব। বন্ধু,—আমার বন্ধু হবে তো?

পারবে হতে? তুমি তো স্ত্রীলোক। আর স্ত্রীলোককে আমি অবিশ্বাস করি। ওদের সম্বন্ধে তেমন ভালো ধারণা নেই। আমাকে ক্ষমা কর তুমি! কিন্তু তুমি তো ওদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু একথা কিছুদিন আগেও মনে হোতো না। ভাবতাম, তুমিও ওদেরই মতো। তোমাকে আমি তখনো ভালোবাসতাম, (কিন্তু জানাইনি) হয়ত কৃতজ্ঞতাবশতঃই বাসতাম, কিন্তু বিশ্বাস ছিল না। এখন তো সব বদলে গেছে। অনেক পরিবর্তন। যা কিছু দেখেছি, শিখেছি আর ভেবেছি তোমার আমার আর সবার ভিতরে—হাঁ, বুঝতেই পারছ আমি অনেক শিখেছি—বড় বেশী শিখে ফেলেছি! আর এরই ভিতরে অসুন্দরের ব্যথা আমার বুকে বেজেছে। কিন্তু মনে মনে তখন বলেছি, ওরা সত্য বলেই তো ওদের জানা ভালো। পৃথিবী কুশ্রী, মেয়েদের সম্বন্ধে মতামত আমার ভালো নয়। মানুষকে আমি ঘৃণা করেছি, ঘৃণা করেছি নিজেকে; কিন্তু তোমাকে করেছি সম্মান। তোমাকে দেখবার মতো দিব্যদৃষ্টি আমি পেয়েছি। তোমার সম্বন্ধেও জেনেছি অনেক কথা, সেকথা তুমিও আমাকে বলনি (না, সব তো বলনি!)—মাসী সেকথা বলেছে! আবার মাসী যা জানে না তাও অন্যের কাছ থেকে শুনেছি। মাসী ভালো মানুষ, কিন্তু সেও সেকথা বুঝতে পারবে না। আমি নিজেও পারিনি। (অথবা মনে হয়েছে, আমি পেরেছি।...না।...হাঁ আমি নিশ্চিত বলতে পারি!)—এতে আমি নিজের পরিচয় পেয়েছি, অন্য সময় তো এ স্বরূপ আমার জানা হোতো না।—যা কিছু লিখলাম, সব যে এলোমেলো হয়ে গেল!'

কাগজের উপর কলমের খোঁচায় ছোট ছোট ফুটোর সৃষ্টি হয়েছে। বোধহয় মনের অস্থৈর্যই তার কারণ।

'কাছে বা দূরে যেখানেই থাকি নিজের কথা বলা ভারী শক্ত। মনে হয় যেন জিভে গেঁরো পড়েছে। ভেবেছিলাম, তুমি সামনে থাকলে বুঝি আমার কথা বলতে পারব। কিন্তু তাতো নয়। আমি জানিনা কি হয়। তোমার চোখের দৃষ্টি আমাকে পাগল করে দেয়...তারা যেন আমাকে রক্ষা করে আবার ঠাট্টাও করে...কখনো বা উদাসীনতা সেখানে ফুটে ওঠে। বোধহয় তখন অন্য কথাই তুমি ভাব। তাকাও, আমার হৃদয়ের দিকে তাকাও, তলদেশে চলে যাও! নিজের ছেলে হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, মানুষ হিসেবে আমাকে দেখ!'

আনেৎ দেখল মার্ক যেন তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। কি তীব্র সে-দৃষ্টি। অনেৎ চোখ ফিরিয়ে নিল। তার ছেলে এখন আর ছোটটি নেই, সে দস্তুর

মতো পুরুষ! একথা তার এতদিন মনেই হয়নি। মা তো সব সময়েই তার সন্তানকে ছোট দেখে। এই ছেলেমানুষি চিঠিগুলোতে রাগের ঝাঁজ আছে, আছে অনিশ্চয়তার শঙ্কা। হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে যেন চিঠিগুলি, তবু তো প্রভুত্বের স্বর ঝরে পড়েছে তার ছত্রে ছত্রে। সেই পুরাকাল, যখন বিধবা মাকে বড় ছেলের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিতে হোতো, তেমনি করে আনেৎকেও আজ নিতে হোলো। সে মাথা নোয়াল।

কিন্তু তাড়াতাড়ি আবার মাথা তুলল।

'আমার ছেলে। তাকে আমি গড়েছি। আমার সৃষ্টি। সে আমার সমান।'

॥ চার ॥

গোধূলির আলোয় বসে বসে সে পড়ল চিঠিগুলো ; কখন আঁধার হয়ে এল টেরও পেল না। মার্ক ফিরে এসেছে বাড়িতে, ঘরে ঢুকল। হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি সে টেবিল থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিল চিঠিগুলো, নিচে পড়ে গেল। সে চিঠি পড়ছে জানতে দিতে চাইল না। নিজের কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে চিঠিগুলো প্রথম পড়ছে—একথা জানতে দেবে না।

আঁধারে সে বসে আছে দেখে মার্ক অবাক হয়ে গেল। সে আলো জ্বালতে গেলে আনেৎ বাধা দিল। এবার ওরা এল জানালার কাছে। কথাবার্তা শুরু হোলো—কিন্তু সহজভাবে নয়। নিচের রাস্তার দিকে তাকিয়ে তারা দেখল। বাড়ির ফটকে ফটকে আলো জ্বলছে, ছায়ার মতো চলেছে লোক-গুলো। দু'জনেই অপ্রতিভ। আনেৎ এই নতুন অনুভূতিগুলি সাজিয়ে নিচ্ছিল। নতুনই বটে! আগে কখনো তার মনে তাদের আনাগোনা সে টের পায়নি। মার্ক তখনো তাকে বিশ্বাস করতে পারল না ; তার মন তিক্ততায় ভরপুর। সে যা কিছু বলেছে, এখনো সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছে আনেৎ। তারা কথা বলে গেল, ঠাণ্ডা স্বর, এলোমেলো তাদের ভাষা ; বহু বিরতিভরা। বিকেলে কি শুনে এসেছে মার্ক বলল। যুদ্ধ আর মৃত্যুর খবর, বিশেষ কিছু নয়। আনেৎ বুঝি শুনতেও পেল না। নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল।

হঠাৎ সে তাকে জড়িয়ে ধরল।

মার্ক ধরা দিল আলিঙ্গনে, সে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেছে।

আনেৎ তাকে বলল : 'আলোটা জ্বালিয়ে দাও!'

বিজলী আলোর বোতাম টিপল মার্ক। টেবিলের তলায় চিঠিগুলো ছড়িয়ে আছে সে দেখতে পেল। আনেৎ তাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েও দিল। এক মুহূর্ত আগেও যে কথা চেপে রাখতে চেয়েছিল, সে স্বীকার করল, ক্ষমা চাইল তার কাছে।

'বন্ধু, বন্ধু আমার···'

চিঠির সেই গর্বোদ্ধত মানুষটি তো আর নেই, এখন সে ছোট্ট ছেলেটি। নিজের ভাবাবেগ দমন করতে ছুটে পালাল নিজের ঘরে।

আনেৎ তাকে অনুসরণ করল না। তার নিজের ভাবাবেগ দমন করতে হবে। সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানেই রইল। চুপচাপ। দেওয়ালের ওপাশেও কোনো সাড়াশব্দ নেই।

সিলভী এসে এই নীরবতা থেকে তাদের মুক্তি দিল। তিনজনে বসল খেতে, সিলভী কড়া নজর রেখেও বুঝতে পারল না কি হয়েছে মার আর ছেলের। তারা দু'জনে যেন বহুদূরে সরে গেছে, অথচ প্রশান্তি এসেছে ফিরে।

সিলভী বিদায় নিল, তারা বসে রইল টেবিলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফিসফিস করে নিজেদের কথা বলে তারা হৃদয়ের ভার লাঘব করে দিল। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে ঘুরে ঘুরে চলল তাদের আলাপ। শোবার সময় হোলো এবার। তারপর মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে খালি পায়ে উঠে এল মার্ক, আনেৎ এর ঘরে ঢুকল। তার বিছানার পাশে একটা নিচু চেয়ারে সে বসে পড়ল। কথা তারা বলল না, চাইল শুধু পরস্পরের সান্নিধ্য।

নিস্তব্ধতার বুকে জেগে উঠল গৃহের নিপীড়িত আত্মা। দুঃখ আর কামনা লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠল। নিচের তলায় বের্নাণ্ড্ পরিবার পুত্র হারিয়েছে —তাদের শোকসন্তপ্ত আত্মা মিশে আছে চিরন্তন স্তব্ধতায়। দোতালার মঁসিয়ে ঝিরের হারিয়েছেন তার একমাত্র পুত্রকে, তিনি দেশপ্রেমরূপ পৌত্তলিকতায় নিজেকে ক্ষইয়ে ফেলছেন এখন, হতাশাই তার একমাত্র আশ্রয়। তারই উপরে বাস করে তরুণ শার্দনেদের পরিবার। একটা গোপন অব্যক্ত লজ্জা যেন দেহমন ছেয়ে ফেলেছে, তপ্ত লোহার মতোই পুড়িয়ে দিচ্ছে : যারা পরস্পরকে ভালোবেসে চিরদিনের জন্য অভিন্নতার শপথ নিয়েছিল, তারা আজ পরস্পরের অজানা,

অচেনা যেন। এমনকি আনেৎ-এর তলায়, ওপাশে যে খালি ঘরটা এখন বন্ধ আছে, ওখানে সেই আত্মঘাতিকা কামোন্মাদ নারীর উষ্ণ নিশ্বাস ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়ি তো নয় যেন আধ পোড়া ধোঁয়ান মশাল। জীবন্ত যারা এই বাড়িতে আছে, তারাও রাতের এই প্রহরে এখনো ঘুমোতে পারেনি। দুঃখ, জ্বরের ঘোর আর কামনা গ্রাস করেছে তাদের।

এই দগ্ধ আত্মার সাগরের ঢেউয়ের চুড়ায় চুড়ায় সাঁতরে চলেছে মা আর ছেলে। দু'একটা কথায়ই তারা বুঝল, এই দুঃখ আর কামনাকে কেন্দ্র করেই তাদের ভাবনা। তারা এড়িয়ে গেল এ প্রসঙ্গ, কিন্তু শক্ত করে চেপে ধরল পরস্পরের হাত। পরস্পরকে হারিয়ে ফেলবে বলে তারা যেন ভয় পেয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, দু'জনে পালাচ্ছে সেই আগুনের ভিতর দিয়ে।

আনেৎ আবার মা। সে তার খুদে এনিয়াসকে বললে: 'এখন ঘুমোতে যাও! এত রাত জাগা ভালো নয়। ঠাণ্ডা লাগবে।'

মার্ক মাথা নাড়ল: 'তুমি তো বহুদিন আমার সেবা করেছ। এবার যে আমার পালা।'

ভোর হয়ে এসেছে। মার্ক ঘুমিয়ে গেছে চেয়ারে, মাথাটা এলিয়ে পড়েছে। আনেৎ উঠে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। মার্ক জাগল না। জানালার পাশে চেয়ারে বসে দিনের প্রতীক্ষায় রইল আনেৎ।

॥ পাঁচ ॥

সন্ধ্যে আর রাতের কথাবার্তায় তারা বেশী কিছু বলেনি, শুধু পরস্পরকে খুঁজে পেয়েছে এই কথাই তারা জানাল। এখন থেকে তারা পাশাপাশি চলবে। মনের গহনের কথা তারা স্থগিত রাখল, পরে বলবে। কিন্তু দিনের পর দিন গেল, বলা হোলো না। আনেৎ আস্তে আস্তে বুঝতে পারল, এক বছরে তার ছেলে অনেক শিখেছে, যুদ্ধ আর সমাজ সম্বন্ধে সে সচেতন। সে তার কথায় অভিজ্ঞতার আমেজ পেল। (মার্কের স্বর বলতে গিয়ে লজ্জায় জড়িয়ে গেল, আনেৎও শুনে পেল লজ্জা)—মার্ক বলে গেল, কি করে সে আবিষ্কার করেছে তার মার আত্মা, আর সেই আত্মার প্রতি জানাল সে শ্রদ্ধা।

কিন্তু তার হৃদয়ে যে দুঃখ ভারী হয়ে চেপে বসেছে সে-কথা মার্ক বলতে পারল না। আনেৎও বাধা দিল। কিন্তু কিছু পরেই বুঝতে পারল, ওকথা না বলতে পারলে সে স্বস্তি পাবে না। সে অশান্ত আত্মার স্বীকারোক্তিতে সাহায্য করল।

সন্ধ্যায়, গোধূলির আলোয়—যখন স্বীকারোক্তির সময় আসে ঘনিয়ে, মানুষ যখন নিজের সম্বিৎ ফেলে হারিয়ে—ঠিক তেমনি এক প্রহরে জানালার ধারে বসে আনেৎ বলল : 'তোমার মনে বোঝা চেপে বসে আছে। সে-বোঝা আমাকে দাও, আমি বইব।'

মাথা নিচু করল মার্ক : 'দিতে চাই, কিন্তু পারি না তো।'

আনেৎ তাকে কাছে টেনে এনে তার চোখ আঙুল দিয়ে চেপে ধরে বলল : 'এখন তো তুমি একা। বল, বল!'

মার্ক ফিসফিসিয়ে বলতে শুরু করল, কষ্ট হচ্ছে যেন তার। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা—ভাল মন্দ সব কিছু ঝরে পড়ল। সে দৃঢ় স্বরেই বলল; মনে হোলো এ যেন তার নিজের কথা নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে থেমে গেল স্বর, জড়িয়ে গেল। আর বুঝি বলবার তার সাহস নেই। আনেৎ নীরব। আঙুলে সে অনুভব করল তার জ্বলন্ত চোখের স্পর্শ, তার লজ্জা। তার আঙুলের চাপে তাকে জানিয়ে দিল : 'বল, বল! আমি তো তোমার লজ্জা নিয়ে নিলাম নিজে!' স্বীকারোক্তি, আর লুকানো কথার আভাসে তার মনে হোলো, এসব সে আগেই জানে। এ সেই পৃথিবী, যেখানে সে অদৃশ্য শক্তির তাড়নায় এসে পড়েছে—তার ছেলেকে সে ছুঁড়ে ফেলেছে সেখানে। তার জন্য তার করুণা হোলো, করুণা হোলো নিজের জন্য।

'এস! আবার আমরা নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াই! এই তো নিয়ম। এস, আমরা তাকে স্বীকার করে নিই!'

কাহিনী শেষ করে সে ভয় পেল, মা কি বলবে কে জানে। আনেৎ ঝুঁকে পড়ল ছেলের মাথার উপর, চুমু খেল। মার্ক শুধাল : 'একথা ভুলে যেতে পারবে?'

'তাহলে আমাকে তুমি ঘৃণা কর?'

'নিজেকে আমি ঘৃণা করি। আমি আর তুমি তো এক!'

'আমি নিজেকে ঘৃণা করি।'

'আমিই কি নিজেকে ঘৃণা করি না?'

'না, না! তুমি তা কোরো না!'

'আমরা মানুষ, আমরা গর্বিত, আবার নিচও।'

'না, না! তুমি তা নও!'

'বাছা, আমার জীবনও তো পবিত্র নয়। আমি ভুল করেছি, এখনো করছি। শুধু নিজের কাজেই নয়। আমাদের মত মানুষের জন্য বিচার-বুদ্ধিতো শুধু পুলিসের কাজ নিয়ে শাস্তি দিয়েই সন্তুষ্ট হয় না। আমাদের কামনা আমাদের ইচ্ছাও যে আমাদের কাজের মতোই অপবিত্র। আমাদের চিন্তাও তো কলুষিত।'

'তোমারও তাই? হাঁ, আমিও তা জানতাম।'

'জানতে?'

'হাঁ, তাই তো তোমাকে এত ভালোবাসি। আমার মতো যে ভাবে না, অনুভব করে না, তাকে কি আমি এত ভালোবাসতে পারতাম!'

'হাঁ, নিষিদ্ধ পৃথিবীই আমাদের ভালোবাসাকে নিবিড় করে তুলেছে।'

তার পিছনে বসে আনেৎ তার কাঁধে হাত রাখল, তাকে জড়িয়ে ধরল নিঃশব্দে। এক মুহূর্ত পরে মার্কের বুক ঠেলে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল:

'স্বীকারোক্তির মহিমা এবার বুঝলাম। এখন আমি শান্ত।'

'হাঁ, যখন মানুষ সব কিছু বলতে পারে, আর অন্যে শুনতে পারে, তখনই তো আসে শান্তি। কিন্তু আমি কার কাছে বলব আমার কথা? আমার যে বলবার অনুমতি নেই।'

'তোমার তো কোন দরকারও নেই।'

নিস্তব্ধ অন্ধকারে শোনা গেল মার্ক আবৃত্তি করছে:

'তুমি এসেছ, তোমার হাত দিয়ে আমাকে ধরে আছ—আমি চুমু খাচ্ছি হাতে: হাঁ ভয়ে ভালোবাসায় আমি চুমু খাচ্ছি।'

আনেৎ কেঁপে উঠল। অতীত থেকে কি ভেসে এল স্বর!

'হা ঈশ্বর! তুমি একথা জানলে কি করে?'

মার্ক নিরুত্তর। সে আবার আবৃত্তি করল:

'আমাকে ধ্বংস করতেই তুমি এসেছ, হে প্রেমময়—'

আনেৎ হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরল: 'থাম, থাম!'

লজ্জা পেল। 'কতদিন আগে! সে কি আমি…অন্য কেউ…আমি তো তখন অন্য মানুষ। সে তো মরে গেছে।'

'হাতে চুমু খেলাম তার—' মার্ক বলল।

'কি করে জানলে?'

মার্ক নিরুত্তর।

'কতদিন হোলো জেনেছ?'

'সে আমাকে বলেছে। আমি মুখস্থ করে রেখেছি।'

'মুখস্থ করেছ? আমার সঙ্গে এত বছর কাটালে বুঝতে পারনি? কি অবিচার!'

'আমাকে ক্ষমা কর!'

'অদ্ভুত ছেলে তুমি।'

'তোমার কি মনে হয় না তুমিও অদ্ভুত স্ত্রীলোক?'

'স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে তুমি কি জান? না, কিছুই জান না।'

সে তীব্র প্রতিবাদ জানাল।

আনেৎ হাসল: হায়রে গর্বান্ধ হতভাগ্য! 'তোমার জ্ঞানের অতো বড়াই কোরো না! কতটুকু তোমার জ্ঞান···ওদের সম্বন্ধে যা জেনেছ সে তো জানাই নয়। পুরুষ নিজের আনন্দের মাপকাঠিতে মেয়েদের বিচার করে। তাদের প্রকৃতি জানতে হলে নিজেকে ভুলে যেতে হবে। কিন্তু তোমার এ বয়সে তা সম্ভব নয়। বন্ধু, আমিও হাজার হাজার স্ত্রীলোকেরই মতো, তাদের থেকে আলাদা তো নই। আমাকে যদি তারা বুঝতে পারে, নিজেদেরই চিনতে পারবে। কিন্তু তারা তো চিনতে চায় না, নিজেদের ঘরের সার্সি বন্ধ করে থাকে; তাদের কাছে থেকেও তাই তাদের চেনা যায় না। কি ঘটছে তাদের মনে, কেউ জানতে চায় না। খুদে শয়তান, তুমি তো ফাঁক দিয়ে দেখেছ! খুব অবাক হয়ে গেছ নিশ্চয়ই? আর অবাক লাগছে এই ভেবে যে তুমি দেখতে পেলে! বন্ধু, যা দেখেছ সে তো মেয়েদের স্বরূপ।'

'কিন্তু সে তো সরল কিছু নয়। সব হেঁয়ালি।'

'তোমরাও কি সরল? আমাদের ভিতরে যে বহু সত্তা লুকিয়ে আছে।'

'কিন্তু সে বহু তো একই।'

'না, সকলের কাছে নয়।'

'তোমার আমার কাছে তো এক। আমি সেই একককেই ভালোবাসি। আমি চাই তুমি আমার ভিতরের একককেই ভালোবাসবে।'

'দেখা যাবে। প্রতিজ্ঞা করব না।'

'আমাকে চটাবার জন্যই তো ওকথা বলছ। কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসতে বাধ্য করব।'

'তুমি জানো উৎপীড়নে আমাকে নোয়ানো যায় না।'

'কিন্তু হৃদয়ের তলায় উৎপীড়নই তো তুমি ভালোবাস।'

'হাঁ, যদি উৎপীড়ককে ভালোবাসি তবে তো।'

'তাকে ভালোবাসতে হবে।'

এখন সে শক্তিমান। তার সঙ্গে ছেলেমানুষের মতো ব্যবহার করার ভানও বৃথা। তাকে প্রতারিত করতেও সে পারবে না। তার প্রভুত্ব সে জাহির করেছে। আর তাদের এই যুগ্মজীবনে সে-শাসন মেনে নিয়েছে আনেৎ। তার কাছে আত্মসমর্পণে তার যেন এক গোপন আনন্দ।

ছয় ॥

পুরুষরা যা করে সেও তাই করল। জয় করতে না করতে সে তার প্রভুত্বের অপব্যবহার শুরু করল।

সে ঘরে এল। আনেৎ বসে বুনছিল। সে তার কাছে গিয়ে চুমু খেল। তার মনে তখন অনেক কথা। তার দিকে তাকাল, তারপর সরে গিয়ে বইয়ের তাকে বই দেখল কিছুক্ষণ। তারপর জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে সুমুখে বসে পড়ল। পাতা ওলটাচ্ছে বইয়ের, যেন পড়ছে। তারপর হাত বাড়িয়ে মার হাত ধরে তাড়াতাড়ি বলল: 'তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

এই কথাই সে বহুদিন বলতে চেয়েছে, কিন্তু সাহস হয়নি। তাই এখন তাড়াতাড়ি বলতে চাইল। যে মুহূর্তে সে ঘরে ঢুকেছে, আনেৎ-এর মনে হয়েছে, কি কথা তার ঠোঁটে এসে থেমে আছে। সে ভয় পেল, এড়িয়ে যেতে চাইল। কিছু একটা খোঁজবার ছলে উঠে গেল, তারপর উদাসীন স্বরে বলল: 'এস, তোমার কি বলবার আছে বল!'

মার্ক শক্ত করে চেপে ধরল তার হাত। আনেৎকে বসে পড়তে হোলো। সে তার হাত ছাড়ল না, চোখ তার নিচু, নিজে বুঝি সে শক্তি সঞ্চয় করছে।

'মা,' সে হঠাৎ বলে উঠল : 'একটা কথা এতদিন বলা হয়নি। তোমার ব্যাপার তোমারই, তা নিয়ে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার বলবার অধিকার আছে। এযে আমারও ব্যাপার। বাবার কথাই জিজ্ঞেস করছি!'

ভাবাবেগে উদ্বেল মার্ক। অস্বাভাবিক জন্মের জন্য তার যে দুঃখ সে তো আজ নতুন নয়। সমাজের সংস্পর্শে সে এরই জন্য অনেক তাচ্ছিল্য সহ্য করেছে, তার মন কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্বীকার করতে সে চায়নি। এত গর্ব তার!

লিসে-তে প্রথম মাসেই সে আঘাত পেয়েছিল, আঘাত ফিরিয়েও সে দিয়েছিল। কিন্তু ততো গভীর তো ছিল না সে-আঘাত। পারীর স্কুলের ছেলেদের বাপ-মার কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ও নেই—বিশেষত যুদ্ধের সময়ে, তখন তো নীতিবাদই উবে গেছে। মেয়েদের প্রতি লুব্ধ ঘৃণায় তারা ভরপুর, ওরা তো তাদের শয্যাসঙ্গিনী ছাড়া অন্য কিছু মনেই করতে পারে না। মেয়েদের শালীনতাবোধের অভাবে তারা ভর্ৎসনা করে না। মার্ককে তারা শুধু দু'একটা রসিকতা করেই ছেড়ে দিয়েছিল। তার ভিতরে কোনো ঘৃণা ছিলনা। বরং এ যেন প্রশংসাই—এই তাদের মনোভাব। কিন্তু মার্ক সেভাবে নেয়নি কথাগুলি। সে তার মার সম্বন্ধে অশিষ্ট ইঙ্গিতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল; মার সম্মান অটুট রাখতে সে ব্যগ্র। আনেৎ নিজে যতটা তার থেকেও বেশী ব্যগ্র ছেলে। প্রশ্নের উত্তর সে ঘুষিতে দিয়েছিল।

তারপর সে ছুটিতে এল মার কাছে। গ্রামাঞ্চলের আবহাওয়ায় সে টের পেল কানাকানি। তাদের দু'জনকে দেখলেই তারা কি যেন গুজগুজ করে বলে। কেউ কেউ বা তাদের পাশকাটিয়ে চলে যায়। মার কাছে সে কোনো কথাই বলল না। কিন্তু গ্রামের প্রতি তার অপরিসীম ঘৃণা দেখা দিল তার মনে। সে ঠিক করল, আর সেখানে যাবে না।

কিন্তু এসব তো তুচ্ছ ব্যাপার। যখন মানুষ কাউকে অশ্রদ্ধা করে, তাদের সম্বন্ধে তারা ভাবতেও চায়না। ধুলোর মতোই তার স্থায়িত্ব। জুতো ঝাড়লেই তো ধুলো ঝরে পড়ে, তারপর থুথু দিয়ে ঘষে ফেললেই হোলো, একেবারে ঝকঝকে হয়ে যাবে জুতো। কিন্তু যাদের জন্য আছে প্রাণের আকর্ষণ? যাদের জন্য হৃদয় ক্ষুধার্ত? তাদের সম্বন্ধে কি হবে?

মার্ক আঠারো বছরে পা দিয়েছে, তার পদবিক্ষেপ ভালোবাসার সোনালী

ছায়া পার হয়ে গেছে। অস্থির হৃদয়ে দেখা দিয়েছে কোমলতা, স্কুলের এক বন্ধুর বোনের প্রেমে সে পড়েছিল। কয়েকবার দেখাও হয়েছে তাদের, পথে ভাইয়ের সঙ্গে, কখনো বা একা। অনুরাগ তাদের উভয়ত, বন্ধুর বাড়ি মার্ক গেছে বহুবার, কিন্তু কখনো নিমন্ত্রণ পায়নি। সে এ অপমান হয়ত অনুভব করত না, কিন্তু তার বন্ধুই নিমন্ত্রণের আশায় তাকে উল্লসিত করে তুলল। তারপর থেকে দেখা দিল বন্ধুর এড়িয়ে যাবার ব্যগ্রতা, তার লজ্জা। মার্ক বুঝতে পারল, তাকে সে অপমান করছে, তার পরিবার এই অবাঞ্ছিত ছেলেটিকে সরিয়ে রাখতে চাইছে। এই প্রচণ্ড আঘাতে মার্ক ঘৃণার আরো নানা ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করল। এ সম্বন্ধে আগে সে সন্দেহও করেনি। সে বুঝতে পারল অন্যান্য বাড়িতে কেন তার প্রবেশ নিষেধ। কখনো সেখানে যেতে তার ইচ্ছে হয়নি, তবু আজকে মনে হোলো, দরজাগুলো তার মুখের উপর বন্ধ হয়ে গেছে।* অপমানিত হোলো সে। এই সমাজের বিরুদ্ধে দেখা দিল বিদ্রোহ।

শেষে মার পক্ষ নিয়েই রুখে দাঁড়ালো, কিন্তু এই অপমানে মার বিরুদ্ধে গোপন আক্রোশে সে জ্বলে উঠল। তার আহত মন বার বার প্রশ্ন করল: তার বাবা কে? তার স্নেহ থেকে কেন সে বঞ্চিত হোলো? সে জানত, মাকে একথা বললে মনে ব্যথা পাবে। কিন্তু নিজে সে ব্যথা পেল বার বার। যার যার ভাগ সে তা পাবেই! সে জানবে, মাকে জিজ্ঞেস করবে।

আনেৎ বুঝতে পারল মার্ক কি বলতে চায়। তখনো তার আশা, হয়ত মার্ক বলবে না সে-কথা। অতীতের এই গুপ্ত কথা সে তাকে জানাতে বাধ্য এ কথা সত্য, সে নিজেই তো একথা একদিন বলবে। কিন্তু আজ নয়, সে ভয় পাচ্ছে। আর এই মুহূর্তে হঠাৎ মার্ক তাকে একথা জিজ্ঞেস করে চমক লাগিয়ে দিল।

'বাছা' আমার, ধীর কণ্ঠে বলল আনেৎ: 'সে তো তোমাকে চেনে না। আমি তো তোমাকে বলেছি, পৃথিবীর চোখে আমি নিষ্পাপ নই—তোমার জন্ম থেকেই তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি।'

'তাতে কিছু যায় আসে না। আমি জানতে চাই কে সে? আমার সে-অধিকার আছে।'

তার অধিকার? তারও?…আনেৎ বললে: 'হাঁ তোমার অধিকার আছে বইকি।'

'সে কি এখনো বেঁচে আছে ?'

'হাঁ।'

'কি নাম তার ? কে সে ? কোথায় থাকে ?'

'হাঁ, সবই বলব। কিন্তু একটু···একটু অপেক্ষা কর।'

তার হৃদয় ভারাক্রান্ত, মার্ক দুঃখিত, তবু সে জানতে চাইল। সে শান্ত স্বরে বলল : 'তাড়াতাড়ি নেই। আর একদিন না হয় শুনব'খন।' তার এই ছদ্মসহিষ্ণুতায় প্রতারিত হোলো না আনেৎ। সে তো বিশ্রাম চায় না। সে নিজের ইচ্ছাশক্তি ফিরে পেয়েছে।

'না, আজ সন্ধ্যায়ই বলব, তুমি শোনবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছ, আর আমিও তোমাকে শোনাতে চাই। তুমি ঠিকই বলেছ, এ তোমার অধিকার। আমি সে-অধিকার লুকিয়ে রেখেছিলাম। বহুদিন আগেই তা বলা উচিত ছিল, আজ সন্ধ্যেয় সে-ঋণ তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে।'

পুত্র ক্ষমা চাইল।

'শান্ত হও,' আনেৎ বলল : 'আমি আজ সন্ধ্যেয়ই বলব।'

বলতে চাইছে, কিন্তু মার্কের আর শোনবার বুঝি ইচ্ছে নেই।

'আলোটা জ্বাল,' সে বলল : 'দরজা বন্ধ করে দাও। কেউ যেন আমাদের বিরক্ত না করে।'

সবে শুরু করেছে এমন সময় দোরে কে ঘা দিল। সিলভীই হবে। দরজা রইল বন্ধ।

ভাবাবেগ নেই তার ভাষায় ; সে বলে গেল অতীতের কাহিনী, বিবাহের অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা। সে গর্বভরে বলে গেল। একেবারে নিজস্ব কথা কিছুই বলল না, কিন্তু যা বলবার ছিল গোপনও করল না। মার্ক শুনে কি ভাবছে ? অনুভূতির প্রকাশ হোলো না তার। স্তব্ধ হয়ে সে শুনল। মা আর ছেলে দু'জনেই যেন অতীতের এই কাহিনীর অপরিচিত দর্শক। পর্দায় ছবির পর ছবি ফুটে উঠছে, তারা দেখছে। ভগবানই শুধু জানেন, কি উন্মুখ হয়ে ছিল আনেৎ সহানুভূতির ঢেউয়ের প্রতীক্ষায় ! তবু সে আবেদন জানাল না। কাহিনীর শেষ পর্যন্ত মার্ক দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্যে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। যখন রায় দেবার সময় এল, সে শুধু বলল : 'কই তার নাম তো বললে না ?'

এতক্ষণ সে তার নামই শুধু বলেছে, পদবী ছিল অজানা। এবার সে বলল : 'রজের ব্রিসো—!'

তার ছেলের উদাসীনতায় জমে গেছে তার বুক।

মার্ক শুধু নাম ছাড়া কিছুই শুনল না। অতি পরিচিত নাম। সে চিৎকার করে উঠল: 'সোশালিষ্ট ডেপুটি রজের ব্রিসো!'

তার চমক বহু কষ্টে লুকিয়ে রাখল—না, তার আনন্দ বুঝি লুকিয়ে রাখতে পারল না মার্ক!

ব্রিসো গণপরিষদের বক্তা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তরুণদের তিনি মুগ্ধ করেছেন। আনেৎ তার ছেলের চোখে সে-মোহ দেখতে পেয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু গর্বিত বলেই সে মনের ভাব দেখতে চাইল না, শত্রুকে সে হেয় করল না: 'হাঁ, নামটা বিখ্যাতই বটে। তোমাকে লজ্জা পেতে হবে না।' একথা বলেই সে তাকাল তার ছেলের দিকে। মার্কের ঠোঁটে সে যেন পড়ল: 'সে-নাম থেকে আমাকে বঞ্চিত করলে কেন?'

কিন্তু মার্ক কথা বলল না। সে উঠে পড়ে ঘরে পায়চারি করতে লাগল। আনেৎ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তার প্রতি ভঙ্গিটি। সে বুঝতে পারল তার ছেলেকে। নিজেকে আর সমর্থন করবার শক্তিও সে যেন হারিয়ে ফেলেছে। ছেলে যদি তাকে সমর্থন না করে, কি হবে তার নিজের সমর্থনে? সে বিপদের মুখে এগিয়ে গেল, তাকে দূরে সরিয়ে রাখল না। জিজ্ঞেস করল: 'তাকে জানতে চাও?'

'হাঁ।'

'ইচ্ছে করলেই পার। আমি তোমাকে সব বলিনি। সে তোমার কথা জানে, জানে তুমি তার ছেলে। তোমাকে ছেলে হিসেবে বরণ করে নিতেও সে প্রস্তুত।'

মার্ক রাগে চিৎকার করে উঠলো: 'আর তুমি আমাকে সে-কথা কখনো বলনি!'

আনেৎ চোখ বুজলো, ম্লান হয়ে গেছে তার মুখ। আবার সে চোখ খুলে তাকাল ছেলের দিকে।

'আমি অপেক্ষা করছিলাম। ইচ্ছে ছিল তোমার বয়স হলে বলব। এখন তো তোমার বয়স হয়েছে।'

মার্ক তার গর্বোদ্ধত তিক্ততা অনুভব করতে পারল না, শুধু জিজ্ঞেস করল: 'কোথায় থাকে সে?'

'জানি না। তবে ঠিকানা জোগাড় করতে কষ্ট হবে না।'

মার্ক পায়চারি করতে লাগল ঘরে। মার কথা ভাবছে না। নিজের কথাই ভাবছে। তার উপরে অবিচার হয়েছে। সে নিষ্ঠুরভাবে বলল : 'কালই তার সঙ্গে দেখা করব।'

॥ সাত ॥

তরুণদের হৃদয় এত নিষ্ঠুর কেন? মার্ক একা তার ঘরে বসে অনুভব করল বিবেকদংশন : কিন্তু কেমন যেন ভালো লাগল তার, যে তাকে ভালোবাসে তাকেই সে হেনেছে আঘাত—সেও তো তাকে ভালোবাসে, তাই এসেছে অনুশোচনা। কিন্তু অনুশোচনার হুল তীব্র আনন্দ নিয়ে এসেছে, সে নিচ্ছে প্রতিশোধ। কিসের জন্য? যে অবিচার আনেৎ করেছে, তার জন্য? না, তাকে ভালোবেসেছে বলে? আনেৎ তাকে কম ভালোবাসলে প্রতিশোধস্পৃহা তো এমন জোরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠত না! একেবারে ভালো না বাসলে, সে-স্পৃহাই তো হোতো না। নিজেকে সমর্থন না করেই আনেৎ সব কথা তাকে বলেছে। আর তারই সুযোগ সে নিয়েছে। তার জন্য মনে এতটুকু বাধেনি, বরং আনন্দই পেয়েছে। নিজেকে এই বলে সমর্থন করেছে, সব কিছু সে ইচ্ছে হলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু সুযোগ নিতে শুরু করেছে সে, কোথায় গিয়ে এর শেষ হবে কে জানে!

আনেৎ আঘাত পেল। সে তাকে খুব ভালোবাসে। 'হাঁ, তাই। আত্মকেন্দ্রিক সে-ভালোবাসা। আর তা ছাড়া ভালোই বা কি করে বাসা যায়? আমার থেকে ওকে আমি সৃষ্টি করেছি। ও তো আমিই। ওকে ভালোবাসতে গিয়ে নিজেকে ভুলব কি করে? কিন্তু তাই তো করতে হবে। আমি তো পারিনি, এখনো পারি না। তার জন্য শাস্তি তো পেয়েছি যথেষ্ট।'

বহুদিন থেকেই সে জানত, এগিয়ে আসছে এই দিন। আজ সেদিন এল। বহু প্রতীক্ষায় কেটেছে তার। ছেলেকে হারাবার ভয়ে সে কতবার কেঁপে উঠেছে। তাকে সে তো নিজের ঈর্ষা দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। তাকে সে হারিয়েছে। তার কাছ থেকে ছিন্ন করে নিয়ে যেতে একমুহূর্তই তো যথেষ্ট। ভয় পেল আনেৎ। এই তরুণদের মনে মাতার জীবনব্যাপী স্নেহের মূল্য তো

একমুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়! তাদের উদগ্র কামনার কাছে তার মূল্য তো অতি তুচ্ছ। হাঁ, একথা সে আগেই ভেবেছিল। কিন্তু ভাবনাকে ছাপিয়ে গেল বাস্তবতা। তাকে সে একটা ভালোবাসার কথাও বলল না, একটু সম্মানও দেখাল না। হাত দিয়ে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেল। অতীতের কোনো কথাই ভাবল না। অতীত তো তার কাছে অতীত, সে আগামীর কথাই শুধু ভাবছে। আনেৎ রাত কাটাল দুরু দুরু বক্ষে এই আগামী দিন আর রাতের ছবি এঁকে। সব শেষ হয়ে যাবে। সে তো আগেই পরাজয় মেনে নিয়েছে।

না, আর যুদ্ধের চেষ্টা বৃথা। মার্ক তার নিজের পথেই চলুক। তার সিদ্ধান্তের কাছে সে হার মানবে। তাকে বেশীদিন কাছে রাখতে না পারুক সে তাকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করবে।

ভোরে দেখা হতে আনেৎ তাকে নিজের সংকল্প জানাল না। সে তার ভালো পোষাক নামিয়ে ঠিক করে রাখল; বেশভূষায় সাহায্য করল, তারপর করল প্রাতরাশের ব্যবস্থা, টেবিলে বসে সে খেতে চেষ্টা করল। তার কাছে সে মনের ভাব চেপে রাখল। মার্ক তাড়াতাড়ি খেতে লাগল—তার মন তখন আসন্ন মুহূর্তের জন্য উদ্‌গ্রীব। আনেৎ জানাল ঠিকানা সে জোগাড় করে রেখেছে। ও বলে দিল ব্রিসোকে বাড়ি থেকে তার ব্যবসায়ের স্থলেই ধরা সহজ। তার কারণও ছিল বইকি। আনেৎ গম্ভীরভাবে পরামর্শ দিল। মার্ক রাজি। মার্ক এই প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

এখন ভাবপ্রবণতা নিয়ে বিলাস করবার সময় নয়। সে নিজে আগে দেখবে, তারপর গড়ে উঠবে তার মতামত। তার মাকে প্রতীক্ষা করতে হবে ততক্ষণ, সইতে হবে—হাঁ সইতে হবে বই কি! কয়েক ঘণ্টার তো ব্যাপার! আর মার তো অভ্যেসও আছে! তারপরে সে না হয় কোমলতায় গলে পড়বে। নিজের মনে মনে এই প্রতিজ্ঞাই সে করল; তাকে সিদ্ধান্তে এসে পৌছতেই হবে। মা অনেক সহ্য করেছে, আজ সে যে সুখের বার্তা নিয়ে আসবে সে তো তার মা-ই উপভোগ করবে বেশী! নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সে নিশ্চিত। মা এখন প্রতীক্ষা করুক। তার প্রচুর সময়।

॥ আট ॥

উনিশ শো সাল থেকে রজের ব্রিসো খ্যাতি লাভ করে আসছেন। কয়েকটা বিখ্যাত মামলায় বিচারালয়ে সাফল্য লাভ করে তিনি ঢোকেন লোকসভায়, সেখানে খুব তাড়াতাড়িই তিনি পয়লা নম্বরদের ভিতরে নিজের জায়গা করে নেন। গণপরিষদে তিনি র‍্যাডিকাল আর সোশালিস্টদের মধ্যপন্থী; তাঁর দৃষ্টি খুব সজাগ, কখন্ কোন্ দলে ভাঙন ধরে কে জানে! এক নৌকা থেকে আর এক নৌকায় যাওয়ার পথ সর্বদাই খোলা রেখেছেন। কয়েকবার মন্ত্রীও হয়েছেন, লোকশিক্ষা, শ্রম, আইন, এমন কি একবার নৌ-দপ্তর পর্যন্ত তাঁর ভাগে পড়েছিল। তাঁর সহকর্মীদের মতোই তিনি যে কোনো দপ্তরেই দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন, মানিয়ে নিয়েছেন। দপ্তর যাই হোক না কেন—রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র তো একই নিয়মে চলেছে। যে লোক হাতল ঘোরাতে জানে তার আর তো কিছু জানার দরকার নেই। আর সব তো তুচ্ছ ব্যাপার। শাসনব্যবস্থাই তো সব।

নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তিনি তাঁর ভাবধারার পরিধি বাড়িয়ে ফেলেছেন. অথবা সঠিক বলতে গেলে, শব্দ-সম্ভারই বাড়িয়েছেন—কথার নিচে অর্থ খুঁজতে যাননি। কেননা কথার কারবারী তিনি, শোনার সময় তো তাঁর নেই। কিন্তু বলেন তিনি ভালোই। একটা বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান, নির্বাচনের উপযোগী জীবজন্তুর জন্ম দিতে তিনি ওস্তাদ, তাদের ব্যবহার করতেও তিনি জানেন। এই বিষয়ে অবশ্য তৃতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আর কয়েকজন রাজ-নীতিজ্ঞও পটু, তাঁরা জনগণের নাড়ি বোঝেন, তাদের স্বরগ্রামের ঘাটগুলো তাদের আঙুলের আয়ত্তে—যে কোন মুহূর্তে তাদের দুর্বলতা, উন্মাদনা, তাদের ঝোঁক নিয়ে তাঁরা যদৃচ্ছা খেলা করতে পারেন। কিন্তু মাননীয় ব্রিসোর মত পটু শিল্পী তাঁরা নন। তিনি গণতন্ত্রের প্রধান ঘাটটিতে ঘা দিলেই সমস্ত জাতির অনুপ্রাণিত স্বর গম্ভীরনাদে বেজে ওঠে, তাদের ভাবধারার নিনাদ শোনা যায়, বেরিয়ে আসে শক্তি আর দুর্বলতা। হাঁ, গণপরিষদে পিয়ানোবাদকদের ভিতরে তিনি শ্রেষ্ঠ। তাঁর দল—বরং দলগুলিই বলা উচিত—কেননা তিনি একই সময়ে বিভিন্ন দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন পরিষদে—তুমুল বাগবিতণ্ডার সময় তারা তাঁরই মুখ চেয়ে থাকে। তিনিও তাদের

বঞ্চিত করেন না। পরিষদী ঐকতানে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়, সে-সংগীত বড় বড় সাদা বিজ্ঞাপনে ছড়িয়ে পড়ে সারা ফ্রান্সে। তিনি এই আবেদন কখনো অস্বীকার করেননি, সব সময়েই তিনি প্রস্তুত। সব বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ—অবশ্য বিচক্ষণ সহকারীদের সাহায্য তিনি নেন। (তিনি একপাল সহকারী পুষে থাকেন।) তাঁর দল বা দলগুলির প্রতি বিশ্বস্ততা আর তাঁর মহিমার তুলনা একমাত্র বুঝি তাঁর ফুসফুসেই মেলে। তাঁর ফুসফুসের ক্লান্তি নেই।

মহাযুদ্ধের সময় এই উৎসাহ আর এই অসাধারণ গলার জোর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে কার্যকরী হয়েছিল। যুদ্ধ তাদের নিয়ন্ত্রণ করেছিল। যে চরম সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবী ধ্বংসের মুখে চলেছে, সেই সত্য পৃথিবী এবং ফ্রান্সকে জানিয়ে দেওয়ার ভার ছিল তাঁর উপর। বহু মিশন নিয়ে এখানে সেখানে ঘোরা-ফেরাও তিনি করেছেন। যুদ্ধের শুরুতেই তিনি অশ্বারোহীসৈন্যের রিজার্ভ দলের মেজরের পদ নিয়েছিলেন, এবং সেই অধিকার বলে শাতো দ্য কাঁপিয়েঞ-তে অধিষ্ঠিত প্রধান সামরিক দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁকে বোঝানো হোলো যে, দেশের কাজ তিনি আরো ভাল করে মার্কিন মুল্লুকের মোরচায় বসে করতে পারেন; তিনিও তাঁর ফুসফুসের জোর পরখ করতে গেলেন সেখানে। তাঁর ফুসফুসের ক্লান্তি এল না। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, তুরস্ক, রুশিয়া এবং নিরপেক্ষ দেশগুলিতে ঘুরে বেড়াবার সময় তিনি নানা বিপদের সম্মুখীনও হয়েছেন। তাঁর সাহস নিয়ে প্রশ্ন তোলা চলে না; আরগন আর ফ্লাঁদের-এর যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলে তিনি এই সাহসই দেখাতেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা তাঁর কাঁধে এই কর্তব্যই চাপিয়ে দিল। জাতির মঙ্গলের জন্য তিনি নিজেকে জীইয়ে রাখলেন, নিরাপদ আশ্রয়ে রইলেন। দেশের প্রয়োজনে, দেশের হিতের জন্য তিনি তোপের পর তোপ দেগেছেন। তবে সে বাক্যের তোপ। তাঁর স্বরে পৃথিবীর কান ভরে গিয়েছিল। লণ্ডন, বের্দ্যো, শিকাগো, জেনেভা, রোম—কোথায় না তাঁর কণ্ঠ স্বর শোনা গেছে! এমন কি বিপ্লবের আগে পিটার্সবুর্গেও সে-স্বর শোনা গেছে। ফ্রান্সের শহরে শহরে, সীমান্তে আর পিছনে, শবযাত্রা আর উৎসবে বেজে উঠেছে। বিদেশে তিনি ফরাসী বাগ্মিতার প্রতীক। তিনি ছিলেন ক্লেমাঁসোর সেই বিখ্যাত মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য। মন্ত্রীসভার সদস্যরা পরস্পরকে ঘৃণা করত, কিন্তু ব্রিসো মতবাদহীন মঙ্গোলমুখো লোকটাকে সহ্য করতে পারেননি। তাই ক্লেমাঁসো তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে বক্তৃতার চোঙা বলে ঠাট্টা করেছিলেন:

'চুপ চুপ, ধর্মবতী কুমারী চুপ !'

কিন্তু আক্রমণের মুখে এই বিদ্বেষ আর রইল না। এতদিনের প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁদের বুদ্ধির সহযোগিতায় নিজেদের ভিতরে পিঠে ভাগ করে নিলেন—মিলরাঁ আর ব্রিয়াঁ, ব্রিসো আর ক্লেমাঁসো মিলে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-পুঞ্জের সৃষ্টি হোলো, তার মাঝখানে রইলো প্রতিশোধের প্রোজ্জ্বল নক্ষত্র—শিকানে, পোয়াঁকারে। পবিত্র মিলনের অবিস্মরণীয় যুগ দ্রুত গেল মিলিয়ে। সে-যুগের সমস্ত রাজনীতিক দলের প্রধানেরা, এমন কি দলছাড়া লোকেরাও স্থান পেয়েছিল। তারা সেই পুরনো শ্রম আর সংঘাতের ঘোড়ার উপর চড়ে বেড়াল। যে পর্যন্ত না বুড়ো ঘোড়া মরে যায় ফ্রান্স চাইল চালিয়ে যেতে।

ব্রিসোর আকাশ কিন্তু মেঘাবৃত হলো না—মাঝে মাঝে অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা তার বাগ্মিতাময় অতীত ঢেকে দিতে চাইল মেঘ ছুঁড়ে। মাঝে মাঝে তিনি নাকি অপরিণামদর্শীর মতো আন্তর্জাতিক শান্তিবাদের স্বর্গে উড়ে গেছেন, এই তাদের অভিযোগ। কিন্তু যে লোক সবকিছু নিয়ে কথা বলে, তার সব কথাইতো আর ধর্তব্যের মধ্যে নেওয়া চলে না। বাঁধাধরা নিয়মে সে চলে না। আর শান্তিবাদ তো (অন্তত নামে যা মনে হয়) অনিষ্টকর ওষুধ নয়, শান্তির সময়ে তার ব্যবহারও নিষিদ্ধ নয়—শুধু যুদ্ধের ভেরী বেজে উঠলেই সে নিষিদ্ধ: তখনই তার কার্যকারিকা শুরু হয়। এই প্রসিদ্ধ বক্তার পক্ষে সবাইকে একথা বোঝাতে বেগ পেতে হয়নি, কিন্তু অবিশ্বাসী শত্রুও তো আছে। ব্রিসো তাই তাঁর পুরনো সঙ্গীদের উন্মত্ত শান্তিবাদী আর ছদ্মবেশী জার্মান বলে গালাগাল দিলেন, তখনো তারা বিশ্বাস করল না। অথচ তিনি শান্তিবাদীদের বিরুদ্ধে একথাও বললেন যে, তারা যুদ্ধের মধ্যে সর্বনাশা খেলায় নেমেছে, তারা মূল্যবান জয়ের ফল এই রণক্লান্ত জাতির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে। তা, বিখ্যাত লোকদের নিন্দা তো হবেই, আর ব্রিসো এই নিন্দাকে উপেক্ষা করবারও শক্তি রাখেন। তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন; তাঁর উপাসকেরা তাঁর এই হাসির তুলনা করল দাঁতঁর সঙ্গে। (অসঙ্গত উপমাই বটে—কেননা ব্রিসোকে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে নিজেকে সমর্থন করতে হয় নি, তাছাড়া তার সে-সাহসও নেই।) তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষও ছিল না, আগামী কালই তিনি শত্রুদের তোষণ করবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি এমনি করেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু প্রতি জিনিষেরই প্রাপ্য পাওনা চুকিয়ে দিতে হয়। তাঁর রাজনীতি

ক্ষেত্রের সৌভাগ্যের প্রায়শ্চিত্ত করতে হোলো বাড়িতে। পারিবারিক জীবনে তিনি সুখী নন, যাকে বিয়ে করেছিলেন সে মোটাসোটা, বর্ণহীন একটা স্ত্রীলোক, ব্যাঙ্কের গচ্ছিত ধনের বাণ্ডিল ছাড়া কিছুই নয়। ব্রিসোর উপযুক্ত স্ত্রী সে নয়। মন বা অনুভূতির দিক থেকে কোনো সম্পদই তার নেই। ব্যক্তিত্বহীনা কিন্তু তবু নিজস্ব সত্তা সে মুছে দিতে পারেনি—ব্যক্তিত্বহীনাদের এই গুণটুকুও তার নেই। সে কেউ নয় তবুও ব্রিসোর দিগন্ত জুড়ে বসে আছে। অবিরাম ঘ্যানঘ্যান করেই তার দিন কাটে, কোনো কিছু প্রশংসা করতে চায় না, এমনকি স্বামীর প্রতিভা আর মহিমাও না। জীবনের শত সুবিধে সুযোগের ভিতর থেকে সে চুনিয়ে চুনিয়ে তার বাজে জিনিষগুলো খুঁজেপেতে নেয়। সবাইকে আর সব কিছুকে নিন্দে করে কাটে তার দিন। এককথায় বলতে গেলে এই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর সব যেমন আছে তেমনি থাক না। সে সবকিছুর উপর ছড়িয়ে দিয়েছে মিয়নো কুয়াশা—অক্টোবরের অশ্রান্ত ধারার মতো। যে তার কাছে আসবে তাকেই এই কুয়াশাদ্বারা আক্রান্ত হতে হবে—ঠাণ্ডা লাগবে তার। সহজেই কল্পনা করা যায় যে, এমন আবহাওয়া শক্তিমান ব্রিসোর সঙ্গে খাপ খায়নি। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া তিনি তার কাছে আসেন না, আর পালাতে পারলেই যেন বাঁচেন। তাই রমণীয় আবহাওয়ার সন্ধানে তিনি ঘুরে বেড়ান। তাঁর মহিমা যেন বাড়ির এই নিঃসঙ্গ আঁধার আরো বাড়িয়েই তোলে।

তাঁর এই 'অতিরিক্তারা' আছে বলে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য তিনি ভোলেননি। এই কৃপণ জীবটি যে একটি কন্যা দান করেই ক্ষান্ত হয়েছে, এ তাঁর দোষ নয়। ব্রিসোর অতি প্রিয় ছিল মেয়েটি। কিন্তু হাসিখুসি, স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি অস্ত্রোপচার করবার সময় মারা যায়। অথচ অস্ত্রোপচার করবার সময় অবস্থা কিছু সঙ্গীন ছিল না; যে মাদক দ্রব্য দিয়ে তাকে অজ্ঞান করা হয়েছিল তারই প্রভাবে সে আর চোখ মেলেনি। তেরো বছর তখন তার বয়েস। সমস্ত ব্রিসো পরিবারই যেন এই ব্যাপারে ধসে পড়ল। স্ত্রী এবার পৃথিবীশুদ্ধ সবাইকে দুষতে সুরু করল, সে ঠাকুর ঘরে নিল আশ্রয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা ব্রিসোর অবস্থা সঙ্গীন করে তুলল; কারণ গির্জানুরক্তি তখন অচল। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ভগবান আর তাঁর দালালের দল—কেউই ছিল না। তিনি আঘাত পেলেন খুবই, নির্জনে তাঁর টেবিলে বসানো মেয়ের ছবির সামনে বসে অঝোড়ে চোখের জল ফেললেন। তারপর এল যুদ্ধ,

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে ভোলবার সুযোগ। পাগলের মতো কাজ সুরু করলেন। তিনি বাড়ি ছেড়ে পালালেন, স্ত্রী আর মৃতা কন্যাকে ভুলে গেলেন। তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন যুদ্ধে। তাঁর স্তাবকরা এখানেও দাঁতঁর সঙ্গে তাঁর সৌসাদৃশ্য খুঁজে পেল। হাঁ, জ্ঞানবানের মতোই তিনি উশৃঙ্খল রজনীর বিলাসও ত্যাগ করলেন। কিন্তু তবু তো তিনি শান্তি পেলেন না।

তিনি অধিকাংশ ফরাসীর মতোই পারিবারিক জীব; পরিবারের স্নেহও তাঁর প্রয়োজন। তার জায়গা অন্য কিছু তো পূরণ করতে পারে না। উচ্চাকাঙ্খা, মহিমা বা আমোদের প্রতি তাঁর উদগ্র কামনা থাকলেও তিনি নিজেকে শূন্যই মনে করলেন। ছেলে না হওয়ার দুঃখে তিনি সান্ত্বনা পেলেন না।

তিনি জানতেন আনেৎ-এর ছেলে তাঁরও ছেলে। মেয়ের মৃত্যুর আগে এ ভাবনা তিনি এড়িয়ে যেতেন। আনেৎ-এর স্মৃতি তাঁর কাছে সুখকর ছিল না। তিনি সে-স্মৃতি দূরে সরিয়েই রেখেছিলেন এবং সে বিদ্বেষ হয়েই তাঁর মনে দেখা দিত। সে ছিল তাঁর আহত গর্বের ক্ষত, বুঝি তাঁর ভালোবাসারও— সে-ক্ষত তো আরোগ্য হয়নি। আনেৎকে তিনি হারিয়ে যেতে দিয়েছিলেন, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে তার খবর নিতেন। কি জানি, এইটুকু না করে তাঁর উপায় ছিল না। তার মন্দ কখনো চাননি, কিন্তু তার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে একথা শুনে তিনি দুঃখও করেন নি। সে সাহায্য চাইলে যে তিনি না করতেন এমন নয়, কিন্তু তিনি বিলক্ষণ জানতেন প্রতিশোধের এই সুযোগটুকু সে কখনো দেবে না।

গত পনেরো বছরের ভিতরে মাত্র দু'তিনবার পথে আনেৎ আর তার ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে, আনেৎও তাঁকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেনি। বরং তিনি নিজেই না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন। মনে দাগা পেয়েছেন, কিন্তু বিশ্লেষণ করতে কখনো চাননি। এই অতীতের রূপকথা—এই স্ত্রীলোকটি—যাকে একদিন তিনি পেয়েছিলেন, সে আজ তাঁর অচেনা—এই নগণ্য পথিক—তাঁর কাছে তার কি মূল্য? তাঁর তো সবই আছে! কিন্তু হায়, মানুষের সব কিছু থাকতে পারে, না থাকলেও সব কিছু থাকার বিশ্বাস করতে পারে, তবু তো সে অতীতের গহ্বর থেকে উঠে আসা দুঃখকে দমন করতে পারে না! সে তো এক বিষাক্ত অনুশোচনা, যে তুচ্ছ জিনিস সে একদিন হারিয়েছে তারই অনুশোচনায় মন তার ভরে যায়। সেই তুচ্ছতম জিনিষই তখন বড় হয়ে ওঠে, আর সব কিছুই

তখন তুচ্ছ বলে মনে হয়। জীবনের ফুলদানীতে সে তো এক অদৃশ্য ফাটল, অথচ সেই ফাটলই নিয়ে আসে ধ্বংস। সব ধসে পড়ে।

তবুও ভালো, অতীতের এই স্মৃতির আনাগোনা বিরল, আর ব্রিসো ভণ্ডামিতে এত অভ্যস্ত যে তিনি নিজের মনকে এই বলে বোঝাতেন, স্মৃতির স্বর তিনি শুনতে পান না। যখন মানুষ গ্লানিময় অধ্যায় পেছনে ফেলে আসে তখন তো তাকে অস্বীকার করাই সব চাইতে ভালো উপায়। তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের বৈচিত্র্য থেকে একে নিশ্চিহ্ন করে দিতে তিনি পারতেন, যদি সেখানে শুধু এই স্ত্রীলোকটির ছায়া তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকত। কিন্তু সেখানে আর একটি ছায়াও তো আছে—সে-ছায়া বুঝি মুছে ফেলা যায় না। সে-ছায়া তার ছেলে।

তাঁর মেয়ের মৃত্যুর পর থেকে এই জীবন্ত ছায়াই তাঁর পিছনে পিছনে চলেছে। তাঁর মনের অলিতে গলিতে অহরহ তারই সামনে গিয়ে তিনি পড়েছেন। তিনি জানেন না কেমন সে দেখতে। দু'তিনবার আনেৎ-এর সঙ্গে দেখা হলেও তিনি ছেলেটিকে ভালো করে দেখবার সুযোগ পাননি। আর চলে যেতে যেতে যে-টুকু তাঁর নজরে পড়েছে তাতে তার ছবি সুস্পষ্ট হয়ে কখনো দেখা দেয়নি। একবার শুধু বাসে কয়েকটা আসন আগে তিনি আনেৎ-এর সঙ্গে তাকে দেখেছিলেন। কিন্তু ছেলেটির চোখ তো তাঁর দিকে ছিল না। সে পাশের আসনের একটি সুন্দরী মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। ব্রিসো স্নেহভরে তাকিয়ে ভেবেছিলেন, হাঁ তাঁর ছেলে তো অমনিই হবে! কিন্তু তিনি কি নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন?

তাঁর ছেলেকে তিনি ফিরে পেতে চান বইকি! তাঁর নিজের জন্য, তাঁর পরিবারের জন্য, তাঁর নাম তাঁর মহিমা জীইয়ে রেখে যাবার জন্য, তাঁর সম্পত্তি আর উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য পুত্রের প্রয়োজন। অন্তত সেই দিনের জন্যও তো দরকার, যখন মাঝি ক্যারন পুত্রহীন ব্রিসোকে ওপারে নিয়ে যেতে রাজি হবে না। 'কি করলে তুমি? মরতে চলেছ, পুনর্জন্ম তো হবে না তোমার—' এই কথাই বলবে।

কিন্তু এ দুঃখ তো কারো কাছে মুখ ফুটে বলা যায় না। উনিশ শো পনেরো সালের একরাতে এক আমোদ প্রমোদের আসরে যদি তাঁর সিলভীর সঙ্গে দেখা না হোতো, একথা কেউ জানতও না। সেদিন আসরে ছিল কৌতূহলী মেয়েদের ভিড়—তারা কেউই পেশাদার নয়। (সিলভী যখন উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-

প্রমোদে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, তখনকার কথা।) সিলভীর সঙ্গে সেদিন ছিল তারই একজন পরিচিত। ব্রিসো সিলভীকে চিনতে পারেননি, কিন্তু সিলভী মনে করিয়ে দিল। আবার তাকে দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। অবশ্য পুরনো দিনের দরজি-শ্যালিকার প্রতি তিনি কখনো চেয়েও দেখেননি, কেননা তাকে নিয়ে তো গর্ব করার কিছু ছিল না। সিলভীও সে-কথা জানত, কিন্তু অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে সে খুশি হোলো। তার সঙ্গীটির তখন অবস্থা চরমে। সিলভী তাকে ছেড়ে ব্রিসোকে নিয়ে পড়ল, কথা বলতে বাধ্য করালো তাঁকে। তিনি মার্ক আর আনেৎ-এর কথা জিজ্ঞেস করলেন। আনেৎ-এর সম্বন্ধে তিক্ততার আভাস থাকলেও তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন না, কিন্তু ছেলের বেলায় তাঁর অসীম কৌতূহল দেখা দিল। তার স্বাস্থ্য, পড়াশুনোর সাফল্য, তার জীবিকা সম্বন্ধে বহু কথাই জানতে চাইলেন। সিলভী বোনপোর প্রশংসাই করল। বোনপো তার গর্ব। ব্রিসো পিতৃস্নেহে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। তিনি একথাও বললেন, ছেলেকে দেখতে পেলে, তাকে কাছে পেলে খুশিই হবেন। তার ভবিষ্যৎ যাতে ভালো হয় তার চেষ্টাও করবেন তিনি।

পরদিন সিলভী দিদিকে সবকথা জানাল। আনেৎ ম্লান হয়ে গেল। সে সিলভীকে শপথ করিয়ে নিলে, যাতে মার্ক একথা জানতে না পারে। সিলভীরও সে-ইচ্ছা মোটেই ছিলনা। সে তার দিদির মতোই মার্ককে ভালোবাসে, তাকে হারাতে রাজি নয়। সে বলল: 'তুমি কি মনে কর, আমি তাকে বলে দেব? বলে দিলে তো আমাদের সে ভুলে যাবে!'

আনেৎ জ্বলে উঠল। ছেলেকে সে প্রতারিত করেছে একথা স্বীকার করতে রাজি নয়। (সিলভী নিষ্ঠুর কথাই হাসতে হাসতে বলেছে: 'কি হয়েছে তাতে? প্রতি মানুষই তো নিজের জন্য—তাই না?') ছেলেকে সে নিজের কাছে রেখেছে নিজের জন্য নয়—ছেলেকে বাঁচাবার জন্য। যে-আদর্শ সে ছেলের জীবনে গড়ে তুলেছে তাকে সে ধ্বংস হতে দেবে না—তাইত তার এই প্রচেষ্টা। কিন্তু সে নিজে ভালো করেই জানে, এও নিজের বাঁচবার প্রচেষ্টারই নামান্তর। পনেরো বছর ধরে এত চেষ্টা করে বহু দুঃখের ভিতর দিয়ে সে তাকে মানুষ করে তুলেছে। দুঃখই ছিল তার আনন্দ, আর আজ সেই ছেলেকে কিনা আর একজন এসে কেড়ে নিয়ে যাবে! সে তো কোন দুশ্চিন্তাই ভোগ করেনি, অথচ ফল ভোগ করবে সে! নিজের কর্তব্য নিয়ে সে তো

কখনো মাথা ঘামায়নি, অথচ এখন এসে নিজের অধিকার জাহির করবে? কিসের অধিকার—রক্তের অধিকার! শত্রু! না, না, তা হবে না!

'আমি কি ন্যায়সঙ্গত কাজ করছিনা? বেশ! অন্যায়ই করব···হাঁ, অন্যায়ই···আমার ছেলের জন্য, তার মঙ্গলের জন্য অন্যায়ই করব!'

॥ নয় ॥

মার্ক নিজের শুভ পথ নিজেই বেছে নিল। অন্যে বেছে দেবে, সে আশায় বসে রইল না।

মার বিরুদ্ধে তখনো তার আক্রোশ। সে তাই একাই চলল অদ্ভুত অভিযানে, তার পিতৃ-অন্বেষণে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল কি সে দেখবে? কি ফলাফল হবে সে-সম্বন্ধে নিশ্চয়তাও নেই। প্রতি পদবিক্ষেপে তার মনে হোলো, ফিরে যাওয়াই উচিত, অসম্ভব বলেই মনে হোলো এই অভিযান। কিন্তু আপন মনে সে বলল:

'আমি যাব। আমি চলেছি। ঔদ্ধত্য হতে পারে, অপরিণামদর্শিতা হতে পারে, তবু যেতে হবে। লজ্জাস্কর হলেও আমি গ্রাহ্য করব না। তার সঙ্গে দেখা করতে চাই—দেখা করব।'

মার দেওয়া ঠিকানার কাছে এসে তার চোখ পড়ল দেয়ালে সাঁটা বিজ্ঞাপনে একটা নামের উপর। যাকে সে খুজছে তারই নাম। বিকেলের একটা সভার বিজ্ঞপ্তি, রজের ব্রিসো বক্তৃতা করবেন।

সে সেখানে গিয়ে হাজির হোলো। একটা বিরাট হল, একসময়ে অশ্বারোহণ শেখাবার বিদ্যালয় ছিল। কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। সে বাড়ি না ফিরে পথের একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল। পথিকদের দিকে পিছন ফিরে সে ভাবতে লাগল, কি করবে। যাঁর স্বর সে কিছুক্ষণ পরেই শুনতে পাবে তাঁর কাছে সে যাবে কি করে? কখন যাবে? কি বলবেন তিনি? ভূমিকা সে করবে না। সে তাঁর কাছে গিয়ে সোজা বলবে: 'আমি তোমার ছেলে।'

কথাটা আওড়াতে গিয়ে জিভ যেন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে এল। কেউ কি

বিশ্বাস করতে পারে? এই ভাবাবেগের মধ্যে তার মঁসিয়ে দ্য পুর্সোঞাক-এর কথা মনে পড়ল। হেসে উঠল সে। যে প্রবৃত্তি অবদমিত থেকে এতদিন পথ খুঁজছিল, এ তারই ছলনা। দৃশ্যের অস্বাভাবিকতা নির্লজ্জভাবে প্রকট হয়ে উঠল তার কাছে। শিস দিতে দিতে সে চলল এক পেয়ালা কালো কফির সন্ধানে। কফিখানার কোণে বসে হলের দরজার দিকে নজর রাখল। দরজা খুলতে প্রথমেই সে ঢুকে পড়ল।

মঞ্চের কাছে প্রথম সারে সে এসে পড়ল। এখানকার আসনগুলি আগে থাকতেই বিশিষ্ট লোকদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে।

তাকে বারবার ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হোলো, কিন্তু সে ফিরে এল, শামুকের মতো লেগে রইল সেখানে। মঞ্চের ঠিক নিচে একটা লোহার থামে ঠেস দিয়ে রইল দাঁড়িয়ে। ব্রিসো এসে ঢুকলেন হলে। এত উত্তেজিত মার্ক, উদাসীনতার ভান করলেও ব্রিসো বসে পড়বার আগে সে তাকে দেখতে পেল না। বহু প্রতীক্ষিত ঘটনা ঘটে গেল, আঘাত লাগল মনে। যা সে কল্পনা করেছিল, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা—একেবারে মিল নেই। কিন্তু বাস্তব এত প্রত্যক্ষ যে, কল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে গেল, কাগজের শেকলের মতোই ছিঁড়ে গেল। আর তো সে-প্রশ্ন নেই! তিনি কি এরকম দেখতে হবেন···না অন্যরকম? তিনি তো এখন সশরীরে বর্তমান। তিনি তো তার একই রক্ত-মাংসে গড়া ছেলের সুমুখে, তাকে তো আর বদলানো যাবেনা!

'ঐ লোকটা!···আমার বাবা!'

কি প্রচণ্ড আঘাত! প্রথমে যেন তার বিদ্রোহী সত্তা চেঁচিয়ে উঠলো: 'না, না!' সময় লাগল তাকে চুপ করিয়ে দিতে, তারপর হঠাৎ সে তার মন স্থির করে ফেলল। 'না, আর আলোচনা করবার কিছু নেই। বাস্তব সুমুখে। আমি গ্রহণ করলাম।'

'ঐ লোকটিই আমি। আমি?'

ব্যগ্র কৌতূহলে সে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সে খুঁটিয়ে দেখল, নিজেকে সে চাইল তার ভিতরে আবিষ্কার করতে।

লম্বাচওড়া লোকটি, পরিপাটি করে কামানো মুখ, সুন্দর ভ্রূ, সোজা নাক, নাসারন্ধ্র যেন বিষ্ঠা আর গোলাপ দুইয়েরই ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য বিস্তৃত, স্ফীত গাল, চিবুকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ। বুক চিতিয়ে চলেছেন, মাথাটা উঁচু—একাধারে যেন অভিনেতা, রাজকর্মচারী, ধর্মযাজক আর সম্পন্ন কৃষকের অপূর্ব মিশ্রণ।

এপাশে ওপাশে ঝুঁকে করমর্দন করতে করতে চলেছেন তিনি। হলের জনতার ভিতরে পরিচিতদের হাত তুলে অভিবাদন জানাচ্ছেন, তাঁর চোখ দর্শকদের দিকে, আর কান দিয়ে শুনছেন পাশে যারা রয়েছে তাদের কথা। তিনি হাসছেন, চটুল উত্তর দিচ্ছেন। কি বলছেন, হলের গোলমালে শোনা যাচ্ছে না, শুধু ঘণ্টার মতো তাঁর স্বরই শোনা যাচ্ছে। তিনি বেশ প্রফুল্ল, সহৃদয়তা তাঁর মুখে চোখে।

'আমি! আমি! ঐ লোকটা!···ঐ মাংস পিণ্ড!···হাসি আর করমর্দনের অতিশয্য···ঐ আমি!'

খুদে রোগা মার্ক, গর্বিত আর ম্লান মার্ক ঐ প্রকাণ্ড মানুষটিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। ঐ গর্বস্ফীত, হাসিখুশি স্থূল লোকটি, কিন্তু দেখতে সুশ্রী বলতে হবে। কেমন একটা আকর্ষণও আছে। কিন্তু সে সন্দেহ করে সে-আকর্ষণকে। শুঁকে দেখে সে গন্ধ তো চিনতে পারছে না। যতক্ষণ না লোকটা বক্তৃতা শুরু করে ততক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

ব্রিসো বলতে শুরু করলেন। মার্ক বশ্যতা স্বীকার করল।

ব্রিসো সাবধানে সুনিপুণভাবে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন। শান্ত সরল ভাবে তিনি তাঁর যন্ত্রকে বাঁধলেন সঙ্গত তানে। তিনি জানতেন সুদক্ষ শিল্পীকে এই পরিপূর্ণ পেক্ষাগৃহ শান্ত করতে হলে ধীরে ধীরেই বাজাতে হবে। যারা সুদক্ষ শিল্পী নয় তারা প্রথমেই জোরে ঘা দেয় তন্ত্রীতে, কিন্তু বেশী দূর তারা এগোতে পারে না, দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। প্রভুত্বের স্বর কিছুক্ষণ পরেই ক্লান্ত হয়ে আসে। কিন্তু তিনি তো প্রভু হয়ে আসেন নি, তিনি সরল সহজ ভাবে বলছেন। তোমারই মতো একজন, তোমার সাথী, যেন তুমি তাকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছ; হাঁ, তোমাকে করায়ত্ত করে কি করবেন তিনি দেখো!···

মার্ক কিছুই দেখল না। সে তখন পানোন্মত্ত। প্রথমে সে কানেও কিছু শুনতে পেল না। শুধু শুনল তাঁর স্বর। উষ্ণ সহৃদয় অনুভূতি সে-স্বরে, ফ্রান্সের মাটির গন্ধ, তার প্রান্তরের সুবাস। মার্ক বার্গাণ্ডীর অধিবাসীর উচ্চারণ আবিষ্কার করল সে-স্বরে, তার মা তার এই উচ্চারণ শুধরে দিয়েছিল। সে যেন এক গুপ্ত যোগসূত্র আবিষ্কার করল। গোষ্ঠীর এই অভিজ্ঞান তো অস্থি মজ্জায় মিশে আছে, কিছুতেই মুছে যায় না—হাঁ, জিভেই তার প্রকাশ। গ্রাম্যতাদুষ্ট সতেজ উচ্চারণ তাকে অভিভূত করে ফেলল। বাপ যেমন করে

ছেলেকে কোলে টেনে নেন, তেমনি করে তাকেও যেন উচ্চারণ-ভঙ্গী আদর করে টেনে নিল। সে কৃতজ্ঞ, সুখী। বক্তার দিকে তাকিয়ে সে হাসল।

ব্রিসো এবার তাকে দেখতে পেলেন। ছেলেটি তাঁকে যেন চোখ দিয়ে গ্রাস করছে।

বক্তৃতার সময় হলের ভিতর থেকে তাঁর বাগ্মিতার ত্রিফলকের কেন্দ্র হিসাবে দু'একটা খুঁজে নেওয়া তাঁর রীতি।

তাদের ভিতর দিয়েই তিনি শুনতে পান, বুঝতে পারেন বক্তৃতার প্রভাব; শব্দের প্রতিধ্বনি আর আকার-ইঙ্গিতে তাঁর বক্তৃতার নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি। এ যেন এক চিত্রনাট্য সৃষ্টি—শুধু ছন্দ থাকে লুকিয়ে, আর অর্কেস্ট্রার ঝনঝনানি। মার্ক ঠিক তাঁর সুমুখে—উত্তেজিত মুখমণ্ডলে চোখদু'টো জ্বলছে—এই তো শ্রেষ্ঠ ত্রিফলক।

এই আরসীতে নিজেকে দেখে ব্রিসো আনন্দিত হলেন।

হঠাৎ ত্রিফলক যেন ম্লান হয়ে এল···

মার্ক তাঁর কথা শুনছিল।

ব্রিসো মোহ ভেঙে দিয়েছেন। তাঁর বাগ্মিতা উচ্চগ্রামে উঠে বালকের তীক্ষ্ণ চোখের সুমুখে প্রকাশ করে দিল তার অন্তঃসারশূন্যতা, হাঁ, পাখা দু'টো তো নকল। জনতার বিস্ময় মার্ককে দিল সাবধান করে, নিজের ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়া শুরু হোলো তার। জনতার সংক্রমণ থেকে যারা নিজেদের বাঁচিয়ে চলে, সে তাদেরই একজন। এই মধুর স্বরে সে জনতার মতোই অভিভূত হয়ে গেছে বলে বিরক্ত হোলো, সে সঙ্কুচিত হোলো। বক্তার মুখ থেকে আর কিছুই সে তীব্র সমালোচনা না করে গ্রহণ করবে না।

মন্ত্রমুগ্ধ জনতার কাছে ব্রিসো এবার অমর ভাবধারার ডঙ্কা বাজালেন। বীরভূমি ফ্রান্সের মহৎ উদ্দেশ্যের কথা শোনালেন। এই তো চিরন্তন নেহাই—সারা পৃথিবী এখানেই গড়ে পিটে তৈরি। হাঁ, এই সেই ফ্রান্স—উৎসর্গের বেদী অপরাপর জাতির উদ্দেশ্যে বলি। পোয়াতিয়ে, মার্ন, ভার্দুনের যুদ্ধ; পেতাঁ, বেইয়ার, মঁজ্যাঁ, শার্ল মার্তেল, জফ্র্ এবং জাঁদা'র্ক···মানুষের মুক্তির জন্য তার অক্লান্ত অশ্রান্ত উৎসর্গ।' নিজেকে উৎসর্গ করে আবার সে জেগে উঠেছে, পেয়েছে নবজন্ম। হাঁ, নিজেকে সে একা রক্ষা করেছে, আর রক্ষা করেছে বিশ্বকে···

মিত্রশক্তির স্বর্ণ আর লৌহবৃত্তের কথাও তিনি বললেন, যেমন করে সাহসী

যোদ্ধারা শার্লমেঞকে ঘিরে থাকতেন, তেমনি করে মিত্রশক্তির ভালোবাসা ঘিরে রেখেছে ফ্রান্সকে। ব্রিসো মিত্রদেশগুলো ঘুরে এসেছেন। তিনি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারেন, তারকাচিহ্নিত-পতাকাধারী সেই ভগিনী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিদানের আশা না রেখে এগিয়ে এসেছে লাফেইয়েৎ-এর ঋণ শোধ করতে, সত্যর জয়লাভ তার কামনা···মহানুভব ইংলণ্ড···কলঙ্কবিহীন ইটালী···ক্রুসেড-এর পর থেকে এমন দৃশ্য আর কেউ দেখেনি। কিন্তু সে-ধর্মযুদ্ধ তো এক খ্রীস্টের সমাধি নিয়ে শুরু হয়েছিল, আর আজকের এই বিরাট ধর্মযুদ্ধে নতুন খ্রীষ্ট মানবদাসত্বের সমাধি উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন···

'বিরাট অপকীর্তির জন্য দোষী তো সেই বর্বর হুনরা, তাদের সেই বিরাট সাম্রাজ্য সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে, যত রাজনৈতিক আর সামাজিক পাপের আকর তো তারা। নিচ উৎপীড়ক আর হীন জনগণ, ভণ্ড সোশালিস্ট আর দাসের দল, ক্রুপ, হেগেল, বিসমার্ক, ত্রাইৎশ্‌কে, দ্বিতীয় বিহ্বল-হেল্‌ম্‌রাই তো শত্রু। ভয়ঙ্কর পাশবিকতা, সার্দানাপালুসের উন্মত্ততা সেখানে। নীটশে তো নিজেকে ভগবান বলে ভেবেছিল, চার পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘেউ ঘেউ করে বেড়াত সে···ক্রন্দনরত জনশক্তি আর জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপে এখন নির্দোষ বেলজিয়াম, পবিত্র পোলাণ্ড, র‍্যাস, লোরেন আহুতি পড়ল, তার উপর উড়ছে লোভান্ধ শকুনিরা। নারী আর শিশুরা তাদের শিকার, নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর তারা। কিন্তু এই বিরাট জন্তুদের উপরে আজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে ফ্রান্সের শ্বেত পাখীর দল, তাদের দলভ্রষ্ট করে দিয়ে রাইন পার হয়ে তারা সমুচিত শাস্তি দেবে এই পাপবোধপুষ্ট জাতিকে। মুক্তি আসছে। ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকার নব স্বাধীনতার মন্ত্রে বলীয়ান জনশক্তি স্বাধীন ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের সহায়তায় মুক্তির এই নির্ঝরে পান করবে। হাঁ, ইউরোপের শেষ সাম্রাজ্য ধসে পড়ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মেলেছে পাখা। রুয়দ-এর দেবদূত! আর্ক দ্য লেতোয়াল-এর আত্মা! হে পিতৃভূমির সন্তানদল, চল এগিয়ে চল!···

'আমি এইমাত্র সীমান্ত থেকে ফিরছি। চমৎকার! চমৎকার! ফ্রান্সের বীর শিশুরা হাসছে—মৃত্যুর হাসি! তারা বলে: জীবন ফুরিয়ে এল বটে, কিন্তু কি মধুর! আমাদের জীবন তো বৃথা যায় নি। যখন তাদের পিছনে হটে যেতে বলা হয়, তারা উত্তর দেয়: না, কখনও না! তার চাইতে ঐ কাঁটাতারে ঝুলিয়ে দাও আমাদের, ফাঁসি দাও!'

মার্ক লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল, তার ভাবব্যঞ্জনা যেন জমে গেছে। ইস্, কি করে সে এই জানোয়ারগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে! ঐ ফাঁপাকথার অশ্লীল কৌশল, আর নিচ মিথ্যাভাষণ! বক্তার দিকে সে তাকাল, চোখে তার ঘৃণা। তার গা দিয়ে ঝরছে ঘাম আর বাগ্মিতা। ব্রিসো বুঝতে পেরেছেন তাঁর এই দর্শকের মনে এক অভিনয় সুরু হয়েছে, কিন্তু সে-নাটকের নাম তো তিনি জানেন না। তিনি পাখীধরার যতগুলো ফাঁদ ছিল পেতে দিলেন। ওর চোখে তীব্র সমালোচনার ছায়া দেখে তিনি অস্বস্তি বোধ করলেন, চোখের দিকে আর তাকাতে সাহস করলেন না।

তাঁর চিৎকার সুরু হেলো: 'ফ্রান্স, একতাবদ্ধ ফ্রান্স!' এ তো কষ্টসাধ্য বাগ্মিতা নয়, কৌশলী শিল্পীর মতোই তিনি শব্দের ব্যবহার করে জনতাকে উত্তেজিত করে তুললেন। কিন্তু বালকের মূর্তি তাঁর মগজের কোথায় যেন বাসা বেঁধেছে, তাকে কিছুতেই সরাতে পারলেন না। আগে তাকে তিনি দেখেছেন; কোথায় দেখেছেন মনে করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর সুষ্ঠু শব্দবিন্যাসের উত্তেজনায় স্মৃতির সেপথ আবছা হয়ে গেল; তিনি কিছুতেই মনে করতে পারলেন না।

এবার শেষ হোলো বক্তৃতা, জনতার কোলাহলে বার বার তারই প্রতিধ্বনি উঠল। শ্রোতারা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তাঁকে অভিনন্দন জানালো, কেউ কেউ বা এই মহান নাগরিকের সঙ্গে করমর্দনের আশায় মঞ্চের দিকে ছুটল। উত্তেজনায় তারা রক্তিম হয়ে উঠেছে, পরস্পরকে ডেকে কথা কইছে, হাসছে, চোখে ঝরছে জল। ব্রিসো সুখী হলেন, শুধু একবার তাঁর দৃষ্টি পড়ল সেই অবাধ্য বালকের দিকে।

সে যে পরাজিত একথা কি সে এখন স্বীকার করবে?

কিন্তু স্থান শূন্য। মার্ক অদৃশ্য। বাগ্মিতার এই দুর্গন্ধ তার কাছে বুঝি অসহ্য হয়েই উঠেছিল, তাই শেষ হবার আগেই চলে গেল। হঠাৎই সে গেল চলে, দরজার কাছে আসতে না আসতে শুনতে পেল জনতার তুমুল হর্ষধ্বনি। একবার পেছন ফিরে তাকালোও। ঠোঁটে তার ঘৃণা। এই প্রলাপোন্মাদ হলের দিকে সে তাকাল একবার, বিজেতা বক্তাকেও সে দেখল। তারপর বেরিয়ে পথে এসে সে ঘৃণায় থুথু ফেলল। চিৎকার করে উঠল—সে শপথ করল।

'আমি শপথ করছি: এই নিচ জনতার হর্ষধ্বনি আমি কখনো গ্রহণ করব না!'

ঠিক সেই মুহূর্তে মঞ্চে ব্রিসো হেসে হেসে তাঁর স্তাবকদের সঙ্গে কথা কইছিলেন আর যে-মূর্তি এতক্ষণ ধরে তাকে বিব্রত করছিল, তাকে মগজের কোঠায় কোঠায় হাতড়িয়ে খুঁজছিলেন। হাঁ, এবার তিনি চিনতে পারলেন তাকে। বাসে দেখা যুবকের কথা তাঁর মনে পড়ল।

॥ দশ ॥

মার্ক লম্বা পা ফেলে চলল এগিয়ে, দৌড়ে সে পালাচ্ছে। তার মোহ-বিচ্যুতির ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবু মোহ-বিচ্যুতি তো উবে গেল না, আঁকড়ে ধরে আছে তাকে। হায় ভগবান! আজ ভোরে যখন সে এই পথে এসেছিল, পৃথিবী তার থেকে কত বদলে গেছে! সে যখন এসেছিল, তখন সে তো তেমন কিছু আশা করবে না বলেই ভেবেছিল। কিন্তু তবুও তো আশা ছিল বুকে! যাঁকে সে দেখতে যাচ্ছে তাঁরই জন্য ছিল তার অধীর আগ্রহ আর আনন্দ! সে তো তাঁকে ভালোবাসবে আর পুজা করবে এই তাগিদই অনুভব করছিল মনে। তাঁর স্বর শুনে তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তেও চেয়েছিল সে। ইস কি বিরক্তিকর! সে তার ঠোঁট মুছে ফেলল, মনে হোলো তার ঠোঁট বুঝি তাকে স্পর্শ করেছে!

'ঐ ঘৃণ্য অলঙ্কারপ্রিয় বক্তা, ঐ অবিশ্বাসী, ঐ ভণ্ড! মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী সে!—ফ্রান্স আর নিজের সঙ্গে প্রতারণা করছে···ফ্রান্স বুঝবে তার ব্যাপার, যদি সে মিথ্যা ভালোবাসে, যদি সে প্রতারিত হতে চায়, হোক না! কিন্তু সে! না, না, সে প্রতারিত হতে চায় না। প্রতারণার বুঝি ক্ষমা নেই—সব চাইতে বড় নিচতা বুঝি এইখানে! ঘৃণা, ঘৃণা, চরম ঘৃণায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছি! আমি যে তারই রক্তমাংসে তৈরি। সেই মূর্তিমান মিথ্যারই সন্তান আমি! সে-মিথ্যা তো আমার ভিতরেও আছে।'

পাগলের মতো সে চলতে লাগল। এসে পৌঁছল সীনের পারে। জলের উপর ঝুঁকে পড়ল। সীনের জলে তার এই অপবিত্র রক্তমাংস সে ধুয়ে ফেলতে চাইল, এই পুতিগন্ধভরা অপবিত্রতা সে আর শরীরে বয়ে নিয়ে বেড়াবে না। বিচার করে সে দেখল না, করুণার লেশমাত্র তখন তার নেই।

সতেরো বছর বয়সে বুঝি এমনি উন্মাদনাই মানুষকে পেয়ে বসে। একবারও মনে হোলো না যে, লোকটা ভালো হতে পারে। সাধারণ মানুষের মতো সেও দুর্বল, ছেলে বলে তাকে চিনতে পারলে সে তাকে আপন করে নিত। সাধারণ মানুষের মতোই তার দুর্বলতা মিথ্যা আর অপবিত্রতার আড়ালে হয়ত এমন এক পবিত্র হৃদয় লুকিয়ে আছে, যেখানে বিশুদ্ধ ভাবাবেগ আর সত্য অধিষ্ঠিত। একথাও তার মনে হোলো না যে, পুরেনো ধরনের এই বিদ্বান বাগ্মীরা ছোটবেলা থেকেই শব্দের আরাধনা করে এসেছে, তারা শব্দের অভিনেতা —কখনো বা বিয়োগান্ত সুরে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে মানুষের মন, কখনো বা বইয়ে দিয়েছে হাসির প্রস্রবণ। নিজেরা শত চেষ্টা করেও বাস্তবের সংস্পর্শে আসতে পারেনি। শব্দের স্তূপের নিচে চাপা পড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে···

কিন্তু মার্ক তো এই ত্রুটি ক্ষমা করতে পারে না! বিশুদ্ধ রক্তে তার জন্ম, জীবনের পথে সে চলেছে। তার কাছে এই নিষ্ক্রিয়তা আর বাগাড়ম্বরের চাইতে পাপও ঢের ভালো। পাপ নিয়ে আসে হত্যা, কিন্তু এই বাগাড়ম্বর তো মৃতজাতক হয়েই জন্মায়···বিশুদ্ধ রক্ত!

মার্কের রক্তে এই ভণ্ডের রক্ত মিশে আছে।

'না, কখনো না!'

সে তার নিজের ভিতরে ঐ লোকটার ভণ্ডামি অনুভব করল। সে তারই অঙ্গভঙ্গী, তার স্বরের অনুকৃতি নিজের ভিতরে লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেল। মনে পড়ল, কতদিন নিজের কাজে এইগুলোকে সে লাগিয়েছে। তখন একবারও মনে হয়নি যে সে অজ্ঞাতে কারো অনুকরণই করেছে। হাঁ, অনুকরণই তো—তার সেই আদর্শকে তো সে আজ দেখল। তাকে তো অস্বীকার করা বৃথা। তার উত্তরাধিকার সে বহন করেছে নিজেরই দেহে মনে।

'না! না! কখনো না! আমার আর তার ভিতরে কোনো সম্বন্ধ নেই! তার কিছুই নেই আমার মধ্যে! তা সত্ত্বেও যদি আমি তারই ছায়া হই, যদি আমার ভিতরে তার পুনরাবির্ভাব ঘটে থাকে, আমি যদি তারই পুনরাবৃত্তি হই, তাহলে আমি আত্মহত্যা করব!'

কয়েক ঘণ্টা সে ক্লান্তভাবে ঘুরে বেড়ালো। খাওয়া হয়নি। রাত এল, বাড়ি ফেরবার কথা ভাবতেই পারল না। কি করে সে মুখ দেখাবে বাড়িতে? কি করে সে তার এই মোহবিচ্যুতির লজ্জা ব্যক্ত করবে?

ঘুরতে ঘুরতে একজন আহত লোকের কাছে সে এসে পড়ল। সাংঘাতিক

আহত হয়েছে লোকটা, মুখখানা একেবারে বিকৃত হয়ে গেছে, একটা চোখ নেই; এক গালে একটা মস্তবড় দাগ, সেখানে বুঝি গলানো সীসা পড়েছিল। জনৈকা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তার হাত ধরে আছে, সস্নেহ বিষণ্ণ তার দৃষ্টি। সে তার কাছ ঘেঁষে গেল, মার্কের মনে পড়ল মার কথা। সেই গর্বোন্নত মূর্তি; তার নিস্তব্ধতা, কলুষহীন কামনা আর পরীক্ষাময় জীবন আজ তো সে ঘৃণা করে না, বরং মার সেই অনমনীয় সত্যনিষ্ঠাকে সে পূজা করে। নিচুতলার এই আহত লোকটির পাশে তার মার মূর্তি যেন ধীরে ধীরে রূপ পাচ্ছে, স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অথচ এ লোকটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি? নিজেকে রক্ষা করবার জন্য যে বাবার বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করে এসেছে, তার সেই ঈর্ষালু কামনা যেন ওর মধ্যে রয়েছে, রয়েছে তার মার অন্যায়।

'নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! তোমার হাতে আমি চুমু খাচ্ছি। আশীর্বাদ করছি তোমাকে!' গতকাল আর আজ সকালের স্মৃতি তার মুখে যেন থাবড়া কষিয়ে দিল। মার প্রতি সে কি নিষ্ঠুর ব্যবহারই করেছে! সে টলতে লাগল। মার কাছে যাবে। তাকে দুঃখ দিয়েছে সে, ফিরে গিয়ে তারই প্রায়শ্চিত্ত করবে। ভগবানকে ধন্যবাদ, এখনো যথেষ্ট সময় আছে···

॥ এগারো ॥

সিঁড়ির কাছে এসে পৌঁছল। বাড়ির দরোয়ান ডেকে বলল: 'আপনার মা খুব বেঁচে গেছেন···পড়ে গিয়ে—'

আর সে শুনতে পেল না, ছুটে সিঁড়ি দিয়ে সে উঠে গেল, এক এক লাফে চার ধাপ পার হয়ে গেল। দরজা খুলে দিল সিলভী। গম্ভীর তার মুখ। মার্ক হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল: 'মা?'

সে বলল: 'এতক্ষণে বাড়ি ফিরতে পারলে? সারাদিন তোমার পথ চেয়েই আমরা বসে আছি।'

মার্ক তার দিকে তাকিয়েও দেখল না, তাকে ঠেলে ঢুকে পড়ল। মার ঘরের দরজা খুলে ফেলল। বিছানায় শুয়ে আছে মা, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মার্ক তাকে দেখে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল। আনেৎ তাড়াতাড়ি বলল: 'কিছুই হয়নি রে। আমি ভারী বোকা। পড়ে গিছলাম।'

মার্ক উদ্বিগ্ন হয়ে তার হাত ধরল। কাঁপছে হাতখানা।

সিলভী তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল : 'এস! ওকে এখন বিরক্ত ক'রো না! আর উত্তেজনা বাড়িয়ো না!'

তারপর সে বলে গেল, কি হয়েছে। স্বরে তার তিক্ততা। আনেৎ-এর চোখ মার্কের দিকে। সে মাঝে মাঝে সিলভীর ভুল শুধরে দিল, এই দুর্ঘটনাকে দিতে চাইল উড়িয়ে। নিজের কাঁধে সব দোষ নিয়ে সে একটু-আধটু ঠাট্টা করতেও চেষ্টা করল।

ছেলে চলে যাওয়ার পর তার মাথা ঠিক ছিল না শুধু এই কথাই সে বলল না। সে বার বার মনে মনে তখন বলেছে : 'ও আমাকে ছেড়ে চলে যাবে!'

সব আশা তার শেষ। সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় কাটাবার জন্য সে শুরু করল কাজ। সে নিজেকে সান্ত্বনা দিল : 'আমাকে ও ছাড়ুক আর না ছাড়ুক, আমি তো নিজেকে এমনি করে ভাসিয়ে দেব না!'

ক্লান্ত হোলো, কিন্তু তবু সে বিশ্রাম করল না, ঘরদোর পরিষ্কার করতে লেগে গেল। মেঝে সাফ করল, পিতলের জিনিষগুলো ঘসেমেজে চকচকে করে রাখল। একটা ছোট্ট মই বেয়ে উপরে উঠে সার্সি পরিষ্কার করতে শুরু করে দিলে। জানালাটা রাস্তার দিকে মুখিয়ে আছে, তাই ধুলো জমেছে সার্সিতে ; জানালার পর্দাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। মইটা কি হঠাৎ সরে গেল? সে কি কয়েক মুহূর্তের জন্য হারাল চেতনা? তার ক্লান্তি, না, উদ্বিগ্নতা —না, হঠাৎ চেতনা প্রাপ্তি—কোনটা? মাঝে মাঝে চেতনার এই অদ্ভুত লুপ্তিই তো ঘনিয়ে আসে। এবারও বুঝি তাই এসেছে?...আনেৎ চোখ মেলে তাকাল। হাঁ, মেঝেয় সে পড়ে আছে। সে পথেও গিয়ে ছিটকে পড়তে পারত, কিন্তু মইটা সরে গিয়ে একপাশে কাৎ হয়ে পড়ায় জানালাটা বন্ধ হয়ে যায়। কাঁচের সার্সিগুলো খান খান হয়ে পড়ে আছে মেঝেয়। আনেৎ-এর কপাল আর হাতের কব্জি দিয়ে ঝরছে রক্ত। উঠতে সে চেষ্টা করল, হাঁটুতে ব্যথা, ডান পা খানাই জখম হয়েছে। সার্সি ভাঙার শব্দ শুনে ছুটে এল দারোয়ান। সিলভীকে সে-ই খবর দিল।

আঘাত খুবই লেগেছে, কিন্তু যে বিরক্তি সে অনুভব করল, তার চাইতে ঢের কম এই যন্ত্রণা। আজকে, এই মুহূর্তে সে তো এই দুর্ঘটনা চায়নি। আজ তার কারো সাহায্যের প্রয়োজনও ছিল না ; তাছাড়া মার্কের করুণা জাগিয়ে

তোলবার ইচ্ছে তার নেই। সে তো তার কাছে সবচাইতে বড় অপমান। সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যথায় পা টন টন করছে, বুকে জ্বালা; বিছানা নিতে হোলো তাকে। অপমানিত লাঞ্ছিত আনেৎ। মনে মনে বার বার বলল: 'ও ফিরে এসে কি বলবে, কি ভাববে?'

যন্ত্রণায় মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে। আনেৎ-এর ক্ষেত্রেও তাই হোলো। সিলভী তার কাছ থেকে এই মানসিক উদ্বিগ্নতার গুপ্ত কারণ জেনে নিল। সিলভী শুনলো, মার্ক তার বাপের খোঁজে গেছে। সে নিজেই যে এর পরোক্ষ কারণ একথা সে ভুলে গেল। আনেৎ ছেলের কাছে একথা প্রকাশ করে মূর্খতা করেছে, কিন্তু এখন তাকে নিষ্ঠুর ভাবে বিচার করা উচিত নয়। তার সমস্ত বিদ্বেষ এবার গিয়ে পড়ল মার্কের উপর। আনেৎ-এর মতো তারও সন্দেহ রইল না, মার্ক তাদের ছেড়ে চলে যাবে। সে আত্মকেন্দ্রিক, সে গর্বিত, নিজের সুখের জন্য পরকে বলি দিতেও তার বাধে না। কিন্তু তার জন্য সিলভী তো তাকে কম ভালোবাসে না! বরং বেশীই বাসে। সে তার ভিতরে নিজেকে দেখতে পেয়েছে, তাই বুঝি ক্ষমা করতে তাকে পারে না। না, না; সে যদি তাদের ছেড়ে যায়, সে ক্ষমা করবে না। যদি—আর যদির কি আছে? যা ঘটবার ঘটে গেছে। সে যখন এত দেরি করছে, সে কি আর ব্রিসোর ওখানে সান্ধ্যভোজ না সেরেই ফিরবে? অন্য কিছু সে ভাবতে পারল না, এমনি করেই বিচার করল মার্ককে। সে সবচাইতে বেশী অন্যায় করলো।

তার শত্রুতা প্রতি দৃষ্টিতে, প্রতি কথায় ফুটে উঠল মার্ককে দেখে। আর অসহিষ্ণু মার্ক এই বিরূপতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষে কণ্টকিত হয়ে উঠল। আনেৎ ভাবল, সে ক্ষমা চাইবে মার্কের কাছে। সিলভীর ব্যবহারে সে মার্কের চাইতে বেশী আঘাত পেল। তাকে থামিয়ে দিয়ে সে বলল:

'এস! যথেষ্ট হয়েছে। আমার কথা আর বলতে হবে না! এসব কথার কোনো মূল্যই নেই!'

তবে কিসের মূল্য? মার্ক বুঝল, মা আর মাসী দু'জনেই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সিলভী থাকতেই চায় আর মার্কও সে থাকলে কিছু বলতে রাজি নয়। আনেৎ তার দিকে তাকাল, অনুনয়ভরা তার দৃষ্টি। সিলভী করল না-বোঝার ভান। তারপর হঠাৎ অভিমানিনী উঠে দাঁড়াল, একটি কথাও না বলে চলে গেল বাইরে।

মা আর ছেলে এবার একা। দু'জনেই প্রতীক্ষা করছে। তারা শুরু করবে

কেমন করে, কোথায় তারা শুরু করবে! মার্ক তাকাল আনেৎ-এর দিকে, আনেৎ চোখ ফিরিয়ে নিল। সে ভীত। তার চোখ তাকে ধরিয়ে দেবে সে তা চায় না। তার ছেলে কি ঠিক করেছে সে জানতে চায় না।

মার্ক ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে লাগল। সেদিনের কাহিনী বলবার আগে সে একবার ঢোক গিলে নিল। তাকাল মার মুখের দিকে। মা শুয়ে আছে বিছানায়, একটুও নড়ছে না। সামনের জানালার দিকে তার দৃষ্টি। সে হঠাৎ থেমে পড়ল···তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাঁটুর উপর মুখ গুঁজে রইল। মুখখানা তার বিছানার চাদরে ঢেকে গেছে, তার ঠোঁটের স্পর্শ মার গায়ে, আর হাত দু'টো জড়িয়ে ধরেছে তার দেহ। সে শুধু বলল :

'তুমি আমার বাবা—তুমিই আমার মা !'

আনেৎ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁদল।

পরিশিষ্ট

॥ এক ॥

মানবতার অর্ণবপোতের কর্ণধার তো তুমি !
তাহলে এই দুঃখের নদী পার হয়ে চলো।
হে উন্মাদ, ঘুমের তো এ সময় নয় !
—বোধিচর্যাবতার

উৎসমুখ খুলে গেছে, প্রতি রুদ্ধ দরজা উন্মুক্ত। ছুটে চলেছে নতুন সেনাদল। বিংশবর্ষীয়েরা চলে গেছে, ঊনবিংশদের পড়েছে ডাক। কাল ডাক পড়বে অষ্টাদশবর্ষীয়দের। মার্কের পালা এল এবার।

মা আর ছেলে দু'জনেই একথা ভেবেছে। কিন্তু পরস্পরকে বলেনি। আনেৎ শুধু যুদ্ধেরই ভয় করে না, মার্কের নিস্তব্ধতাও তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। তার মনে কি ঘটছে সেই কথা সে ভেবেই ভীত। সে তো সেকথা জানে, ভালো করেই জানে।

কার কাছে বলবে এই ভীতির কথা ? একা তার নিজের ব্যাপার হলে সে চেপে রাখত। কিন্তু এতে তার ছেলেরও ব্যাপার। কার কাছে ছুটবে পরামর্শের জন্য ? সিলভী ? তার কথা শুনেই সিলভী তার স্বভাবসিদ্ধ চিৎকার করে উঠল :

'যুদ্ধ ! ছ'মাসেই তো শেষ হবে যুদ্ধ ! হুনদের প্রায় হয়ে এসেছে।'

আনেৎ উত্তর দিল : 'তুমি প্রতি ছ'মাস অন্তরই তো ওকথা বলছ।'

'এবার কিন্তু খাঁটি সত্যি—' সিলভী জোর দিয়ে বলল।

'কিন্তু তোমার মতো বিশ্বাস করে আমার তো চলবে না।'

'আমারও চলবে না, ব্যাপারটা এখন মার্ককে নিয়ে বলেই চলবে না। অন্যের ব্যাপার হলে নিজেকে বোকা বানিয়ে রাখা যায়, কেননা ফলাফল তো আর গায়ে লাগে না, কিন্তু নিজের ব্যাপারে ভুল হলেই মুস্কিল। তুমি ঠিকই বলেছ। যুদ্ধ যে কতদিন চলবে কে জানে ! সব জুড়িয়ে এল, তখনই আবার শুরু হচ্ছে। এই তো আবার আর একদল এল আসর গরম করতে। এর

পরে কিসের পালা। তা ওরা যত ইচ্ছে আসর মাত করুক। আমাদের মার্ক ওখানে নাচতে যাবে না।'

'কিন্তু কি করে তা সম্ভব।'

'জানি না। তবে ওরা তার নাগাল কিছুতেই পাবে না। যুদ্ধ আমাদের স্বামী, বন্ধু আর প্রেমিককে গ্রাস করেছে, আমরা তাদের মরণের মুখে ছুটে যেতে দিয়েছি; ওরা জীবন উপভোগ করে গেছে। কিন্তু আমাদের সন্তান-দের তো আমরা এনেছি নিজেদেরই জন্য—আমি ওকে বাঁচাব।'

'প্রতি মা তার ছেলেকে সঁপে দিচ্ছে—'

'কিন্তু আমি আমারটিকে দেবো না।'

'তোমারটি?'

'হাঁ, ওতো আমাদের দু'জনেরই দিদি।'

'কিন্তু কি করে তা সম্ভব?'

'হাজারো উপায় আছে।'

'আমি একটা উপায়ই চাইছি বোন।'

'আমাদের বহু বন্ধু আছে। তোমার ফিলিপ ভিলার তো এখন সেনা-বাহিনীর কর্তা, সে তো ইচ্ছে করলেই ওকে রেহাই দিতে পারে।'

'তুমি ভাবছ, আমি তার কাছে যাব?'

'কেন যাবে না শুনি? তাতে কি ক্ষতি হবে? হুঁ, বুঝেছি তোমার গর্বে আঘাত লাগবে। আমি কিন্তু ছেলের জন্য ওর চাইতে অনেক বেশী করতাম। আমার ছেলের জন্য যদি প্রয়োজন হোতো রাস্তার লোককে পর্যন্ত দেহ দিতে দ্বিধা করতাম না।'

'আমার ছেলের জন্য আমার গর্বকে আমি দলে পিষে চলে যেতে পারি। কিন্তু ওরই ভালোর জন্য আমি বলছিলাম—'

'কিন্তু এতে কি ওর ভালো হবে না?'

'নিজেকে যদি এমনি করে অসম্মান করি, ওর তো ভালো হবে না। আমি যে ওকে চিনি। ও আমাকে ক্ষমা করবে না। ওর যাতে অপমান, এমন কিছু করলে নিজেকেও যে আমি ক্ষমা করতে পারব না বোন।'

'ওকে বাঁচানো কি অসম্মানজনক বলে মনে কর?'

'এমনি করে আমাকে বাঁচালে আমার কাছে তো তাই মনে হোতো।'

সিলভী রেগে গেল। 'বাঃ, চমৎকার মা! ওকে বাঁচাতে পারলে অপমান

গ্রাহ্য করতাম না। বেশ, তুমি যদি কিছু না কর, আমি চুপ করে বসে থাকব না।'

আনেৎ চেঁচিয়ে উঠল: 'তোমাকে আমি নিষেধ করছি সিলভী!'

'আমাকে তুমি বাধা দিতে পারবে না।'

'হুঁ! ওকে বিপদ থেকে বাঁচানোই কি যথেষ্ট?'

'কিসের ভয় তুমি করছ?'

আনেৎ এই ভেবে ভয় পেল: বিপদ থেকে বাঁচালে মার্ক বিপদের মুখেই ছুটে যাবে।

॥ দুই ॥

বই আর নিজের ভাবনা নিয়ে বন্দী হয়ে রইল মার্ক। এক উষ্ণ ঘনিষ্ঠতায় মা আর ছেলের হৃদয় বাঁধা পড়লেও মার্ক তার নিজের ঘরেই বন্দী হয়ে দিন কাটাতে লাগল। কথাও সে বলে না। আনেৎ তার এই কোটরে আশ্রয় গ্রহণকে সম্মানের চোখে দেখল। সে প্রতীক্ষা করবে, মার্ক বেরিয়ে এসে খুঁজে নেবে তাকে। সে বুঝতে পারল মার্কের ভিতরে চলেছে এক বিরাট পরিবর্তন। চিত্তশুদ্ধি আর পরিণতির পালা। চার বছরের এই সমস্যার সংকট থেকে সে খুঁজছে সমাধানের পথ।

মার্ক এই কঠোর আত্মপরীক্ষার সমাধান চায়। যেমন অপরকে তেমনি নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে বিচার করল, সে তার স্বভাবের চপলতা থেকে মুক্তি চাইল, সংযমী হয়ে উঠল। কঠোর জীবন আর সুষ্ঠু চিন্তা—এই তার আকাঙ্ক্ষা। তার শেষ সংঘাতে সে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। এ যেন উগ্র লজ্জা আর গলিত বিবেকের উত্তপ্ত তরল ধারাস্নান। কিন্তু তার ভস্মস্তূপের মধ্য থেকে যে বস্তু পাওয়া গেল সে তো নিষ্পাপ আর সুদৃঢ় হয়েই দেখা দিল। তার তরুণ মনের চিন্তাধারাকে সে এবার পরীক্ষা করে নিল। হাঁ, ভাবধারা অকালেই পরিণতি পেয়েছে। এই ভাবধারা সে পেয়েছে তার বই আর দার্শনিকদের কাছ থেকে। তারই যুগের কোরাসের নায়ক তারা।

পরীক্ষায় তারা কমই টিকল। তাদের কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না।

তারা তো শব্দের সমারোহ, কায়া নেই, শুধু ছায়া। কোনো শব্দই তাদের রূপ পায়নি। অথবা একটা কথাই শুধু রূপ পেয়েছে : তারা যন্ত্রযুগেরই অবদান, মানবতাকে তারা হাতুড়ির আঘাতে যন্ত্রের রূপই দিয়েছে, তার মুক্তি আনতে পারেনি। এক পক্ষ আর এক পক্ষকে যেন হামানদিস্তায় দলে পিষে মারছে। স্বাধীনতা নেই, নেই আত্মার কর্মপ্রেরণা। ভাবধারার মেঘ থেকে ইচ্ছা-শক্তি পাচ্ছে না মুক্তি, বিদ্যুতের মতো বেরিয়ে আসতে পারছে না।

কিন্তু তবু মেঘের নিচে আছে আগুন, আছে ঠাণ্ডা ত্বকের নিচে, আছে হাওয়ায় মাটিতে আর জলে···

এক সন্ধ্যেয় সে হ্যাণ্ডেল তুলে নিল। (সে ধর্মগ্রন্থের পরিচয় তারই ভিতর দিয়ে পেয়েছে।)

ইস্‌রায়েল-এর অধ্যায়ে সে পড়ল : "অথ উবাচ···"

সে শুনতে পেল যেন···

॥ তিন ॥

বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরে পড়ছে বাড়ির। এক এক বিন্দু এক এক জন বাসিন্দা।

একতলার বাসিন্দে মুমা রাভুসা। মদ আর কাঠের ব্যবসায়ী। চার বছর ধরে অর্থের জ্বরে তাকে পেয়ে বসেছে। সে-জ্বর সে বাড়িয়েও দিয়েছে। আমুদে লোকটার উপর তিন থাক চর্বি জমে উঠেছে, কিন্তু তেমনি আমুদেই আছে। পুরনো জুতো জোড়া পায়ে দিয়েই সে ঘোরে। কিন্তু স্বাস্থ্যের দীপ্তি তার দেহে, আর আছে রৌপ্যের বিভূতি। সে টাকার ছোটখাটো পাহাড় জমিয়ে ফেলেছে, এখন আর কিছু তার করবার নেই। অবসর গ্রহণ করবার আগে ফিলোপিমেন্‌-এর মতোই সে তার নিজের কেনা জমিতে বসে তার ছেলের ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু তার ছেলে তো ফিরে এল না। একদিন দেখা গেল ক্লোভির দেহ ঝুলছে কাঁটাতারে। যেদিন সকাল বেলা খবর এল, সবাই শুনতে পেল নিচুতলায় একটা চিৎকার উঠছে। একটা ষাঁড়কে যেন পিটিয়ে মারছে কসাই—এমনি সে-চিৎকার। তার এতদিনের চেষ্টায় এত রোজগার,—সব বৃথা গেল। হঠাৎ পক্ষাঘাতে শুয়ে পড়ল এই বিরাট মানুষটি।

সেরে উঠল বটে, কিন্তু তখন তার জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেছে, আর গেছে একটা চোখ। বাড়ির আর কেউ স্বর শুনতে পায় না। মদের ব্যবসাও আর তেমন চলে না।

তার পরেই খবর এল লিডিয়ার। ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ তাকে আর্তোয়ার হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল, সেখানে দুই বিরুদ্ধ সেনাবাহিনীর অগ্নিবৃষ্টির মাঝখানে সে আহতদের শুশ্রূষা করে। তার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতেই সে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তের বহু প্রতীক্ষাও সে করেছে! হায়, যদি সে বিশ্বাস করতে পারত! কিন্তু তাতো পারেনি। তার শুধু বিশ্বাস করবার ইচ্ছে। কিন্তু এ তো ইচ্ছার গণ্ডিতে পড়ে না। ইচ্ছাশক্তি আত্মার পাশের প্রকোষ্ঠের দরজা খুলে দেয় কিন্তু শেষের দরজার গিয়ে থেমে যায়। অথচ এই দরজাই তো আসল দরজা। ঈশ্বর, যদি কেউ নিজের প্রিয়জনের সঙ্গে নরকবাস সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হতে পারত! লিডিয়া নিশ্চিত হতে না পারুক, মুক্তি পেল। সে কি এখনো তেমনি সুকোমল ফুলের মতোই আছে? কল্পনার স্বর্গ থেকে আবার বাস্তবে ফিরে এসে তার ফুলের দেহ কি আবার নতুন করে গড়া হবে? সেখানে আবার কামনার মিশেল পড়বে? আবার কি মৃত্যু তাকে গ্রাস করবে নতুন করে?

এবার ফিরে এল কাইয়োদের ছেলে হেক্টর। আহতদের গৌরব নিয়ে সে ফিরল। নাক তার নেই, চোয়ালও উড়ে গেছে। (রাষ্ট্র তাকে সদয় হয়ে আর একটি দান করেছে তার পরিবর্তে। এটির স্থায়িত্ব দু'বছরের জন্য চুক্তি করা, সাবধানে ব্যবহার করলে তিন বছরও চলতে পারে।) তার হাত পা প্রথম হাঁটতে শেখা শিশুরই মতোই কাঁপে। কিন্তু সম্মানচিহ্ন মিলেছে তার। তার মা তাকে সব সময়েই তার চোখের কোমল দৃষ্টি দিয়ে ঢেকে রাখেন। এই দুর্ঘটনা সত্বেও তিনি সুখী, তিনি গর্বিত। যখন সে বেড়াতে বেরোয়, বুড়িমার বাহুর উপর ভর দিয়েই খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে। তবু সেই চিরদিনের বেড়াবার অভ্যেস তারা ছাড়েনি। তাদের উপার্জনও কমে গেছে, তবু মা কোন রকমে চালিয়ে নিচ্ছেন। মা আর ছেলে নিজেদের ভাগ্যবান বলেই মনে করেন।

জেসোফিন ক্লাপিয়ে এখন যুদ্ধকালীন নীতিবোধ জাইয়ে রাখবার কাজে নিযুক্ত। এই কাজে সে তার বিচারবুদ্ধি আর দেহ পাত করছে। দলত্যাগীদের সব চাইতে বড় দোষ তাদের অত্যুগ্র উৎসাহ। আর এই নতুন কাজের উৎসাহে শান্তিবাদী আদর্শের জন্য সে তার পুরনো সঙ্গীদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

সে ভুলে গেছে একদিন তারও ছিল এই আদর্শ। এর জন্য তাকে বহু সইতে হচ্ছে, এই অভিযোগই সে করে বেড়ায়। যাদের কাছে সে তার নতুন মতবাদ প্রচার করে, তারা না শুনে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলে সে চিৎকার করে বলে, তার অপমানে দেশেরও তারা অপমান করছে। অপরের পক্ষে এ তো বিপদজনক; তার পক্ষেও বটে। সে বুঝি পাগলা গারদের পথেই চলেছে।

ব্রশ কেঁপে উঠেছে। সে এই বাড়ির রক্ষক। ওমনিদ-দের মতোই তাকে বিপরীত অর্থে শান্তিরক্ষকই বলা চলে।

মার্ক তার অফিস-ঘরের সুমুখ দিয়ে যেতে যেতে মাকে বলল: 'আমরা যেন পেয়র-লাসেজে এসে পড়েছি। কবরখানার রক্ষককে দেখছ মা? চল মা এবার আমাদের পায়রার খোপে চল!'

'হাঁ, চল, পায়রার খোপে চল!' আনেৎ বলল।

অর্ধউচ্চারিত কথায় তারা পরস্পরের কাছে দুঃখের সংবাদ জানাল। বাড়ির কাউকে তারা ঘৃণা করে, কাউকে বা করে না; কারো প্রতি আছে বিরক্তি। এ যেন পলিফেমাসের গুহা। এই বাড়িতে, এই শহরে, এই পৃথিবীতে বন্দী আত্মারা ধৈর্য সহকারে নিজের নিজের দিন গুনছে। তারা খাদ্য হতে চায়, খাদ্যই হবে।

এবার মার্ক বলল: 'আমার পালা এল।'

আনেৎ তার হাত চেপে ধরল। 'না, না! ও কথা বোলো না!'

তাকে শেষ করতে না দিয়ে সে দুঃখিত হোলো। মার্ক কি ঠিক করেছে অন্তত সেটুকুও তো তাকে জানতে হবে।

মার্ক নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল মার দিকে। শোয়ার ঘরে সে বসেছে মার সুমুখে, তার পায়ের কাছে একটা টুলে। তার হাত দু'খানা হাঁটুর উপর। বহুক্ষণ সে তাকিয়ে রইল মার দিকে, চোখে তার দৃঢ়তা। আনেৎ-এর দৃষ্টিও কোমল, স্নিগ্ধ। সে এখন মার্কের একেবারে আপনার। কিন্তু সে তো সে-সুযোগ আর নেবে না। তার মা তো পরম ধন।

সে তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল: 'অদ্ভুত কিন্তু! যুদ্ধের আগে আমরা কেউই তো শান্তিবাদী ছিলাম না!'

'ও নাম উচ্চারণ কোরো না মার্ক।' আনেৎ বাধা দিল।

'ঠিক, ঠিক। ওরা তো নামকে কলুষিত করেছে। যারা মুখে শান্তির বাণী প্রচার করতো, তারাই আজ তাকে অস্বীকার করছে।'

'কিন্তু অস্বীকার করবার মতো সরলতাও যদি তাদের থাকত! তারা নিজেরা এ আদর্শকে কখনো বিশ্বাস করেনি, শুধু আদর্শের মিথ্যে খোলসে নিজেদের সাজিয়েছে।'

'তারা যা ইচ্ছে করুক,' মার্ক বলল: 'কিন্তু আমরা যারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলাম, তারা তো কখনো এর বিরুদ্ধে যাইনি। যখন এই আদর্শের প্রচার হচ্ছিল, মনে আছে, ভারী খুশিই হয়েছিলাম। তুমি তো একে স্বীকার করেই নিয়েছিলে কিন্তু আজ এ পরিবর্তন হোলো কেন আমাদের?'

'এর নিচতাই এনেছে এই পরিবর্তন।' আনেৎ উত্তর দিল।

'হাঁ, আর তার নিচে লুকানো মিথ্যাও।'

আনেৎ বলতে লাগল: 'যখন দুর্বল নিরস্ত্র আর বন্দীর প্রতি ঘৃণা দেখতে পাই, যখন মানুষের দুর্দশা, নিচপ্রবৃত্তির শোষণ, বিবেকের প্রতি উৎপীড়ন আর জনমতের ভীরুতা প্রবল হয়ে ওঠে, তখন মন আমার লজ্জায় আর দুঃখে নুয়ে পড়ে। আমি দেখেছি, ভেড়াদের ওরা বীর বলে শিরোপা পরিয়ে দেয়, ভালো মানুষগুলোকে ওরা হত্যায় প্ররোচিত করে। আর অক্ষম জনশক্তি নিজেকে বুঝতে পারে না, কতগুলি বিপথগামী মানুষের দ্বারা চালিত হয়।'

'যখন দেখি,' মার্ক এবার বলল: 'এই ঘৃণ্য যুদ্ধ তার মুখ লুকিয়ে চলেছে, ছদ্মবেশের আড়ালে এই নিষ্ঠুর হত্যাকারীর দল পৃথিবীর পকেট মারছে, এই উদ্ধত দাসত্ব কলকল নিনাদে শূন্যগর্ভ স্বাধীনতার বুলি কপচাচ্ছে, বীরত্বের ভণ্ডামি করছে—তখন আমি হেসে উঠি, ওদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারি আমার ব্যঙ্গময় হাসি।'

'ওদের উত্তেজিত কোরো না মার্ক! ওরাই যে সংখ্যায় বেশী!'

'তাই তো স্বাভাবিক। ঘৃণ্য উৎপীড়ক তো লাখো লাখো ঘৃণ্য মানুষের সমষ্টি।'

'ওরা কি করছে জানে না।'

'যতদিন না জানে ততদিন দাসত্বশৃঙ্খলে ওরা বন্দী থাক!'

'তুমি বড় নিষ্ঠুর। করুণা করতে হবে। ওরা তো শৃঙ্খলে বন্দী। চিরদিনই ওরা বাঁধা পড়ে আছে। তাই তো গণতন্ত্র একটা ভণ্ডামি বলেই মনে হয়। ওরা বিশ্বাস করে, সার্বভৌম জনশক্তি ওরা—একথা ওদের বলাও হয়, আর সেই সার্বভৌম শক্তিকে নিলামে বিকিয়ে দেয়।'

'কিন্তু তাদের এই সার্বভৌম্য নির্বুদ্ধিতার জন্য আমার এতটুকু করুণা নেই।'

'তাদের মধ্যে সব চাইতে নির্বোধ যে সেও আমার ভাই।'

'ভাই—! ও-সম্বোধনের কোনো অর্থ হয় না। পথে যে জঞ্জাল ঘাঁটছে আমি সেই কুকুরটারও তো ভাই! কিন্তু তার সঙ্গে আমার মিল কোথায়?'

'একটা মিল তো আছে। সে মিল জীবন।' উত্তর দিল আনেৎ।

'হাঁ, যে-জীবন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কিন্তু সে তো যথেষ্ট নয়।'

'আর কি আছে?'

'তোমার তো তা আছে, অথচ আমাকে তুমি জিজ্ঞেস করছ? সে এমন জিনিষ জীবন বা মৃত্যু তাকে ধ্বংস করতে পারে না। সে অনন্তের বীজ।'

'কিন্তু সে-বীজ কোথায়? হায়, আমি তো আমার ভিতরে তাকে দেখছিনা!'

'কিন্তু যে কাজ তুমি করছ, তুমি যা আছ, এই বীজ তোমার ভিতরে না থাকলে তুমি তো তা হতে পারতে না।'

'তুমি দেখছি আমার চাইতে ঢের বেশি জ্ঞানী। আমি যা ভাবি তাই-ই করি। মনে প্রাণে করে যাই, প্রায়ই ভুলও হয়। কিন্তু এই বয়সেও আমি তো এই বীজ ঠিক চিনতে পারিনি; আর চেনবার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করি না।'

'কিন্তু আমার তো প্রয়োজন আছে। আমাকে জানতে হবে, কোথায় চলেছি, কোথায় আমার যাবার ইচ্ছা।'

'যেখানে যেতে চাও সেইখানেই তো যাচ্ছ।'

'তা হোক না! আমি দেখতে চাই।'

'কি দেখবে? কি চাও তুমি? কোথায় চলেছ?'

মার্ক উত্তর দিল না।

আনেৎ সাহস জড়ো করে জিজ্ঞেস করল, তার গলা বুজে এসেছে: 'যুদ্ধ যদি তোমাকে গ্রহণ করতে আসে, কি বলবে তাকে?'

'তাকে না-ই বলব।' মার্ক বলল।

আনেৎ আঘাতের প্রতীক্ষায় ছিল। আঘাত পেয়ে সে তাকে বাধা দেওয়ার জন্য হাত তুলল। 'না, না, ওকথা নয়।'

মার্ক শান্ত স্বরে বলল: 'তুমি কি আমাকে "হাঁ" বলতে বলছ মা?'

আনেৎ বাধা দিল: 'না, না, তাও নয়!'

মার্ক মার দিকে তাকাল, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে তার মা। এর উত্তর তার অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিল। সে প্রতীক্ষা করল, মন সে সুস্থির করুক। করুণা আর শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠল। কিন্তু মার তো কোনো যুক্তি নেই, শুধু আছে বাৎসল্য-রসে অভিষিক্ত দুশ্চিন্তা।

'না, না, নিজে কিছু ঠিক কোরো না! এখনও বিচারবুদ্ধি তোমার হয়নি, তুমি জানো. না! অপেক্ষা কর! যে-শিশু এখনও জীবনকে দেখেনি তার নিষেধ শুনে তোমার সমস্ত জীবন বিপদাপন্ন করা তো পাপ ছাড়া কিছু নয়।'

'কিন্তু তুমি, তুমি তো জীবনকে দেখেছ!'

'আমি নারী। কিছুই জানি না। আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না, আমাকে নির্দেশ দেওয়ার কেউ নেই। আমি শুধু হৃদয় আর প্রবৃত্তির কথা শুনেই চলেছি। কিন্তু সেই তো যথেষ্ট নয়।'

'না, তাতো নয়ই। কিন্তু কি যথেষ্ট বলতে পার? জীবনের শেষ সীমায় এসেও কি মানুষ বলতে পারে সে সব কিছু জেনেছে, সে নিশ্চিন্ত হয়েছে, সে পরীক্ষা করে দেখেছে? তাহলে সে কি আগামীকালের প্রতীক্ষা করেই থাকবে—এই কি হবে তার শাস্তি? কিন্তু এমনি করে দিনের পর দিন সব কিছু স্থগিত রেখে একদিন অপমানিত ঘৃণিত হয়ে সে পৌঁছবে তার অস্তিমে। বেশীর ভাগ মানুষই তো তাই করে। বল, কখন আমি বেঁচে থাকবার অধিকার পাব?'

আনেৎ শুনতে চাইল না। (সে ভালো করেই শুনেছে তার কথা।)

'নিজেকে ধ্বংস করবার অধিকার তোমার নেই।'

'আমি ধ্বংস করতে তো চাই না, আবার গড়ে তুলতে চাই।'

'কি গড়ে তুলতে চাও? কার জন্য?'

'প্রথমে আমার জন্যে তো বটেই। এক বিরাট সৌধ, পবিত্র তার আবহাওয়া—সেখানে আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে চাই। অন্য লোকের মতো মিথ্যার অন্ধগুহায় থেকে হাঁপিয়ে উঠতে আমি চাই না। তুমি আমাকে কঠোর বলতে পার—হাঁ, আমি তাই। যাদের তুমি করুণা কর, তাদের সাহায্য করতে হলে আমাকে নিষ্ঠুরই হতে হবে। আর তাদের জন্য গড়ে তুলতে হবে আমার এই সৌধ।'

'কিন্তু সে তো একদিনের ব্যাপার নয়, মার্ক। গড়তে হলে তো অনেক সইতে হবে।'

'হাঁ, ভিত্তিকে সইতে হবে বইকি। বিরাট সৌধও তো একখানা পাথর দিয়েই শুরু হয় মা। আমি তো সেই পাথর।'

'তুমি মার্ক। তুমি আমার।'

'তোমার থেকেই আমার আবির্ভাব। তোমার সৃষ্ট আমি।'

'কিন্তু আমাকে তুমি বলি দিতে চাইছ! তোমার তো সে অধিকার নেই।'

'মা, সে তো তোমার দোষ। তুমি আমাকে খাঁটি হতে বলেছ, সত্যিকারের মানুষ হতে বলেছ, তাই-ই তুমি চাও। কিন্তু তা হতে পারব কিনা জানি না। তবু চেষ্টা করতে চাই। এস, আমরা পরস্পরের কাছে অন্তত মন খুলে দিই। মানুষ তার স্বার্থ আর কামনার সীমারেখার বাইরে যখন বিশ্বস্ততা হারিয়ে ফেলে তখনই এসে হাজির হয় পাপ। এই সীমায় পৌঁছেই মানুষ ছলনার আশ্রয় নেয়, এই শান্তিবাদীদের মতোই নিজেদের সঙ্গে চাতুরি খেলে। তুমি চাও আমি বিশ্বাসী হই। কিন্তু আমাদের সুখ বিসর্জন দিয়ে বিশ্বাসী হবো তা তো চাও না। একি ভালো? এই কি সারল্য?'

আনেৎ উত্তর দিল: 'হাঁ।'

'হাঁ, এই-ই ঠিক পথ।'

সে তার হাত ধরল, হাত পিছলে যাচ্ছে, শক্ত করে সে ধরল। 'আমার দিকে তাকাও তুমি। যা ভাবছ, তা তুমি বলছ না। আমার দিকে তাকাও তুমি। হাঁ, এই-ই আমি চাই! উত্তর দাও! আমি কি ভুল করেছি! আমাদের ভিতরে কে বেশী সরল—তুমি না আমি?'

আনেৎ তার মাথায় চুমু খেয়ে বলল: 'তুমি!'

কিন্তু পরক্ষণেই চিৎকার করে উঠল: 'না, না, এ পাগলামি! এ আমি চাই না।'

সে তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইল, করতে চাইল আলোচনা।

'সরলতা বলতে আমি বুঝি নিজের চিন্তাধারার সরলতা, কাউকে প্রতারণা না করা—মানুষ নিজে যা বিশ্বাস করে সে-বিশ্বাস নিয়ে নিজেই যেন সে ছিনিমিনি না খেলে, তার বেশী কিছু তো নয়। আমাদের কাছ থেকে অসম্ভব কিছু তো চায় না। আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে যাব এইটুকুই তার দাবি। আমাদের আত্মাই একমাত্র মুক্ত, দেহ তো বন্দী। আমরা সমাজের দাস, তারই হুকুম আমরা মেনে নিই। নিজেদের ধ্বংস না করে তাকে ধ্বংস করতে আমরা অক্ষম। যখন সে অন্যায় করে, আমাদের তাকে বিচার করে দেখা ছাড়া অন্য উপায়ও থাকে না। কিন্তু তাকে আমাদের মেনে নিতে হয়।'

'মা, তুমি তোমার জীবনকে অস্বীকার করছ। তুমি কি মনে কর, তোমার বিদ্রোহ, তোমার যুদ্ধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার রুখে দাঁড়ানোর খবর আমি রাখি না? তুমি তো আমার শ্রেষ্ঠ আইন-অমান্যকারিণী···তা যদি না হতে, তোমাকে তো এত ভালোবাসতাম না!'

'না, না, আমার পথে তুমি যেও না! এ আমার শাস্তি! এ পথ ভুল··· তোমাকে তো বলেছি, আমি অন্ধের মতো চলেছি জীবনের পথে। আমার অনুভূতি আর নারী-সুলভ কামনা ছাড়া পথ দেখাবার কেউ তো ছিল না। হাঁ, আর ছিল আনন্দে নন্দিত হৃদয়, একটু ছোঁয়া লেগে সে চমকে উঠত। পুরুষ আমি সৃষ্টি করলাম, সে-পুরুষ তো আমাকে আদর্শ বলে গ্রহণ করতে পারেনি। আমি যে স্ত্রীলোক! সে তো প্রকৃতির এই কাদা থেকে নিজেকে উদ্ধার করবে। তার দৃষ্টি হবে তীক্ষ্ণ, সুদূরপ্রসারী।'

'থামো, থামো! কিছুক্ষণ পরেই তো আমরা ও-আলোচনায় আসব। তখন আমাকে হয়ত পিছু ফিরতে বলবে। কিন্তু এখন বল, তোমার অবাধ্যতাকেও কি তুমি অস্বীকার কর?'

'আমার কাছে সবই তো পরাজয়।'

'কিন্তু প্রতি পরাজয়ই তো (স্বীকার কর!) মুক্তি।'

'কিন্তু আমি তো শেকল বদলেছি শুধু ক্ষতবিক্ষত হবার জন্য। একটা শেকল থেকে পালিয়ে আর এক শেকলের বাঁধনে ধরা পড়েছি। হয়ত শেকলেরও দরকার আছে।'

'তুমি নিজের বিরুদ্ধেই বলছ মা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শেকল তোমার সয় না। তুমি শেকলের বিরুদ্ধে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লড়াই করবে—এ আমি জানি।'

'কিন্তু যদি ভুল করে ফেলি, কি হবে? যদি শেকল ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে এই শৃঙ্খলিত প্রবৃত্তি নিজের এবং অপরের সর্বনাশ করে বসে? যদি উৎসর্গ দিয়ে আবার আদেশ কিনে নিতে হয়?'

'মা, তুমি সহৃদয় আত্মসুখী মানুষ বলে নিজেকে জাহির কোরো না! সে-মানুষ তো প্রতিবেশীর ভালোর চাইতে বিশ্বের শৃঙ্খলাকেই ভালোবাসে। পৃথিবীর নিচতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার বিপদ সে বরণ করতে চায় না, সে চায় তার ভাবধারার প্রশান্তি। গ্যেটে যতটুকু পেয়েছিলেন, ততটুকুতে আমাদের চলবে না। এই চিরন্তনী ব্যবস্থাই আমাদের কাছে যথেষ্ট নয়। যখন অন্যায় তাকে কলুষিত করে দেয়, নিশ্বাস নেবার জন্য বদ্ধ জানালা ভেঙে দেওয়াই তো আমাদের কাজ।'

'তুমি তোমার শিরা-উপশিরা কেটে ফেলতে চাও?'

'হাঁ, তাই। ঐ বদ্ধ জানালা ভেঙ্গে দিতে চাই। তারপর যদি পা হড়কে সেই

ভাঙা জায়গা থেকে পড়ে যাই, তাও ভালো। আমি তো ভাঙলাম। অন্যে এবার ভালো করে নিশ্বাস ফেলতে পারবে।'

'বাছা, মানুষকে তুমি বিশ্বাস কর না। একথা তো একশোবার তুমি বলেছ। তবে আজ আবার আত্মোৎসর্গের কথা বলছ কেন? মানুষের উপর আমার বিশ্বাসের জন্য তুমিই কি আমাকে ঠাট্টা করনি? আর আমার বিশ্বাস এমনি আঘাত খেয়ে নুয়ে পড়েছে, সে-দৃঢ়তাও যে তার নেই।'

'ক্ষমা কর! আমি তো কখনো তোমাকে ঠাট্টা করিনি। তোমার বিশ্বাসের জন্যই তো তুমি আমার চোখে এত মহান, বুঝি তোমার বিশ্বাসেও ততো গরিমা নেই···কিন্তু এই মানবতাবাদকে কখনো আমি ভালোবাসতে পারলাম না। এই আদর্শ তো ফাঁকা বুলি আর পার্থিব মোহ ছাড়া কিছুই নয়। আমি মানুষকে দেখেছি বিপদে পড়েছে, ভিড় জমাচ্ছে, পরস্পরের গায়ে পড়ছে, ডানে বাঁয়ে, সামনে পেছনে এগিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের পদতাড়নায় উড়ছে ভাবধারার ধুলো। আমাদের জীবনে, এই বিশ্বের জীবনে এক বিয়োগান্ত প্রহসন আমি দেখেছি, এখনো তার শেষ দৃশ্য লেখা হয়নি। যারা আক্রমণ চালাচ্ছে তাদের দ্বারাই রচিত এই দৃশ্য; তারই পরিকল্পনা চলছে। সেই আমি আক্রমণকারীদেরই একজন। এর জন্য আমি মনোনীত হয়েছি। আমি যে তোমার ছেলে মা, আমি যে-মার্ক রিভিয়ের, তাইতো আর পেছু-হটা চলে না। আমার গর্ব তো সেইখানেই! আমার দল জিতুক আর হারুক, আমি এই প্রতিযোগিতার খেলা ছাড়ব না, শেষ পর্যন্ত দেখব।'

'এ খেলা কি বলতে পার? তুমি কোন দলে? নতুন না পুরনো দলে? সে কথা কি কেউ বলতে পারে, কে জোর দিয়ে বলবে বল? হয়ত অতীত ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রণ করবে, হয়ত ভবিষ্যৎ আসবে অতীতকে নিয়ন্ত্রণ করতে। কিন্তু আমাদের আলো দেখাবে কে? আমি যখন অন্য সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনোজগতেই বাস করতাম তখন হঠাৎ অনুভব করেছি, ধর্ম-বিশ্বাসের প্লাবন আমার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। আমি তখন মনে মনে বলেছি: যদি বিজয়ী বীর (যে ভগবান আসছেন) আমার মধ্যে না থাকেন, কি করে এই অনুভূতি আমি পেলাম! কিন্তু পরে দেখেছি অন্য সবাইও এমনি নিশ্চিত, এমনি বিরুদ্ধবাদী, আমার মতোই বিভিন্ন। দেশপ্রেমের ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, আইন-কানুন, স্বাধীনতার এমন কি ভালোবাসার নামে এই অন্ধ বিশ্বাসের খেলা দেখেছি। উন্মত্ত অন্ধ জীবনকে দেখেছি নিজেকে নিঃশেষ করে

দিতে, তখন আর গর্বভরে বলতে পারিনি : হাঁ, আমারই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস।'

'আমার বিশ্বাস আমারই। বিশ্বাস আর দু'টো থাকে না।'

'যাদের ভালোবাসি তাদের বিশ্বাসও যে আমার। আমার বিশ্বাস তো তাদের ভালোবাসা।'

'তুমি কি অনেককে ভালোবাস? ভালোবাসার লোক কি বেশী খুঁজে পাওয়া যায়?'

'হয় ভালোবাসি, না হয় তো করুণা করি। একই তো কথা।'

'আমি তোমার করুণার পাত্র হতে চাই না মা। আমি অন্য ধরণের ভালোবাসা চাই। সে-ভালোবাসার থাকবে নির্বাচনী শক্তি, সে পছন্দ করে চিনে নেবে।'

'ওরে নিষ্ঠুর, আমি তো তোমাকে খুবই পছন্দ করে নিয়েছি। তোমাকে কাছে রাখবার জন্য পৃথিবীকে আমি ছাড়তে পারি। বেশ, তবে আমার সঙ্গে থাক, আমার মতো হও—বেছে নাও আমাকে। তুমি বড় বেশী স্বপ্ন দেখ। জোয়ার-ভাঁটার মত একবার আস আবার চলে যাও, কিন্তু এগোতে তো তুমি পার না। মানুষকে তো এগোতে হবেই, তার জন্য যা মূল্য দিতে হয় সে দেবে। নিজের বেছে নেওয়া পথে সোজা চলতে গিয়ে যদি ধ্বংস করতে হয়, তাও তো করতে হবে।'

'কিন্তু যদি সামনে দেখা দেয় প্রতিরোধ প্রাচীর? যদি মানুষ একা হয়, আর তার বিরুদ্ধে যদি দাঁড়ায় সমস্ত পৃথিবী—কি হবে তা হলে?'

'যে নেতা সে তো একাই এগোবে। একা যে এগিয়ে যায় সেই তো অগ্রদূত। তার প্রতি পদক্ষেপেই তো পৃথিবীর মানুষের সড়ক তৈরি হয়!'

'এতো মানুষের বিশ্বাস! যত মানুষ পৃথিবীতে প্রায় ততগুলি বিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই আমি এই বিশ্বাসের চাইতে মানুষকেই বেশী বিশ্বাস করি। আর এই পাগলদের আমি বাৎসল্যে সিক্ত হয়ে জড়িয়ে ধরতে চাই।'

'কিন্তু তারা তো চায় না। তারা মার স্তন্য চায় না। বহুদিন তারা বুকের দুধ ছেড়েছে। না, না, আমরা বিশ্বাস করব, কাজ করব, করব ধ্বংস! এগিয়ে যাব দৃঢ় পদক্ষেপে, সংঘর্ষ শুরু হবে, কিন্তু তবু আমরা এগোব···তুমি বোধহয় দেশ সম্বন্ধে প্রচলিত সেই কথাটা শুনেছ···ওরা বলে, এ যেন মরুভূমিতে

তাঁবু খাটানো! চল, এগিয়ে চল, পিঠে বয়ে নিয়ে বেড়াও তাঁবু খাটানোর খুঁটি আর ত্রিপল।'

'কিন্তু আমার শিবির যে চিরদিনের জন্য খাটানো হয়েছে। আমার হৃদয়ের এই ধর্ম। এই সব সামাজিক কর্তব্য বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দেয় পরস্পরকে খণ্ডন করে, তারা তো আমার কাছে কোমল বৃত্তিগুলির চাইতে বড় নয়। ভালোবাসা আর মাতৃত্ব তো অবিনশ্বর চিরন্তন হয়েই আমার কাছে দেখা দিয়েছে। তাদের উপর আঘাত হানলে আমার বুকে ব্যথা লাগে। তাদের যত সঙ্কটই আসুক না কেন, আমি রক্ষা করতে ছুটে যাই। কিন্তু তার বেশী তো এগুতে পারি না।'

'আমি কিন্তু এগিয়েই চলেছি। যখন সামাজিক কর্তব্য স্বাভাবিক ভাবাবেগের উপর আঘাত হানে, তখন তো অন্য আর এক মহান সামাজিক কর্তব্যকে তার জায়গায় এনে বসাতে হবে। হাঁ, সেসময় আজ এসেছে।'

'এই সমাজ, আর তার নীতি, প্রশ্নোত্তরমালার ভিতর দিয়ে তার জ্ঞানের প্রচার শেষ হওয়াই তো উচিত, আর শেষ হয়ে যাবেও। আমাদের সত্তা যে সেই দাবীই জানাচ্ছে। আমাদের বিচার-বুদ্ধি, আমাদের কামনা-ভাবনা প্রতিবাদ করে উঠছে এই উৎপীড়নকারী সামাজিক সম্বন্ধের বিরুদ্ধে। আজকের জগতে এ সম্বন্ধের কোনো দরকার নেই। পচে গলে পুরনো হয়ে গেছে। যে মহাশক্তি মানুষের হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে, আইন তারই উপর টেনে দিয়েছে বিধিনিষেধ, তাকে গণ্য করেছে পাপ বলে। ন্যায়ের এই অবিচার, সমাজব্যবস্থার এই অন্যায় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব করেছে—যেখানে শাসন হয়ে উঠেছে চরম উৎপীড়নেরই নামান্তর। যদি হাজার হাজার তরুণ এই যুদ্ধকে তাদের মুক্তির উপায় বলে মনে করে থাকে, যদি আমার হৃদয় যুদ্ধের নামে মেতে উঠে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই। আমরা ভেবেছিলাম, এই যুদ্ধ নিয়ে আসবে আমাদের মুক্তি। কিন্তু তা তো হলো না। যে পুরনো ভাবধারা আর সংস্কার আমাদের গলা টিপে ধরেছিল, যে দূষিত সমৃদ্ধি আর নীতিবাদের উদাসীন বিতৃষ্ণায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম, তার উপরে বিরক্তিকর মতবাদের পালিস পড়ল মাত্র। দেখা দিল প্রাণহীনতা আর ভণ্ডামি। তোমাদের পুরনো শান্তিবাদ আর মানবতা একদিন প্রকৃতিকে রেখেছিল পঙ্গু করে, আমাদের বাঁচার সেই বলিষ্ঠ পবিত্র আনন্দকে হত্যা করেছিল। হাঁ, সেই পবিত্র আনন্দকে ধ্বংসই করেছিল। আমরা ভাবলাম, এবার বুঝি সেই অভিশপ্ত নাগপাশ

খসে পড়বে। কিন্তু মূর্খ, মূর্খ আমরা! মুক্তির কোন উপায়ই তো হোলো না। এল এক ঘৃণ্য যুদ্ধ, সবকিছুকে এক নিষ্ফল নিচ দুঃখ আর মৃত্যুর মেঘে ঢেকে দিয়ে গেল। বাঁধন হলো আরো শক্ত, তারুণ্য বন্দী হলো শৃঙ্খলে। লা বালু-র মতোই খাঁচায় পোরা হোলো তাকে! না, না, আমরা ভাঙব, ভাঙব এই হননকারী ব্যবস্থা, এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা। এতো ব্যবস্থা নয়, তারই নামে বিশৃঙ্খলা। একে ভাঙতে হবে, আর সেই ভগ্নস্তূপের উপর গড়ে তুলতে হবে এক উন্নত উদার ব্যবস্থা—যারা আসছে, যারা এসেছি তারাই তাতে অংশ নেবে। আলো চাই, চাই বায়ু, আরো বায়ু! ভালোমন্দের আরো উদার সংজ্ঞা খুঁজে নিতে হবে! আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও তো পরিধি বাড়ছে।'

'কোথায় দেখলে তুমি এদের? আমি তো আমার খোকা ছাড়া আর কাউকে এখনো দেখিনি। আর তাকে আমি ভয় করি। ইতিহাসের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে কেন তাকে আমি নিয়ে এলাম?' বলল আনেৎ।

'তার জন্যে দুঃখ কোরো না মা। আমার জন্য দুঃখ করতে আমি দেব না। এতো ঝড়ের মুহূর্ত, ঝড় আরো বেশীক্ষণ থাকুক, বাড়ুক ঝড়! আর দীর্ঘজীবী হও মা তুমি! তুমি তো আমাকে এই ঝড়ে ওড়বার পাখা দিয়েছ! তোমার সেই 'শেষ দস্যুর' গল্প মনে আছে?—সেই যে নরওয়ের সেই জেলে, যার কাহিনী আমরা পড়েছিলাম? অবশেষে মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে সে লফোডেন দ্বীপের ঝটিকাময় পরিবেশ ছেড়ে এল শহরের বদ্ধ হাওয়ায়, কিন্তু সুখী সে হতে পারল না। আমি আমার যুগেই থাকতে চাই মা, তোমার যুগের শান্তি আমি চাই না। তোমার যুগ মানুষের তেজহীন অগ্রগতির অক্ষম স্বপ্ন দেখেছে। তোমার পর্দায় বর্তমানের যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছে, সে তো একঘেয়েমি ভরা অসঙ্গতি। কায়েমী স্বার্থবান শ্রেণী তাই-ই উপভোগ করছে, কিন্তু ক্ষিদে তাদের বাড়েনি। বিবর্ণ আনন্দ আর হতশ্রী দুঃখ—একঘেয়েমির বিদ্রূপ আর বিবর্ণ মাধুর্য—এই নিয়েই তারা খুশি আছে। তাই এসেছে বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা। আর আমাদের মতো শ্রমিকদের কাছে সে নিয়ে এসেছে চাকার চিরস্থায়ী এক আবর্তন—আর একবার অন্ধকারে চাকা শুধু ঘুরে গেল মাত্র। এমনি করে চিরদিনই ঘুরবে। কিন্তু আজ তো আর সেদিন নেই। ঝড় উঠেছে, আজ ধসে পড়ছে সে-সৌধ, আমাদের নিচুতলায় এসে পৌঁচেছে দিনের আলো আর ঝোড়ো হাওয়া। যে জীবন, মানুষ আর মুহূর্ত আসছে, তার সম্বন্ধে আমাদের নেই মোহ। আমরা সেই অসম্ভব আর বিরাট গহ্বরের কিনারে এসে পড়েছি।

সেইখানেই বাস করছি। এ-জীবন থাকবে কি তলিয়ে যাবে জানি না। তবু নিজেদের এই একদিনের বিশ্বকে কাঁধে নিয়ে চলেছি।'

'আমরা? কে এদের দেখেছে? তারা কোথায়? কে তারা?'

'যে প্রথম কাজ করতে এগিয়ে আসবে সে-ই তো সেই "আমাদের" পূর্বপুরুষ। আমাদের সম্ভব হবে তার থেকেই।'

'কিন্তু সে তো মরে যাবে।'

'হাঁ, সে মরবে।'

'কিন্তু সেই পূর্বপুরুষের ভূমিকা তুমি নেবে এ আমি চাই না মার্ক।'

'তুমিই তো এইমাত্র সেই মাতৃত্বের কথা বলছিলে। যে-মাতৃত্ব প্রতি মানুষের কাছে পৌঁছোবার স্বপ্ন দেখে, এই তো তার ব্যবহারের সুযোগ! আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা তুমি আর সবার ভেতরে বেটে দাও না মা!'

'আমি শুধু নিষ্ফল গর্ব করেছিলাম। আমি তা পারব না। আর কেই বা তা পেরেছে? সে তো মানুষের সাধ্য নয়। আমি তোমার ভিতরেই সবাইকে আবিষ্কার করেছি। সবার ভিতরে দেখেছি তোমাকে। তোমাকে পাওয়ার আগে সবার ভিতরে তোমাকেই তো খুঁজে বেড়াতাম, আজ তোমাকে পেয়ে হারাব? না, না, সবাইকে দিয়ে আর আমার দরকার নেই। তুমিই তো আমার বিশ্ব!'

'কিন্তু বাইরের বিশ্ব যে আমাদের টানছে, তাকে তো নিয়তির বিধান মানতে হবে। আর সেই বিধান অনুসারে চলব আমরা। যদি ক্রুশে বিদ্ধ হতে হয় তবুও। সেই বিষাদময়ী জননীকে (মাতের দলোরোজা) মনে রেখো!'

'সে যদি না চায় তবুও? সে তো উৎপীড়িত।'

'আমরা সবাই-ইতো তাই। তুমি আমি—সবাই।'

'কে উৎপীড়ন করছে?'

'আমাদের স্বভাবগত আইন-কানুন।'

'যদি সে আমার বিরুদ্ধেই হয়, কেন আমি তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করব? আমি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি। আর আর আইন-কানুনের মতোই আমি তাকে উপেক্ষা করতে জানি।'

'তুমি তা পার না। তাহলে তো বিশ্বাসী হতে পারবে না।'

'বেশ তো, না হয় মিথ্যাবাদীই হব!'

'তা পারবে না। আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী হতে দেব না মা।'

মার্ক তাকাল মার দিকে। একটু থেমে আবার কাঁপা গলায় বলে গেল: 'মা, দু'টো জিনিষ আমি পছন্দ করি না: এক অবিশ্বাসী আর এক ভীরু হওয়া। বোধহয়...' সে ইতস্তত করল: 'বোধহয় আমি নিজে ভীরু আর মিথ্যাবাদী বলেই পছন্দ করি না।'

আনেৎ দু'হাত দিয়ে তার মুখখানা তুলে ধরে বলল: 'কে বলে তুমি মিথ্যাবাদী?'

মার্ক চোখ বুজে ধীরে ধীরে বলল: 'হাঁ মা, আমি তাই, মনের তলায় যে আমার ভীরুতা লুকিয়ে আছে...'

আনেৎ দু'বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। মার্ক ছাড়িয়ে নিল না, সে মার বুকে মাথা দিয়ে শুয়ে রইল। দু'জনেই দুর্বল। কিন্তু তাদের দুর্বলতা নিয়ে এসেছে শক্তি। পরস্পরেরই দুর্বলতা পরস্পরের কাছে শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে।

মার্ক নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল: 'তুমি মিথ্যাবাদী—এতো বাজে কথা।'

'আমি নিজেকে প্রতারণা করেছি।'

'তুমি তো প্রতারণা করনি। প্রতারিত হয়েছ।'

'মনের ছলের কথা কি কেউ জানে? আমি কি নিজের কাছে বারবার মিছে কথা বলিনি?'

'যদি বলে থাক, তার কারণ মানুষ কখনো প্রতারণা ছাড়া বাঁচতে পারে না।'

'যদি প্রতারণা জীবন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় জীবনই যে অদৃশ্য হয়ে যাবে।'

'ও-ই তো আমাদের মায়ায় ঘিরে রাখে।'

'যদি প্রতারণা ছাড়া জীবন না চলে, যদি এ মায়াই হয়, তাহলে তো সত্যিকারের জীবন সে নয়। সত্যিকারের জীবন তার গণ্ডির বাইরে। সে জীবনকে আমাদের আবার খুঁজে বার করতে হবে।'

'কোথায় তাকে মিলবে?'

'তোমার আমার ভিতরে, সত্যের প্রয়োজনের ভিতরে সে লুকিয়ে আছে। যদি সে আমাদের ভিতরে বাঁচতে না পারে, কি করে সে হবে আমাদের জীবনের নেতা?'

আনেৎ ছেলের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে সে সংযত করল। এতো তার ছেলের কাছে জীবন-মরণ সমস্যা।

'আমি অনুনয় করছি, হাঁ, ভিক্ষা চাইছি। এই ফাঁকির জন্য নিজের বিপদ ডেকে এন না মার্ক! কি ফল হবে তাতে? তুমি তো জানো, মানুষকে তুমি বদলাতে পারবে না। তাদের জন্য যে যাই করুক, তারা ঠিক তেমনি থাকবে, তেমনি কামনা আর সংস্কারী মানুষ, তেমনি অন্ধ—আর সেই অন্ধতার নাম দেবে বিচার-বুদ্ধি বা বিশ্বাস। কিন্তু সে তো এক পাথরের দেওয়াল—শামুকের খোলা মাত্র। বাঁচবার জন্য এই-ই তাদের চাই। এই খোলা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারবে না। শুধু তুমিই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সত্যকে জীইয়ে রাখ, লুকিয়ে রাখ। যে চোখে তার আলো সয় না, তার কাছে তার পর্দা তুলে দেখাতে যেওনা। কি ফল হবে, কি ফল হবে? যারা সে-পর্দা তুলবে, তাদের তো মরতে হবে!'

'কি ফল হবে? তোমার জীবনে কি ফল পেয়েছ? তুমি সত্যের যে-রূপ দেখেছ, সেই অনুসারে কি জীবন কাটাওনি মা? তোমার সত্যের বাণী কি তুমি শোনোনি, বিপদ আসে বলে কি তাকে উপেক্ষা করেছ? সত্যের বাণী শুনেছ বলে কি কখনো অনুতাপ এসেছে তোমার মনে? উত্তর দাও! উত্তর দাও! ···তুমি কি সেজন্যে দুঃখ করেছ?'

আনেৎ-এর অন্তরে শুরু হোলো সংঘাত, তবু সে উত্তর দিল: 'না।' সে অভিভূত হয়ে গেল। 'হাঁ আমিই ওকে হত্যা করেছি।'

ছেলে তাকাল মার দিকে; ভালোবাসা ঝড়ে পড়ছে দৃষ্টিতে। মার্কের মুখেও ফুটে উঠল প্রশান্ত হাসি। সে বলল: 'মা নিজেকে আর ক্ষতবিক্ষত কোরো না। হয়ত সেদিন আসবেই না, হয়ত কিছুই হবে না, হয়ত যুদ্ধই তার আগে শেষ হয়ে যাবে। এখনো কিছু ঠিক হয়নি। জানি না, কি করব। কিছুই জানি না। শুধু জানি, সে-মুহূর্ত যদি আসে, আমি বিশ্বাসঘাতক হব না। অন্ততঃ চেষ্টা করে দেখব। আমাকে তখন সাহায্য কোরো, প্রার্থনা কোরো আমার জন্য।'

'কিন্তু কার কাছে প্রার্থনা করব?'

'তোমার আত্মার কাছে। সেই-ই তো আমার উৎস। আমি ঝরনা, সেই উৎস থেকেই তো আমার জন্ম।'

॥ চার ॥

সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রতীক্ষা আর দুশ্চিন্তার পর (—এর ভিতরে তারা আর এ-বিষয়ে আলোচনা করেনি, কিন্তু দু'জনেই ভেবেছে, আর গোপনে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দেখেছে। আনেৎ-এর কান তো হাওয়ায় ভেসে আসার শব্দের প্রতীক্ষা করছিল। কখন সেই ভীষণ মুহূর্ত আসবে ঘনিয়ে, বিমানের শব্দ এসে পৌঁছবে কানে, তার ছেলে চলে যাবে—) একদিন সকালবেলা শহরের কামানগুলো গর্জে উঠল। পথে তুমুল কোলাহল, যেন বান ডেকেছে।

তারা কিছু ভাবার আগেই সিলভী এল হাঁপাতে হাঁপাতে। চিৎকার করে সে বলল : 'যুদ্ধ-বিরতির খবর এসেছে! সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর পড়েছে!'

তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। আনেৎ এবার নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ ফেরাল। হাতে মুখ ঢেকে সে ভাবাবেগ লুকিয়ে রাখতে চাইল।

দর্শক দু'জন, তারই সম্মানে সে অবগুণ্ঠন সরাতে চেষ্টা করল না। তারা প্রতীক্ষা করতে লাগল আনেৎ কখন শান্ত হবে। তারপর তারা এল আনেৎ-এর কাছে। মার্ক তাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল জানালার কাছে, তাকে সেখানে বসিয়ে নিজে বসল তার পাশে। সিলভী ধ্যানী বুদ্ধের ভঙ্গীতে বসে পড়ল তাদের পায়ের কাছে। ওদের দিকে তাকিয়ে সে হাসল।

তিনজন বসে রইল পৃথিবীর এই ভগ্নস্তূপের ওপর।

আনেৎ চোখ বুজে শুনতে পেল ঘণ্টাধ্বনি আর চিৎকার। পথে কারা চলেছে গান গেয়ে। সে অনুভব করল তার গালে মার্কের গালের স্পর্শ। স্বপ্ন দেখল। দুঃস্বপ্ন শেষ। দুঃস্বপ্ন প্রিয়তমের মাথার ওপর বজ্র হয়ে উদ্যত হয়েছিল, সে তো আর নেই। নেই ভারী-হয়ে-চেপে-বসা পৃথিবীর দুঃখের বোঝা, নেই ভীষণ পরীক্ষা। সেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সে তো এখনো নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। ভীরু সে, নতুন পৃথিবীর স্বাদ গ্রহণ করতে বুঝি ভয় পাচ্ছে। আবার সে নিশ্বাস ফেলতে পারবে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে···

মার্কও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যে বিপদ ঘনিয়ে আসছিল, তাকে সে তো প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি। তাকে এড়িয়ে যেতে সে চেয়েছিল, কিন্তু গর্ব দিয়েছে বাধা। কিন্তু তবু সে তো নিশ্চিন্ত নয়। তার নিজের শক্তি আর বিশ্বাসের প্রতি তার বুঝি সে আস্থাও নেই। সে শুনতে পেল বিশৃঙ্খল

জনতা চিৎকার করছে, হাসছে। বুঝতে পারল, অগ্নিপরীক্ষা তো শুধু স্থগিত রইল···কিন্তু এই যে ক'বছর সে বাঁচবে, সেই তো এখন ঢের! নিশ্বাস ফেলবার জায়গা মিলেছে এবার। সামনে রয়েছে জীবন, তাকে উপভোগ করতে হবে। সে স্বপ্ন দেখল।

সিলভী তাকিয়ে রইল স্বপ্নবিলাসীদের দিকে। সে অতীত বা ভবিষ্যতের চিন্তা করল না। এই মুহূর্তটি মধুর হয়ে দেখা দিয়েছে, আনন্দ উপচে পড়ছে। বিপদসঙ্কুল সমুদ্রযাত্রা শেষ করেছে তারা তিনজন; দাঁড় এখনো নৌকায় বাঁধা কিন্তু জল আর সে কাটবে না, এখন সে ঘুমাচ্ছে প্রশান্ত সমুদ্রের বুকে। সেও স্বপ্ন দেখল। কি সুন্দর সন্ধ্যা!

কিন্তু বাড়িটা শোকে ঝিমিয়ে রইল, পথের তুমুল হর্ষধ্বনি শুধু ফুটিয়ে তুলল তার বিয়োগান্ত নিস্তব্ধতা।

তেতলায় অধ্যাপক ঝিরের তাঁর জানালা নিশান দিয়ে সাজালেন। দুঃখে তাঁর বুক জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গেছে, তিনি এখন পাথরে গড়া মানুষ। শান্তি এসেছে, এখন তো তাঁর জীবনের মরুভূমিতে আঁকড়ে ধরবার মতো আর কিছু রইল না। স্তূপের মতো ভেঙে পড়লেই তো হয় এখন। চারতলায় বের্নাওঁারা তাদের জানালা বন্ধ করে দিলেন; বাবা আর মেয়ে গির্জায় গেলেন, গির্জার আঁধারে সান্ত্বনা খুঁজতে চললেন। আর মা বিছানায় পড়ে রইলেন। মৃত্যু তাঁর ধীরে ধীরে আসছে। দুঃখ নিয়ে এসেছে ব্যাধি; আর বের্নোওঁা প্রার্থনা করতে করতে বুঝতে পারলেন না যে তাঁর এই জীর্ণ দেহ আর নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না, ক্যানসার সেখানে তার বাসা বেঁধেছে। একতলার মদের দোকান ভরতি। কিন্তু হুমাকে সেখানে দেখা গেল না। সে পিছনের ঘরে দরজা বন্ধ করে পড়ে রইল। একা বসে বসে মদ খেল, চোখের জল ঝরে পড়ল পানপাত্রে।

আনেৎ-এর কাছে এই জীর্ণদীর্ণ জীবনের দুঃখ আর জনতার হর্ষ যেন মিশে এক সুরের সৃষ্টি করল, সে শুনতে পেল সে-সুর। তারা সবাই তো একই মায়ার ফাঁদে ধরা পড়েছে, জড়িয়ে গেছে, মাথা তাদের পড়ছে নুয়ে, ঘাতকের লাল জোব্বার নিচে তারা মুখ লুকিয়েছে। কারো কাছে সে এসেছে স্বদেশ-প্রেমের উন্মাদনার প্রতীক নিশান নিয়ে, আবার কারো কাছে বা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বা প্রেমের ধূমকেতুরূপে সে উদয় হয়েছে। যে প্রতারণা সইতে পারে না বলে ভান করে, কথার মায়ায় যার ঘৃণা, তার সেই ছেলে কি সব চাইতে বেশি

প্রতারিত হয়নি ? পৃথিবীর বিরোধ সত্বেও সে সত্যের ছায়ার কাছে নিজেকে আর মাকে বলি দিতে রাজী হয়নি ? সত্যনিষ্ঠা—হাঁ, এই বুঝি পৃথিবীর বড় মোহ ! সবাই নিজের কল্পনায় উন্মাদ—সবাই দেখছে স্বপ্ন।

হঠাৎ দেখতে পেল ; সে নিজে বিশ্বের স্বপ্নধারায় স্নান করছে, রামধনু রঙের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে। এক মুহূর্তের জন্য তার মাথা ভেসে উঠল জলের উপর। সে ঢেউয়ের কঠোর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করল, ছুঁড়ে ফেলে দিল তার মোহবন্ধন। তবে কি সে জাগবে ? এক মুহূর্তের জন্য জাগরণের পাখার ঝাপটানি শুরু হোলো তার স্বপ্নে। তার মনের চূড়ায় চূড়ায় ফাটল দিয়ে এল এক টুকরো আলো—পিছলে পড়ল চারিদিকে।

কিন্তু গালে সে অনুভব করল আর একখানা গালের স্পর্শ—তারই অস্থি-মাংস, তারই অস্থিমাংসে গড়া ছেলে তাকে বন্দী করে রেখেছে। হাঁ, সে তো ভালোবাসা আর বেদনার শৃঙ্খলে তারই সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। তার সঙ্গে আসন্ন পরীক্ষায় তাকে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। নিয়তি অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। সেই-ই তাদের একই শেকলে বেঁধেছে।

(জানি, আমি জানি সেই মূর্তিমতী বিষাদের কথা···কিন্তু আমি তো ভয়ে শিউরে উঠিনি। আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখ !···)

চোখ ফিরে এল তার দিকে—তার ছেলে—তার প্রিয় স্বপ্ন। জীবিতের চোখে আবার পড়ল তার চোখ। তার মুখে হাসি। সে আবার শুয়ে পড়ল···

'হাঁ, শীগ্‌গিরই আমরা জেগে উঠব।'

* * *

[পরবর্তী খণ্ড : 'একটি যুগের মৃত্যু']